পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ

লোকনাটক বিচারগান : বিষয় ও আঙ্গিক বৈচিত্র্য

Folkdrama Bichargan : Diversity of Themes and Forms

মো. জাহিদ হোসেন

বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সেপ্টেম্বর, ২০২৩

Dhaka University Institutional Repository

লোকনাটক বিচারগান : বিষয় ও আঙ্গিক বৈচিত্র্য

Folkdrama Bichargan : Diversity of Themes and Forms

গবেষক : মো. জাহিদ হোসেন

রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও শিক্ষাবর্ষ : ১৭/২০২০-২০২১

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক : অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর

বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সেপ্টেম্বর, ২০২৩

অনুমোদনপত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের পিএইচ.ডি. গবেষক মো. জাহিদ হোসেন (রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও শিক্ষাবর্ষ : ১৭/২০২০-২০২১) আমার তত্ত্বাবধানে **'লোকনাটক বিচারগান : বিষয় ও আঙ্গিক বৈচিত্র্য'** (Folkdrama Bichargan : Diversity of Themes and Forms) শিরোনামে পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য যে অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপন করছে, আমার জানা মতে সেটি তার নিজস্ব ও মৌলিক গবেষণার চূড়ান্ত রূপ। আমার প্রত্যক্ষ দিকনির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে গবেষক অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করেছেন। এই অভিসন্দর্ভের কোনো অংশ এর আগে কোথাও প্রকাশিত হয়নি এবং অন্য কোনো ডিগ্রির জন্য জমা প্রদান করা হয়নি। সুতরাং তার এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভের গবেষণাপত্র হিসেবে জমা দেয়ার জন্য আমি অনুমতি প্রদান করছি।

....

স্বাক্ষর ও তারিখ

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক : ড. সৌমিত্র শেখর

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও

উপাচার্য, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ।

E-mail : scpcdu@gamil.com

Whatsapp : +8801732102103

ঘোষণাপত্র

আমি মো. জাহিদ হোসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে **'লোকনাটক বিচারগান : বিষয় ও আঙ্গিক বৈচিত্র্য'** (Folkdrama Bichargan : Diversity of Themes and Forms) শিরোনামে পিএইচ.ডি. গবেষণার বর্তমান অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপন করলাম। আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও বর্তমানে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালেয়ের মাননীয় উপাচার্য ড. সৌমিত্র শেখর, যিনি আমার এই গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে আন্তরিক নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধান করেছেন। এই অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণভাবে আমার মৌলিক কর্ম। অধ্যয়ন, মাঠ-পর্যায়ে অনুসন্ধান করে প্রাপ্ত তথ্য ও অধীত বিদ্যার সঙ্গে গবেষণার সারাৎসার আমি এই অভিসন্দর্ভে নিজস্ব ভাষা ব্যবহার করে উল্লেখ করেছি। আমি ঘোষণা করছি, বর্তমান অভিসন্দর্ভের কোনো অংশ এর আগে কোথাও প্রকাশিত হয়নি অথবা প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করা হয়নি।

....

মো. জাহিদ হোসেন

রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও শিক্ষাবর্ষ : ১৭/২০২০-২০২১

Dhaka University Institutional Repository

পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ

লোকনাটক বিচারগান : বিষয় ও আঙ্গিক বৈচিত্র্য

Folkdrama Bichargan : Diversity of Themes and Forms

গবেষক : **মো. জাহিদ হোসেন**

রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও শিক্ষাবর্ষ : ১৭/২০২০-২০২১

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক : **অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর**

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের উর্বর ভূমির মতোই সমৃদ্ধ এদেশের শিল্প-সংস্কৃতি। এদেশে বহু আঙ্গিক ও রীতির সংস্কৃতির চর্চা চলমান রয়েছে। যার মধ্যে লোকসংস্কৃতি অন্যতম। লোকসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত উপাদানগুলোর মধ্যে লোকনাটক, লোকসংগীত, লোকনৃত্য, লোককৃত্য, লোকবাদ্য, লোকক্রীড়া, লোককাহিনি, গীতিকা, লোকছড়া, মন্ত্র, ধাঁধা ও প্রবাদ-প্রবচন উল্লেখযোগ্য। এগুলোর মধ্যে 'লোকনাটক' অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যা বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত ও চর্চিত। এই অভিসন্দর্ভে লোকনাটকের একটি আঙ্গিক বা ধারা হিসেবে 'বিচারগান' নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যার শিরোনাম '**লোকনাটক বিচারগান : বিষয় ও আঙ্গিক বৈচিত্র্য (Folkdrama Bichargan : Diversity of Themes and Forms)**'। বিচারগান বাংলাদেশের লোকনাটকের পরিবেশনাগুলোর মধ্যে সমৃদ্ধ একটি লোকনাট্যাঙ্গিক। যেটিকে বিষয় ও আঙ্গিকের কারণে একটি স্বতন্ত্র ধারা হিসেবে গণ্য করা হয়। পরিবেশনাটি গদ্য, কাব্য, বাদ্য, নৃত্য ও গীত সহযোগে বহু আখ্যানভিত্তিক প্রতিযোগিতামূলক সংলাপের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের ঢাকা, মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, রাজবাড়ি, শরিয়তপুর, মাদারীপুর, টাঙ্গাইল, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ ও সিলেট জেলাসহ প্রায় সারাদেশেই পরিবেশনাটি প্রচলিত রয়েছে। অভিসন্দর্ভটিতে লোকনাটক বিচারগানের বিষয় ও আঙ্গিক বৈচিত্র্যের নানাদিক নিয়ে তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরিবেশনা রীতিটিকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে 'বিচারগান' দেশের নানা অঞ্চলে নানা

Dhaka University Institutional Repository

নামে পরিচিত। তার মধ্যে ভাবগান, তত্ত্বগান, শব্দগান, বাউলগান, বাউলাগান, বাউল-বিচারগান, কবির লড়াই, ফকিরিগান, ধরাটগান, খাড়া-কাওয়ালি, বৈঠকিগান, মজলিশিগান, মালজোড়া গান ও পালাগান নাম ছাড়াও নানা নামে বাংলাদেশে পরিচিত ও প্রচলিত। তবে পরিবেশনাটির নাম 'বিচারগান'-এর পাশাপাশি বহুল পরিচিত নাম হচ্ছে 'পালাগান'। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে সহজ পরিচিতি। কেননা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু লোকপরিবেশনা 'পালাগান' নামে পরিবেশিত হয়। এক্ষেত্রে বিচারগানের জন্য পরিচিতি সংকটও তৈরি হয় বটে। তাই এই অভিসন্দর্ভে পরিবেশনাটিকে 'বিচারগান' হিসেবেই আখ্যায়িত করা হয়েছে। পুরো অভিসন্দর্ভটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভাজন করে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম 'বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতিতে লোকনাট্য : পরিচয়' এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'বাংলাদেশের লোকনাট্যে বিচারগান : ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে' শিরোনাম ধরে আলোচনা করা হয়েছে। যেখানে লোকসংস্কৃতি, লোকসাহিত্য ও ফোকলোর কী, এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন তত্ত্বের ভিত্তিতে বিচারগানের সাথে এই তিনটি তাত্ত্বিক বিষয়ের সম্পর্ক বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যেখানে দেখানো হয়েছে, বিচারগান লোকনাট্যের অন্তর্ভুক্ত, লোকনাট্য ফোকলোরের অন্তর্ভুক্ত, ফোকলোর লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত এবং লোকসাহিত্যসহ এই সবগুলো বিষয়ই লোকসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। বিচারগান যেহেতু লোকনাটকের একটি আঙ্গিক বা ধারা। তাই লোকনাটক নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, যেখানে লোকনাটককে আট ভাগে বিভাজন করে আলোচনা করা হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক লোকনাটক অন্যতম। আর প্রতিযোগিতামূলক লোকনাটকের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে বিচারগান। যেটি 'লোকনাটক বিচারগান : বিষয় ও আঙ্গিক বৈচিত্র্য' শিরোনামের অভিসন্দর্ভে প্রমাণ করা হয়েছে। লোকনাটক বিচারগান বাংলাদেশের লোকনাটকের ধারায় ক্রমবিকাশের মাধ্যমে কবিগান থেকে উৎপত্তি হয়ে বিকশিত হয়েছে। তত্ত্বীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিচারগানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমানে লোকনাটক বিচারগান সমগ্র বাংলাদেশেই প্রচলিত-চর্চিত হয়। সারাদেশে বিচারগানের পরিবেশনাগুলোতে তেমন কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না, কেবল অঞ্চলভেদে গায়েন-কুশীলবদের ভাষাগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। লোকনাটক বিচারগানের বিষয় ও আঙ্গিক বৈচিত্র্য সন্ধান ও বিশ্লেষণ হচ্ছে গবেষণার মূল বিষয়। অভিসন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়ে বিচারগানের বিষয়-বৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিচারগানে মূলত দুটি বিষয়বস্তু নিয়ে একটি পালা হয়। মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিচারগানের ৬০টির অধিক পালার সন্ধান পাওয়া গেছে। এই পালাগুলোকে অভিসন্দর্ভে পাঁচটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে- ক. ধর্ম বিশ্লেষণাত্মক পালাসমূহ খ. আত্মীয় সম্পর্কীত পালাসমূহ গ. হাস্যরসাত্মক পালাসমূহ ঘ. জীবনবৃত্তান্তমূলক পালাসমূহ ও ঙ. বিবিধ বিষয়ের পালাসমূহ। বিচারগানের প্রতিটি পালা বিষয়বস্তুর দিক থেকে স্বতন্ত্র হয়েও অন্য পালার সাথে সম্পর্কযুক্ত। এর কারণ হচ্ছে গায়েনগণ পরিবেশনাটি

Dhaka University Institutional Repository

উপস্থাপনকালে বিচিত্র বিষয়ের উদাহরণ দিয়ে থাকেন। বিচারগানের 'ধর্ম বিশ্লেষণাত্মক পালাসমূহ'-এর মধ্যে যে পালাগুলো আলোচনা করা হয়েছে, সেই পালাগুলো দর্শক-শ্রোতা ও কুশীলবদের নিকট বেশি জনপ্রিয় এবং এই পালাগুলোই সারাদেশে বেশি পরিবেশিত হয়ে থাকে। এই পালাগুলোর মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক গুরুগম্ভীরতত্ত্ব। যেখানে মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মুক্তির দিশা নিয়ে দ্বিপাক্ষিক যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে গায়েনগণ আলোচনা করে থাকেন। এই পালাগুলোতে যেমন গুরুগম্ভীরতত্ত্ব আশ্রয় করে মানুষকে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শিক্ষা দেয়া হয়, তেমনি বহু হাস্যরসাত্মক বিষয়ও আলোচনার মাধ্যমে দর্শক-শ্রোতার মনে হাসির উদ্রেক করা হয়ে থাকে। তার মানে ধর্ম বিশ্লেষণাত্মক পালাসমূহতেও নিজস্ব বিষয়বস্তুর বাইরে আলোচনা করা হয়ে থাকে। এরপর 'আত্মীয় সম্পর্কীত পালাসমূহ'-এর অন্তর্ভুক্ত পালাগুলোতে মূলত পারিবারিক, সামাজিক ও আত্মীয় সম্পর্কিত বিষয়াদিকে প্রাধান্য দিয়ে গায়েনগণ পরিবেশনা উপস্থাপন করে থাকেন। তবে এই পালাগুলোর সাথে সবচেয়ে বেশি বিষয়বস্তুর সম্পর্ক রয়েছে ধর্ম বিশ্লেষণাত্মক পালাসমূহের। অন্যদিকে বিচারগানের 'হাস্যরসাত্মক পালাসমূহ'-এর পালাগুলোতে চটুল বিষয়াদির প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। এই পালাগুলোর পরিবেশনাজুড়ে থাকে হাস্যরসের উপস্থিতি। যেখানে হাস্যরসাত্মক ঘটনা ও উদাহরণের পাশাপাশি বাংলা লোকসমাজে প্রচলিত বহু লোকগল্পের আলোচনা হয়ে থাকে। এই পালাগুলো এক শ্রেণির দর্শক-শ্রোতার নিকট যেমন জনপ্রিয় তেমনি বহু দর্শক-শ্রোতা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যও করে থাকেন। এমনকি পালাগুলো সরাসরি দর্শকসম্মুখে পরিবেশনার চেয়ে অডিও, ভিডিও এবং বর্তমানে ইউটিউব মাধ্যমে বেশি পরিবেশিত হয়ে থাকে। বিচারগানের 'জীবনবৃত্তান্তমূলক পালাসমূহ'-এর পালাগুলোতে দুজন ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক সাধুপুরুষের জীবনী নিয়ে গায়েনগণ পালা উপস্থাপন করে থাকেন। এই পালাগুলোতে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক গুরুগম্ভীরতত্ত্ব বেশি আলোচিত হয়ে থাকে। তবে বিচারগানের অন্যান্য পালাগুলোর বিষয়ও প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করেন গায়েনগণ। এছাড়া বিচারগানের 'বিবিধ বিষয়ের পালাসমূহ'-এর মধ্যে যে পালাগুলো আলোচনা করা হয়েছে সেগুলোকে মূলত সুনির্দিষ্ট বিষয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। এই পালাগুলোতেও ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক গুরুগম্ভীরতত্ত্বের পাশাপাশি চটুল ও হাস্যরসাত্মক বিষয়াদি বিদ্যমান রয়েছে। তবে অভিসন্দর্ভে আলোচিত প্রত্যেকটি পালা-ই অন্য পালার সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়েও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে আসরে পরিবেশিত হয়ে থাকে, সে বিষয়টিও প্রমাণ করা হয়েছে। বিচারগানের পালাগুলোর বিষয়-বৈচিত্র্যের পাশাপাশি পরিবেশনা-কৌশলভেদে আঙ্গিক-বৈচিত্র্যও রয়েছে। অভিসন্দর্ভের চতুর্থ অধ্যায়ে আঙ্গিক-বৈচিত্র্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে বিচারগানের পরিবেশনা-কাঠামো; বিচারগানের চরিত্র পরিচিতি; বিচারগানের কুশীলবদের অভিনয় প্রস্তুতি; বিচারগানের অভিনয় পদ্ধতি; বিচারগানের পৃষ্ঠপোষক ও কুশীলবের বায়না; বিচারগানের কুশীলবদের পোশাক ও সাজসজ্জা; বিচারগানের আসর-আসন ব্যবস্থাপনা ও সাজঘর; বিচারগানে

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র; বিচারগানে আলো, শব্দ ও দ্রব্য-সামগ্রীর ব্যবহার; বিচারগানের প্রচারণা এবং বিচারগানের বিচারক বা বিজ্ঞশ্রোতা নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এই বিষয়গুলো আলোচনার মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে বিচারগানের প্রত্যেকটি আঙ্গিকই বাংলাদেশের বহু লোকপরিবেশনার আঙ্গিকের চেয়ে অধিকতর সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময়। অভিসন্দর্ভের পঞ্চম অধ্যায়ে 'বাংলাদেশের অঞ্চলভেদে বিচারগান : বিষয় ও আঙ্গিকের পারস্পরিক তুলনা' নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যেখানে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে, বিচারগানের বিষয় যেমন বৈচিত্র্যময়, তেমনি দেশের অঞ্চলভেদে পরিবেশনাটির আঙ্গিকের বৈচিত্র্যও সুস্পষ্ট। এমনকি বিচারগানের বিষয়ের বিচারেও এর আঙ্গিক বৈচিত্র্যময়তা রয়েছে। সর্বোপরি **'লোকনাটক বিচারগান : বিষয় ও আঙ্গিক বৈচিত্র্য (Folkdrama Bichargan : Diversity of Themes and Forms)'** শিরোনামের এই অভিসন্দর্ভে মাঠ পর্যায়ের অনুসন্ধানলব্ধ তথ্য-উপাত্ত ও তত্ত্বীয় বিচার-বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি তথা লোকনাটকের একটি সমৃদ্ধ ধারা হিসেবে বিচারগানকে অভিহিত করা যায়। ধর্মনিরপেক্ষতা ও মানবতাবাদী দর্শনের সুতোয় গাঁথা লোকনাটক বিচারগানের বিষয় ও আঙ্গিক। যার বিষয়বস্তুর অধিকাংশ ধর্মনির্ভর হলেও পরিবেশনার সাথে যুক্ত গায়েন-কুশীলব ও দর্শক-শ্রোতাসহ সংশ্লিষ্ট লোকজন ধর্মনিরপেক্ষতা ও মানবতাবাদী দর্শনে বিশ্বাস করে থাকেন। এছাড়া বিচারগানের আসরে গায়েন-কুশীলবদের মূখ্য উদ্দেশ্য থাকে দর্শক-শ্রোতার মধ্যে মানবতাবাদী দর্শন প্রচার করা। যার মাধ্যমে সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। সর্বোপরি, এই অভিসন্দর্ভে এটাই প্রমাণিত হয়েছে লোকনাটক বিচারগানের বিষয় ও আঙ্গিকের বৈচিত্র্য বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যময়তারই সাক্ষ্য বহন করে। সেই সাথে পরিবেশনাটি দ্বিপাক্ষিক যুক্তি-তর্কের শৈল্পিক আঘাত-প্রত্যাঘাতের মাধ্যমে উপস্থাপিত হওয়ায় তা দর্শক-শ্রোতাকে সহনশীল মানুষ হতে উদ্বুদ্ধ করে। এছাড়া লোকনাটক বিচারগানের মূল বিষয় মানবিক মূল্যবোধের শিক্ষা, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এদেশের মানুষকে আলোকিত করে।

বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

'লোকনাটক বিচারগান : বিষয় ও আঙ্গিক বৈচিত্র্য' (Folkdrama Bichargan : Diversity of Themes and Forms) শিরোনামে যে পিএইচ.ডি. গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমি রচনা করেছি। এর পেছনে বেশ কয়েকজন মহৎ মানুষের সহযোগিতা ছাড়া তা হয়তো এতো নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে পারতাম না। বিশেষ করে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর, যিনি আমার এই গবেষণা সম্পাদনে অশেষ সহযোগিতা করেছেন। তিনি আমাকে পিএইচ.ডি.অভিসন্দর্ভের বিষয় হিসেবে এই বিষয়টি বেছে নিতে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং আমাকে গবেষণার বিভিন্ন পথ বাতলে দিয়েছেন। এই গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে তিনি আমাকে আন্তরিক পরামর্শ, তাথ্যিক-তাত্ত্বিক সহযোগিতা দান করেছেন। সর্বোপরি তাঁর অকৃপণ দিকনির্দেশনা আমাকে প্রতিনিয়ত ঋদ্ধ করেছে এবং নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে। এছাড়া যাঁদের সহযোগিতা ছাড়া আমি আমার এ গবেষণাটি কখনোই সম্পন্ন করতে পারতাম না, তাঁরা হলেন বিচারগানের গায়েন, দোহার, বাদক, পৃষ্ঠপোষক ও দর্শক-শ্রোতা, যাঁদের অনেকেই আমাকে মূল্যবান তথ্য ও তত্ত্বগত সহযোগিতা দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে আবুল সরকার মহারাজ (মানিকগঞ্জ), বড় আবুল সরকার (মুন্সিগঞ্জ), ফকির আবুল সরকার (রাজবাড়ি), অসীম সরকার (রাজবাড়ি), আরিফ দেওয়ান (ঢাকা), আব্দুর রাজ্জাক দেওয়ান (মুন্সিগঞ্জ), সুনীল কর্মকার (ময়মনসিংহ), সাত্তার সরকার (মানিকগঞ্জ), আয়নাল বয়াতি (ফরিদপুর), কিয়ামদ্দিন বয়াতি (মানিকগঞ্জ), মো. দিরাজদ্দিন (মানিকগঞ্জ), মো. আজিমদ্দিন (মানিকগঞ্জ), পারুল সরকার (মানিকগঞ্জ), আলেয়া বেগম (মাদারীপুর), মানিক দেওয়ান (ফরিদপুর), শফিউল বাশার চিশতি (মানিকগঞ্জ), কাজল দেওয়ান (ঢাকা) ও কাজী মনির সরকার (মানিকগঞ্জ) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে ব্যক্তি মানুষের পাশাপাশি বহু প্রতিষ্ঠান হতে সহযোগিতা গ্রহণ করেছি, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বাংলা বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি ও থিয়েটার অ্যান্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি, জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি এবং কেরানিগঞ্জের বামুনসুর গ্রামের দেওয়ান বাড়ি ও মানিকগঞ্জের সিংগাইরের ফকির মওলা দরবার শরিফ। আমাকে সহযোগিতা দানকারী প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সর্বোপরি আমার এই গবেষণার সকল প্রকার ভুল-ভ্রান্তি, ত্রুটি-বিচ্যুতি, ব্যর্থতা-সংকীর্ণতা আমার নিজের বলে স্বীকার করছি, তবে প্রত্যাশা করছি যে, একজন গবেষক হিসেবে আমার আর্থিক ও সময়গত সীমাবদ্ধতার জন্য আমার সব ত্রুটি ক্ষমারযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রস্তাবনা ০৮

ভূমিকা ০৯

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতিতে লোকনাট্য : পরিচয় ১৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের লোকনাট্যে বিচারগান : ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে ২৬

তৃতীয় অধ্যায়

বিচারগানের বিষয়-বৈচিত্র্য ৪০

প্রথম পরিচ্ছেদ

ধর্ম বিশ্লেষণাত্মক পালাসমূহ ৪৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আত্মীয় সম্পর্কিত পালাসমূহ ৯০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হাস্যরসাত্মক পালাসমূহ ১০৬

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জীবনবৃত্তান্তমূলক পালাসমূহ ১৪৭

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিবিধ বিষয়ের পালাসমূহ ১৭২

চতুর্থ অধ্যায়

বিচারগানের আঙ্গিক-বৈচিত্র্য ২০৮

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিচারগানের পরিবেশনা-কাঠামো ২০৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিচারগানের চরিত্র পরিচিতি ২২৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিচারগানের কুশীলবদের অভিনয় প্রস্তুতি ২২৮

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিচারগানের অভিনয় পদ্ধতি ও পর্যবেক্ষণ ২৩০

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিচারগানের পৃষ্ঠপোষক ও কুশীলবের বায়না ২৩৬

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিচারগানের কুশীলবদের পোশাক ও সাজসজ্জা ২৩৮

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিচারগানের আসর-আসন ব্যবস্থাপনা ও সাজঘর ২৪৪

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিচারগানে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র ২৪৮

নবম পরিচ্ছেদ

বিচারগানে আলো, শব্দ ও দ্রব্য-সামগ্রীর ব্যবহার ২৫০

দশম পরিচ্ছেদ

বিচারগানের প্রচারণা ২৫৩

একাদশ পরিচ্ছেদ

বিচারগানের বিচারক বা বিজ্ঞশ্রোতা ২৫৫

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশের অঞ্চলভেদে বিচারগান : আঙ্গিক ও বিষয়ের পারস্পরিক তুলনা ২৫৭

উপসংহার ২৬১

টীকা ২৬৫

পরিশিষ্ট-১ : বিচারগানের পারিভাষিক শব্দ ৩০৬

পরিশিষ্ট-২ : বিচারগানের পরিবেশনার অংশবিশেষ ৩০৭

পরিশিষ্ট-৩ : বিচারগানের আলোকচিত্র ৩৫৫

তথ্যনির্দেশ ৩৭৬

প্রস্তাবনা

বাংলাদেশ লোকসংস্কৃতির দেশ। এ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রয়েছে লোকসংস্কৃতির নানাবিধ উপাদান ও প্রতিষ্ঠান। এই সব উপাদানের মধ্যে লোকনাটক অন্যতম। বাংলাদেশে অঞ্চলভেদে নানা আঙ্গিকের লোকনাটক বিদ্যমান রয়েছে। আর এ সব লোকনাটক আঙ্গিক, রীতি, ঘটনাপ্রবাহ, রস, ধর্মীয় বিশ্বাসভেদে বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন নামে পরিচিত। এই লোকনাটকের এলাকাভেদে পরিবেশনা বৈচিত্র্যও রয়েছে । এর পরিবেশনা ভঙ্গি দেখলেই পরিবেশনা বৈচিত্র্য খুব সহজেই চোখে পড়ে। এ পরিবেশনাগুলোর মধ্যে বিচারগান অন্যতম। এছাড়াও লোকনাটকের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয় কবিগান, জারিগান, আলকাপগান, গম্ভীরাগান, পটগান, মুখানাচ, ভেলাভাসান, নৌকা বাইচ, মান্দার বাঁশ নাচ, বিভিন্ন রকম যাত্রা, বিভিন্ন প্রকারের কিস্‌সা-কাহিনি প্রভৃতি। এ সকল পরিবেশনার মাধ্যমে আমাদের দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-বেদনা, জীবনবোধ প্রভৃতির প্রকাশ ঘটায়। তাই বলা চলে এ দেশের মানুষের ইতিহাস ও ঐতিহ্য কালানুক্রমে বহন করে চলে এই সব লোকনাটকের পরিবেশনা। সুতরাং লোকনাটকের সাংস্কৃতিক গুরুত্বের পাশাপাশি রয়েছে ঐতিহাসিক গুরুত্বও। আর এক্ষেত্রে বিচারগানের গুরুত্বও সমান। বাংলাদেশের বিচারগান ক্রমবর্ধিষ্ণু পরিবেশনা। বাঙালির খুবই আকর্ষণীয় এই শিল্পমাধ্যমটি এগিয়ে নেয়ার প্রয়াস হিসেবেও যে কোনো ধরনের গবেষণার মূল্য আছে বলে মনে হয়।

চিত্র-১ : বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতিতে লোকনাটক বিচারগানের পরিবেশনার বিভিন্ন মুহূর্ত।

ভূমিকা

বাংলাদেশের যেমন রয়েছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, তেমনি এদেশের আছে বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক সৌন্দর্য। সাংস্কৃতিক সৌন্দর্য এদেশের মৃত্তিকার মতই উর্বর ও ফলবান। বিশেষ করে এদেশের লোকসংস্কৃতির রয়েছে প্রাচুর্যময় ভাণ্ডার। যে ভাণ্ডার বহু আঙ্গিক ও বৈচিত্র্যময় লোকসংস্কৃতি দ্বারা পুষ্ট ও পরিপূর্ণ। লোকসংস্কৃতির বিস্তৃত বৈভবে রয়েছে নানা আঙ্গিকের লোকপরিবেশনা। যেগুলো আবার বহুবিভাজনে স্বতন্ত্র নাম ও পরিচয়ে একে অপরের পরিপূরক হয়ে প্রদর্শিত হয়। এ সকল লোকআঙ্গিকের প্রধান প্রধান ধারার মধ্যে লোকনাটক, লোকসংগীত, লোকনৃত্য, লোককৃত্য, লোকবাদ্য, লোকক্রীড়া, লোককাহিনি প্রভৃতি অন্যতম। লোকসংস্কৃতির এই প্রধান ধারাগুলোরও রয়েছে নানান শাখা-উপশাখা। যার প্রত্যেকটি আবার স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে বিশেষ আঙ্গিক হিসেবে চিহ্নিত হয়। তবে এদেশের লোকনাটক ও লোকসংগীত একে-অন্যের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বিশেষ করে নাটক যেহেতু একটি মিশ্র ও সামগ্রিক শিল্প, তাই এতে প্রদর্শনকলা সংগীত, নৃত্য, বাদ্য প্রভৃতির যৌগ-সম্মিলন ঘটে। এই যূথবদ্ধ উপাদানের ভিত্তিতে বাংলাদেশের লোকনাটকে তাই লোকসংগীতের পরিবেশনামূলক উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। নাটক যৌগশিল্প হওয়াতেই হয়তো এদেশের লোকনাটকের আঙ্গিকগুলোর সাথে গানের গভীর সম্পর্ক দৃশ্যমান। এমনকি অধিকাংশ লোকনাটকের সাথে গান বা গীত শব্দটিও সংযুক্ত আকারে পাওয়া যায়। বর্তমানে বাংলাদেশে যে সকল লোকনাটকের আঙ্গিকগুলো অস্তিত্বশীল-ক্রিয়াশীল ও সমৃদ্ধ তারমধ্যে বিচারগান, কবিগান, জারিগান, গম্ভীরাগান, আলকাপগান, পটগান, মুখানাচ, পুতুল নাচ, মান্দার বাঁশ নাচ, ভেলা ভাসান, নৌকা বাইচ, বিভিন্ন রকম যাত্রা, বিভিন্ন প্রকারের কিস্‌সা-কাহিনি প্রভৃতি অন্যতম। তবে এগুলোর মধ্যে বর্তমানে সবচেয়ে বেশি প্রদর্শিত ও চর্চিত লোকনাটক হচ্ছে বিচারগান। লোকনাটকের এই আঙ্গিকটি বাংলাদেশের প্রায় সমগ্র অঞ্চলেই পাওয়া যায় এবং নিয়মিত প্রদর্শিত হয়ে থাকে। এদেশে যখন নাগরিক ও বৈশ্বিক সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে লোকসংস্কৃতি বিলুপ্ত হচ্ছে, তখন বিচারগান আঙ্গিকটি তার আত্তীকরণ কাঠামোর জোরে বিবর্তনমূলক প্রক্রিয়ায় ক্রমান্বয়ে বর্ধিষ্ণু ও সমৃদ্ধ হচ্ছে। বিচারগান মূলত তার কাঠামো ও কৌশলগত কারণে বেশি ক্রিয়াশীল। এছাড়া এ পরিবেশনার দার্শনিক, নান্দনিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক দিক বিবেচনায়ও বর্তমান পরিস্থিতিতে গুরুত্ব বহন করে। পরিবেশনাটি যেমন লোকসংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করছে, তেমনি নাগরিক ও বৈশ্বিক সাংস্কৃতিক আগ্রাসনকেও রুখে দিচ্ছে। অর্থাৎ বিচারগান লোকসংস্কৃতির সেই সমৃদ্ধ ধারা যেটি লোকসমাজকে ছাপিয়ে নাগরিক ও বৈশ্বিক অঙ্গনেও বিচরণশীল। যা ইতোমধ্যে দেশীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও চর্চিত।

'লোকনাটক বিচারগান : বিষয় ও আঙ্গিক বৈচিত্র্য' শিরোনামের গবেষণার প্রয়োজনে *লোক, লোকসংস্কৃতি, লোকসাহিত্য, ফোকলোর ও লোকনাট্য* সম্পর্কে আলোচনা আবশ্যক। কেননা এই বিষয়গুলোর তত্ত্বীয় পরিচয়

অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করলে লোকনাটক বিচারগান বুঝতে সহায়ক হবে। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী লোকগবেষণা বেশ সমৃদ্ধ ও বিস্তৃত। আর এই লোকগবেষণার চাবিশব্দ 'লোক' বা Folk। সাধারণত বাংলা ভাষায় Folk শব্দটির আভিধানিক অর্থ হিসেবে 'লোক' শব্দটি সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়ে থাকে। Folk-এর বাংলা শব্দ হিসেবে 'লোক' শব্দের ব্যবহার প্রসঙ্গে লোকগবেষক ড. মযহারুল ইসলাম বলেন,

> Folk অর্থে লোক যেমন উচ্চারণের দিক থেকে তেমনি অর্থের দিক থেকেও বিশেষ উপযোগী। সুতরাং Folk অর্থে লোক শব্দটির ব্যবহারে কারো কোনো আপত্তি থাকবার কথা নয়। সত্যিকারভাবে আপত্তি ওঠেও নি, কেননা বাংলাদেশে যেমন, পশ্চিম বাংলায়ও তেমনি Folk অর্থে লোক কথাটি নিঃসংকোচে সবাই মেনে নিয়েছেন। (মযহারুল, ২০২০ : ০৭)

Folk শব্দের আভিধানিক অর্থ লোক হলেও এই লোক শব্দটির অর্থগত ব্যাপক তাৎপর্য রয়েছে। কেননা এই 'লোক' মানে যে কোনো মানুষকে বোঝানো হয় না। বিশেষ শ্রেণি, পেশা ও অঞ্চলের মানুষকে লোকগবেষণায় লোক হিসেবে নির্দেশ করা হয়ে থাকে। লোক শব্দ দ্বারা সাধারণত গবেষকগণ অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত এবং যে সকল মানুষ প্রাচীন বিশ্বাস ও সংস্কারের মধ্যে বসবাস করেন তাদেরকে বোঝানো হয়। এ বিষয়ে আলীম আল রাজী বলেন,

> 'লোক' শব্দটির আভিধানিক যে অর্থ সেই সাধারণ 'লোক' বা 'ব্যক্তি' অর্থে এর প্রয়োগ সাধারণত হয় না।'লোক' শব্দ দ্বারা সংকীর্ণ অর্থে নগর-শিক্ষা, সংস্কৃতির বাইরের অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত, বিশ্বাস প্রবণ, প্রাচীন সংস্কার ও প্রথা চালিত মানুষের একটি পর্যায়কে বুঝে থাকি। ধারণা করা হয় এক সময় সমস্ত মানুষ লোক পর্যায়ভুক্ত ছিলো।(আলীম, ২০১০ : ৫)

যাহোক 'লোক' বা Folk-এর আভিধানিক অর্থ একই ঐতিহ্যের ধারক ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর বা সম্প্রদায় (এনামুল : ২০১০ : ১০৬১) বোঝায়। আর এই 'লোক' সম্বন্ধীয় সকল শিল্পকলা যখন পদ্ধতিগত আলোচনা করা হয়, তখন এই 'লোক'-এর সাথে বিভিন্ন শব্দ যুক্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বীয় বিষয়াদি পঠন-পাঠন হয়। তার মধ্যে লোকসংস্কৃতি, লোকসাহিত্য, লোকবিজ্ঞান, লোককৃত্য, লোককলা, লোককৃতি, লোকবিদ্যা, লোকতত্ত্ব, লোকযান, লোকশ্রুতি, লোকজ প্রভৃতি। এখন কথা হচ্ছে লোকনাটক বিচারগানের সাথে *লোকসংস্কৃতি, লোকসাহিত্য, ফোকলোর ও লোকনাট্য* কিভাবে যুক্ত হয়। বিশেষ করে *লোকসংস্কৃতি, লোকসাহিত্য ও ফোকলোর* এই তিন শব্দের অর্থ ও প্রয়োগ নিয়ে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে। পূর্বে *লোকসংস্কৃতি, লোকসাহিত্য ও ফোকলোর* তিনটি বিষয়কে একই মনে করা হতো কিন্তু বর্তমানে এ সংক্রান্ত গবেষণার অগ্রগতির সাথে নতুন নুতন চিন্তার অবতারণা হয়েছে। সেক্ষেত্রে দেখা যায়, অনেক গবেষক *লোকসংস্কৃতি ও ফোকলোর বা Folklore* বিষয় দুটিকে একই মনে করেন। আবার কোনো কোনো গবেষক *লোকসংস্কৃতি ও ফোকলোর বা Folklore* বিষয় দুটিকে একই অর্থে মেনে নেন না। তারা মনে করেন লোকসংস্কৃতি ও ফোকলোর এক বিষয় নয়। এছাড়া প্রমুখ লোকগবেষক *লোকসংস্কৃতি ও ফোকলোরকেই লোকসাহিত্য* মনে করেন। অবশ্য বর্তমানে আধুনিক লোকগবেষকের মতবাদের ভিত্তিতে একটি গ্রহণযোগ্য মিমাংসায় আসা যায়। এক্ষেত্রে ড. মযহারুল ইসলাম, ড. আবদুল খালেক ও ড. শরদিন্দু ভট্টাচার্যের মতামত অনেক বেশি

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। *লোকসংস্কৃতি, লোকসাহিত্য ও ফোকলোর* এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে ড. শরদিন্দু ভট্টাচার্য বলেন,

> লোকসংস্কৃতির শিল্পিত রূপ হচ্ছে ফোকলোর। ফলে লোকসাহিত্য, লোকসংগীত, লোকনাট্য, লোকবিজ্ঞান, লোকক্রীড়া, লোকাচার, লোকচিত্রসহ শিল্পে পরিণত লোকসংস্কৃতির সব অনু, পরমাণু এর অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য এই বিষয়টি নিয়ে মতভেদ আছে। ফোকলোরের সংজ্ঞা মেনে নিয়েও কেউ কেউ এর প্রতিশব্দ হিসেবে লোকসংস্কৃতি, লোকসাহিত্য, লোককায়ন, লোকশ্রুতি, লোকবাদ্য, লোকযান প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু ফোকলোর একটি স্বতন্ত্র ও বিস্তৃত বিষয়, লোকসংস্কৃতির পরই এর অবস্থান। ফলে লোকবিজ্ঞান, লোকসাহিত্য প্রভৃতি ফোকলোরের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। আর লোকসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত বিষয় ফোকলোর। (শরদিন্দু, ২০১১ : ১৩-১৪)

ফোকলোর ও লোকসংস্কৃতি যে এক বিষয় নয়, এটি সবচেয়ে জোরালোভাবে দাবি করেছেন খ্যাতিমান লোকগবেষক ড. মযহারুল ইসলাম। তাঁর মতে, লোকজীবনের প্রতিটি বিষয়ই লোকসংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি যখন শৈল্পিকভাবে উপস্থাপিত হয়, তখন হয় লোকসাহিত্য এবং সেটি যখন পালা-গীতিকায় উঠে আসে তখন তা ফোকলোর। ড. মযহারুল ইসলাম বিষয়টি বোঝানোর জন্য কিছু উদাহরণও দিয়েছেন। সে রকম উদাহরণ দিয়ে যদি বলি, বাংলার চিরায়ত চিত্র হচ্ছে গ্রামীণ নারীরা কলসীতে নদী থেকে জল ভরে আনেন। এটি লোকসংস্কৃতি। যখন এই দৃশ্য শৈল্পিক রূপে বিচারগানের কবিয়াল মাতাল রাজ্জাক লিখেছেন,

> কে গো সুন্দরি তোর রূপ দেইখা মরি
> জল ভরিয়া যাও সন্ধ্যা বেলা গো ॥
> জল ভরিয়া যাও কন্যা জলে দিয়া ঢেউ
> ফিরা ফিরা চাও কেন টুকটুকি লাল বউ
> তোরে জিজ্ঞাসি আমি ওগো কেমন তোর স্বামী
> জলের ঘাটে পাঠাইল একেলা ॥ (তপন, ২০২২ : ২৪২)

এটি হয়ে যায় তখন লোকসাহিত্য। আর এই লোকসাহিত্য যখন পালাগীতিকায় মুদ্রিত হয়, তাই হয়ে যায় ফোকলোর। বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয় ড. শরদিন্দু ভট্টাচার্যের ভাষায়, ‘লোকসংস্কৃতির কোনো একটি অংশকে যখন কেউ সচেতনভাবে পুনর্নির্মাণপূর্বক ভিন্ন ধরণের শিল্পরূপ দান করে, তখন তার নাম হয় ফোকলোর।’(শরদিন্দু, ২০১১ : ১৪) ড. শরদিন্দু ভট্টাচার্যের মতো ড. আবদুল খালেকও ড. মযহারুল ইসলামের সাথে একমত পোষণ করেছেন। আবদুল খালেক এ প্রসঙ্গে বলেন,

> ফোকলোর বিষয়টি কী এবং ফোকলোরের সীমারেখা কত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত, ভারতীয় উপমহাদেশের লেখক, পণ্ডিত, গবেষকদের কাছে তা স্পষ্ট ছিলো না। বরং ফোকলোর সম্পর্কে একটা ভ্রান্ত ধারণা ছিলো। যে কারণে দীর্ঘকাল

Dhaka University Institutional Repository

> ‘লোকসাহিত্য’-কে ফোকলোর বলে চালানো হয়েছে। লোকসাহিত্য এবং ফোকলোর যে এক বিষয় নয়, মযহারুল ইসলামের গবেষণাকর্ম থেকে তা প্রথম জানা গেল। (খালেক, ২০২২)

অর্থাৎ ড. মযহারুল ইসলামের মত মেনে নিলে বিষয়টিকে এমনভাবে বলা যায়, লোকসাহিত্য হচ্ছে ফোকলোরের অন্তর্ভুক্ত আর ফোকলোর হচ্ছে লোকসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। এই বিষয়টি মেনে নিয়ে ড. শরদিন্দু ভট্টাচার্য বলেছেন,

> লোকসাহিত্য ও লোকবিজ্ঞান যেমন ফোকলোরের একটি অন্যতম প্রধান অঙ্গ; তেমনি ফোকলোর হচ্ছে লোকসংস্কৃতির একটি অন্যতম অবিচ্ছেদ্য অংশ। লোকবিজ্ঞান, লোকক্রীড়া, লোকসংগীত, লোকসাহিত্য, লোকনাট্য প্রভৃতি যেমন একক অথবা সমষ্টিগতভাবে ফোকলোর-এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়; তেমনি গোটা ফোকলোরই অন্তর্ভুক্ত লোকসংস্কৃতির। (শরদিন্দু, ২০১৭ : ১৫)

আর গবেষণার বিষয় হচ্ছে ‘লোকনাটক বিচারগান : বিষয় ও আঙ্গিক বৈচিত্র্য।’ অর্থাৎ বিচারগান লোকনাট্যের একটি অন্তর্ভুক্ত বিষয়। তাহলে এখানে বলা যায়, বিচারগান লোকনাট্যের অন্তর্ভুক্ত, লোকনাট্য ফোকলোরের অন্তর্ভুক্ত, ফোকলোর লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত এবং লোকসাহিত্যসহ এই সবগুলো বিষয়ই লোকসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। এই পুরো বিষয়টিকে নিম্নের চিত্রে চিত্রায়িত করা যায়।

লোকসংস্কৃতি
↓
লোকসাহিত্য
↓
ফোকলোর
↓
লোকনাট্য
↓
বিচারগান

উপরিউক্ত মতবাদকে মেনে নিয়ে লোকনাটক বিচারগানের বিষয় ও আঙ্গিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে *লোকসংস্কৃতি, লোকসাহিত্য ও ফোকলোর* সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যেতে পারে। যার মাধ্যমে বিস্তারিতভাবে বোঝা যাবে *লোকসংস্কৃতি, লোকসাহিত্য ও ফোকলোরের* মধ্যে লোকনাটক ও বিচারগান অন্তর্ভুক্ত।

লোকসংস্কৃতি

সাধারণত সংস্কৃতি বলতে আমরা বুঝি মানুষের জীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আচরণ বা পদ্ধতি। মানুষের প্রতিটি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ক্রিয়াকেই আমরা সংস্কৃতি বলতে পারি। সেটা হতে পারে চিরাচরিত নিয়ম বা অপ্রস্তুত কর্ম। এমনকি সংস্কৃতি চর্চিত হয় ব্যক্তিক, সামষ্টিক বা প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে। প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি ক্রিয়াই যেমন সংস্কৃতি, তেমনি আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বা বিনোদনের উদ্দেশ্যে শৈল্পিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও সংস্কৃতি হিসেবে বিবেচ্য। অর্থাৎ যাপিত

জীবনের দৃশ্যমান এমন কোনো ক্রিয়া নেই যা সংস্কৃতির আওতার মধ্যে পড়ে না। আর সংস্কৃতির মূল ক্রিয়ানক হচ্ছে মানুষ। মানুষই হচ্ছে সকল সংস্কৃতির ধারক বা বাহক ও পরিচালক। আর এই মানুষের মধ্যে শিক্ষিত, অশিক্ষিত, নাগরিক, গ্রামীণ ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার সকলেই অন্তর্ভুক্ত। যখনই এই সংস্কৃতির আগে 'লোক' শব্দটি যুক্ত হয় তখন হয়ে যায় লোকসংস্কৃতি। এই লোকসংস্কৃতি বিষয়টি সংস্কৃতির চেয়ে কম পরিসরে প্রতিনিধিত্ব করে। কেননা 'লোক' বা Folk মানেই সুনির্দিষ্ট মানুষকে বোঝায়। বেশির ভাগ লোকগবেষকগণই লোকসংস্কৃতির 'লোক' দিয়ে সাধারণ মানুষের দিকেই নির্দেশ করেছেন। যে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অভাব রয়েছে এবং তারা সুনির্দিষ্ট অঞ্চলে বিশেষ করে গ্রামীণ জনপদে এই মানুষজন বংশপরম্পরায় বসবাস করেন। এমনকি বর্তমান প্রেক্ষাপটে বলা যায়, এমন অঞ্চলের মানুষ, যাদের মধ্যে এখনও নাগরিক সভ্যতার সকল সুযোগ-সুবিধা পৌঁছেনি, তারাই হচ্ছেন লোকসংস্কৃতির 'লোক' । এই 'লোক' সমাজের মধ্যে চর্চিত সংস্কৃতিই হচ্ছে লোকসংস্কৃতি। কোনো কোনো লোকগবেষক আবার এই লোকসংস্কৃতির 'লোক' শব্দ দ্বারা সমাজের উঁচু স্তরের মানুষের দ্বারা নিচুস্তরের মানুষের প্রতি বৈষম্যমূলক-হেয়কর পরিচায়ক শব্দ বলে মনে করেন।

এ বিষয়ে ড. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য বলেন,

> সমাজ বিবর্তনের একটি বিশেষ অংশকে আর এক অংশ যেদিন 'লোক' বলে চিহ্নিত করলো সেদিন হতেই 'লোক' কথাটি ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে ঐ বিশেষ অংশের পরিবর্তন ঘটা সত্ত্বেও আজও একটা অংশকে আর একটা অংশ 'লোক' বলে চিহ্নিত করে থাকে। (গৌরীশঙ্কর, ১৯৭২ : ৫)

গবেষকগণ 'লোক' বা লোকসংস্কৃতিকে যেভাবেই ব্যাখ্যা করুন না কেন, বর্তমান বিশ্বে লোকসংস্কৃতি গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যার চর্চা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে যথেষ্ট সমৃদ্ধ। এমনকি সভ্যতার পরিবর্তনের সাথে লোকসংস্কৃতিও পরিবর্তিত-বিবর্তিত হচ্ছে। লোকসংস্কৃতির পরিবর্তনশীলতার বিষয়ে অনুপ সাদি বলেন,

> লোকসংস্কৃতি কখনই স্থবির নয়। সমাজজীবনের জঙ্গমত্বই তার পরিবর্তনের সূচক। ফেলে-আসা সামন্ততন্ত্রী সমাজের প্রতি আবেগ জনিত স্মৃতিমেদুরতার জন্যই গবেষক ও অনুরাগী মানুষ অতীত লোকসংস্কৃতিকে অবিকৃতভাবে ধরে রাখতে চান। সমাজ পরিবর্তনের অমোঘ গতির মুখে লোকসংস্কৃতিকে লক্ষণরেখার গণ্ডিতে ধরে রাখা কোনো দেশেই সম্ভব হয়নি। লোক যেহেতু একটা প্রবাহমান ধারা, লোকসংস্কৃতিও তাই বিলুপ্ত হতে পারে না, তার রূপান্তর ঘটে। লোকসংস্কৃতির সঙ্গে প্রয়োগ শিল্প (Performing art) ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অতি। লোকসংস্কৃতির বস্তুনির্ভর উপাদানসমূহ, যেমন লোককথা, ছড়া, প্রবাদ, কথকতা, পাঁচালি প্রভৃতি সমস্তই রূপ লাভ করে অভিকরণ প্রক্রিয়ায় বা প্রয়োগ শিল্পের মাধ্যমে জারিত হয়ে। (অনুপ, ২০২১ : পত্রিকা)

এখন আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, কোন কোন লোক উপাদান নিয়ে লোকসংস্কৃতি চর্চিত-বিকশিত। লোকসংস্কৃতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত যে সব উপাদান রয়েছে, তার মধ্যে লোকসাহিত্য, ফোকলোর, লোকনাট্য, লোকসংগীত, লোকনৃত্য,

Dhaka University Institutional Repository

লোককৃত্য, লোকক্রীড়া, লোকমন্ত্র, লোকবিজ্ঞান, লোকাচার, লোকচিত্র, লোকছড়া, ধাঁধা, লোকচিকিৎসা, লোককথা, লোকবিশ্বাস, লোকযান, লোকশ্রুতি, লোকবার্তা প্রভৃতি বিষয়কে আলোচনা করা হয়ে থাকে।

লোকসাহিত্য

লোকসাহিত্য কী কিংবা লোকসাহিত্য বলতে কী বুঝায়? বিষয়টি নিয়ে সাধারণ মানুষ তো বটেই, বিজ্ঞগবেষক মহলেও বিস্তর মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন, সাধারণ মানুষের মুখে মুখে রচিত সাহিত্যই লোকসাহিত্য। আবার কোনো গবেষক বলেছেন, শুধু সাধারণ মানুষ হলেই হবে না, তাদের হতে হবে নিরক্ষর বা স্বল্প শিক্ষিত। লোকসাহিত্যের রচয়িতার বসবাসের স্থানের ক্ষেত্রেও রয়েছে মতভেদ। অনেকেই মনে করেন লোকসাহিত্যিকরা সকলেই হবেন গ্রাম্যজনপদের মানুষ, যাদের নিকট আধুনিক সভ্যতার আলো এখনও পুরোপুরি পৌঁছেনি। অবশ্য এখানেও প্রশ্ন থেকে যায়, কারণ লোকউপাদান নিয়ে কোনো শহুরে মানুষ যদি সাহিত্য রচনা করেন তাকে কী লোকসাহিত্য বলা হবে না? যদি সেটি লোকসাহিত্য না হয়, তখন তাকে কী বলা হবে? অনেকে অবশ্য নাগরিক-শিক্ষিত মানুষ কর্তৃক লোকনির্ভর রচনাকে পল্লিসাহিত্য হিসেবে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ লোকসাহিত্যের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা এখনও গবেষকমহলে নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। যেমন লোকসাহিত্যকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী বলেন,

> যে সাহিত্য লোকেদের জন্য, লোকেদের দ্বারা, লোকদের নিয়ে সৃষ্ট, তাই হল লোকসাহিত্য। স্বভাবতই এখানে 'লোক' শব্দটির কিছু ব্যাখ্যা আবশ্যক। ইংরেজিতে যাকে 'Folk' বলা হয় বাংলায় তাকেই আমরা লোক বলে থাকি। এক সংহত সমাজের মানুষ একই রূপ ভৌগলিক পরিবেশে, একই রূপ ঐতিহ্যকে স্বীকার করে নিয়ে কম বেশি যখন একই মানের জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, তখন সেই সংহত সমাজের সদস্যরা 'লোক' আখ্যায় ভূষিত হয়। লোকসাহিত্য এইরূপ সংহত সমাজে সৃষ্ট হয়। (বরুণকুমার, ১৯৯৫ : ৪০৫)

তবে অনেক লোকগবেষক মনে করেন, লোকসাহিত্য হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাহীন মানুষের দ্বারা রচিত সাহিত্য। তাদের সামান্য অক্ষরজ্ঞান থাকতে পারে। এমনকি তাদের রচিত লোকসাহিত্যের লিখিত রূপ সচরাচর থাকে না। আসলেও কী বর্তমানে লোকসাহিত্যিকদের রচনার লিখিত রূপ থাকে না? কিন্তু বর্তমানে অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, প্রায় সকল লোকসাহিত্যিকদের রচনার কোনো না কোনো সৃষ্টির লিখিত রূপ রয়েছে। সেটা পরিমাণে সামান্য হতে পারে। লোকসাহিত্যের ক্রমউন্নয়ন হচ্ছে, বর্তমানে স্বশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত এমনকি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষিত লোকজনও লোকসাহিত্য রচনা করেছেন। এ বিষয়ে গবেষক আজির হাসিবের মতামত বেশ জোরালো। তিনি বলেন,

> লোকসাহিত্য মুখে মুখে রচিত ও প্রচারিত হলেও সময়ের ব্যবধানে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাগ্রসর অবস্থার কারণে সাম্প্রতিককালে লিখিত আকারে রচনা, সংরক্ষণ ও সংকলন হয়ে থাকে। বিজ্ঞানসম্মত বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করে লোকসাহিত্যবিষয়ক নানা

গবেষণায় এর উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ নিয়ে বিস্তৃত গবেষণা সাম্প্রতিককালে হচ্ছে। শুধু যে স্বশিক্ষিত মানুষ লোকসাহিত্য রচনা করছে তা কিন্তু নয়, শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপক অগ্রযাত্রায় অ্যাকাডেমিক বা শিক্ষিত লোকদের দ্বারাও বিভিন্ন সময়ে লোকসাহিত্য রচনা করার প্রমাণও পাওয়া গেছে। (আজির, ২০২০: ১০)

তবে লোকসাহিত্যের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা অনুসন্ধানের চেয়ে এর কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যার মাধ্যমে লোকসাহিত্য সম্পর্কে সকল মতভেদ এড়িয়ে একটি সাধারণ ধারণা পাওয়া যায়। সেগুলো হচ্ছে-

১. লোকসাহিত্য প্রধানত মুখে মুখে রচিত ও সংরক্ষিত হয়।

২. লোকসাহিত্যের রচয়িতরা প্রধানত স্বশিক্ষিত, তবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায়ও শিক্ষিত হতে পারেন।

৩. লোকসাহিত্যের পটভূমি মূলত গ্রামীণ হয়।

৪. লোকসাহিত্যের অলিখিত রূপ বেশি হলেও বর্তমানে লিখিত রূপও যথেষ্ট পাওয়া যায়।

৫. লোকসাহিত্য ক্রমশ পরিবর্তিত ও আত্তীকরণ প্রক্রিয়ায় সমৃদ্ধ হয়।

৬. বর্তমানে লোকসাহিত্য গ্রামীণ অঞ্চল ছাড়িয়ে শহরাঞ্চলেও চর্চিত-বিকশিত হয়।

লোকসাহিত্যের বৈশিষ্ট্যভেদে একে অনেক গবেষক ৮ ভাগে ভাগ করে আলোচনা করেছেন। সেগুলো হচ্ছে-

ক. লোকনাটক

খ. লোকসংগীত

গ. লোককাহিনি

ঘ. গীতিকা

ঙ. ছড়া

চ. মন্ত্র

ছ. ধাঁধা ও

জ. প্রবাদ-প্রবচন

তবে বর্তমানে লোকগবেষকগণ এই বিষয়গুলো ছাড়াও লোকসাহিত্যের মধ্যে যাত্রা, লোকমহাকাব্য, লোককবিতা, লোকএপিটাফ, পুঁথি, শিকলি চিঠিসহ প্রভৃতি বিষয়কে শাখা হিসেবে মনে করেন। আর লোকসাহিত্যের লোকনাটক ও লোকসংগীতের মধ্যে লোকনাটক বিচারগান অন্তর্ভুক্ত।

ফোকলোর

ফোকলোর বা Folklore শব্দটি মূলত উইলিয়াম জন টমস্ (Willium John Toms) সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন। যা ইউরোপে শুরু হয় এবং পরবর্তীতে জার্মানীতে গ্রিম (Grimm) ভাতৃদ্বয়-এর লোকসংগ্রহের মাধ্যমে আধুনিক ফোকলোর চর্চার সূত্রপাত ঘটে। ফোকলোর যেমন নির্দিষ্ট লোকগোষ্ঠীর সামগ্রিক পরিচয় বহন করে তেমনি এটি অধ্যয়ন শাস্ত্রও বটে। ফোকলোর বা Folklore-এর বাংলা প্রতিশব্দ কী হতে পারে এ নিয়ে গবেষকমহলে বিস্তর মতভেদ রয়েছে। কেননা বাংলা ভাষায় ফোকলোর বা Folklore-এর কোনো সুনির্দিষ্ট শব্দ সর্বসম্মতিতে নির্ধারিত হয়নি। বর্তমানে ইংরেজি Folklore শব্দটি বাংলা ভাষায় হুবহু ফোকলোর হিসেবেই বেশি ব্যবহৃত হয়। ফোকলোর বিষয়টি কী, এটি সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞায় প্রকাশ করা বেশ কঠিন বললে অত্যুক্তি হবে না। এ সম্পর্কে বেশ পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায় ড. মযহারুল ইসলামের ভাষ্য থেকে, তিনি বলেন,

> ফোকলোর সাধারণ মানুষের সৃষ্টি, অশিক্ষিত মানুষ মুখে মুখে এগুলোর সৃষ্টি করে-তা যেমন দলগতভাবে সমবেত প্রয়াসে তেমনি ব্যক্তিগতভাবে ব্যক্তিগত প্রয়াসেও সৃজিত হয়- মুখে মুখেই তা প্রচারিত ও হস্তান্তরিত হয়- পূর্বপুরুষ থেকে পরবর্তী পুরুষে, এক সংস্কৃতি থেকে অন্য সংস্কৃতিতে- এক দেশ বা মহাদেশ থেকে অন্য দেশ বা মহাদেশে। ফোকলোরের কোনো কোনো উপাদান লিখিতভাবেও সৃজিত হয়, মৌখিকভাবে সৃজিত হয়ে লিখিত ঐতিহ্যে প্রবেশ করে, আবার লিখিতভাবেও সৃজিত হয়ে মৌখিক ঐতিহ্যে প্রবেশ করে। (মযহারুল, ২০২০ : ৫)

ফোকলোরের উপাদান হিসেবে লোকসাহিত্যের নানান উপাদান, লোককাহিনি, গীতিকা, লোকনাটক, লোকসংগীত, লোকনৃত্য, লোকখেলা, লোকভাস্কর্য, এপিটাফ, মারজিনালিয়া বই, শিকলী চিঠি, লেট্রিনালিয়া প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত।

এ পর্যায়ে জোরালোভাবে বলা যায় যে, *লোকসংস্কৃতি, লোকসাহিত্য ও ফোকলোরের* একটি উপাদান হচ্ছে লোকনাটক। এছাড়া আরো সুনির্দিষ্ট করে বলতে গেলে লোকসংস্কৃতির একটি উপাদান হচ্ছে লোকনাটক। কেননা লোকসাহিত্য ও ফোকলোরেরও উপাদান যেহেতু লোকনাটক, আর লোকসংস্কৃতির অন্তভুক্ত হচ্ছে লোকসাহিত্য ও ফোকলোর, তাই লোকসংস্কৃতির উপাদান হচ্ছে লোকনাটক। আর লোকনাটকের একটি আঙ্গিক বা শাখা হচ্ছে বিচারগান।

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতিতে লোকনাট্য : পরিচয়

বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি আবহমান কাল থেকেই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে দীপ্তিমান। কেননা এদেশের লোকসংস্কৃতির প্রতিটি শাখাই সমৃদ্ধ ও ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে ক্রমশ উন্নত হচ্ছে। লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্র সুবিস্তৃত ও বিভিন্ন আঙ্গিকে দৃশ্যমান হয়। লোকসংস্কৃতি কখনও গানে গীত হয়, কখনও নাটকে অভিনীত হয়, কখনও পটে অঙ্কিত হয়, কখনও হস্তে নির্মিত হয় বা কখনও নিছকই লোককৃত্যানুষ্ঠান। লোকসংস্কৃতি যেমন কালের ধারায় উৎপত্তি হয়ে ক্রমবিকাশ লাভ করেছে। তেমনি এটি বিবর্তনমূলক উপায়ে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে ও রীতিতে দৃশ্যমান হয়েছে। লোকসংস্কৃতি প্রতিনিয়তই পরিবর্তন, পরিমার্জন, পরিবর্ধনের মধ্য দিয়ে টিকে থাকে। তবে সংস্কৃতির পরিবর্তনের সাথে সাথে বা তুলনামূলক প্রভাব বিস্তারকারী সংস্কৃতির আগ্রাসনে অনেক লোকসংস্কৃতির শাখাই বিলুপ্ত হয়ে যায়। অথবা কখনও কখনও আত্তীকরণের মাধ্যমে ভিন্ন রূপে টিকে থাকে। যা লোকসংস্কৃতির জন্য একই সঙ্গে আশীর্বাদ ও অভিশাপ। আর লোকসংস্কৃতির এই সৃজনচক্রের মধ্যে অস্তিত্বশীল অনন্য শাখা হিসেবে লোকনাটক বিবেচ্য। লোকসংস্কৃতি যেমন সদা পরিবর্তনশীল, ঠিক তেমনি লোকনাটকও প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়ে এক রূপ থেকে আরেক রূপে চিহ্নিত হয়। এমনকি লোকনাটক বিভিন্ন সময়ে তার অবস্থানের পরিবর্তন ঘটিয়ে আজও টিকে আছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে লোকনাটক কী? নাট্যগবেষকগণ নানাভাবে এই লোকনাটককে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তবে একেবারে সহজভাবে বললে, নির্দিষ্ট লোকসমাজের অভিনীত নাটকই লোকনাটক। এ প্রসঙ্গে আলীম আল রাজী বলেন, " 'লোক' দ্বারা অভিনীত 'নাট্য'ই হলো আমাদের লোকনাট্য। লোকনাট্য কতটা প্রাচীন তা নাট্যশাস্ত্রে পাওয়া যায়। নাট্যশাস্ত্রের প্রথম অধ্যায়ে ভরতমুনি নাটককে 'লোকবৃত্তানুকরণ' বলেছেন।" (আলীম, ২০১০ : ১৮) লোকসংস্কৃতি যেহেতু কোনো নির্দিষ্ট লোকসমাজের ঐতিহ্যগত ধারায় সৃজন ও পরিবেশিত হয়। অন্যদিকে লোকনাটকও 'লোক' দ্বারা লোকসমাজে অভিনীত ও পরিবেশিত হয়। লোকনাট্য সম্পর্কে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন, "গ্রামীণ সমাজের জনসাধারণের জীবন অবলম্বন করে যে নাট্যধর্মী রচনা মুখে মুখে রচিত হয়ে মুখে মুখেই প্রচারিত হয় তাই লোকনাট্য।"(আশুতোষ, ১৩৭৪ : ৮) অর্থাৎ লোকনাটকের সাথে গ্রামীণ সমাজের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে এবং এই পরিবেশনার মধ্যে নাটকীয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিদ্যমান। যেখানে গল্প, সংলাপ, অভিনয়, চরিত্রসহ নাটকের সকল উপাদানের উপস্থিতি রয়েছে। এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে লোকনাট্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পাণ্ডুলিপিহীন মুখে মুখে রচিত হয়ে মুখে মুখেই পরিবেশনাগুলো প্রদর্শিত ও প্রচলিত হয়। লোকনাট্য কি ও এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন, গবেষক মোহাম্মদ সাইদুর , তিনি বলেন–

> লোকনাট্য কলা বলতে এমন এক জাতীয় গীতাভিনয় ও অভিনয় কলার কথা বলা হয়েছে– যে কাহিনীর রচক, গীতাভিনয়ের দর্শক, শ্রোতা, কলাকুশলী, পাত্র-পাত্রী থেকে নর্তক-নর্তকী, গীতক-বাদক সবাই পল্লীর সাধারণ নিরক্ষর ও সামান্য অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন লোকসমাজ। এ জাতীয় কাহিনী-কলার অভিনয় বা নাটকীয় কোন ফর্ম বা লিখিত রূপ নেই। প্রাচীন কাল থেকেই এ কলার বিভিন্ন কাহিনী ও রূপ সাধারণ মানুষের স্মৃতি ফলকে রক্ষিত হয়ে যুগের পর যুগ শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগুলি আজ পর্যন্ত চলে আসছে। সে দিক থেকে এ কলা যেহেতু সাধারণ লোকসমাজে উদ্ভুত ও সাধারণ লোকসমাজেই এর ব্যাপ্তি সুতরাং একে 'লোকনাট্য কলা' বলাই শ্রেয়। (সাইদুর, ১৯৯৯ : ১৩৩-১৩৪)

লোকনাটক সাধারণ মানুষের মুখে মুখে রচিত হয়ে ঐতিহ্যগত ধারায় কিংবা বংশ পরম্পরায় গ্রামীণ পরিবেশে চর্চিত হয়, এ বিষয়টি নিয়ে গবেষকমহলে কোনো মতভেদ নেই। তবে বর্তমানে লোকনাট্যের সৃজনে বেশ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এখন অনেক লোকনাট্যের গায়েন-কুশীলবের মুখে মুখে রচনার পাশাপাশি লিখেও লোকনাটক রচিত হচ্ছে। তাছাড়া গবেষক মোহাম্মদ সাইদুর বলেছেন, লোকনাট্যের কোনো লিখিত রূপ নেই। এ কথাটিও এখন আর লোকনাট্যের ক্ষেত্রে যথার্থ নয়। বাংলাদেশের বহু লোকনাট্য দল ও গায়েনের নিকট লোকনাট্যের লিখিত রূপ পাওয়া যায়। বিশেষ করে লোকনাট্য যাত্রার পাণ্ডুলিপি ছাড়া তো এই ধারার লোকনাট্যের পরিবেশনার কথা চিন্তাই করা যায় না। আর লোকনাটক বিচারগানের প্রায় প্রত্যেক গায়েন ও তার দলে পরিবেশনার জন্য প্রয়োজনীয় গান ও তত্ত্বকথা তাদের ডায়েরি ও খাতায় লিখিত আকারে থাকে। এ বিষয়ে সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের মতামত অধিক গ্রহণযোগ্য। তিনি লোকনাট্যের সংজ্ঞায় বলেছেন,

> লোকনাট্যের কোনো সংজ্ঞা নির্মাণের আগে লোক বা Folk কথাটির বুৎপত্তি বিচার করা প্রয়োজন। ব্রিটানিকা বিশ্বকোষ 'লোক' কথাটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে "শহুরে সংস্কৃতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে অবস্থিত অশিক্ষিত অথবা স্বল্পশিক্ষিত গ্রামীণ জনগোষ্ঠী"-কে বুঝিয়েছে। লোকনাট্য এই সব মানুষজনের জন্য এবং মানুষজনকে নিয়ে রচিত এবং অভিনীত নাটক। আপাতঃ দৃষ্টিতে সাধারণ মানুষজনের আবেগকে ধারণ করে, তাদের ব্যবহৃত অথবা সহজবোধ্যভাষায় এবং আদিম পর্যায়ের সামাজিক উৎসবানুষ্ঠানের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি, বিশেষ করে সমষ্টিক আবেগ সঞ্চারণের উদ্দেশ্যে লিখিত নাটককে লোকনাট্য বলা হয়। (মনজুরুল, ১৯৯৯ : ১৮৭)

এখানে গবেষকের মাধ্যমে স্পষ্ট হয় যে, লোকনাট্যের লিখিত রূপ আছে। কিন্তু তার কথায় আবার লোকনাট্যের চর্চিত এলাকা হিসেবে গ্রামীণ এলাকাকে নির্দেশ করে। এমনকি তিনি শহুরে সংস্কৃতি ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরের অশিক্ষিত ও স্বল্প শিক্ষিত লোকের নাট্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। গবেষকের এই কথাটি পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা লোকনাট্যের অধিকাংশ কুশীলব অশিক্ষিত বা স্বল্প শিক্ষিত কথাটি ঠিক থাকলেও বর্তমানে বহু লোকনাট্য দলের কুশীলবদের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষিত তো বটেই কেউ কেউ উচ্চ শিক্ষিতও রয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বিচারগানের গায়েন জালাল সরকার সাধু (মানিকগঞ্জ), নজরুল ইসলাম বয়াতি (ঝিনাইদহ), কাজী মনির সরকার (মানিকগঞ্জ) প্রত্যেকেই বি.এ পাশ।

এছাড়া বর্তমানে লোকনাটক বিচারগানের তরুণ গায়েন যারা রয়েছেন প্রায় প্রত্যেকেই প্রাতিষ্ঠানিকভাব শিক্ষিত। অর্থাৎ বর্তমানে অশিক্ষিত ও স্বল্প শিক্ষিত লোকের পাশাপাশি উচ্চ শিক্ষিত লোকের মধ্যেও লোকনাটক চর্চিত-বিকশিত হচ্ছে। লোকনাট্যকে বোঝার জন্য এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, বেশির ভাগ লোকনাট্যাঙ্গিকই ধর্মীয় কৃত্যনির্ভর হয়ে থাকে। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি পরিবেশনাই কোনো না কোনোভাবে ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে যুক্ত। একথাও সত্য ধর্মনিরপেক্ষ বহু লোকনাট্যাঙ্গিকও রয়েছে। লোকনাট্যের সাথে ধর্মের সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে Atiqul Huque Chowdhury বলেন,

> The contents of Folk drama are generally religious. Even in cases where humanity and human elements are the subject matter, the universal ideals of religion are strongly and predomintly demonstrated in those places. (Atiqul, 1999 : 164)

এ কথা স্পষ্ট যে, লোকনাট্যের সাথে ধর্মীয় কৃত্যাচারের সম্পর্ক প্রাচীন ও সুগভীর। এমনকি এই ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে বাংলায় যুগে যুগে বহু লোকনাট্যাঙ্গিকের উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছে। যেমন, যখন বাংলাদেশে (পূর্ববঙ্গ) হিন্দু জনসংখ্যা বেশি ছিলো, তখন রামযাত্রা, কৃষ্ণযাত্রা বেশি পরিবেশিত হতো। আর এখন বাংলাদেশে মুসলিম জনসংখ্যার আধিক্যের কারণে গাজীর যাত্রা, কারবালার যাত্রার মতো ইসলামধর্ম সম্পর্কিত লোকনাট্য পরিবেশনার সৃষ্টি হয়েছে এবং বর্তমানে এই পরিবেশনাগুলো নিয়মিত চর্চিত হচ্ছে।

তবে লোকনাটকের কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার মাধ্যমে লোকনাটকের আঙ্গিক ও রীতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। নিম্নে এ রকম কতগুলো বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা হলো:

১. লোকনাটক প্রধানত গ্রামীণ লোকসমাজে ঐতিহ্যগতভাবে উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ লাভ করে। যে পরিবেশনার কোনো লিখিত নাটলিপি বা পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় না। কুশীলব ও দর্শক-শ্রোতা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের সাধারণ মানুষ। যাদের বেশির ভাগেরই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই।

২. লোকনাটকের চর্চা ও প্রসারে বংশ-পরম্পরা বা গুরু-শিষ্য পরম্পরার ভূমিকাই প্রধান। এর কাহিনি ও ঘটনা মূলত লৌকিক ও পৌরাণিক। পরিবেশনা কাঠামো দ্বন্দ্বনির্ভর নয়। লোকনাটকের ঘটনা বা কাহিনি সরলরৈখিকভাবে বিন্যাসকৃত। যার প্রতিটি মুহূর্ত শিল্পরসের বুননে গাঁথা।

৩. লোকনাটকের ঘটনা ও চরিত্রগুলোও সাধারণ মানুষের জীবন-যাপন ও বাস্তবতানির্ভর। যেখানে সাধারণ মানুষের গল্প-কথা, দুঃখগাঁথায় পরিপূর্ণ থাকে।

৪. লোকনাটকের মঞ্চ বা আসর ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পরিবেশনা অঞ্চলের স্থানীয় উপাদান ও উপকরণের ভিত্তিতেই নির্মিত হয়। আসরের আকার সাধারণত উন্মুক্ত। তবে বর্গাকার, আয়তকার ও ত্রিভুজাকার আসরও হয়।

৫. লোকনাটকের পরিবেশনায় কাব্য-গীত-নৃত্য-বাদ্য এই চারের উপস্থিতি আবশ্যিকভাবেই প্রায়ই থাকে। সেই সাথে গায়েন, ডায়না, দোহার ও বাদক চরিত্রেরই উপস্থিতি লক্ষণীয়।

৬. লোকনাটকের বিষয় বা গল্পের উৎস হিসেবে ধর্মীয় বিশ্বাস-কাহিনি, লৌকিক কাহিনি ও পৌরাণিক কাহিনির সম্মিলনে ঘটে।

৭. লোকনাটকের আঙ্গিকে অঞ্চলভেদে স্থানীয় অঞ্চলের ভাষা, পোশাক ও সংস্কৃতির প্রাধান্য থাকে।

৮. লোকনাটক পরিবেশনার মূল উদ্দেশ্য থাকে ধর্মীয় ও সামাজিক সম্প্রীতির বাণীর প্রচার এবং প্রতিটি পরিবেশনার কুশীলব ও দর্শক-শ্রোতা সম্প্রীতির সাথে অংশগ্রহণ করেন।

৯. লোকনাটকের পরিবেশনার পৃষ্ঠপোষক মূলত স্থানীয় জনগণের বারোয়ারি প্রয়াস ও ধনাঢ্য শৌখিন মানুষ।

১০. লোকনাটক যেমন কালের স্রোতধারায় অলিখিতভাবে উৎপত্তি হয়। তেমনি কালক্রমে বিলুপ্ত হয় কিংবা পরিবর্তিত হয়ে নতুন কোনো আঙ্গিকে চর্চিত হয়।

উপরিউক্ত আলোচনা ও গবেষকদের মতামতের ভিত্তিতে লোকনাটককে চিহ্নিত করতে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে, লোকসমাজে সৃজিত, বিকশিত ও চর্চিত নাট্যই লোকনাট্য। লোকনাট্যের কুশীলবগণ অশিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চ শিক্ষিতও হতে পারে। যাদের বেশির ভাগ গ্রামাঞ্চলে বসবাস করলেও কেউ কেউ শহরাঞ্চলেও বসবাস করেন। লোকনাট্যের পাণ্ডুলিপি প্রধানত মুখে মুখে রচিত ও প্রচারিত হলেও লিখিত পাণ্ডুলিপিও তৈরি হয় এবং গুরু-শিষ্য পরম্পরায় হস্তান্তরিত হয়ে টিকে থাকে। এছাড়া লোকনাট্যের বিষয়বস্তুর অধিকাংশই ধর্মসম্পর্কিত, তবে ধর্মনিরপেক্ষ ও লৌকিক বিশ্বাসনির্ভর লোকনাট্যও রয়েছে। বিশেষত লোকনাট্যের কুশীলবগণ নারী ও পুরুষ হয়ে থাকে। অবশ্য বহু লোকনাটকের দল রয়েছে যেখানে হিজড়ারাও যুক্ত থেকে পরিবেশনায় অংশগ্রহণ করেন। সর্বোপরি লোকনাটক লোকসমাজে সৃজিত ও পরিবেশিত হলেও এর আবেদন লোকসমাজ ছাড়িয়ে নাগরিক জীবনেও আরো বেশি পরিমার্জিত রূপে নিজস্ব আঙ্গিকে চর্চিত হয়।

যাহোক লোকনাটক লোকসংস্কৃতির এমন একটি শাখা যার মধ্যে আবার রয়েছে অসংখ্য আঙ্গিক ও রীতির লোকনাটক। বিভিন্ন লোকনাট্যগবেষকগণ আঙ্গিকভেদে লোকনাটককে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। এক্ষেত্রে দেখা যায়, গবেষক মাহবুব আলম বেগ লোকনাট্যের আঙ্গিকগত পার্থক্যের ওপর ভিত্তি করে লোকনাট্যরীতিকে পাঁচ শ্রেণিতে ভাগ করেছেন,

> ১. পৌরাণিক বা ধর্মীয় বিষয়ক কাহিনী অবলম্বনে লোকনাট্য; অথাৎ রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের ভক্তিভাবমূলক ঘটনা অবলম্বনে রচিত। যেমনঃ রাম-সীতার পালা, সীতার বনবাস, রাজা হরিশ্চন্দ্র, কৃষ্ণলীলা, আদ্যের গম্ভীরা (শিব অবলম্বনে রচিত) ইত্যাদি।

২. লৌকিক দেব-দেবী ও পীর মাহাত্মমূলক কাহিনী অবলম্বনে রচিত। যেমন: মনসা মঙ্গল, ভাসান যাত্রা, গাজীর গান, সত্যপীরের পালা, বনদূর্গার পালা ইত্যাদি।

৩. রূপকথা বা উপকথামূলক কাহিনী অবলম্বনে রচিত। যেমন: মদন কুমার-মধুমালার পালা, ডালিম কুমার পালা, কাঞ্চনমালার পালা, রূপবান-রহিম বাদশার পালা ইত্যাদি।

৪. সামাজিক জীবন আশ্রিত রচিত লোকনাট্য। যেমন: বাদিয়ানীর পালা, ধোপার পাট, মইশাল বন্ধু, গুনাই, ফুলমতির পালা ইত্যাদি।

৫. ব্যঙ্গরসাত্মক কাহিনী অবলম্বনে রচিত। যেমন: আলকাপ ইত্যাদি। (মাহবুব, ১৯৯৯ : ১৫৩)

লোকনাট্যের এই শ্রেণিকরণটি মূলত করা হয়েছে ধর্মীয়, লৌকিক, সামাজিকসহ নানা কাহিনিকে বিবেচনায় রেখে। তবে লোকনাট্যকে প্রধানত দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত, ধর্মীয় কৃত্যনির্ভর ও দ্বিতীয়ত লৌকিক কৃত্যনির্ভর। এই দুই ভাগে অবশ্য লোকনাট্যকে আলোচনা করতে গেলে বিস্তারিত বিশ্লেষণে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। এক্ষেত্রে লোকনাট্যের পরিবেশনাস্থল, পরিবেশনা-কৌশল ও পরিবেশনা উপাদানের ওপর ভিত্তি করে লোকনাট্যকে আট ভাগে ভাগ করা যায়। লোকনাট্যগবেষক সাইদুর রহমান লিপন ও আলীম আল রাজী লোকনাট্যকে আট ভাগে ভাগ করেছেন। লোকনাট্যের শ্রেণিকরণ প্রসঙ্গে সাইদুর রহমান লিপন বলেন,

> অভিনয় উপাদানের প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্য এবং পরিবেশনার আঙ্গিকগত বৈচিত্র্যের দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের লোকনাট্যকে নিম্নোক্ত আটটি শ্রেণির অভিনয়রীতির মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। ক. বর্ণনাত্বকরীতি (যা কথানাট্য নামেও কেউ কেউ আলোচনা করেছেন) খ. সংলাপত্বকরীতি গ. মিশ্ররীতি ঘ. নাটগীতরীতি ঙ. অধিব্যঞ্জনাত্বকরীতি বা অধি-ব্যক্তিকরীতি চ. প্রতিযোগিতামূলক ছ. শোভাযাত্রামূলক এবং জ. কথনরীতি। (সাইদুর, ২০১০ : ৭)

এই আট রীতির লোকনাটক সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার করলে লোকনাটক বিচারগান কোনো রীতি বা আঙ্গিকের মধ্যে পড়ে, সেটি বুঝতে সহায়ক হবে।

ক. বর্ণনাত্মকরীতির লোকনাটক

বাংলা লোকনাট্যের ধারায় বর্ণনাত্মকরীতির পরিবেশনাগুলোতে মূলত এক বা একাধিক প্রধান কুশীলবগণ কথায় বা গানে গানে নাট্যের কাহিনি বর্ণনা করেন। বর্ণনাত্মকরীতির লোকনাট্যে যিনি প্রধান গায়েনের ভূমিকা পালন করেন তাকে ‘কথক’ বা Story teller বলা হয়ে থাকে। লোকনাটক তথা লোকসংস্কৃতির এই ‘কথক’ প্রসঙ্গে ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী বলেন,

> লোকসংস্কৃতরি আঙ্গিনায় ‘কথক’ বলতে বুঝি Story teller কে, গল্প বলে যে তাকে। একেই ইংরেজিতে Infomant ও বলা হয়। তাই বলে যে কোনো গল্প বলিয়েকেই ‘কথক’ আখ্যায় আখ্যায়িত করা যাবে না। পরিশীলিত গল্প বা মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত গল্প এঁরা বলেন না, এঁরা বলেন লোককথা, মৌখিকভাবে যা সৃষ্ট। (বরুণকুমার, ২০০৯ : ১৩)

বর্ণনাত্মকরীতির লোকনাট্যে অবশ্য সহায়ক অভিনেতা হিসেবে দোহার ও যন্ত্রীদল মূলগায়েনের সাথে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেন। পরিবেশনায় মূলগায়েন গদ্য, পদ্য, গীত ও বাদ্যের সহায়তায় কাহিনি বর্ণনা করেন। এ সময় কখনও কখনও মূলগায়েন নেচে নেচেও দর্শকসম্মুখে কাহিনি উপস্থাপন করেন। বর্ণনাত্মক রীতির লোকনাট্যের মধ্যে জনপ্রিয়তম পরিবেশনাগুলো হচ্ছে, ময়মনসিংহ অঞ্চলের নানা রকম কিস্‌সা-কাহিনি, রাজশাহী অঞ্চলের গম্ভীরাগান, এছাড়া নামকীর্তন, লীলাকীর্তন, রামায়ণগান, গাজীরগানসহ বহু লোকনাট্য পরিবেশনা দেশে রয়েছে।

খ. সংলাপাত্মকরীতির লোকনাটক

বাংলাদেশে চর্চিত ও পরিবেশিত লোকনাট্যের মধ্যে সংলাপাত্মকরীতির লোকনাটক সব চেয়ে বেশি জনপ্রিয়। এই রীতির পরিবেশনায় কুশীলবদের মধ্যে অভিনয়ে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সুযোগ বেশি থাকে। কারণ এই রীতির লোকনাট্যের মূলগায়েনের বর্ণনার চেয়ে কুশীলবদের সংলাপ বা কথোপকথন বেশি হয়। কুশীলবগণ মূলত উত্তম পুরুষে সংলাপ পরিবেশন করেন। সংলাপাত্মকরীতির লোকনাট্যের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় পরিবেশনা হচ্ছে নানা প্রকারের যাত্রা। বিশেষ করে কৃষ্ণযাত্রা, রামযাত্রা, বেহুলার ভাসান যাত্রা, মনসাযাত্রা, গাজীর যাত্রা, কারবালার যাত্রা, ইমামযাত্রা, রহিম-রূপবান যাত্রা, অষ্টকযাত্রা, নৌকা বিলাস যাত্রাসহ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই রীতির লোকনাটক সংলাপনির্ভর হলেও গান, কাব্যও থাকে।

গ. মিশ্ররীতির লোকনাটক

বাংলাদেশে প্রচলিত লোকনাট্যাঙ্গিকগুলোর মধ্যে মিশ্ররীতির লোকনাটকই বেশি পরিবেশিত হয়। এই আঙ্গিক বা ধারার লোকনাটকের অভিনয় প্রক্রিয়া বেশ সমৃদ্ধ, কারণ লোকসংস্কৃতির প্রায় সকল প্রকার উপাদানের উপস্থিতি এখানে রয়েছে। মিশ্ররীতির লোকনাট্যে সংলাপ ও বর্ণনাত্মক এই দুই রীতির অভিনয়ের মাত্রা প্রায় সমান। এই রীতিতে সংলাপ ও বর্ণনার পাশাপাশি গদ্য, পদ্য, গীত, নৃত্য ও বাদ্যের উপস্থিতি রয়েছে। তবে এই রীতির নাট্যে সংলাপ ও বর্ণনা না থাকলেও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের জন্যও একে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায়। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ জামিল আহমেদ বলেন, '...বর্ণনামূলক অথবা চরিত্রাভিনয় দ্বারা কোনো কাহিনী/ঘটনা উপস্থাপিত না হলেও নাট্যের অপর সকল বৈশিষ্ট্য লক্ষনীয় এ জন্যই এসকল অনুষ্ঠান রীতিকে 'মিশ্রনাট্য' আখ্যায়িত করা হয়েছে।' (জামিল, ১৯৯৫ : ৩২) অর্থাৎ লোকনাট্যের সকল উপাদান ও খুব সহজে প্রয়োগ করা যায়। মিশ্ররীতির লোকনাট্যের মধ্যে

ময়মনসিংহ অঞ্চলের গীতিকাসমূহ বেশি প্রচলিত। এছাড়া গাজীরগান, পদ্মাপুরাণ, লক্ষ্মীর গান, জঙ্গজারি, সঙযাত্রা, খৎনার গান বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য।

ঘ. নাটগীতরীতির লোকনাটক

লোকনাট্যের অভিনয় উপাদানের উপরে ভিত্তি করে বিভাজিত লোকনাটকগুলোর মধ্যে নাটগীতরীতির লোকনাটক বাংলাদেশে খুব কম প্রচলিত। নাটগীতরীতির লোকনাটক সম্পর্কে সৈয়দ জামিল আহমেদ বলেন,

> ‘কথানাট্য’ রীতির একক কুশীলবকৃত বর্ণনাত্মক অভিনয়ের বিপরীতে ‘নাটগীত’ রীতির পরিবেশনা একাধিক অভিনেতা/অভিনেত্রী নৃত্য, গীত সংলাপ এবং কিছু কিছু গদ্য সংলাপের সাহায্যে কাহিনীর চরিত্রসমূহকে রূপদান করেন। ‘কথানাট্য’ রীতির মত ‘নাটগীত’ রীতির পরিবেশনায়ও কথক গীতের মাধ্যমে কাহিনী বর্ণনা ও প্রাত্যহিক গদ্যে ব্যাখ্যা করে থাকেন এবং একদল উপবিষ্ট দোহার ও যন্ত্রী নৃত্য ও গীত অংশে সহযোগিতা দান করেন। (জামিল, ১৯৯৫ : ১৬)

তবে এ রীতির প্রধান অভিনয় উপাদান হচ্ছে নাচ ও গান। পরিবেশনায় নাচ ও গানের মাধ্যমেই পুরো আখ্যান দর্শকসম্মুখে উপস্থাপিত হয়। নাটগীতরীতির লোকনাটকে নাচ ও গানের আধিক্য সম্পর্কে আলীম আল রাজী বলেন,

> নাটগীতে সংলাপাত্মক রীতির প্রায় সবগুলোই নাচের এবং গানের হয়ে থাকে। মনসা বিষয়ক ‘বেইল্যা নাচানী’, কৃষ্ণ বিষয়ক ‘মণিপুরী রাশনৃত্য’, পূর্ব ময়মনসিংহ অঞ্চলে শিবকালী বিষয়ক ‘শিবনাচ’, নাটোর অঞ্চলের নাথ বিষয়ক ‘যোগীর গান’ উল্লেখযোগ্য। (আলীম, ২০১০ : ১১)

ঙ. শোভাযাত্রামূলক লোকনাটক

ধর্মীয় ও লৌকিক বিশ্বাসে মানুষ যখন কোনো বিশেষ আচার-অনুষ্ঠান দলবদ্ধভাবে বিভিন্ন সাজে সজ্জিত হয়ে শোভাযাত্রা করে তখন তাকে শোভাযাত্রামূলক লোকনাটক হিসেবে অভিহিত করা যায়। এ রীতির নাট্যে কোনো সংলাপ বা বর্ণনা মূখ্য বিষয় নয়। অভিনেতা-অভিনেত্রীগণ মূলত চলন্ত অবস্থায় নানান দৃশ্যের অবতারণা করেন। যেখানে থাকে দেব-দেবীর প্রতিমা, প্রতিচ্ছবি বা দেব-দেবীর সাজে সজ্জিত নারী-পুরুষ, ধর্মীয় কোনো ঘটনার ঐতিহাসিক চিত্রায়ন বা জাতিগত অনুষ্ঠানের আনন্দ মিছিলসহ প্রভৃতির দৃশ্যায়ন। এ রীতির লোকনাট্যের পরিবেশনাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, রথযাত্রা, জন্মাষ্টমীর মিছিল, মহররমের তাজিয়া মিছিল, পহেলা বৈশাখের মঙ্গল শোভাযাত্রা, গাওয়াল শিন্নির চাল সংগ্রহ, নৌকা বাইচে ময়ূরপঙ্খিনৌকা ভাসান ও নীলের গাজন অন্যতম।

চ. অধিব্যক্তিকরীতির লোকনাটক

বাংলা লোকনাট্যাঙ্গিকগুলোর মধ্যে অধিব্যক্তিকরীতির লোকনাটক বেশ চমকপ্রদ পরিবেশনা। কেননা পরিবেশনাগুলোতে অভিনেতা-অভিনেত্রীগণ মঞ্চে বা আসরে প্রত্যক্ষভাবে দর্শকসম্মুখে উপস্থিত হন না। অভিনেতা-অভিনেত্রীগণ পুতুল বা মুখোশের অন্তরালে থাকেন, সেখান থেকে পুতুল বা মুখোশের মাধ্যমে নাট্যের গল্প বা বিষয়বস্তুর অবতারণা করে থাকেন। মূল বিষয়টি হচ্ছে অধিব্যক্তিকরীতিতে অভিনেতা-অভিনেত্রীকে ছাড়িয়ে যখন কোনো দ্রব্য-সামগ্রী আসরে দৃশ্যমান হয়ে নাটকের গল্প তৈরি করে তাই অধিব্যক্তিকরীতির লোকনাটক। অধিব্যক্তিকরীতির লোকনাটকের মধ্যে নানা রকম পুতুল নাচ অন্যতম পরিবেশনা। এছাড়াও মুখানাচ, কালিকাচ, গাজীরপট ও মহেশখেলা অধিব্যক্তিকরীতির লোকনাটক।

ছ. প্রতিযোগিতামূলক লোকনাটক

বাংলা লোকনাটকের বৈচিত্র্যময় আঙ্গিকগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক লোকনাটক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কারণে নাট্যকলার পঠন-পাঠন ও গবেষণাঙ্গণে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। এ রীতির লোকনাটক যেমন বাংলা অঞ্চলের বিরল পরিবেশনা, তেমনি বিশ্বনাট্যাঙ্গনেও স্বল্প প্রচলিত নাট্যপরিবেশনা। প্রতিযোগিতামূলক লোকনাট্যের মূল বিশেষত্ব হচ্ছে এই পরিবেশনায় কোনো বিষয়ের ওপর কুশীলবদের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক প্রতিযোগিতা হয়। এই নাট্যিক প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে কুশীলবদের এক পক্ষের অন্য পক্ষকে পরাজিত করতে হয়। এমনকি কোনো কোনো পরিবেশনায় রীতিমতো বিচারকও থাকেন। যারা পরিবেশনায় অংশগ্রহণকারীদের অভিনয়, সাজ-সজ্জা, যুক্তিতর্ক, তত্ত্বকথার ওপর ভিত্তি করে এক পক্ষকে বিজয়ী ঘোষণা করেন। বাংলাদেশে প্রতিযোগিতামূলকরীতির লোকনাটকের মধ্যে প্রাচীনতম লোকনাটক হচ্ছে কবিগান। তবে এই আঙ্গিকটি এখন প্রায় বিলুপ্তির পথে। বর্তমানে বিচারগান হচ্ছে প্রতিযোগিতামূলক লোকনাট্যের সবচেয়ে সমৃদ্ধ প্রচলিত ও জনপ্রিয় পরিবেশনা। লোকনাটক বিচারগানই এই অভিসন্দর্ভের মূল আলোচ্য বিষয়। এখানে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, লোকনাটক বিচারগান *লোকসংস্কৃতি, লোকসাহিত্য, ফোকলোর ও লোকনাটক* এই প্রত্যেকটি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত একটি উপাদান। যেটি প্রতিযোগিতামূলক পদ্ধতিতে দর্শকসম্মুখে পরিবেশিত হয়। এ সম্পর্কে পরবর্তিতে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। যাহোক, বাংলাদেশের প্রতিযোগিতামূলক লোকনাটকের মধ্যে কবিগান, বিচারগান ছাড়াও পাইল্যাযাত্রা ও ভাসান-পালাগানসহ প্রভৃতি পরিবেশনা রয়েছে।

জ. কথনরীতির লোকনাটক

বাংলা লোকনাটকের আঙ্গিকগুলোর মধ্যে কথনরীতির পরিবেশনা সুপ্রাচীন। এই রীতির পরিবেশনা এক সময় বাংলা অঞ্চলে বেশ প্রচলিত ও জনপ্রিয় ছিলো। পরিবেশনা পদ্ধতি সহজ হওয়ায় কথনরীতির লোকনাটকে কুশীলবদের অংশগ্রহণ অধিক দেখা যায়। তবে এই রীতির পরিবেশনায় অভিনয়ের বহুমাত্রিকতা না থাকায় অন্যান্য রীতির লোকনাটকের সাথে পাল্লা দিয়ে বর্তমানে লোকআসরে খুব বেশি পরিবেশিত হয় না। কথনরীতির লোকনাটকের পরিবেশন মূলত সুরাশ্রয়ী ও বর্ণনাত্মক। এই রীতির প্রধান গায়েনকেও 'কথক' বা Story teller বলা হয়। কুশীলবদের সবাই উঠানে বসে পরিবেশনা উপস্থাপন করে থাকেন। এই নাট্যে একজন প্রধান পাঠক বা বর্ণনাকারী থাকেন, তার সাথে অন্যরা দোহার ধরেন। বাংলাদেশে কথনরীতির লোকনাটকের মধ্যে পুঁথিপাঠ সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। এছাড়া বিভিন্ন রকম পাঁচালীও রয়েছে, যেমন- মনসার পাঁচালী, শিবের পাঁচালী, পির পাঁচালী প্রভৃতি।

চিত্র-২ : নাগরিক-আসরে লোকনাটক বিচারগানের পরিবেশনার একটি মুহূর্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের লোকনাট্যে বিচারগান : ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিত

বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির বিশাল ভাণ্ডারের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান লোকনাট্য বা লোকনাটক। লোকনাট্যের আরেকটি স্বতন্ত্র আঙ্গিক বা ধারা হচ্ছে বিচারগান। কেননা প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত লোকনাটকের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্যের সাথে তুলনামূলক বিচারগান পরিবেশনাটিকে সংজ্ঞায়িত করলে এবং এর উৎপত্তির ইতিহাস খুঁজলে বিচারগানকে লোকনাটকের একটি আঙ্গিক হিসেবেই অভিহিত করতে হয়। কারণ বিচারগানেও গ্রামীণ সমাজের জীবন-আচার, ধর্মীয়-পৌরাণিক ও লৌকিক বিশ্বাস এবং ঐতিহ্যগত ধারায় গুরু-শিষ্য পরম্পরায় এর উৎপত্তির চিহ্ন মেলে। এছাড়া এই পরিবেশনার কাহিনির রচয়িতা, দর্শক-শ্রোতা, কুশীলব, গায়ক-বাদক, নর্তক-নর্তকী সবাই লোকসমাজের সাধারণ মানুষ। যাদের বেশির ভাগেরই নিরক্ষর বা সামান্য অক্ষর-জ্ঞান সম্পন্ন। শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমানে কেউ কেউ বিশেষ করে মূল গায়েন উচ্চ শিক্ষিতও পাওয়া যায়। তবে এই উদাহরণ একেবারেই অপ্রতুল। সুতরাং সার্বিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে বিচারগানকে লোকনাটকের একটি স্বতন্ত্র আঙ্গিক বলা যায়। অন্যদিকে বিচারগানের উৎপত্তিস্থল খুঁজতে গেলেও লোকনাটকের অন্যান্য আঙ্গিকের মতই অলিখিত ও গুরু-শিষ্য পরম্পরা হওয়ার কারণে সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে লোকনাটক বিচারগানের সাথে লোকসংগীতের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। লোকসংগীত যেমন গুরু-শিষ্য পরম্পরা বিকশিত হয়, তেমনি লোকনাটক বিচারগানও গুরু-শিষ্য পরম্পরা বিকশিত হয়েছে এবং হচ্ছে। 'লোকসংগীত ঐতিহ্যনুসারী,ট্রাডিশনাল গান, এর টেকস্ট এবং সুর দুটোই আমরা পরম্পরাসূত্রে প্রাপ্ত।' (বরুণকুমার, ২০০৯ : ৪৪) বিচারগানের সাথে লোকসংস্কৃতি তথা লোকসংগীতের অন্যান্য কয়েকটি পরিবেশনা যেমন বাউলগান, কবিগান, কড়চাগানের সাথে নিবিড় সম্পর্কের চিহ্ন পাওয়া যায়। বাউলগানে যেমন আত্মতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, কামতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব ও গুরু-শিষ্যের সম্পর্কের উপস্থিতি রয়েছে। ঠিক তেমনি এই বিষয়গুলো বিচারগানেও বিদ্যমান। মূল পার্থক্য বাউলগান শুধু সংগীত হিসেবে উপস্থাপিত হয়। কিন্তু বিচারগানে নাটকীয় উপাদান-উপকরণ বিদ্যমান রয়েছে। তবে বিচারগানে বাউলগানগুলো গাওয়া হয়ে থাকে। লোকনাটক বিচারগানে বাউলগানের উপস্থিতি সম্পর্কে গবেষক সাইমন জাকারিয়া বলেন,

> বর্তমান সময়ের বিচারগানের আসরে লালন সাঁইজির এমন অনেক প্রশ্ন উত্থাপন ও উত্তর প্রদত্ত গান স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিবেশিত হয়ে থাকে এবং নিত্য নতুন আসরে প্রতিভাবান গায়েন-কবির সৃজন দক্ষতায় প্রশ্ন উত্থাপনের নতুন গান ও উত্তর প্রদানের নতুন গানও রচিত হয় বৈকি। (সাইমন, ২০০৮ : ৪৬৮)

বিচারগানে যেমন লালন ফকিরের গান গীত হয়, তেমনি বিচারগানের গায়েনগণও নিত্য-নতুন গান রচনা করেন। একই বিষয়ভিত্তিক বহুগান রয়েছে, যার মধ্যে লালন ফকির রচিত গান গীত হয়, আবার বিচারগানের কিংবদন্তি

গায়কদের রচিত গানও গীত হয়। যেমন লালন ফকিরের একটি প্রশ্নবোধক গান বিচারগানে গাওয়া হয়, সেটি হচ্ছে- ‘জানতে হয় আদম সফির আদ্য কথা’। আবার বিচারগানের বিখ্যাত গায়ক রজ্জব আলী দেওয়ান রচিত প্রশ্নবোধক গান ‘আমি কোথায় ছিলাম, কোথায় এলাম আবার জানি কোথায় যাই, দয়াল আমার দেশের খবর জানতে চাই।’ এছাড়া বিচারগানে বহুল পরিবেশিত দেওয়ান আ. রশিদ চিশ্‌তির গান ‘আমি ডুব দিয়ে রূপ দেখিলাম প্রেম নদীতে/আল্লা, মহাম্মদ, আদম তিনজনা এক নূরেতে।’ যেখানে আদম সৃষ্টির রহস্যের প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে গানের ধরণ ও দর্শন চিন্তা বাউলগান ও বিচারগানের একই কিন্তু পরিবেশনা কৌশল আলাদা। এতে করে বলা যায়, বিচারগানের উৎপত্তি লালন ফকিরের সমসাময়িক কাল বা তারও কিছু সময় পরে হয়েছে। এছাড়া বিচারগানের সাথে সাদৃশ্য পাওয়া যায় পশ্চিমবঙ্গের তরজাগানের। এ প্রসঙ্গে রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী বলেন, “পশ্চিম বাংলার তরজাগান বাংলাদেশের ফরিদপুর অঞ্চলে করচাগানে রূপান্তরিত হয়ে পর্যায়ক্রমে বিচারগানে রূপ নেয়।” (সাইমন, ২০০৮ : ৪৬৮) তবে বিচারগানের উৎপত্তি প্রসঙ্গে এই মতের সাথে সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করেন বিচারগানের আদিশিল্পী আলফো দেওয়ানের পঞ্চম প্রজন্ম (গুরু-শিষ্য পরম্পরা ও বংশের উত্তরসূরি) আরিফ দেওয়ান। তিনি বলেন,

> বিচারগান বা পালাগান বাংলাদেশের কবিগানেরই পরিবর্তিত একটি রূপ। কবিগানে হিন্দুধর্মের বিষয়বস্তু বেশি ছিলো আর বিচারগানে ইসলামধর্মের বিষয়বস্তু বেশি। তবে দুই গানের আসল ভাববস্তু একই। দুই গানের মাধ্যমেই ধর্মীয় সম্প্রীতি ও মানবতার কথা বলা হয়। (আরিফ, ২০২১ : সাক্ষাৎকার)

বিচারগান ও কবিগানের মধ্যে পারস্পরিক তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কবিগানে যেমন প্রশ্ন করা হয় এবং প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়। অনুরূপভাবে বিচারগানেও এ বিষয়টি রয়েছে। তবে কবিগানে রয়েছে অনেক বেশি কাব্য ও ছন্দ কিন্তু বিচারগানে কাব্য-ছন্দ থাকলেও গদ্যের আধিক্যই বেশি। অন্যদিকে কবিগানে হিন্দুধর্মের দর্শন ও পুরাণ নিয়ে বেশি আলোচনা করা হয়। আর বিচারগানে ইসলামধর্মের দর্শন ও পুরাণ নিয়ে আলোচনার আধিক্য দেখা যায়। তবে দুই পরিবেশনাতেই আবার আন্তঃধর্মীয় দর্শন, কাহিনি ও সম্প্রীতির বাণী আলোচিত হয়। অর্থাৎ বিচারগান ও কবিগানের সাদৃশ্যের ভিত্তিতে কবিগানকে বিচারগানের পূর্বসূরি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এমনকি কবিগানের সাথে বিচারগানের বর্তমান পরিবেশনা আঙ্গিক ও রীতির মধ্যেও মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কবিগান সম্পর্কে সৈয়দ জামিল আহমেদ বলেন,

> A Popular form of debating contest, between two professional minstrels [চারণ কবি] (kaviyal or sarkar) and their troupes [অভিনয়কারী দল], is known as kavi Gan. The sarkar create their argument in extempore [প্রস্তুতিহীনভাবে] verse and lyric, with musical and choral accompaniment. (জামিল, ২০০০ : ৩৩৫)

কবিগানের পরিবেশনা কাঠামোতে কয়েকটি বিষয় দেখা যায়, কবিগানে দুজন মূলগায়েন থাকেন, কবিগান প্রতিযোগিতামূলক, কাব্য-গীত-বাদ্য-দোহারের সাহায্যে পরিবেশিত হয়। বিচারগানেও দুজন মূলগায়েন থাকেন। মূল সহযোগী হিসেবে দোহার থাকেন এবং কাব্য-গীত-বাদ্যের উপস্থিতিও থাকে। এছাড়া মূল দুই গায়েনের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়। অর্থাৎ কবিগানের মতো বিচারগানকেও প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশনা বলা যেতে পারে। প্রতিযোগিতামূলকরীতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলীম আল রাজী বলেন,

> মূল বৈশিষ্ট্য হল একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রতিযোগিতা। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে কাহিনীর ছোঁয়া থাকতে পারে। যেখানে কাহিনী তুলে ধরা হয় সেখানে প্রতিযোগিতা সাজানো থাকে। বগুড়া অঞ্চলে 'পাইল্যা যাত্রা' এ একই দলের দু'জন লড়াই করে কাহিনী উপস্থাপন করে থাকে। কাহিনী উপস্থাপন করার উপায় হল- একজন আরেকজনকে যাবার বেলায় প্রশ্ন করে যাবে। দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলাদেশের জারীগান প্রতিযোগিতামূলক। আর কাহিনী ছাড়া প্রতিযোগিতামূলক রীতি হল; 'কবিগান'। এর মধ্যে কোনো কাহিনী নেই। আগেই ঠিক করা থাকে- কে কোন বিষয় নিয়ে বিতর্ক করবে। (আলীম, ২০১০ : ৩১)

প্রতিযোগিতামূলকরীতির লোকনাটকের বৈশিষ্ট্যের সাথে বিচারগানের পরিবেশনা-কাঠামোর বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য থাকায় বিচারগানকে প্রতিযোগিতামূলকরীতির লোকনাটক পরিবেশনা বলা যায়। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, লোকনাটক বিচারগান হচ্ছে বাংলাদেশের চিরায়ত লোকসংস্কৃতির লোকনাটকের একটি স্বতন্ত্র আঙ্গিক যেটি পরিবেশনা রীতির দিক থেকে প্রতিযোগিতামূলক লোকনাট্য পরিবেশনা।

চিত্র-৩ : বিচারগানের গায়েন অসীম দাস বাউলের পরিবেশনার একটি মুহূর্ত।

বাংলাদেশের অঞ্চলভেদে বিচারগানের নামকরণ

লোকনাটক বিচারগান পরিবেশনাটি যেহেতু প্রায় সমগ্র বাংলাদেশে পরিবেশিত হয়। সেহেতু এই পরিবেশনাটির বিষয় ও আঙ্গিকের পার্থক্যের সাথে সাথে এর নামেরও রয়েছে চমকপ্রদ পার্থক্য। যদিও উৎপত্তিগতভাবে এর নামকরণের সঠিক ইতিহাস জানা যায় না। বিচারগানের শিল্পীদের ভাষ্য মতে, বিচারগানের আদি শিল্পী আ. হালিম বয়াতি কর্তৃক ফরিদপুর অঞ্চলে বিচারগান পরিবেশনাকালে মুরব্বি শ্রেণির দর্শক-শ্রোতারা এই পরিবেশনার নাম রাখেন বিচারগান। কারণ পরিবেশনাটির প্রতি পদে পদে রয়েছে বিচার-বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া এবং বিজ্ঞ-শ্রোতাগণ সূক্ষ্ম বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গায়কদ্বয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয় করতেন। অন্যদিকে বিচারগানের নামকরণের বিষয়ে আ. হালিম বয়াতি সংক্রান্ত এই অভিমতের বিষয়ে ভিন্ন কথা জানা যায়। মানিকগঞ্জের বিচারগানের গায়ক ছোট আবুল সরকার (মহারাজ), বিচারগানের এক আসরে বলেন, "ফরিদপুরের সাধক হালিম বয়াতি বিচারগানকে বলতেন 'ধর্মসংগীত'। যেহেতু বিচারগানের মাধ্যমে মানুষের মাঝে ধর্মের বাণী প্রচার করা হয়, তাই একে 'ধর্মসংগীত' বলা হয়।" (ছোট আবুল, ২০২০ : পরিবেশনা) তবে বাংলাদেশের কোনো অঞ্চলেই 'ধর্মসংগীত' নামে বিচারগান পরিচিতি পায়নি। যদিও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকম নামে বিচারগান পরিচিত ও পরিবেশিত হয়ে থাকে, বিচারগানের বহুল পরিচিত আরেকটি নাম হচ্ছে 'পালাগান'। এমনকি বর্তমানে দেখা যাচ্ছে দেশে বিচারগানের নামের চেয়ে লোকমুখে ও গায়কগণ 'পালাগান' বেশি বলে থাকেন। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে সহজ পরিচিতি। কারণ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন লোকপরিবেশনা 'পালাগান' নামে পরিবেশিত হয়। যেমন-যাত্রাপালা, মনসার পালা, ভানুমতির পালা, কিস্‌সাগানের পালা প্রভৃতি। 'পালা' শব্দটি সর্বজন পরিচিত হয়তো এজন্যই 'পালাগান' হিসেবেই বেশি পরিচিতি লাভ করেছে। এছাড়া পরিবেশনাটিতে দুই পক্ষের দুই গায়ক দুটি পালা নিয়ে 'পাল্লাপাল্লি' করেন। সে জন্যও বিচারগান 'পালাগান' হিসেবে পরিচিতি লাভ করছে। 'পালাগান' শব্দটির সাথে লোকনাটকের অন্যান্য পরিবেশনার সাথে নামকরণে কিছুটা হলেও সাংঘর্ষিক। পরিবেশনাটি সবচেয়ে বেশি প্রচলিত ও জনপ্রিয় দেশের কয়েকটি অঞ্চলে তার মধ্যে ঢাকা, মানিকগঞ্জ, টাঙ্গাইল, মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর ও রাজবাড়ি জেলায় 'বিচারগান' নামেই পরিচিত ও প্রচলিত। অঞ্চলভেদে বিচারগানের এই নামের পার্থক্যের বিষয়ে ঢাকার কেরানিগঞ্জের বিচারগানের গায়ক কানন দেওয়ান এক আসরে বিচারগানের নামের পার্থক্যের বিষয়ে হাসি-তামাশা করতে করতে বলেন,

> নতুন নুতন একেক জায়গায় যাই, একেক রকম অভিজ্ঞতা হয়। কয়েক বছর আগে গান করতে গেছিলাম পাবনায়। আমি মাত্র আসরে উঠছি, আমাকে দেখে পাবলিক বলে, দ্যাখ দ্যাখ ঢাকা থেকে ফকির এসেছে। চিন্তায় পড়ে গেছি ঢাকা থেকে গেছি শিল্পী, আমাকে বলে ফকির ! আমি তো যেমন-তেমন, প্রতিপক্ষ শিল্পী ছিলো মহিলা শিল্পী। আর উনি এমন সাজগোজ করেছেন, দেখতে দেখা যায় রাজরাণী। যখন আসরে গেছে, আম-পাবলিক বলে, এইটা হচ্ছে ফকিরের ফকিরনী ! গান

করতে করতে বুঝলাম কোনো এলাকার গালি কোনো এলাকার বুলি। আমরা বলি পালাগান বা বাউলগান ওদের এলাকায় বলে ফকিরিগান। (শিল্পী) পুরুষ হইলে ফকির, মহিলা হইলে বলে ফকিরনী। ফকির বলুক আর ফকিরনী বলুক গানের ভাব কিন্তু একটাই। (এরপর কাব্য-গীতে) ওরে পাবনা জেলায় ফকিরিগান, ময়মনসিংহে বাউলাগান, গাজীপুরে বৈঠকীগান, আবার মানিকগঞ্জে ভাবগান, আবার টাঙ্গাইলে তত্ত্বগান, আবার ঢাকা সিটির কথা বলি, ঢাকায় কয় খাড়া কাওয়ালি, একেক জায়গায় একেক রকম নাম। (কানন, ২০২১ : পরিবেশনা)

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য, বিচারগানের নাম পরিচিতিতে যেমন জেলা-অঞ্চল বিচারে পার্থক্য রয়েছে। ঠিক তেমনি আবার কোথাও একই জেলার মধ্যেও নাম পরিচিতিতে পার্থক্য রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বিচারগানের গায়ক কানন দেওয়ান বিভিন্ন জেলায় বিচারগানের বিভিন্ন নামের পার্থক্যের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমার মাঠপর্যায়ের পর্যবেক্ষণে এর ভিন্ন চিত্র উঠে এসেছে। যেমন আমি মানিকগঞ্জের বিভিন্ন এলাকার বিচারগানের পরিবেশনা দেখেছি এবং সে সকল পরিবেশনার পোস্টার সংগ্রহ করেছি। সেখানে সব জায়গায় 'বিচারগান' নামেই উল্লেখ করা হয়েছে। নিচে প্রামাণ্য হিসেবে 'বিচারগান' পরিবেশনার পোস্টারের ছবি সংযুক্ত করা হলো।

চিত্র-৪ : মানিকগঞ্জের বংখুরী গ্রামের বিচারগানের একটি পোস্টার, যেখানে পরিবেশনাটিকে বিচারগান হিসেবেই উল্লেখ করা হয়েছে।

এছাড়া কানন দেওয়ান বিচারগানের নামের বিষয়ে ময়মনসিংহ অঞ্চলের ব্যাপারে বলেছেন সেখানে বিচারগানকে বলা হয় 'বাউলাগান'। কিন্তু বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের নেত্রকোণা জেলার জনপ্রিয় বিচারগানের গায়ক সালাম সরকার বলেন, "আমাদের এলাকায় বাউল-পালাগানকে *ধরাটগান*ও বলা হয়। কারণ গানে এক শিল্পী আরেক শিল্পীকে প্রশ্নের ফাঁদে ফেলে ধরে তাই।" (সালাম, ২০২০ : পরিবেশনা) অন্যদিকে মাদারীপুর জেলার বিচারগানের বহুল জনপ্রিয় শিল্পী বাউলমাতা আলেয়া বেগম আলো বলেন, "বিচারগানের পদে পদে বিচার তাই বিচারগান। 'বাউল-বিচারগান' তাই মহাজনদের গান।" (আলেয়া, ২০২০ : পরিবেশনা) এখানে আলেয়া বেগমের ভাষ্য মতে

জানা যায় বিচারগানকে কেউ কেউ 'বাউল-বিচারগান'ও বলে থাকেন। এর অন্যতম কারণ হতে পারে বিচারগানে বাউলগানের সংযুক্তিমূলক পরিবেশনা। কেননা বিচারগান মূলত মিশ্রসংগীত নাট্য পরিবেশনার সম্মিলন। তাই হয়তো একে আলাদা করে বোঝাতে 'বাউল-বিচারগান' বলা হয় কোথাও কোথাও। অন্যদিকে বাংলাদেশের বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে বিচারগানকে 'মালজোড়া' গান বলা হয়। তবে মালজোড়া গানের আসরের পরিবেশনায় একটু ভিন্নতা রয়েছে, যেখানে সুনির্দিষ্ট পালা থাকে না। দুই পক্ষের শিল্পী একে অপরকে যে কোনো বিষয়ের ওপর প্রশ্নবাণে আক্রমণ করতে পারেন। তবে এটিও বিচারগানের সামগ্রিকতার মধ্যে পড়ে। বিচারগানের নামের পার্থক্যের বিষয়ে গবেষক সাইমন জাকারিয়া বলেন,

> বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই 'বিচারগান' আরও বেশ কিছু নামে পরিচিত। ঢাকা বিভাগের ফরিদপুর অঞ্চলে এই গান 'বিচারগান' হিসেবে পরিচিত ও প্রচলিত থাকলেও যশোর-নড়াইল অঞ্চলে এই গান 'ভাবগান' বা 'তত্ত্বগান' নামেই অধিক পরিচিত। অন্যদিকে তা কুষ্টিয়া অঞ্চলে 'শব্দগান', চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে 'কবির লড়াই' নামে প্রচলিত। আবার টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ অঞ্চলে এই গান 'বাউলার লড়াই' নামে পরিচিত। আসলে গানে-কথায় দুই গায়েন-কবির তর্ক বা তত্ত্ব আলাপ হচ্ছে এই গানের প্রধান বিশেষত্ব। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ধর্মীয় বিষয়কে আশ্রয় করেই বিচারগান পরিবেশিত হয়ে থাকে। সে দিক দিয়ে অনেকেই বিচারগানকে আধ্যাত্ম সংগীত বলে থাকেন। সাধারণত বিভিন্ন ধরনের তত্ত্ব মিশ্রিত বাউলগানের মাধ্যমে বিচারগান করা হয়ে থাকে। তবে, বিচারগানের আসরে মাঝে মধ্যে ভাটিয়ালি, বিচ্ছেদ গানও পরিবেশিত হয়। (সাইমন, ২০০৮ : ৪৬৭)

একই আঙ্গিক ও পরিবেশনা রীতির হওয়া সত্ত্বেও বিচারগান যেমন বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে পরিচিত। ঠিক তেমনি ভারতের পশ্চিমবঙ্গেও রয়েছে বিচারগানের মতো একই আঙ্গিক ও রীতির পরিবেশনা যা সে অঞ্চলে 'তরজাগান' নামে পরিচিত। 'তরজাগান'ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিবেশিত হয়ে থাকে। এ বিষয়ে বিশ্বজিৎ হালদার বলেন,

> বর্তমানে উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, নদীয়া, হাওড়া, হুগলী, বাঁকুড়া, মেদেনীপুর, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলাগুলিতে তরজার প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। তরজা হল হেঁয়ালি বা প্রহেলিকাধর্মী ছড়াগান, যা দুই মূল গায়েন তাঁদের সহকর্মীদের নিয়ে বাদ্যযন্ত্র সহযোগে ছদ্ম লড়াইয়ের মাধ্যমে আসরে পরিবেশন করে থাকেন। (বিশ্বজিৎ, ২০১৯)

অর্থাৎ বিচারগান আঙ্গিকটি যেমন বিভিন্ন নামে পরিচিতি হয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ঠিক তেমনি এই আঙ্গিকটি ভিন্ন নামে পশ্চিমবঙ্গেও বিদ্যমান। এমনকি বিচারগানের উদ্ভব ও বিকাশের সাথে যোগসূত্রও রয়েছে, যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। বিচারগানে যেহেতু লোকনাট্য ও লোকসংগীতের বিভিন্ন ধারা ও রীতির সম্মিলন হয়েছে। এতে করে একই পরিবেশনার বিভিন্ন পরিবেশনার চিহ্ন পাওয়া যায়। এজন্য হয়তো 'বিচারগান' নানা অঞ্চলে নানা নামে পরিচিত। তার মধ্যে ভাবগান, তত্ত্বগান, শব্দগান, বাউলগান, বাউলাগান, বাউল-বিচারগান, কবির লড়াই,

ফকিরিগান, ধরাটগান, খাড়া কাওয়ালি, বৈঠকিগান, মজলিশীগান, মালজোড়া গান ও পালাগান নাম ছাড়াও নানা নামে বাংলাদেশে বিচারগান পরিচিত ও প্রচলিত।

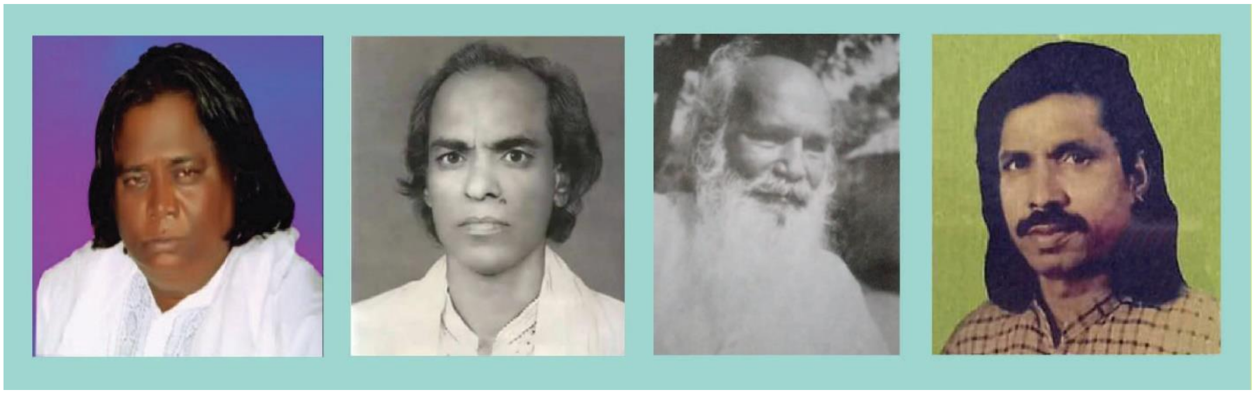

চিত্র-৫ : বিচারগানের গায়েন (বাম থেকে) আব্দুর রশিদ সরকার, মাতালকবি রাজ্জাক দেওয়ান, খালেক দেওয়ান ও কিয়ামদ্দিন বয়াতি।

বিচারগানে গুরুবাদ ও গুরু-শিষ্য পরম্পরা

বাংলাদেশের সমগ্র অঞ্চলে বিচারগানের চর্চা ও পরিবেশনার অন্যতম প্রধান প্রেরণাদায়ক বিষয় হচ্ছে গুরুবাদ। বিচারগানের গায়েন, কুশীলব ও পৃষ্ঠপোষক এমনকি ভক্ত-দর্শক-শ্রোতারাও গুরুবাদে বিশ্বাস করেন। এখানে হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টানসহ সব ধর্মের বেড়াজাল ছাপিয়ে গুরুবাদী দর্শনই মূখ্য হয়ে ওঠে। যেখানে বিচারগানের কুশীলবগণ মানবগুরুকে আশ্রয় করে পরমগুরু স্রষ্টাকে প্রাপ্তির প্রত্যাশায় গানের মাধ্যমে আকুতি ও প্রার্থনা জানায়। গুরুকে আরাধনামূলক গানও বিচারগানে গীত হয়ে থাকে। বিখ্যাত বাউল শাহ্ আব্দুল করিম যিনি বিচারগান করতেন, যা সিলেট অঞ্চলে মালজোড়া গান হিসেবে পরিচিত। তার একটি বিখ্যাত গুরুবাদী গান রয়েছে 'মুর্শিদ ধন হে কেমনে ভজিব তোমারে...'। বিচারগানের কুশীলবগণ যে ধর্মেরই হন না কেন, তারা প্রত্যেকেই গুরুবাদে বিশ্বাসী। এমনকি প্রায় সবাই গুরুর নিকট (মুরিদ/বাইয়াত/ভক্ত) শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। গুরুকে বিভিন্ন নামেও ডাকা হয়, যেমন- মুর্শিদ, দয়াল, গোঁসাই, গুরু-গোঁসাই, পির, ফকির, সাঁই প্রভৃতি। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য বিচারগানের কুশীলবগণ যে ভিন্ন একটি দর্শনে বা লৌকিক ধর্মে বিশ্বাস করেন, তার প্রমাণ হচ্ছে, কুশীলবগণের মধ্যে দেখা যায়, জন্মসূত্রে হয়তো মুসলিম কিন্তু তিনি জন্মসূত্রে একজন হিন্দু গুরুর নিকট মুরিদ হয়েছেন। আবার দেখা যায়, কেউ জন্মসূত্রে হিন্দু কিন্তু তিনি জন্মসূত্রে মুসলিম পিরের নিকট মুরিদ হয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে বিচারগানের বিখ্যাত গায়ক আয়নাল মিয়া বয়াতি ও অসীম দাস বাউলের কথা বলা যায়। অসীম দাস বাউল জন্মসূত্রে হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও আয়নাল মিয়া বয়াতির নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। এছাড়া বিচারগানের কুশীলবগণের মধ্যে প্রচলিত আছে, বিচারগানের বিখ্যাত গায়েন মাতালকবি রাজ্জাক দেওয়ান ওসিয়ত করে গেছিলেন তার মৃত্যুর পর যেন নিজের

পরিহিত জামা-কাপড় তাঁর হিন্দু ভক্তদের দিয়ে দেয়া হয়, যাতে তারা হিন্দুধর্ম মতে আগুনে পুড়িয়ে গুরুর সৎকার করতে পারেন। সুতরাং এতেই বোঝা যায়, বিচারগানে গুরুবাদী দর্শন কতটা প্রচলিত ও প্রায়োগিক। বিভিন্ন সময় গায়েনদের দেখা যায়, বিচারগানের আসরে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে গুরুবাদের উদ্ধৃতি দেন। এছাড়া নানা কাহিনি ও পুরাণের গল্প বলে বলে দর্শকদের মাঝেও গুরুবাদী দর্শন প্রচার করেন।

যেমন, মঞ্চে প্রায়ই গায়েনগণ উপনিষদে বর্ণিত 'গুরু' শব্দের অর্থ 'গু' মানে অন্ধকার আর 'রু' মানে আলো। অর্থাৎ 'গুরু' মানে অন্ধকার দূরকারী আলো। এই বাণী প্রচার করে থাকেন। এছাড়া বিচারগানে কিংবদন্তি গায়ক আব্দুর রশিদ সরকার আসরে 'গুরু'র গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলতেন, কোরানের এমন কোনো আয়াত বা বাক্য নেই যেখানে গুরু ধরার বা গুরুর নিকট বাইয়াত হওয়ার বিষয় নেই। বিচারগানের প্রায় প্রতিটি পরিবেশনাই গুরু-শিষ্যের প্রেম বা গুরুবাদের আলোচনায় ভরা। এমনকি বিচারগানের সবচেয়ে বেশি প্রচলিত ও জনপ্রিয় পালাটি হচ্ছে গুরু-শিষ্য বা গুরু-ভক্ত। যেখানে গুরু-শিষ্যের প্রেম, সম্পর্ক ও করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। শুধু তাই নয়, বিচারগানের পরিবেশনার আয়োজন বা প্রদর্শনীর পেছনেও গুরুবাদী দর্শনের ভূমিকাই প্রধান। যেহেতু বাংলাদেশের মাজার কেন্দ্রিক সমাজ-সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতাই বিচারগানের মূল চালিকা শক্তি। আর এই মাজারগুলো প্রতিষ্ঠিত মূলত গুরুবাদী ধারার দর্শন ও চর্চা থেকে। এমনকি বাংলাদেশের মাজারগুলো কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করে না। মাজার কেন্দ্রিক দর্শন মূলত গুরুবাদী দর্শন। যেখানে মানবগুরু হয়ে পরমগুরু বিধাতার কাছে পৌঁছানোর মাধ্যম হিসেবে মাজারে শায়িত পির-অলিদের আশ্রয় করা হয়। অন্যদিকে বাংলাদেশের মাজারের মত অনেক হিন্দু গোঁসাইদের মঠ বা সমাধি কেন্দ্রিক পৃষ্ঠপোষকতায় বিচারগান পরিবেশিত হয়। যার দর্শনও গুরুবাদী দর্শন। অর্থাৎ 'গুরুবাদী' দর্শনের আচারানুষ্ঠানের নামান্তর হিসেবে বিচারগানের পরিবেশনা হয়ে থাকে। বিচারগানের কুশীলবগণ গুরু-শিষ্য পরম্পরায় বিচারগান আত্মস্থ করেন এবং পরিবেশনা করেন। বাংলাদেশের সব অঞ্চলের বিচারগানের গায়েনেরই বিচারগানের গুরু রয়েছেন। অবশ্য কেউ কেউ বিচারগানের গুরুকে ওস্তাদ বলে সম্বোধন করে থাকেন। অন্যদিকে ঐ গায়েনের গানের গুরু একজন থাকেন আর আধ্যাত্মিক গুরু থাকেন অন্য একজন। কখনও একজন গুরুই আধ্যাত্মিক ও গানের গুরুর ভূমিকা পালন করেন। তবে এখানে বিচারগানের গুরু-শিষ্য পরম্পরাই আলোচ্য বিষয়। বাংলাদেশে অঞ্চলভেদে দেখা যায়, বিচারগানের কতগুলো প্রসিদ্ধ পরম্পরা রয়েছে। যেগুলোকে একেকটি ঘরণা বা গুরুকেন্দ্র বলতে পারি। বিখ্যাত ও ঐতিহ্যবাহী গুরু-শিষ্য পরম্পরার মধ্যে ঢাকার আলফো দেওয়ান, খালেক দেওয়ান, মালেক দেওয়ান, মাতালকবি রাজ্জাক দেওয়ান; মুন্সীগঞ্জের বড় আবুল সরকার, আব্দুস সাত্তার মোহন্ত; মানিকগঞ্জের আব্দুর রশিদ সরকার, ছোট আবুল সরকার; ঢাকার রজ্জব আলী দেওয়ান, পরশ আলী দেওয়ান; ফরিদপুরের আ. হালিম বয়াতি, আয়নাল মিয়া বয়াতি; সিলেটের শাহ্ আব্দুল করিম, কারি আমির উদ্দিন;

ময়মনসিংহের জালাল উদ্দিন খাঁ, ইসরাঈল শাহ্, সুনীল কর্মকার, সালাম সরকার, হবিল সরকার প্রমুখ গুরু-শিষ্য পরম্পরা স্বনামধন্য ও সুপরিচিত। বিচারগানের গুরু-শিষ্য পরম্পরার প্রামাণ্য হিসেবে কতগুলো গুরু-শিষ্য পরম্পরা তালিকা আকারে সন্নিবেশিত করা হলো।

বিচারগানের গুরু-শিষ্য পরম্পরা : ১

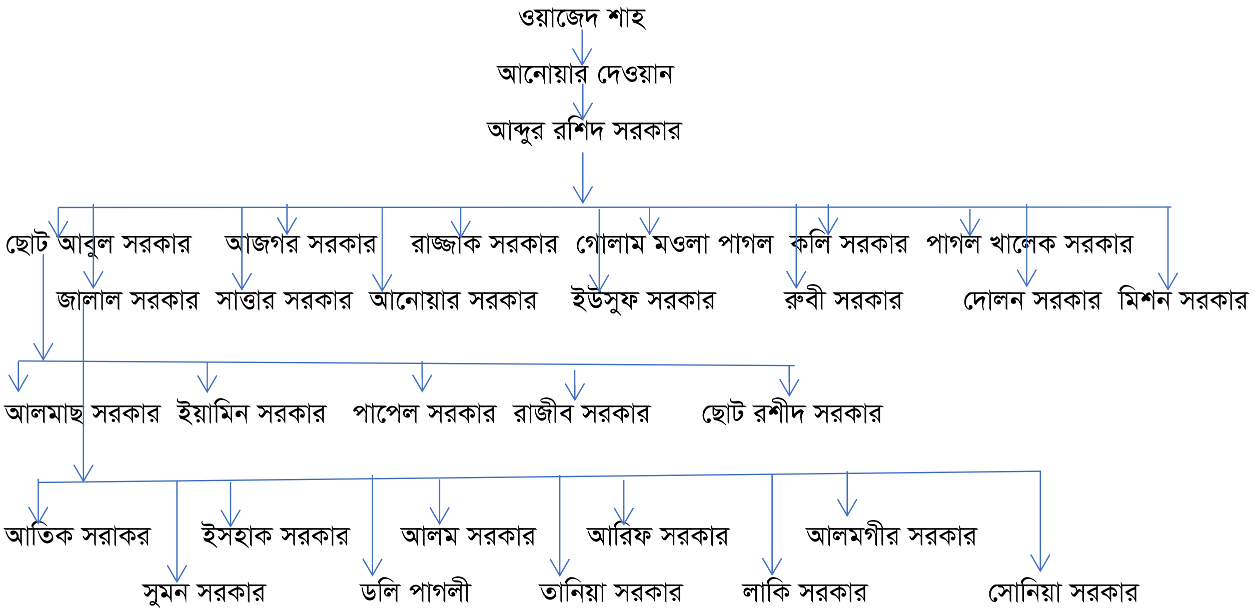

বিচারগানের গুরু-শিষ্য পরম্পরা : ২

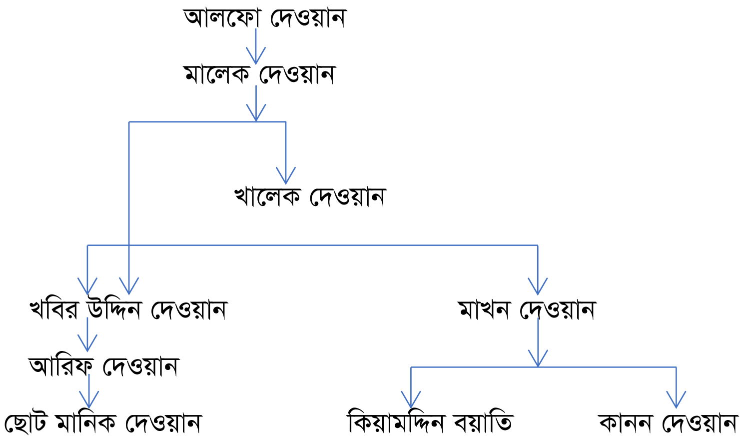

বিচারগানের গুরু-শিষ্য পরম্পরা : ৩

রজ্জব আলী দেওয়ান
↓
পরশ আলী দেওয়ান
↓
- করিম দেওয়ান
- মানিক দেওয়ান

বিচারগানের গুরু-শিষ্য পরম্পরা : ৪

আব্দুল হালিম বয়াতি
↓
- আয়নাল মিয়া বয়াতি
  ↓
  - ফকির আবুল সরকার
  - অসীম দাস বাউল
- লাল মিয়া বয়াতি
- দলিল উদ্দিন বয়াতি

বিচারগানের গুরু-শিষ্য পরম্পরা : ৫

জালাল উদ্দিন খাঁ
↓
ইসরাঈল মিয়া
↓
সুনীল কর্মকার
↓
জেসমিন সরকার

বিচারগানের গুরু-শিষ্য পরম্পরা : ৬

আবেদ আলী সরকার ও মকবুল সরকার
↓
সালাম সরকার
↓
- সোহাগ সরকার
- হবিল সরকার

বিচারগানের গুরু-শিষ্য পরম্পরা : ৭

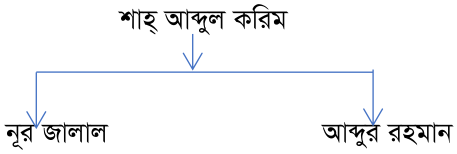

তালিকায় উল্লেখিত গুরু-শিষ্য পরম্পরা ছাড়াও বাংলাদেশে অঞ্চলভেদে অসংখ্য গুরু-শিষ্য পরম্পরা রয়েছে। আর গুরু-শিষ্য পরম্পরা ধারাগুলোর কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। এই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলো মূলত ধর্মীয় বিশ্বাস, জেলা অঞ্চল, পোশাক-পরিচ্ছদ, গানের সুরের বৈচিত্র্য, আঞ্চলিক শব্দ চয়ন কিংবা একেক গুরু-শিষ্য পরম্পরা একেক অঞ্চলের মাজারের ভক্ত বা ভিন্ন ভিন্ন তরিকাপন্থী। যেমন কুষ্টিয়া অঞ্চলের বিচারগানের গায়েনগণ অনেক বেশি লালন ফকিরের অনুসারী এবং লালন ফকিরের গানই বেশি পরিবেশন করেন। মৈয়মনসিংহ অঞ্চলের গায়েনগণ জালাল উদ্দিন খাঁ, উকিল মুন্সী, দ্বিজদাশ বাউল প্রমুখ কিংবদন্তি কবিয়ালদের গান ও তত্ত্ব বেশি পরিবেশন করেন। অন্যদিকে ঢাকা অঞ্চলের বিচারগানের গায়েনগণ দেওয়ান আ. রশিদ চিশ্‌তি, আ. রশিদ সরকার, রাধাবল্লভ সরকার, ভবা পাগলা, খালেক দেওয়ান, মালেক দেওয়ান, মাতালকবি রাজ্জাক দেওয়ান, আব্দুস সাত্তার মোহন্ত, বড় আবুল সরকার, ছোট আবুল সরকার, আব্দুর রহমান বাউল প্রমুখ কবিয়াল ও পদকর্তাদের গান ও তত্ত্ব-তালিমের পরিবেশনা বেশি করেন।

আবার ফরিদপুর অঞ্চলের গায়েনগণ গুরু-শিষ্য পরম্পরা ধারায় আ. হালিম বয়াতি ও আয়নাল মিয়া বয়াতির বাণী ও সুরের গান বেশি পরিবেশন করেন। এছাড়া সিলেট অঞ্চলের বিচারগান বা মালজোড়া গানের গায়েনগণ কারি আমির উদ্দিন, শাহ আব্দুল করিম, হাছন রাজা, রাধারমন দত্ত প্রমুখ কালজয়ী পদকর্তাদের গান ও দর্শনের উপস্থাপন বেশি করে থাকেন।

বিশেষ করে দেখা যায়, চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিচারগানের ধারাটি যদিও খুব বেশি প্রচলিত নয়, তবুও যতটুকু রয়েছে সেখানকার শিল্পীরা খুব বেশি করে ভাণ্ডারী ঘরণার গান করে থাকেন।

একটি বিষয় খুবই স্পষ্ট যে, গুরু-শিষ্য পরম্পরা ও অঞ্চলভেদে বিচারগানের পরিবেশনায় কিছু পার্থক্য থাকলেও গায়েনগণ বাংলাদেশের সব অঞ্চলের পদকর্তা, কবিয়াল বা বাউলদের রচিত গানই পরিবেশন করেন। এমনকি এক অঞ্চলের গায়ক অন্য অঞ্চলের গায়কের নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং পারস্পরিক গান ও দর্শনের বিনিময় করেন।

তবে বিচারগান লোকনাট্য পরিবেশনাটি বিকশিত ও সমৃদ্ধ হওয়ার পেছনে এই ‘গুরুবাদ’ ও ‘গুরু-শিষ্য পরম্পরা’ মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা-অঞ্চলের বিচারগানের গায়েন

লোকনাটক বিচারগান পরিবেশনাটি যেহেতু সারা বাংলাদেশেই পরিবেশিত হয়, সেহেতু দেশের প্রত্যেকটি জেলা-অঞ্চলেই কম-বেশি বিচারগানের গায়েন রয়েছেন। যারা নিজ অঞ্চলের বাইরেও পরিবেশনাটিতে অভিনয় করে থাকেন। বিচারগানের উৎপত্তি থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত অগণিত গায়েনের আবির্ভাব বাংলাদেশে হয়েছে এবং হচ্ছে। দেশের অগণিত গায়েনের মধ্যে অনেকেই তাদের পরিবেশনা ও সৃজনগুণে খ্যাতি অর্জন করেছেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ গান রচনা ও সুর করে খ্যাতি অর্জন করেছেন, অন্যদের মধ্যে আবার অনেকেই পরিবেশনা-গুণে খ্যাতি লাভ করেছেন। বিচারগানের খ্যাতিমান অনেক গীতিকার ও সুরকার মৃত্যুর পরও তাদের গানের মাধ্যমে অমরত্ব পেয়েছেন। তাদের সৃজিত গানগুলোই বিচারগানের আসরে বর্তমান গায়েনগণ বেশি পরিবেশন করে থাকে। এছাড়া বর্তমানেও অনেক গায়েন তাদের গান রচনা, সুর ও পরিবেশনা-গুণে জনপ্রিয়তা পেয়েছেন। বর্তমানে দেশের বিচারগানের আসরে প্রয়াত ও বর্তমান বহু গায়েনের সৃজিত গানগুলো বিভিন্ন পালায় গায়েনগণ পরিবেশন করে থাকেন। ‘লোকনাটক বিচারগান : বিষয় ও আঙ্গিক বৈচিত্র্য’ শিরোনামের এই অভিসন্দর্ভের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে প্রয়াত ও বর্তমান বহু গায়েনের বিভিন্ন গান ও তাদের পরিবেশনা প্রামাণ্য হিসেবে আলোচনা করা হবে। তাই এ পর্যায়ে খ্যাতিমান প্রয়াত ও বর্তমান বেশ কয়েকজন গায়েনের নামের তালিকা নিচে উল্লেখ করা হলো। এতে করে বাংলাদেশের বিচারগানের গায়েন সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যাবে।

বিচারগানের প্রয়াত খ্যাতিমান কয়েকজন গায়েন : আব্দুর রশিদ সরকার (মানিকগঞ্জ), অসীম দাস বাউল (রাজবাড়ি), শংকর দাস বাউল, আয়নাল মিয়া বয়াতি (ফরিদপুর), জালাল উদ্দীন খাঁ (ময়মনসিংহ), আলফো দেওয়ান (ঢাকা) খালেক দেওয়ান (ঢাকা), মালেক দেওয়ান (ঢাকা), খবির উদ্দিন দেওয়ান (ঢাকা) রজ্জব আলী দেওয়ান (ঢাকা), মাতালকবি রাজ্জাক দেওয়ান (ঢাকা), কিয়ামদ্দিন বয়াতি (মানিকগঞ্জ), মাখন দেওয়ান (ঢাকা), পরশ আলী দেওয়ান (ঢাকা), খোরশেদ আলম বয়াতি (ঝিনাইদহ), দলিল উদ্দিন বয়াতি (ফরিদপুর), আব্দুল হালিম বয়াতি (ফরিদপুর), শাহ আব্দুল করিম (সুনামগঞ্জ), ননী ঠাকুর, রশিদ উদ্দিন (নেত্রকোণা), ঈসরাইল মিয়া (ময়মনসিংহ), নূর মেহেদী আব্দুর রহমান (মানিকগঞ্জ), মায়া রাণী, নূর আলম সরকার, আব্দুস সাত্তার মোহন্ত (মুন্সিগঞ্জ), এছাক সরকার প্রমুখ।

বিচারগানের বর্তমান খ্যাতিমান কয়েকজন পুরুষ গায়েন : এম.এ ফারুক (রাজশাহী), তোফাজ্জেল হোসেন (ফরিদপুর), তারাব আলী দেওয়ান (মানিকগঞ্জ), কার্তিক সরকার (মানিকগঞ্জ), বড় আবুল সরকার (মানিকগঞ্জ),

ছোট আবুল সরকার (মানিকগঞ্জ), ফকির আবুল সরকার (রাজবাড়ি), শাহ আলম সরকার (মুন্সিগঞ্জ), মফিজ দেওয়ান, হানিফ সরকার, জালাল সরকার সাধু (মানিকগঞ্জ), জালাল সরকার, জলিল সরকার (মানিকগঞ্জ), সুনীল কর্মকার (ময়মনসিংহ), শরিয়ত সরকার (টাঙ্গাইল), হুমায়ুন সরকার, সালাম সরকার (নেত্রকোণা), অলিদ মিয়া (ময়মনসিংহ), জসীম সরকার, নেওয়াজ দেওয়ান, বাতেন সরকার, লতিফ সরকার(মুন্সিগঞ্জ), সুনীল কর্মকার (ময়মনসিংহ), সুশীল সরকার (টাঙ্গাইল), কাজল দেওয়ান (ঢাকা), মিরাজ দেওয়ান (ঢাকা), আক্কাস দেওয়ান (মানিকগঞ্জ), আলমাছ সরকার (মানিকগঞ্জ), সাত্তার সরকার (মানিকগঞ্জ), আনোয়ার দেওয়ান, আনোয়ার সরকার (ফরিদপুর), ছোট আনোয়ার সরকার (মুন্সিগঞ্জ), বক্কার সরকার (ফরিদপুর), মিরাজ দেওয়ান (ঢাকা), শহিদুল দেওয়ান (মানিকগঞ্জ), সেন্টু দেওয়ান (মানিকগঞ্জ), ফরহাদ সরকার (মানিকগঞ্জ), পাগল মনির (ঢাকা), পাগল বাচ্চু (ঢাকা), লাল মিয়া বয়াতি (মানিকগঞ্জ), বড় মানিক দেওয়ান (রাজবাড়ি), ছোট মানিক দেওয়ান, করিম দেওয়ান, কানন দেওয়ান (ঢাকা), পাগল তারা (শেরপুর), আনোয়ার সরকার, জীবন দেওয়ান, শাহ আলম সরকার (মুন্সিগঞ্জ), নজরুল ইসলাম বয়াতি (ঝিনাইদহ), কারি আমির উদ্দিন (সিলেট), নূর জালাল (সুনামগঞ্জ), রুহী ঠাকুর (সুনামগঞ্জ) হবিল সরকার (নেত্রকোণা), সোহাগ সরকার (নেত্রকোণা), আজিজ সরকার, পাগল সোহরাব, সুরুজ মিয়া বয়াতি, ইয়ামিন সরকার, মালেক সরকার, আরিফ দেওয়ান (ঢাকা), রাজ্জাক দেওয়ান (মুন্সিগঞ্জ), রফিক সরকার, জহির পাগলা, সুমন দেওয়ান (নরসিংদী), হেলাল সরকার (মানিকগঞ্জ), পাগল সুমন সরকার, আব্দুল গনি সরকার, হারুন সরকার, ছোট রজ্জব দেওয়ান (ঢাকা), আব্দুর রহমান (সুনামগঞ্জ), মুকুল সরকার, তারাব আলী বয়াতি (টাঙ্গাইল), বারেক বৈদেশী (ময়মনসিংহ), পাগল দুলাল, কবির দেওয়ান (সুনামগঞ্জ), হাফিজ সরকার, পাগল আলাউদ্দিন, পাগল রুহুল আমিন, আল-আমিন সরকার, আলমগীর সরকার, আরিফ সরকার, আক্কাস সরকার, পাগল সেন্টু সরকার, অন্ধ আনোয়ার সরকার, অন্ধ আজিজুল সরকার, আলামিন দেওয়ান, অন্ধ আলামিন সরকার, হানিফ সরকার, জয়নাল সরকার, সিরাজ দেওয়ান (মানিকগঞ্জ), পাপেল সরকার (মানিকগঞ্জ), আলামিন নুরী (চুয়াডাঙ্গা), মনির সরকার (মানিকগঞ্জ),আজগর সরকার (মানিকগঞ্জ), নাসির সরকার (মানিকগঞ্জ), রাজীব সরকার (ফরিদপুর), সুজন সরকান (ফরিদপুর), ফারুক সরকার (ফরিদপুর), ইয়ামিন সরকার (ঝালকাঠি), হেমায়েত সরকার (মাদারীপুর), গফুর সরকার (মানিকগঞ্জ), করিম দেওয়ান (ঢাকা), কাওসার সরকার (মানিকগঞ্জ), সফি দেওয়ান (মানিকগঞ্জ), রাজীব সরকার (মানিকগঞ্জ), ছোট রশীদ সরকার (মাদারীপুর), এসহাক সরকার (চুয়াডাঙ্গা), মিশন সরকার (রাজশাহী), ইউসুফ সরকার (মানিকগঞ্জ), হায়দার সরকার (মানিকগঞ্জ), সোহাগ সরকার (ফরিদপুর), আব্দুল হাই দেওয়ান, দারোগালী বয়াতি (মানিকগঞ্জ), কারি আমির উদ্দিন (সিলেট), বাতেন সরকার (ফরিদপুর), মজিদ সরকার (মানিকগঞ্জ), সেকেন্দার সরকার (মানিকগঞ্জ) প্রমুখ।

বিচারগানের বর্তমান খ্যাতিমান কয়েকজন নারী গায়েন : আলেয়া বেগম (মাদারীপুর), আকলিমা বেগম (ঢাকা), নীলা পাগলী (ময়ময়সিংহ), বিলকিস বানু (ফরিদপুর), ছোট রুমা সরকার (মানিকগঞ্জ), বড় রুমা সরকার (ঢাকা), ছোট মমতাজ (গাজীপুর) সোনালী সরকার (ঢাকা), সীমা সরকার (ফরিদপুর), ঝুমা সরকার (মানিকগঞ্জ), মৌসুমী বাউল (মানিকগঞ্জ), জেসমিন সরকার (ময়মনসিংহ), মুক্তা সরকার (ঢাকা), দেওয়ান বাবলী সরকার, খাদিজা ভাণ্ডারী, পারুল সরকার (মানিকগঞ্জ), মমতাজ বেগম (মানিকগঞ্জ), আঁখি সরকার, লিপি সরকার, শেফালী সরকার (ঢাকা), স্বপ্না সরকার, কলি সরকার (মানিকগঞ্জ), জ্যোতি দেওয়ান, পাগলী রুমা রহমান, লিমা পাগলী, আছমা পাগলী, শিল্পী পাগলী, দোলন সরকার, রেশমা সরকার, শিরিন সরকার, শারমিন সরকার, সোনিয়া সরকার (ফরিদপুর), তাপসী সরকার (মানিকগঞ্জ), রুবী সরকার (মানিকগঞ্জ), মৌ সরকার (মানিকগঞ্জ), রাজেদা সরকার (ফরিদপুর), সোনালী সরকার (ঢাকা), সীমা সরকার (ফরিদপুর), হারুন সরকার (মানিকগঞ্জ), চন্দ্রা সরকার (ফরিদপুর), জ্যোতি সরকার (ফরিদপুর), দোলন সরকার (মানিকগঞ্জ), সালমা সরকার (ফরিদপুর), শাহানাজ সরকার (ফরিদপুর), লাইলী সরকার (ফরিদপুর), পাপিয়া সরকার (ফরিদপুর), মারুফা সরকার (মানিকগঞ্জ), সীমা সরকার (ফরিদপুর), শিল্পী সরকার (টাঙ্গাইল), রিতা দেওয়ান (মানিকগঞ্জ), শিখা সরকার (ফরিদপুর) প্রমুখ।

চিত্র-৬ : বিচারগানের আসরে পরিবেশনারত এক নারী গায়েন।

তৃতীয় অধ্যায়

বিচারগানের বিষয়-বৈচিত্র্য

বাংলাদেশ নামক বর্তমান ভূ-খণ্ডের সহস্র বছরের ইতিহাসের কালের স্রোতধারায় নানা রকম শাসন ব্যবস্থা, সমাজ ব্যবস্থা ও ধর্মীয় পরিবর্তন-বিবর্তনের ফলশ্রুতিতে জন্ম ও বিকাশ লাভ করেছে অসংখ্য আঙ্গিক ও রীতির বৈচিত্র্যময় লোকসংস্কৃতি। তারই একটি স্বতন্ত্র ধারা এই ভূ-খণ্ডের লোকনাট্য। এই লোকনাট্যও ইতিহাসের নানা সময়ে সাংস্কৃতিক বির্বতনের পথ ধরে যেমন বিলোপ হয়েছে, তেমনি সৃষ্টি হয়েছে বৈচিত্র্যময় নতুন নতুন লোকনাট্য আঙ্গিক। যে বৈচিত্র্যময়তায় রয়েছে বিষয়গত নানান পার্থক্য। বাংলাদেশের লোকনাট্য বা ঐহিত্যবাহী নাট্যাঙ্গিকের বিষয় বৈচিত্র্য সম্পর্কে সাইমন জাকারিয়া বলেন,

> বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারা অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। সহস্র বছর ধরে বহু জাতি ও ধর্মের সঙ্করে এদেশের মানুষ যেমন বহুমাত্রিক জ্ঞান চর্চায় নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করতে পেরেছেন তেমনি সেই জ্ঞান চর্চার সঙ্গে উদ্ভাবন করেছেন নানা ধরনের নাট্যরীতি। আর সে সকল নাট্যরীতি কখনো ব্যবহৃত হয়েছে ধর্মকথা প্রচারের নিমিত্তে, কখনোবা গুরু পরম্পরায় প্রাপ্ত জ্ঞানের ধারাবাহিকতা প্রবাহিত রাখার স্বার্থে। এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে ধর্মীয় কৃত্য পালনে ও চিত্তবিনোদনের তাগিদে বাংলার মানুষ প্রথম থেকেই বিভিন্ন প্রকার নাট্যক্রিয়া বা নাট্যমূলক অভিনয়, তথা নাট্যচর্চা করে এসেছে। প্রবহমাণ সময় এবং বিভিন্ন প্রকার এলাকার জনমানুষের ধর্ম, আচার, ব্যবহার, রুচি, পেশা, ভাষা ও জীবনধারার বৈচিত্র্যের কারণে এদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারা বিষয়- বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। (সাইমন, ২০০৮ : ৪৫)

বাংলাদেশের লোকনাট্য আঙ্গিকগুলো যেমন বিষয় বৈচিত্র্যে ভিন্ন ভিন্ন ধারায় বিভক্ত হয়ে স্বতন্ত্র ধারা হিসেবে চিহ্নিত ও প্রচলিত। তেমনি আবার প্রতিটি স্বতন্ত্র ধারার আঙ্গিকেও রয়েছে বিষয় বৈচিত্র্যময়তা। লোকনাট্য যাত্রার কথাই ধরা যাক, এই যাত্রা যেমন স্বতন্ত্র ধারা, ঠিক তেমনি আবার বিষয়বস্তুর দিক থেকে বহু রকমের যাত্রা রয়েছে। তার মধ্যে রাম যাত্রা, কৃষ্ণ যাত্রা, ইমাম যাত্রা, কারবালার যাত্রা, গাজীর যাত্রা, সঙ যাত্রা, ভাসান যাত্রা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অর্থাৎ একই আঙ্গিক বা বিষয়ের আবার রয়েছে বহু উপ-বিষয়ভিত্তিক বৈচিত্র্যময়তা। লোকনাটক বিচারগানেও এই বিষয়ভিত্তিক বৈচিত্র্যময়তা রয়েছে। বিচারগানের পরিবেশনা বিশ্লেষণ করলে অসংখ্য বিষয়ের উপস্থিতি লক্ষণীয়। তবে বিচারগানকে বিষয়ের দিক থেকে প্রধানত পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা-

ক. ধর্ম বিশ্লেষণাত্মক পালাসমূহ

খ. আত্মীয় সম্পর্কিত পালাসমূহ

গ. হাস্যরসাত্মক পালাসমূহ

ঘ. জীবনবৃত্তান্তমূলক পালাসমূহ ও

ঙ. বিবিধ বিষয়ের পালাসমূহ

এই পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে আবার বেশ কিছু বিষয়ভিত্তিক পালা রয়েছে। বিচারগানের প্রতিটি পালাই মূলত স্বতন্ত্র একেকটি বিষয় হিসেবে চিহ্নিত। বিষয়গত বা পালাগত পার্থক্যের বিচারে বিচারগানের বিষয় বৈচিত্র্যময়তাকে নিম্নের ছকের মাধ্যমে বিভাজন করা যেতে পারে।

ধর্ম বিশ্লেষণাত্মক পালাসমূহ	**আত্মীয় সম্পর্কিত পালাসমূহ**	**হাস্যরসাত্মক পালাসমূহ**	**জীবনবৃত্তান্তমূলক পালাসমূহ**	**বিবিধ বিষয়ের পালাসমূহ**
গুরু-শিষ্য জীব-পরম কাম-প্রেম হিন্দু-মুসলমান রাধা-কৃষ্ণ সুবোল-মিলন শরিয়ত-মারফত হাশর-কেয়ামত নবুয়েত-বেলায়েত নূরতত্ত্ব-কারতত্ত্ব দেহতত্ত্ব-পারঘাটা আদম-হাওয়া আদম-শয়তান আদি আদম-বনি আদম আদি আদম-বিশ্বনবি আদম সৃষ্টি-নুর সৃষ্টি আদমতত্ত্ব-দেহতত্ত্ব আদম তত্ত্ব-নবি তত্ত্ব নবি তত্ত্ব-মেরাজ তত্ত্ব হায়াতুন্নবি-ওফায়াতুন্নবি নবি-সাহাবা	নারী-পুরুষ বাবা-মা বাবা-ছেলে মা-ছেলে ভাই-ভাই মামী-ভাগিনা	শালা-দুলাভাই শালী-দুলাভাই দেবর-ভাবী ননদ-ভাবী বিয়াই-বিয়াইন দুই বিয়াইন বাইদা-বাইদানী দুই বাইদানী দাদা-নাতিন দাদি-নাতি দাদি-নাতিন নানা-নাতিন জামাই-বউ জামাই-শাশুড়ি বউ-শাশুড়ি বুড়ি-ছোকরা বুড়া-ছুকরি	নবির জীবনী-কৃষ্ণের জীবনী বড়পির-খাজা বাবা খাজা বাবা-নবিজি লালন সাঁই-সিরাজ সাঁই লালন সাঁই-রশিদ সাঁই শাহ্ জালাল-শাহ্ পরান	মালজোড়া গ্রাম-শহর ধনী-গরীব সংসার-সন্ন্যাস বেহেস্ত-দোজখ জিন্দা-মরা তরিকার ভাই-বোন হাশরের মাঠ- কারবালার মাঠ পাগলা-পাগলী দয়াল-কাঙাল এজিদি ইসলাম-মুহাম্মদি ইসলাম কোরান-বিজ্ঞান

ছকে উল্লেখিত পালাগুলোর বাইরেও বিচারগানের গায়েনগণ নিত্য-নতুন বিষয়ের ওপর পালার সৃষ্টি করে থাকেন। সাধারণত প্রতিটি বিচারগানের পরিবেশনায় দুটি বিপরীতমুখী বিষয়ের দুটি পালা নিয়ে দুই দলের গায়েনগণ

‘পাল্লাপাল্লি’ বা প্রতিযোগিতা করেন। তবে মালজোড়া পালাটি হচ্ছে একটি সামগ্রিক পালা যেখানে কোনো সুনির্দিষ্ট বিষয় থাকে বা এ পালায় গায়েনদ্বয় একে অপরকে যে কোনো বিষয়ের ওপর প্রশ্নবাণে আক্রমণ করতে পারেন। অবশ্য দেশের সিলেট অঞ্চলে আবার সামগ্রিকভাবে বিচারগানই ‘মালজোড়া গান’ নামে পরিচিত। বিচারগানের প্রতিটি পালাই যেহেতু স্বতন্ত্র বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে সৃষ্টি, সেহেতু প্রতিটি বিষয়েই রয়েছে বিস্তৃত তত্ত্ব ও তথ্যগত বিশালতা। সেই সাথে প্রতিটি বিষয়ের পালা কেন্দ্রিক আবার অসংখ্য গানও রয়েছে। গায়েনগণ বিচারগানের পরিবেশনার আয়োজক কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত বিষয়ের পালার ওপর পরিবেশনা উপস্থাপন করে থাকেন। এ পর্যায়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ও জনপ্রিয় বিষয়ের পালাগুলো নিয়ে সারাংশমূলক ও সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করা যেতে পারে। এতে বিচারগানের বিষয় বৈচিত্র্যের একটি সামগ্রিক চিত্র চিত্রায়িত হবে। সেই সঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, বিচারগানের বিষয় বৈচিত্র্য হিসেবে পালাগুলো আলোচনা করতে যেয়ে উদারহণ বা প্রামাণ্য হিসেবে অডিও ক্যাসেট/ফিতা ক্যাসেট ও সিডি/ভিসিডিতে ধারণকৃত ও বাজারজাতকৃত বিচারগানের পালাসমূহ থেকে পরিবেশনার অংশ বেশি নেয়া হয়েছে। কেননা আসরে সরাসরি পরিবেশিত পালাগুলো সাধারণত সারারাত ব্যাপী হয়ে থাকে, এতে করে এই পরিবেশনাগুলো থেকে উদারহণ বা প্রামাণ্য উপস্থাপন করতে গেলে লেখার বাহুল্য বেড়ে যাবে। অন্যদিকে ক্যাসেটে পরিবেশিত পালাগুলো সংক্ষিপ্ত ও বাহুল্যমুক্ত। তাই অভিসন্দর্ভটিকে বাহুল্যমুক্ত করতে বেশির ভাগ প্রামাণ্যের ক্ষেত্রে ক্যাসেটে ধারণকৃত পরিবেশনা যুক্ত করা হয়েছে।

চিত্র-৭ : বিচারগানের অডিও ক্যাসেট ও ভিসিডি ক্যাসেটের ছবি (গবেষক কর্তৃক আব্দুর রশিদ সরকারের বাড়ি হতে সংগৃহীত)

প্রথম পরিচ্ছেদ

ধর্ম বিশ্লেষণাত্মক পালাসমূহ

বাংলাদেশে প্রচলিত ও পরিবেশিত প্রায় সকল লোকনাটকই ধর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত, বিচারগানও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে বিচারগান ধর্ম সম্পর্কিত হলেও এই পরিবেশনাটি সম্পূর্ণভাবেই একটি ধর্মনিরপেক্ষ নাট্যাঙ্গিক। বিচারগান সুনির্দিষ্ট কোনো ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করে না। বাংলাদেশে যতগুলো ধর্ম রয়েছে, তার প্রায় সবকটি ধর্মের সাথে এই পরিবেশাটির সম্পর্ক রয়েছে। বিচারগান পরিবেশনার প্রধান উদ্দেশ্য দর্শক-শ্রোতার মাঝে ধর্মের বাণী প্রচার করা। আর তাদের মতে তারা সকল ধর্মকে বুকে ধারণ করে মানবধর্ম বা মানবতাবাদের কথা বলেন। এ প্রসঙ্গে আয়নাল বয়াতির শিষ্য ও কিংবদন্তি বিচারগানের গায়েন অসীম দাশ বাউল বলেন,

> আমার কাছে ইসলামও যে রকম, সনাতনও ঐ রকম। আমি বাউল, আমার কাছে, কোনো মুসলমান নাই, আমার কাছে কোনো হিন্দু নাই, আমার কাছে কোনো বৌদ্ধ নাই, আমার কাছে কোনো খ্রিস্টান নাই। বাউল মানে একটি জাতি পৃথিবীতে, সে জাতির নাম মানুষ জাতি। তাই পালার ক্ষেত্রে একেকটা পাট নিয়ে আমরা গান গেয়ে থাকি। যখন আমার হিন্দুর ভূমিকা পড়ে, তখন আমি হিন্দু হই। যখন আমার ইসলামের ভূমিকা পড়ে, তখন আমি ইসলাম হই। (অসীম, ২০১৯ : পরিবেশনা)

অর্থাৎ বিচারগানে গায়েনগণ যে পরিবেশনায় অভিনয় করুক না কেন, তাদের মূল উদ্দেশ্য মানবতাবাদ দর্শনের প্রচার করা। তারা মঞ্চে অভিনয়ের জন্য পালা অনুযায়ী পরিবেশনায় অংশগ্রহণ করেন মাত্র। বিচারগানে ধর্ম বিশ্লেষণাত্মক পালার ক্ষেত্রে প্রধানত বাংলাদেশের প্রধান দুই ধর্ম ইসলামধর্ম ও হিন্দুধর্ম কেন্দ্রীক পালা দেখা যায়। পূর্বে ছকে বিভাজন করে দেখানো হয়েছে, ধর্ম বিশ্লেষণাত্মক পালার মধ্যে রয়েছে- গুরু-শিষ্য, জীব-পরম, কাম-প্রেম, হিন্দু-মুসলমান, রাধা-কৃষ্ণ, রাধা-কৃষ্ণের বাসর, মান-ভঞ্জন, সুবোল-মিলন, শরিয়ত-মারফত, হাশর-কেয়ামত, নবুয়েত-বেলায়েত, আদম-হাওয়া, আদম-শয়তান, আদি আদম-বনি আদম, আদি আদম-বিশ্ব নবি, আদম সৃষ্টি-নুর সৃষ্টি, আদমতত্ত্ব-দেহতত্ত্ব, আদম তত্ত্ব-নবি তত্ত্ব, নবি তত্ত্ব-মেরাজ তত্ত্ব, হায়াতুন্নবি-ওফায়াতুন্নবি ও নবি-সাহাবা পালা। এই পালাগুলোকে আবার বিশ্লেষণের প্রয়োজনে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় এবং যে পালাগুলো যে ভাগের মধ্যে পড়ে তা হলো-

১. মিশ্রধর্ম বিশ্লেষণাত্মক পালাসমূহ : গুরু-শিষ্য, জীব-পরম, কাম-প্রেম ও হিন্দু-মুসলমান পালা

২. হিন্দুধর্ম বিশ্লেষণাত্মক পালাসমূহ : রাধা-কৃষ্ণ ও সুবোল-মিলন পালা।

৩. ইসলামধর্ম বিশ্লেষণাত্মক পালাসমূহ : শরিয়ত-মারফত, হাশর-কেয়ামত, নবুয়েত-বেলায়েত, নূরতত্ত্ব-কারতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব-পারঘাটা, আদম-হাওয়া , আদম-শয়তান, আদি আদম-বনি আদম, আদি আদম-বিশ্ব নবি, আদমতত্ত্ব-

দেহতত্ত্ব, আদম সৃষ্টি-নুর সৃষ্টি, আদম তত্ত্ব-নবি তত্ত্ব, নবি তত্ত্ব-মেরাজ তত্ত্ব, হায়াতুন্নবি-ওফায়াতুন্নবি ও নবি-সাহাবা পালা।

নিচে এ পালাগুলো নিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হলো। এতে করে লোকনাটক বিচারগানের বিষয় বৈচিত্র্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।

১. মিশ্রধর্ম বিশ্লেষণাত্মক পালাসমূহ

এই পালাগুলোতে কোনো ধর্মকে প্রাধান্য দিয়ে আলোচনা করা হয় না। পালার প্রয়োজেন যে ধর্মের প্রসঙ্গ আসে, সেই ধর্মের তত্ত্ব, গল্প বা কাহিনির বর্ণনা করা হয়। গায়েনগণ মূলত গুরু-শিষ্য, জীব-পরম, কাম-প্রেম ও হিন্দু-মুসলমান পালা নিয়ে অভিনয় করার সময় এই পালাগুলোর বিষয়কে উপস্থাপন করার জন্য সব ধর্মের তত্ত্বীয় সহযোগিতা নেন। নিচে বিচারগানের বিষয়-বৈচিত্র্য হিসেবে এই পালাগুলো নিয়ে ক্রমান্বয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

গুরু-শিষ্য পালা

বিচারগানের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও পরিবেশিত পালা হচ্ছে গুরু-শিষ্য পালা। বাংলাদেশের সমগ্র অঞ্চলেই এই পালাটি বেশি পরিবেশিত হয়ে থাকে। পালাটির দুটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে, বিষয় দুটি হচ্ছে 'গুরু' ও 'শিষ্য'। একদিকে যেমন বিচারগানের কুশীলবদের ধর্মীয় বিশ্বাস 'গুরুবাদ', অন্যদিকে বিচারগানের আয়োজক বা পৃষ্টপোষকরাও 'গুরুবাদ'-এ বিশ্বাস করেন। আর এই গুরুবাদী দর্শনে গুরু-শিষ্য একে-অপরের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এছাড়া বিচারগানের চর্চা ও বিকাশে গুরু-শিষ্য পরম্পরাতো রয়েছেই। এ সকল বিষয়ের কারণেই বিচারগানের গুরু-শিষ্য বিষয়ের পালাটি সর্বাধিক জনপ্রিয়। গুরু-শিষ্য পালাটি সর্বাধিক পরিবেশিত হয় পির-গোঁসাইদের বাড়িতে, তাছাড়া বিভিন্ন মাজারের ওরশ মাহফিলেও পালাটি গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপিত হয়। এটি খুবই গুরুগম্ভীর ও তত্ত্বপূর্ণ পালা। গুরু-শিষ্য পালাটি দেশের অনেক অঞ্চলে 'গুরু-ভক্ত' পালা নামেও পরিচিত। পালাটি ধর্মীয় পালা হলেও এটি কোনো সুনির্দিষ্ট ধর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। পালার মূখ্য বিষয় গুরুর ভূমিকা ও শিষ্যের কর্তব্য। এ সংক্রান্ত আলোচনার প্রয়োজনে গায়েনগণ সকল ধর্ম ও পৌরাণিক কাহিনির তত্ত্ব ও উপমা উপস্থাপন করে থাকেন। গুরু-শিষ্য পালা সাধারণত বয়সে জ্যেষ্ঠ ও বিজ্ঞজনকে গুরুর ভূমিকায় অভিনয় করতে দেয়া হয়, আর তুলনামূলকভাবে যে গায়েন বয়সে ছোট ও কম জানেন (সব সময় সঠিক নয়) তাকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শিষ্যের ভূমিকায় অভিনয় করতে দেয়া হয়ে থাকে। এ পালায় গুরুর প্রতি জটিল ও নিগূঢ় প্রশ্ন করে থাকেন যিনি

শিষ্যের ভূমিকায় থাকেন। পক্ষান্তরে শিষ্যের প্রতি গুরুর প্রশ্ন থাকে সহজ ও কর্তব্যবিষয়ক। গুরু-শিষ্যের একের প্রতি অন্যের প্রশ্নের প্রধান প্রধান বিষয়গুলো সাধারণত নিম্নরূপবর্তী।

গুরুর প্রতি শিষ্যের প্রশ্ন	**শিষ্যের প্রতি গুরুর প্রশ্ন**
ক. কেন গুরু ধরবো, গুরু ধরার প্রয়োজনীয়তা কী?	ক. শিষ্য কেন গুরু ধরতে চায়?
খ. কী কারণে গুরু মহৎ বা বড়?	খ. শিষ্যের কী ধন আছে যা দিয়ে গুরুকে ভজন করবে?
গ. গুরু ধরার ধর্মীয় দলিল কী?	গ. গুরুর প্রতি শিষ্যের কর্তব্য কী?
ঘ. গুরু কী ধন দেয় যার কারণে গুরু ভজতে হবে?	ঘ. শিষ্য গুরুর কাছে কী চায়?
ঙ. এছাড়া গুরুর প্রতি শিষ্য আত্মতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব কামতত্ত্বসহ নানান সাধন-ভজন সম্পর্কে প্রশ্ন করে থাকেন।	ঙ. এছাড়া শিষ্যকে গুরু কর্তব্য ও সাধন-ভজন বিষয়ক প্রশ্ন করে থাকেন।

উপরি উক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও গুরু-শিষ্য ভূমিকায় অভিনয়কারী গায়েনদ্বয় নানা রকম হাসি-ঠাট্টামূলক ও তত্ত্বমূলক প্রশ্ন করে থাকেন। প্রশ্নগুলো গদ্য ও কাব্যেই বেশি করেন। গুরু ও শিষ্য পক্ষের বিভিন্ন প্রশ্নবোধক গানের মাধ্যমেও প্রশ্নবাণে আক্রমণ করা হয়। আর এই প্রশ্নবোধক গানের জবাবে উত্তরবোধক গানও পরিবেশন করা হয়। বিচারগানের আসরেও একটি প্রশ্নবোধক গান হচ্ছে-

গুরু আমি দেশের খবর জানতে চাই,
কোথায় ছিলাম, কোথায় আইলাম,
আবার যেন কোথায় যাই ॥
ছিলাম যখন নিরাকারে, না ছিল মোর আকার-সাকার,
করেছিলাম কিবা আহার, কী খেয়ে জীবন বাঁচাই।
এই সংসারে আকার নাই যার, স্থিতি কিসে জানা দরকার
করিতে সেই দেশের বিচার, ভাবিয়া আর কুল না পাই ॥ (দেওয়ান রজ্জব, ২০১৮ : ১৬)[১]

বিচারগানের আসরে শিষ্যপক্ষের গায়েন এই গানের মাধ্যমে নিজের সৃষ্টি বা জন্ম রহস্য সম্পর্কে জানতে চায়। গুরুপক্ষের গায়েন ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক বিভিন্ন তত্ত্বের সহায়তা নিয়ে যৌক্তিকভাবে প্রশ্নের উত্তর দেয়ার চেষ্টা করে থাকেন। কখনো কখনো গায়েন প্রশ্নের উত্তর গানের মাধ্যমেও দেন। গুরু-শিষ্য পালাটি বেশ গুরুগম্ভীরতত্ত্বনির্ভর হওয়ায় গায়েনগণ আসরে একে-অপরকে প্রশ্নও করেন খুবই নিগূঢ়তত্ত্বনির্ভর। এছাড়া গুরু-শিষ্য পালার প্রায় সকল

আসরেই গুরু ধরার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রশ্ন-উত্তর থাকে। আব্দুর রশিদ সরকার ও আমজাদ সরকার অভিনীত গুরু-শিষ্য পালায় এর প্রামান্য পাওয়া যায়। পালাটিতে শিষ্যপক্ষ হতে আমজাদ সরকার গুরুপক্ষের গায়েন আব্দুর রশিদ সরকারকে প্রশ্ন করেন, মানুষ তার নিজের ধর্মমতানুসারে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ইবাদত করা সত্ত্বেও তার কেন গুরু ধরতে হবে? বা গুরু ধরার ধর্মীয় দলিল কী? এই প্রশ্নের উত্তরে গুরুপক্ষের গায়েন আব্দুর রশিদ সরকার কোরান-হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে গুরু ধরার পক্ষে ধর্মীয় দলিল পেশ করেন। এছাড়া তিনি বাউল-সুফিদের গুরুবাদী ধারার সিলসিলার পরমগুরু হিসেবে বিবেচ্য নবি মুহাম্মদ (স.) ও মাওলা আলি (রা.)-এর গাদিরে খুমের ঘটনার কথা উল্লেখ করে গুরু ধরার পক্ষে যুক্তি উপস্থান করেন। গুরু-শিষ্য পালাটিতে গুরুর প্রতি আকুতি জানিয়েও বহুগান আসওে পরিবেশিত হয়ে থাকে। এ রকম একটি জনপ্রিয় গান হচ্ছে-

আজ আমার বান্ধব কেহ নাই, দয়াল চাঁন তুমি বিহনে।
আমার ডুবু ডুবু তরী, কেমনে ধরি পাড়ি,
হালের বৈঠা খাইলরে ঘুনে ॥
তাই দেখে নদীর ঝড়, সবাই হইল পর,
ফেলিয়া আমায় তুফানে।
ডাকে তোমার কাঙ্গাল কোথায় আছো দয়াল।
তরাইয়া নাও ঘোর নিদানে ॥ (লতিফ, ২০১৯ : পরিবেশনা)[২]

বিচাগানের জনপ্রিয় গায়েন লতিফ সরকার রচিত এই গানটি বিচারগানের আসরে বহুল পরিবেশিত একটি গান। গানটিতে শিষ্য সকল সমস্যার সমাধান হিসেবে গুরুর কৃপাদৃষ্টি প্রত্যাশা করেছেন। এবং পরপারে মুক্তিদাতা হিসেবেও গুরুর আরাধনা করা হয়েছে। বিচারগানের গুরু-শিষ্য পালাটি গানে, কথায় ও তত্ত্বে চমৎকার একটি পালা। পালাটির বিষয়বস্তুই পালাকে অনন্য করে তুলেছে।

চিত্র-৮ : বিচারগানের গায়েন (বাম থেকে) আব্দুল হালিম বয়াতি, আব্দুর রশিদ সরকার ও আমজাদ সরকার।

জীব-পরম পালা

বিচারগানের বিষয়ভিত্তিক পালাগুলোর মধ্যে জীব-পরম পালাটিকে ধর্ম বিশ্লেষাত্মক পালা হিসেবে শ্রেণিকরণ করা হলেও এটি কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এই পালাটি আন্তঃধর্মের বিষয়বস্তুর বিচার-বিশ্লেষণে উপস্থাপিত হয়। এটি ধর্মনিরপেক্ষ পালাও বটে। এছাড়া জীব-পরম পালাটি লোকিক ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মুক্তচিন্তার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবেও বিবেচ্য। জীব-পরম পালা বলতে বুঝানো হয় সৃষ্টি ও স্রষ্টা। এখানে জীব মানে সৃষ্টি বা মানুষসহ তাবৎ জীব-জগৎ এবং পরম মানে বিধাতা বা সৃষ্টিকর্তাকে বুঝায়। অর্থাৎ বিচারগানের জীব-পরম পালাটিতে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যকার নানাবিধ দ্বন্দ্ব ও অস্তিত্বের লড়াই হয়। যেখানে সৃষ্টি স্রষ্টাকে অস্বীকার করতে চায়। অন্যদিকে স্রষ্টা তাঁর বড়ত্ব-মহত্বের বড়াই করে এবং সৃষ্টিকে তাঁর প্রতি আনুগত্য স্বীকার করাতে নানা রকম যুক্তি উপস্থাপন করে থাকেন। আর সৃষ্টিও স্রষ্টার যুক্তির বিপক্ষে যুক্তি দিয়ে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ দাবি করেন এবং স্রষ্টার মহত্বকে অসার প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। যেখানে স্রষ্টা ও সৃষ্টির পক্ষের দুই গায়েন বিভিন্ন ধর্মের তত্ত্বের ভিত্তিতে এবং নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা খাটিয়ে যুক্তি উপস্থাপন করেন। পালাটিকে মোটাদাগে দেখলে অনেকটা নাস্তিক-আস্তিকের লড়াই মনে হয়। বিচারগান পরিবেশনার শেষ পর্যায়ে প্রায়ই দেখা যায়, জীব ভূমিকায় যিনি অভিনয় করেন, তিনি পরমের ভূমিকায় অভিনয়কারী গায়েনের নিকট আত্মসমর্পন করার মাধ্যমে পরমের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে থাকেন। তবে অনেক সময় পালাটির দ্বিপাক্ষিক যুক্তি-তর্কের লড়াই তুমুল পর্যায়ে পৌঁছালে তখন কেউ কারও নিকট আত্মসমর্পন বা অনুগত্য স্বীকার করে না। বিশেষ করে বিচারগানের স্বনামধন্য দুই প্রয়াত গায়েন জুটি আ. হালিম বয়াতি বনাম রজ্জব আলী দেওয়ান ও আব্দুর রশিদ সরকার বনাম পরশ আলী দেওয়ান একে-অপরের নিকট আনুগত্য স্বীকার করতে চাইতেন না। যুক্তি দিয়ে যে করেই হোক নিজের পক্ষকে জয়ী করতে চাইতেন। এ জন্য জীব পক্ষের গায়েন পরম পক্ষের গায়েনকে যাচ্ছেতাই ভৎসর্ণা করতেন। এমনকি জীবের ভূমিকায় থেকে পরমকে নানাভাবে হেয়প্রতিপন্ন করতে দ্বিধা করতেন না। এ রকম একটি পালার বিষয়ে বিচারগানের প্রবীণ দর্শক মো. আজিমদ্দিন জানিয়েছেন,

> প্রায় ৩০-৪০ বছর আগে মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর থানাধীন বাহাদুরপুর বাজারে প্রয়াত আ. হালিম বয়াতি ও রজ্জব আলী দেওয়ানের মধ্যে জীব-পরমের পালায় তুমুল লড়াই হয়েছিলো। যেখানে রজ্জব আলী দেওয়ান ছিলেন জীবের ভূমিকায় আর আ. হালিম বয়াতি ছিলেন পরমের ভূমিকায়। উক্ত পালায় রজ্জব আলী দেওয়ান জোরালো যুক্তি দিয়ে বলেন স্রষ্টা বলতে কিছুই নেই। অন্যদিকে আ. হালিম বয়াতিও ছাড়ার পাত্র নন। তিনিও নানা যুক্তি দিয়ে পরম বা স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ করতে চান। দর্শক-শ্রোতা মোহগ্রস্থ হয়ে সেই পালা উপভোগ করেছিলো। (আজিমদ্দিন, ২০২১ : সাক্ষাৎকার)

এমনকি বর্তমানেও এই পালাটির মাধ্যমে প্রান্তিক পর্যায়ে মানুষজনের মুক্তচিন্তার চর্চা হয়। পালাটিতে ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানধর্মসহ নানা ধর্ম ও মতের দৃষ্টান্ত ও মিথ উপস্থাপন করে পরমের অস্তিত্ব চ্যালেঞ্জ করা হয়। বাংলাদেশের

সকল ধর্মের মানুষের নিকট পালাটি বেশ জনপ্রিয়ও বটে। জীব-পরম পালায় গায়েনদ্বয় একে-অপরের প্রতি যে সকল প্রশ্ন করে থাকেন, তার মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে-

ক. স্রষ্টাকে কে সৃষ্টি করেছেন? স্রষ্টার যদি পিতা-মাতা না থাকে তবে তার নাম রেখেছেন কে?

খ. স্রষ্টার আসল নাম কি? স্রষ্টা কত জন? স্রষ্টা যদি একজন হয় তবে পৃথিবীতে তাঁর দেয়া ধর্ম এতগুলো কেন?

গ. স্রষ্টা যদি স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় তবে তাঁর আবার ইবাদত-উপাসনার কী দরকার?

ঘ. স্রস্টার আকার কী? আকার থাকলে সে দেখতে কেমন?

ঙ. বিশ্বের এতকিছু দেখা যায়, স্রষ্টা থাকলে তাকে দেখা যায় না কেন?

চ. স্রষ্টা যদি না থাকে তবে জীবের জন্ম হলো কিভাবে?

ছ. জীব যদি কারও সৃষ্টিই না হয়, তবে সে জন্ম-মৃত্যুর উর্ধ্বে নয় কেন?

জ. জীব যদি মুখাপেক্ষীই না হবে তাহলে সে নিজেকে নিজের মত চালাতে পারে না কেন?

ঝ. জীবের জন্মের আগে সে কোথায় ছিলো এবং মৃত্যুর পর কোথায় যাবে?

ঞ. জীব যদি পার তবে কোনো কিছু সৃষ্টি করে দেখাও?

এ রকম বহু প্রশ্ন ও উত্তর জীব-পরম পালায় করা হয়ে থাকে। বর্তমান সময়ের বিচারগানের জনপ্রিয় গায়ক পাগল মনির জীবের ভূমিকায় থেকে গায়ক বড় আবুল সরকারের কাছে একটি পালায় প্রশ্ন করেন, তাতে উপরে উল্লেখিত প্রশ্নগুলোর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। পরিবেশনাটিতে পাগল মনির বলেন,

> আমার এইবার প্রশ্ন এলো ধর্মসভার ঠাঁই, জীব নিয়া পরমের কাছে কিছু জানতে চাই, কী প্রশ্ন? পরম আমার খালি প্রশ্ন, জীব এবং পরম, এই জীব-পরমের মধ্যে সম্পর্ক কী? এবং জীব-পরমের মধ্যে লেনদেন হয় কিভাবে? এই প্রথম স্টেজে ছোট একটি প্রশ্ন? আশা করি জবাব দিবেন? 'কুলবিল মুমিনিন আরশে আল্লাহ্'। মুমিনের কলবে আল্লার আরশ বা আরশের সমতুল্য। যদি এই কথাই সত্য হয়। এই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় মুমিন ছিলো আমাদের রাসুল। রাসুলের চাইতে বড় মুমিন হইতে পারে না, আজ পর্যন্ত হয়ও নাই, হবেও না। যদি মুমিনের কলবেই আল্লার বারামখানা হয়ে থাকে, আরশের সমতুল্য হয়ে থাকে, আল্লার সিংহাসন হয়ে থাকে। তাইলে রাসুলের ভেতরেওতো কলব ছিলো। তাইলে এই কলবের মইধ্যে থুইয়া সপ্তম আকাশ ভেদ করে, আবার কোন আল্লার কাছে দেখা করতে গেছে? তাইলে এই কলবে কোন আল্লাহ আর সপ্তম আকাশ ভেদ করে কোন আল্লাহ? এই পর্যন্ত কথা আমার আর তো কিছু নাই, আশা করি জবাব দিবে আমার আবুল ভাই।
> (মনির, ১৯৯৮ : পরিবেশনা)

উক্ত পালাটিতে দেখা যায়, পাগল মনিরের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বড় আবুল সরকারও চমকপ্রদ প্রশ্ন রাখেন পাগল মনিরের প্রতি। পরমের ভূমিকা থেকে প্রথম আসরে আবুল সরকারের মূল প্রশ্ন ছিলো- জীবের এতই বাহাদুরি তবে সে পরমের অধীন কেন? জীব কেন তার মরণ ঠেকাতে পারে না? এভাবেই বিচারগানের প্রতিটি জীব-পরমের পালায়

পরমের অদৃশ্যতা ও জীবের মুখাপেক্ষীতা নিয়ে স্যাটায়ারধর্মী প্রশ্নবাণে আঘাত করা হয়। এমনকি অনেক মহাত্মা বাউল, কবিয়াল, গায়করা চমকপ্রদ প্রশ্নবোধক গানও রচনা করেছেন। তার মধ্যে বিচারগানে বহুল পরিবেশিত একটি গান হচ্ছে-'জানিতে চাই দয়াল তোমার আসল নামটি কী?' এই গানটি অবশ্য কবিগানের বিখ্যাত কবিয়াল বিজয় সরকার রচিত। গানটির মধ্যে পরমকে নানাভাবে প্রশ্ন করা হয়েছে।

আমরা বহুনামে ধরাধামে কত রকমে ডাকি,
(আমি) জানিতে চাই দয়াল তোমার আসল নামটা কি ॥
কেউ তোমায় বলে ভগবান আবার গড বলে কেউ করে আহ্বান,
কেউ খোদা কেউ জিহুদা কেউ কয় পাপীয়ান,
গাইলাম জনম ভরে মুখস্থ গান মুখ বুলা টিয়াপাখি ॥ (বিজয়, ২০২২ : সংগ্রহ)[৩]

এই পালাটিতে গায়েনগণ আসরে এমন সব যুক্তি উপস্থাপন করেন যার কারণে অনেক গায়েনকে দেশের ধর্মান্ধদের রোষানলে পড়তে হয়। বাংলাদেশে ইতোমধ্যেই বিচারগানের বহু গায়েন মৌলবাদী-উগ্রবাদী গোষ্ঠীর হামলা-মামলার শিকার হয়েছেন। বিশেষ করে বিচারগানের প্রখ্যাত গায়েন শরিয়ত সরকার প্রতিক্রিয়াশীলদের মামলায় হয়রানির শিকার হয়েছেন। জীব-পরম পালাটিতে যে সমস্ত আলোচনা হয় তাতে অবশ্য পরিবেশনার দর্শক-শ্রোতারা অভ্যস্ত। এমনকি আসরে যুক্তির মাধ্যমে আঘাত-পাল্টা আঘাত কম হলে দর্শক-শ্রোতাদের নিকট পরিবেশনাটির আবেদন কমে যায়। মূলত পালাটির সৌন্দর্যই হচ্ছে গায়েনদের মুক্ত আলোচনা।

চিত্র-৯ : বিচারগানের গায়েন (বাম থেকে) পাগল বাচ্চু, পাগল সোহরাব ও পাগল মনির।

কাম-প্রেম পালা

বিচারগানের প্রতিটি পালা ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিকতত্ত্বনির্ভর হলেও কাম-প্রেম পালাটি অতিনিগূঢ়তত্ত্বনির্ভর। পালার প্রেম পক্ষ নিয়ে যে গায়েন লড়াই করেন, তাঁর আলোচ্য বিষয় থাকে- স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টির/ সৃষ্টির প্রতি স্রষ্টার, গুরুর প্রতি শিষ্যের, পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের, বোনের প্রতি ভাইয়ের বা সামগ্রিক অর্থে মানুষের প্রতি মানুষের যে প্রেম বা ভালোবাসা। যে ভালোবাসা বা প্রেমে যৌনতা নেই। পালায় আরেক পক্ষ কাম নিয়ে পরিবেশনায় প্রতিযোগিতা করেন। যেখানে মূলত নর-নারীর যৌনতা মিশ্রিত ভালোবাসাই প্রধান। যার মাধ্যমে মানুষের বংশবৃদ্ধির প্রক্রিয়া সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করা হয়। এ পালাটিতে সুফি ও বাউল মতাদর্শন অনুসারে রতি শাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয় বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। দুই পক্ষের গায়েনের আলোচনার সারমর্ম থাকে কিভাবে রতি ধারণ করে জীবন যাপন করা যায়। কারণ বিচারগানের কুশীলবদের বিশ্বাস, ঈশ্বর প্রাপ্তির অন্যতম সাধনা হচ্ছে রতি সাধনা। বিচারগানের বর্তমান প্রখ্যাত গায়ক জালাল সরকার (সাধু) কাম-প্রেম পালার এক আসরে বলেন,

> ষাট ফোঁটা রক্ত থেকে এক ফোঁটা রতি, ষাট ফোঁটা রতি থেকে এক ফোঁটা মতি আর ষাট ফোঁটা মতি থেকে এক ফোঁটা জ্যোতি। আর সাধকরা এই জ্যোতি অর্জন করার মাধ্যমে সাঁইয়ের দেখা পান বা জ্যোতি পর্যায়ে গেলেই সাধক তার মধ্যে সাঁইয়ের দর্শন করতে পারেন। (জালাল, ২০১৯ : পরিবেশনা)

বিচারগানের গায়ক-কুশীলবদের বিশ্বাস অনুসারে কামকে বশ করে রতি ধারণের মধ্য দিয়ে শুদ্ধ প্রেমের জগতে পৌঁছালেই মিলে পরম ঈশ্বরকে। তবে বিচারগানে পালার প্রয়োজনে গায়েনগণ যুক্তি দিয়ে প্রতিপক্ষের বিষয়কে (কাম/প্রেম) অস্বীকার বা নাকচ করেও দেন। অবশ্য পালার পরিশেষে দুপক্ষের গায়েনই কাম ও প্রেমকে মেনে নেন। অন্যদিকে কাম ও প্রেম বিষয়টি অন্যান্য পালার চেয়ে অনেক বেশি মনোদৈহিক হওয়ায় শ্রোতা-দর্শকদের নিকট খুবই জনপ্রিয়। এছাড়া বিচারগানের প্রধান পৃষ্টপোষক পির ও গোঁসাইদের আধ্যাত্মিক বিষয় হওয়ায় মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন দরবার বা আখড়ায় কাম-প্রেম পালাটি উপস্থাপনও বেশি হয়ে থাকে। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে দরবার বা আখড়ার ভক্ত-শিষ্যরা যাতে খুব সহজেই রতি সাধনা শিখতে পারেন। পালাটির পরিবেশনাকালে কখনো কখনো খোলামেলা যৌনতাবিষয়ক আলোচনা হয়। অবশ্য আলোচনা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রতীকী আশ্রয় করে হয়। এ জন্য গায়েনগণ বিভিন্ন প্রতীকী শব্দ বা বর্ণ ব্যবহার করেন। তার মধ্যে পুরুষ যৌনাঙ্গকে 'আলিফ' আর স্ত্রী যৌনাঙ্গকে 'মিম' বা 'ত্রিমোহনা' হিসেবে উল্লেখ করতে দেখা যায়। এমনকি বিচারগানে পরিবেশিত কামতত্ত্বের বহুগানেও 'আলিফ' বা 'ত্রিমোহনা' শব্দদ্বয় পাওয়া যায়। তবে 'আলিফ' ও 'মিম' বর্ণ বা শব্দ দুটিকে যৌনাঙ্গের মানে ছাড়া অন্যান্য মানেও বুঝানো হয়। সর্বোপরি বিচারগানের গায়েনগণ প্রতীকী শব্দ চয়ন কিংবা অনাবৃত যৌনতাবিষয়ক খোলামেলা শব্দ ব্যবহার করে দর্শকদের মাঝে রতিশাস্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করেন। গায়েনগণ পালায় কখনো কখনো

যৌনতা মিশ্রিত কৌতুকও (এডাল্ট জোকস্) পরিবেশন করে থাকেন। এছাড়া কাম-প্রেম পালায় গানে গানে কাম ও প্রেমের নিগুরতত্ত্বের আলোচনা করতে দেখা যায় গায়েনদের। আব্দুর রশিদ সরকার রচিত এ রকমই একটি গান বিচারগানের কাম-প্রেম পালায় বেশ জনপ্রিয় ও বহুল পরিবেশিত। সেটি হচ্ছে-

অনাদির আদি গোলকের নিধি
তার নাই কভু গোষ্ঠী খেলা
টল অটল সুটল এসব তো শাইর
ভবলীলা ॥
ওহেদাল্লা লা শারিকি
নিত্য ছেড়ে নীলায় দেখি,
করে অটলে আশ্রয়, টলে সৃষ্টি হয়
জাতে রয় স্বরূপের গোলা ॥ ঐ (রশিদ, ২০২০ : ১৯২)[৪]

এই গানটি মূলত পালাটির প্রেম পক্ষের গায়েন গেয়ে থাকেন। গানের মধ্যে প্রেম ও কামের বিভিন্ন পর্যায় উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সাথে পরম ঈশ্বর কামুক নয় তিনি সকল প্রেমের আধার সে কথাই বলা হয়েছে। পালাটিতে অন্যান্য পালার মতোই গায়েনগণ স্বপক্ষের পালাকে শ্রেষ্ঠ দাবি করে যুক্তি উপস্থাপন করেন। প্রেম ও কাম মানুসের জীবনের সাথে ওতোপ্রতোভাবে যুক্ত থাকায় দুটি বিষয়ের পক্ষেই জোড়ালো যুক্তি দিতে পারেন গায়েনগণ। তবে গায়েনভেদে পালার জয়-পরাজয় অনেকাংশেই নির্ভর করে। আসরে যে পক্ষের গায়েন বেশি বিজ্ঞ হয় সে পক্ষেরই জয় হয়। তবে বিজ্ঞতার সাথে সাথে গায়েনের বাগ্মিতাও আবশ্যক। সঠিক সময়ে সঠিক যুক্তি না দিতে পারলে আসরে গায়েনের পরাজয় নিশ্চিত হয়ে যায়। পালায় গায়েনগণ একে-অপরকে প্রতিযোগিতায় পরাজিত করতে নানা রকম প্রশ্ন করে থাকেন। এই প্রশ্নগুলোর বেশির ভাগই গদ্য-কথায় হলেও গানে গানেও প্রশ্ন-উত্তর করা হয়ে থাকে। বিচারগানের দুই বিখ্যাত গায়েন আব্দুর রশিদ সরকার ও আকলিমা বেগম পরিবেশিত কাম- প্রেম পালার একটি পরিবেশনায় গানের মাধ্যমে প্রশ্ন করার দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে। পালার এক পর্যায়ে আকলিমা বেগম গানে গানে আব্দুর রশিদ সরকারকে প্রশ্ন করেন-

(ওরে) প্রেম হইলো কত প্রকার, কোন প্রেমে মূল মহাজন,
ওহে প্রেমিক প্রেমের কথা কর বিশ্লেষণ ॥
কোন প্রেমে কাহার বসতি, কোন প্রেমে হয় ঊর্ধ্বে রতি,
কোন প্রেমে তোর ভজন গতি, ঊর্ধ্বে সদা হয় গমন ॥ (আকলিমা, ২০০৭ : পরিবেশনা)[৫]

গানটিতে আকলিমা বেগম কাম পক্ষ থেকে প্রেম পক্ষের গায়েন আব্দুর রশিদ সরকারের নিকট জানতে চেয়েছেন, প্রেম কত প্রকার ও কী কী? কিভাবে প্রেমের আদান-প্রদান হয়? এছাড়া কাম ছাড়া প্রেম করা যায় কিনা তাও জানতে

চাওয়া হয়েছে। পালাটিতে আব্দুর রশিদ সরকার এই গানের উত্তর দিয়ে আকলিমা বেগমের প্রতিও প্রশ্ন করেন। পালায় দুই গায়েনই বিচক্ষণ হওয়ায় স্ব স্ব পালার পক্ষে জোড়ালো যুক্তি দিতে সক্ষম হয়েছেন। পালায় কে জয়ী, কে পরাজিত হয়েছেন সেটা বলা মুশকিল বটে। তবে পালাটিতে দুই পক্ষের গায়েনই পরিবেশনায় শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ রেখেছেন। যাহোক, কাম-প্রেম পালার বিষয়বস্তুর জন্যই পালাটি বিচারগানের আসরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পালা হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

হিন্দু-মুসলমান পালা

বাংলাদেশের লোকনাট্য পরিবেশনার মধ্যে বিচারগানের হিন্দু-মুসললমান পালাটি বিষয়বস্তুর দিক থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী পরিবেশনা। এমনকি এ পালাটির বিষয় ও আঙ্গিকের স্বাতন্ত্র্য সারাবিশ্বের নাট্যজগতেও বিরল বললে অত্যুক্তি হবে না। কেননা এটি এমন একটি পরিবেশনা যেখানে দুটি বৃহৎ ধর্ম নিয়ে প্রতিযোগিতামূলক বাহাস হয়। অথচ পরিবেশনার পদে পদে আবার আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির বাণী প্রচারিত হয়। সেই সঙ্গে পরিবেশনায় গায়েনগণ দুই ধর্মের ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যমান আচার-সংস্কৃতির বিভিন্ন খুঁত ধরিয়ে দেয়। পরিবেশনার সবচেয়ে চমকপ্রদ বিষয়টি হচ্ছে এই ধর্মীয় বাহাসের দ্বিপাক্ষিক কৌশল। পালাটিতে বিচারগানের অন্যান্য পালার মতোই দুজন গায়েন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অভিনয় করে থাকেন। পালায় দুটি ধর্মের মধ্যে লড়াই হওয়ার দরুন দেখা যায়, গায়েন ব্যক্তি জীবনে যে ধর্মাবলম্বন করেন, সে ধর্মের বিপক্ষের পালাটির পক্ষাবলম্বন করে গান পরিবেশন করে থাকেন। অর্থাৎ যিনি হিন্দু তিনি মুসলমানের পক্ষে আর যিনি মুসলমান তিনি হিন্দুর ভূমিকায় অভিনয় করে গান করেন। দেখা যায়, নিজ পালাকে (যেটি তার নিজের ধর্ম নয়) জেতানোর জন্য নিজের ব্যক্তি জীবনে চর্চিত ধর্মের বিপক্ষেও কথা বলেন। পালার স্বার্থে বিপক্ষের গায়েনের পালার (হিন্দু/মুসলমান) বিরুদ্ধে নানা রকম যুক্তি উপস্থাপন করেন। হিন্দু-মুসলমান পালাটিতে যে সব সময় এই রকমই হয় তা নয়, কখনো কখনো গায়েনগণ নিজ ধর্মের পক্ষেও পালা নিয়ে পরিবেশনায় অংশগ্রহণ করেন। তখনও দেখা যায়, গায়েনগণ অন্যপক্ষের ধর্মের বিরুদ্ধে কড়া কথাবার্তা বলেন। আবার এমনও হয় দুইজনই হয়তো মুসলমান বা হিন্দু গায়ক কিন্তু দুইজন গায়ক দুই ধর্মের পক্ষে গান করেন। এভাবে হিন্দু-মুসলমান পালাটি অবশ্য খুব বেশি অনুষ্ঠিত হয় না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যক্তি জীবনে চর্চিত ধর্মের বিপক্ষের পালাটিতে গায়েনগণ গান করেন এবং এই পালায় প্রধানত হিন্দু ও মুসলমান গায়েনই অভিনয় করে থাকেন। পালাটির মধ্যে যেভাবে গায়েনদ্বয় একে-অপরের বিপক্ষে পালার (হিন্দু/মুসলমান) বিরুদ্ধে নানা রকম অভিযোগ তুলেন, ভুল-ত্রুটি-কুসংস্কার চিহ্নিত করেন এবং ধর্মীয় বিশ্বাসকে প্রশ্নবিদ্ধ করেন, তা সত্যি বিস্ময়কর ব্যাপার। অথচ পালার মধ্যকার গায়েন, কুশীলব ও দর্শক-শ্রোতা ব্যাপারটিকে খুব স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেন।

পরিবেশনাস্থলে কোনো রকম সাম্প্রদায়িকতা, উগ্রতা-অসহিষ্ণুতা দেখা তো যায়-ই না বরং যে গায়েন যত বেশি বিপক্ষের পালার ধর্মের খুঁত ধরতে পারেন সে তত বেশি বাহবা পেয়ে থাকেন। বিচারগানের হিন্দু-মুসলমান পালাটিকে বলা যেতে পারে বাংলাদেশ তথা গোটা বিশ্বের জন্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সহিষ্ণুতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পালার সামগ্রিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, গায়েনগণ ধর্মের বিভেদকে সরিয়ে দিয়ে মানবতাবাদের বাণী প্রচার করেন। বিচারগানের প্রায় সব গায়কই হিন্দু-মুসলমান পালাটিতে অভিনয় করে থাকেন। কোনো কোনো গায়ক আবার এই পালাটিতে অভিনয়ের জন্য দর্শক-শ্রোতাদের নিকট বেশ জনপ্রিয় হয়েছেন। তাদের মধ্যে খুব জনপ্রিয় ও স্বনামধন্য দুজন গায়ক হচ্ছেন ননী ঠাকুর ও পরশ আলী দেওয়ান। এই দুজন গায়কই প্রয়াত হলেও এখনো মানুষের মুখে মুখে ফেরে তাদের পরিবেশিত হিন্দু-মুসলমান পালার লড়াইয়ের গল্প। অডিও (ফিতা ক্যাসেট) যুগে এই দুজনের হিন্দু-মুসলমান পালার একটি ক্যাসেট এক সময় গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে, হাট-বাজারে, দোকানে, মাইকে, মালাই বিক্রেতার ভ্যান গাড়িতে বাজতো। বিশেষ করে ননী ঠাকুরের শ্লেষাত্মক ঠাট্টা-মশকরা আর পরশ আলী দেওয়ানের কণ্ঠে হিন্দুধর্মবিষয়ক গানগুলো মানুষকে বিমোহিত করে রাখতো। এছাড়া মালেক সরকার বনাম শংকর দাস বাউল, সুনীল কর্মকার বনাম বারেক বৈদেশী ও অসীম সরকার বনাম শাহ আলম সরকার, এই তিন যুগলের হিন্দু-মুসলমান পালার লড়াই বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। ২০২০ সালে শংকর দাস বাউল ও ২০২২ সালে অসীম দাশ বাউল প্রয়াত হয়েছেন। এখনও ভিসিডি ও ইউটিউবে ধারণকৃত তাদের হিন্দু-মুসলমান পালা দর্শক-শ্রোতাদের নিকট বেশ জনপ্রিয়। এ পালাটি প্রায় সব গায়ক করলেও বর্তমানে বড় আবুল সরকার, লতিফ সরকার, কাজল দেওয়ান, কাজল রেখা, মমতাজ বেগম, পাপিয়া সরকারসহ প্রমুখ গায়ক পালাটির জন্য দর্শক নন্দিত হয়েছেন। হিন্দু-মুসলমান পালায় গায়েনগণ কিছু সাধারণ প্রশ্ন ও শ্লেষাত্মক কথা বলে থাকেন। এর মধ্যে ধর্মের মৌলিক বিষয়কে প্রশ্নবিদ্ধ করেন ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিভিন্ন আচার-আচরণ নিয়ে ঠাট্টা-শ্লেষ করে থাকেন। এ রকম কতগুলো প্রশ্নবোধক ও শ্লেষাত্মক বিষয় হচ্ছে-

ক. ইসলামধর্মে মূর্তি পূজা হারাম অথচ হজে গিয়ে কাবাগৃহের গায়ে হাজরে আসওয়াদ পাথরে চুম্বন, কাবাগৃহ তাওয়াফ, শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করার জন্য কংক্রিটের স্তম্ভে পাথর ছোঁড়াকে মূর্তি পূজার নামান্তর বলে কটাক্ষ করেন হিন্দু পক্ষের গায়েন।

খ. হিন্দুধর্মে মূর্তিপূজা করা হয় অথচ মূর্তি নিজেই নিজেকে রক্ষা করতে পারেন না বলে কটাক্ষ করেন মুসলমান পক্ষের গায়েন।

গ. নবি মুহাম্মদ (স.)-এর বহুবিবাহ ও আয়েশা (রা.)-এর মতো বালিকাকে বিবাহ করাকে শ্লেষ করা হয়।

ঘ. শ্রী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান হয়ে মামীর সাথে কিভাবে লীলা করেন, এ বিষয় নিয়ে শ্লেষ করা হয়।

ঙ. মুসলমানদের মধ্যে পুরুষদের সুন্নতে খাৎনা হলেও মেয়েদের কী বিধান? এ বিষয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে প্রশ্ন করা হয় হিন্দু-মুসলমান পালায়।

চ. হিন্দুধর্মের ব্রাহ্মণদের পৈতা, পূজা, আচারের সমালোচনা করা এবং জাত-পাতের বৈষম্য নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় হিন্দু-মুসলমান পালায়।

ছ. নবি মুহাম্মদ (স.) কর্তৃক তাঁর পালিতপুত্র জায়েদ (রা.)-এর স্ত্রীকে বিবাহ পক্ষান্তরে নিজপুত্র দেবতা কার্তিকের প্রতি মা দেবী দুর্গার কাম বাসনার সমালোচনা যেমন হয়, তেমনি গায়েনগণ এই সম্পর্কের বৈধতার পক্ষে নানান যুক্তিও উপস্থাপন করে থাকেন।

জ. দুর্গা পূজায় বেশ্যালয়ের মাটি লাগে কেন? মা কালীর জিব বের করা কেন? গণেশের মাথা হাতির কেন? বিনা দোষে সীতা বনবাসী কেন? হিন্দুধর্মের এ রকম বিবিধ বিষয়ের কারণ জানতে চাওয়া হয়।

ঝ. নামাজ পাঁচ ওয়াক্ত কেন? রোজা ত্রিশটি কেন? চার বিয়ে বৈধ কেন? কোরবানি করতে হবে কেন? জিহাদ বা ধর্মযুদ্ধ কেন? ইসলামধর্মের নানান বিষয়ের কারণ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়।

ঞ. ইসলাম কিংবা হিন্দুধর্মের মধ্যে এত উপসম্প্রদায় বা মতবাদ কেন? এ বিষয়ে জানতে চান গায়েনগণ।

এ রকমভাবে গায়েনগণ বিপক্ষের গায়েনকে প্রশ্নবাণে পরাজিত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করে থাকেন। তবে দেখা যায়, গায়েনগণ প্রতিটি প্রশ্নেরই যুক্তি সহযোগে উত্তর দিয়ে থাকেন এবং উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাও উত্তর শুনে বাহবা দেন। এমনকি সরাসরি ধর্মের স্তুতি ও ধর্মকে কটাক্ষ করে গায়েনগণ গানও পরিবেশন করে থাকেন। গানের বাণীতেও অসাম্প্রদায়িকতার চর্চা দেখা যায় বিচারগানে। গায়ক হয়তো হিন্দুধর্মের কিন্তু তিনি ইসলামধর্মের স্তুতিমূলক গান রচনা করেন। অন্যদিকে গায়ক হয়তো ইসলামধর্মের কিন্তু তিনি হিন্দুধর্মের গুণগান করে গান রচনা করে থাকেন। বিচারগানের দুই প্রখ্যাত গায়েন মালেক সরকার ও শংকর দাস বাউল পরিবেশিত হিন্দু-মুসলমান পালায় তার প্রামণ্য পাওয়া গেছে। মালেক সরকার ইসলাম ধর্মাবলম্বী হয়েও হিন্দুধর্মের পক্ষে গান রচনা করেছেন আার শংকর দাস বাউল হিন্দু ধর্মাবলম্বী হয়েও ইসলামধর্মের পক্ষের গান রচনা করেছেন। হিন্দু-মুসলমান পালায় মালেক সরকার রচিত-পরিবেশিত একটি গান হচ্ছে-

> নামের বাঁশি আছে প্রভু, গয়া-কাশি-গোলকধাম,
> যদি ভালো লাগে তোমার দ্বীনবন্ধুর নাম ॥
> নামই তন্ত্র, নামই মন্ত্র, নামে কাটে মনের ভ্রান্ত,
> নাম জপিয়ে নিশীকান্ত মরা নামই হয় সে রাম ॥ (মালেক, ১৯৯৮ : পরিবেশনা)[৬]

মালেক সরকার রচিত এই গানটিতে যেমন হিন্দুধর্মের স্তুতি ও তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে, তেমনি হিন্দু-মুসলমান পালায় শংকর দাস বাউল রচিত-পরিবেশিত একটি গানে ইসলামধর্মের স্তুতিসহ নানা বিষয় চিত্রিত হয়েছে। গানটি হচ্ছে-

আমার মুহাম্মাদ রাসুল গো, আমার হাবিবে রাসুল ॥
সাফায়েতুল্লাহ নবি, রাহমাতাল্লিল আলামিন,
যাকে পেয়ে ধন্য হল আসমান-জমিন,
ও জিকির করে ফেরেশতাগণ নামেতে মশগুল ॥ (শংকর, ১৯৯৮ : পরিবেশনা)[৭]

মালেক সরকার ও শংকর দাস বাউল পরিবেশিত হিন্দু-মুসলমান পালাটিতে স্বধর্মের বাইরের ধর্মের যেমন প্রশংসা করে গান পরিবেশন করেছেন, তেমনি গায়েনদ্বয় পালায় নানা রকম যুক্তি দিয়ে নিজের অভিনীত পালাকে জয়ী করার চেষ্টাও করেছেন। বিশেষ করে মালেক সরকার মুসলমান হয়েও পালায় অভিনয়ের প্রয়োজনে ইসলামধর্মের সমালোচনা করেছেন। অন্যদিকে শংকর দাস বাউলও হিন্দু ধর্মাবলম্বী হয়ে হিন্দুধর্মের সমালোচনা করতে দ্বিধা করেননি। এই পরিবেশনার এক পর্যায়ে মালেক সরকার হিন্দুধর্মের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্যের কথা তুলে ধরেন। পালায় অবশ্য শংকার দাস বাউল মুসলমানদের নির্দোষ দাবি করে জোড়ালো বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এই দুই গায়েনের অভিনীত হিন্দু-মুসলমান পালাটি একটি অসাধারণ পরিবেশনা, যাতে বিচারগানের আসরে এই পালার যথার্থ বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। হিন্দু-মুসলমান পালার প্রামাণ্য হিসেবে অভিসন্দর্ভের পরিশিষ্টে পালাটির গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ যুক্ত করা হয়েছে। যার মাধ্যমে পালাটি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। যাহোক, বিচারগানের হিন্দু-মুসলমান পালাটি বিষয়বস্তুর কারণে নিঃসন্দেহে অনন্য-অসাধারণ। কেননা এ পালায় আন্তঃধর্মের সমালোচনা ও সম্প্রীতির প্রেয়ময় উপস্থাপন হয়ে থাকে।

চিত্র-১০ : বিচারগানের গায়েন (বাম থেকে) শংকর দাস বাউল, মালেক সরকার, ননী ঠাকুর ও পরশ আলী দেওয়ান।

২. হিন্দুধর্ম বিশ্লেষণাত্মক পালাসমূহ

লোকনাটক বিচারগানের আসরে পরিবেশিত পালাগুলোর মধ্যে হিন্দুধর্ম বিশ্লেষণাত্মক দুটি পালা রয়েছে। পালা দুটি হচ্ছে রাধা-কৃষ্ণ ও সুবোল-মিলন পালা। এছাড়া জীবনবৃত্তান্তমূলক পালাসমূহের মধ্যে নবির জীবনী-কৃষ্ণের জীবনী নামে একটি পালা রয়েছে। এই পালাটিও হিন্দুধর্মের সাথে সম্পর্কিত একটি পালা, এ বিষয়ে অভিসন্দর্ভের জীবনবৃত্তান্তমূলক পালাসমূহের মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে রাধা-কৃষ্ণ ও সুবোল-মিলন পালা সম্পর্কে

বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। তবে মাঠ-পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ-অনুসন্ধান করে জানা গেছে, বর্তমানে সুবোল-মিলন পালাটি এখন আর বিচারগানের আসরে পরিবেশিত হয় না। এ সম্পর্কে বিচারগানের গায়েন পারুল সরকার বলেন,

> বিচারগানে সুবোল-মিলন পালাটি এখন আর নেই। এই পালাটি এক সময় হতো কিন্তু বর্তমানে এই পালার তেমন চাহিদা নেই, তাই পালাটি আমরা আর এখন গাই না। তবে রাধা-কৃষ্ণ পালার মধ্যে এই পালার নানা বিষয় আলোচনায় চলে আসে। (পারুল, ২০২০ : সাক্ষাৎকার)

সুতরাং হিন্দুধর্ম বিশ্লেষণাত্মক পালাসমূহের মধ্যে নিচে শুধু রাধা-কৃষ্ণ পালাটি আলোচনা করা হলো।

রাধা-কৃষ্ণ পালা

বাংলাদেশে প্রচলিত যতগুলো লোকনাট্য আঙ্গিক রয়েছে, তার মধ্যে রাধা-কৃষ্ণবিষয়ক পরিবেশনাগুলো অন্যতম সমৃদ্ধ ধারা ও জনসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয়তম। প্রায় সব লোকনাট্য আঙ্গিকেই রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ের উপস্থিতি রয়েছে। তার মধ্যে কীর্তন, যাত্রা, শোভাযাত্রা, পালা ও নাটগীত উল্লেখযোগ্য। তবে বিচারগানে রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ের উপস্থিতি সম্পূর্ন ভিন্ন রূপে দেখা যায়। বিচারগান একটি প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশনা। তাই রাধা-কৃষ্ণ পালাটিও দ্বিপাক্ষিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই উপস্থাপিত হয়। যেখানে রাধা ও কৃষ্ণ সম্পর্কে ধর্মীয় ও লৌকিক বিশ্বাস, প্রেম ও বিরহের গল্প, আধ্যাত্মিক দর্শন প্রভৃতি আলোচিত হয়। বিচারগানের কুশীলব তথা পৃষ্টপোষক পির-গোঁসাই ও ভক্তদের বিশ্বাস মতে, কৃষ্ণ হচ্ছেন পরম আর রাধা হচ্ছেন জীব। এছাড়া কৃষ্ণকে পরম গুরু আর রাধাকে ভক্ত হিসেবেও বিচারগান সংশ্লিষ্টরা বিশ্বাস করেন। বিচারগানের দর্শক-শ্রোতাদের মধ্যে যারা উপরিতলের ভাবনার তারা রাধা-কৃষ্ণকে নিছক মানব-মানবী বা প্রেমিক-প্রেমিকা যুগল মনে করেন। আর পরিবেশনার সাথে জড়িত আধ্যাত্মিক গভীর জ্ঞান সম্পন্ন মানুষজন রাধা-কৃষ্ণকে স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রেমময় শ্বাশত যুগল রূপে আরাধনা করে থাকেন। রাধা-কৃষ্ণ সম্পর্কে বহুমাত্রিক বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির কারণে বিচারগানের পালাগুলোর মধ্যে রাধা-কৃষ্ণ পালাটি জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান করে। রাধা-কৃষ্ণবিষয়ক পরিবেশনার জনপ্রিয়তা প্রসঙ্গে সাইমন জাকারিয়া বলেন,

> বৈদিক ঋষি কৃষ্ণ, মহাভারতের রাজনীতিক ও যোদ্ধা কৃষ্ণ, গীতার দার্শনিক কৃষ্ণ, বৈষ্ণবদের প্রেমাস্পদ কৃষ্ণ ও পৌরাণিক কৃষ্ণ মিলে এক অবতারের সৃষ্টি হয়েছে। হিন্দু ও বৈষ্ণব শাস্ত্রীয় অন্যান্য পৌরাণিক দেব-দেবীর অখ্যানের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর হ্লাদিনী-শক্তি শ্রীরাধার প্রেমলীলা বিষয়ক আখ্যানের জনপ্রিয়তা সর্বাধিক। (সাইমন, ২০০৮ : ২০৮)

বিচারগানেও রাধা-কৃষ্ণ পালাটির জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ হচ্ছে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা। যে প্রেমকে বিজ্ঞ দর্শকরা মনে করেন, স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রেম বা গুরু ও শিষ্যের প্রেম আর সাধারণ দর্শকরা মনে করেন মানব-মানবীর প্রেম। এই চমকপ্রদ বিষয়-বৈচিত্র্যের জন্যই হয়তো বিচারগানে রাধা-কৃষ্ণ পালাটি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তাছাড়া বিচারগানে পরিবেশিত অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক পালার চেয়ে রাধা-কৃষ্ণের পালার কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। যার

মধ্যে গানের ঢঙ, পোশাক ও মেক-আপ অন্যতম। সাধারণত বিচারগানের পালাগুলোতে বাউল ঘরাণার গানই বেশি পরিবেশিত হয়। কিন্তু রাধা-কৃষ্ণ পালাটিতে বাউল ঘরাণার পাশাপাশি কীর্তন ঢঙের গানের উপস্থিতি দেখা যায়। সুরের এই ভিন্নতার জন্যে দর্শক-শ্রোতা পালাটি থেকে ভিন্ন রসের আস্বাদন পায়। বিচারগানের বেশির ভাগ পালায় গায়েনগণ বাউল ও সুফিদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে থাকেন। কিন্তু রাধা-কৃষ্ণ পালায় কৃষ্ণের ভূমিকায় পুরুষ গায়েন ও রাধার ভূমিকায় নারী গায়েন অভিনয় করার জন্য হিন্দুধর্মের পূজা-অর্চনায় রাধা-কৃষ্ণের প্রতিমায় যে রকমের পোশাক পরানো হয়ে থাকে অনেকটা সে রকম পোশাক পরিধান করেন। এতে দর্শক-শ্রোতা সহজেই অভিনেতা-অভিনেত্রীর চরিত্রের সাথে একাত্ম হয়ে যায়। অন্যদিকে রাধা-কৃষ্ণ পালায় রূপদানকারী গায়েনকে দেখা যায়, পৌরাণিক ও লৌকিক বিশ্বাস অনুযায়ী গায়ে মেক-আপ করে আসরে পরিবেশনা উপস্থাপন করেন। এক্ষেত্রে বলা যায়, গানের ঢঙ, পোশাক ও মেক-আপের বৈচিত্র্যময়তার কারণেও বিচারগানের অন্যান্য পালার চেয়ে রাধা-কৃষ্ণ পালাটি বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছে। পালাটির বিষয়বস্তু, ধর্মীয় ও দার্শনিক গভীরতার জন্যে একাধারে মুসলিম পিরের বাড়ি ও মাজার প্রাঙ্গণ এবং হিন্দু গোঁসাইয়ের বাড়িতে সমানভাবে পালাটি অনুষ্ঠিত হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বারয়ারি আয়োজনেও পালাটি পরিবেশিত হয়। অবশ্য স্থানভেদে পালাটির পরিবেশনার ধরণ কিছুটা পাল্টে যায়। দেখা যায়, পির-গোঁসাইয়ের বাড়িতে যখন পালাটি পরিবেশিত হয়, তখন অনেক বেশি গুরুগম্ভীরতত্ত্ব আলোচিত হয়। একই পালা যখন বারয়ারি মেলায় অনুষ্ঠিত হয়, তখন কিছুটা হালকা ও চটুল বিষয়ের আলোচনা বেশি হয়। যেখানে প্রেম-কাম ও হাস্যরসের আধিক্য বেশি থাকে। মূলত রাধা-কৃষ্ণ পালাটির পরিবেশনার উপস্থাপন ধরণ নির্ভর করে পালাটি কোথায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে তার উপর ভিত্তি করে। এমনকি দেখা যায়, স্থানভেদে পরিবেশনার গায়েনদ্বয়ের মধ্যে প্রশ্নের ধরণও পাল্টে যায়। পির-গোঁসাইয়ের বাড়িতে কিংবা মাজারে যখন পালাটি অনুষ্ঠিত হয় তখন গায়েনগণ একে-অপরকে প্রশ্ন করেন ধর্মের নিগূঢ়তত্ত্বনির্ভর আর বারয়ারি মেলাতে গায়েনদ্বয় একে-অপরকে প্রশ্ন করেন রসিকতা ও যৌনতামিশ্রিত নানা বিষয়। তবে রাধা-কৃষ্ণ পালাটিতে সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ করলে কিছু বিশেষ প্রশ্ন পাওয়া যায়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-

ক. শ্রী কৃষ্ণ মর্ত্যে আসেন কেন? কলি যুগে কৃষ্ণ আসার আগে আর কতবার অবতার হিসেবে এসেছেন?

খ. কৃষ্ণে গায়ের রঙ কালো কেন? আর তাঁর ঠোঁট ও পায়ের পাতাই বা লাল কেন?

গ. কৃষ্ণের হাতে বাঁশি কেন? কৃষ্ণের বাঁশির কয়টি ছিদ্র? বাঁশিতে ছিদ্রের কারণ কী?

ঘ. কৃষ্ণ ননি চুরি করে খায় কেন?

ঙ. কৃষ্ণ কার জন্য বাঁশি বাজায়? যদি রাধার জন্যই বাঁশি বাজায় তবে সে রাধাকে এত প্রেমজ্বালা দেয় কেন?

চ. রাধা কাকে বেশি ভালোবাসেন কৃষ্ণকে নাকি তাঁর বাঁশির সুরকে?

ছ. কোন কারণে রাধা-কৃষ্ণের জন্ম-জন্মান্তরের সঙ্গী হয়েও কলি যুগে এসে রাধা আয়ান ঘোষের স্ত্রী হলো?

জ. কৃষ্ণ দেবী কালির রূপ ধারণ করেছিলো কেন?

ঝ. পৃথিবীতে আবারও কী রাধা-কৃষ্ণ অবতরণ করবে?

এ রকম অসংখ্য ধর্মীয়, পৌরাণিক ও লৌকিক বিশ্বাসনির্ভর প্রশ্ন রাধা-কৃষ্ণের ভূমিকায় অভিনয়কারী গায়েনদ্বয় একে-অপরকে করে থাকেন। গায়েনদ্বয় একে অপরের খুঁত ধরে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করতে চায়। দেখা যায়, কখনো কখনো এক অপরকে ঠাট্টাচ্ছলে অপমানও করে থাকেন। এই চমকপ্রদ বিচারগানের পালাটি প্রায় বাংলাদেশের সমগ্র অঞ্চলেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বিচারগানের গায়ক শাহ আলম সরকারের ভাষ্য মতে, 'দেশের কুষ্টিয়া অঞ্চলে রাধা-কৃষ্ণ পালা সর্বাধিক জনপ্রিয় ও প্রচলিত।' বাংলাদেশের সব গায়কও এ পালাটি করতে পারেন না। সাধারণত যে সকল গায়েন ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতত্ত্ব সম্পর্কে বেশি জানেন তারাই পালাটি বেশি করে থাকেন। ঝিনাইদহ জেলার খোরশেদ আলম বয়াতি কৃষ্ণের ভূমিকায় গান গেয়ে বা অভিনয় করে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এছাড়া মুন্সিগঞ্জের শাহ আলম সরকার, কুষ্টিয়ার বাউল লাকি আনু, মাদারীপুরের আলেয়া বেগম, মানিকগঞ্জের মমতাজ বেগম ও ঢাকার লিপি সরকার রাধা-কৃষ্ণ পালায় গান গেয়ে বেশ পরিচিতি পেয়েছেন। বিচারগানের রাধা-কৃষ্ণ পালাটি বিষয়-বৈচিত্র্যের দিক থেকে যে কতটা চমকপ্রদ ও অনন্য বৈশিষ্ট্যের তা আলেয়া বেগম ও খোরশেদ আলম বয়াতির একটি লোকজনপ্রিয় অডিও ক্যাসেটের রেকর্ড থেকে প্রামাণ্য হিসেবে প্রশ্ন-উত্তরের নমুনা উপস্থাপন করা যায়। পালাটিতে কৃষ্ণের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন ঝিনাইদহের খোরশেদ আলম বয়াতি ও রাধার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন মাদারীপুরের আলেয়া বেগম।

> **রাধা পক্ষের গায়েন আলেয়া বেগম :** আপনার কাছে আমার প্রশ্ন থাকবে, কৃষ্ণের সমস্ত শরীর কালো, এই কালো হবার কারণটা কী? আর সমস্ত শরীরের মধ্যে দুইটা জাগা কিন্তু লাল। আপনারা সবাই জানেন, কৃষ্ণের ঠোঁট দুইটা লাল আর পায়ের তলা দুইটা লাল। আমার এখানেই জানা দরকার, কৃষ্ণের শরীরটা কালো হবার কারণ কী? আর ঠোঁট দুইটা লাল, আর পায়ের তলা দুইটা লাল তার কারণ কী? এটা আধ্যাত্মিক এবং বাহ্যিক দুই দিকেই আমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করবেন। এই জিজ্ঞাসা রইল, দেখি আমার খোরশেদ ভাই কী জবাব দেয়?
>
> **কৃষ্ণ পক্ষের গায়েন খোরশেদ আলম বয়াতি :** অনুরাগী কৃষ্ণ ভক্তগণ শ্রীমতি রাধারাণী যে কথা বলে গিয়েছেন, যে আলোচনা করে গেছেন, আলো তো নয় খালি চোনা !... আসলে আমি শ্যামল বরণ তার চেয়েও উজ্জ্বল। ও শ্রীমতি রাধা লোকে বলে দেখতে কালো, তোমার কাছেও কী কালো? যদিও হয়ে থাকি আমি কালো, তুমি বাস কেন আমাকে ভালো? ঘৃণা কর, তাই না? আসলে আমি কালো নই। যাহোক একটি মজার বিষয় আমার জানার আছে। এই জগতে মা লক্ষ্মী, মা সরস্বতী, মা দুর্গা, মা পার্বতী, মা কালী, মা সংকরী সবাইকে মা বলে ডাকে। তোমাকে কেন মা বলে ডাকে না? যেই পথ দিয়ে যাও, সেই পথ দিয়ে হাত ইশারায় বলে, ঐ যায় রাধা কলঙ্কিনী। কেন তুমি কি সন্তানের মা হওনি? তোমাকে কেন রাধা কলঙ্কিনী বলে? তোমাকে কেন মা বলে ডাকে না? (খোরশেদ ও আলেয়া, ২০১৭ : পরিবেশনা)[৮]

চিত্র-১১ : রাধা-কৃষ্ণ চরিত্রে (বাম থেকে) আলেয়া বেগম, খোরশেদ আলম বয়াতি, দোলন সরকার ও লতিফ সরকার।

বিচারগানের অন্যান্য পালার মত রাধা-কৃষ্ণ পালাতেও প্রশ্ন-উত্তরের পাশাপাশি নানান ধর্মীয় ও পৌরাণিক কাহিনি বর্ণনা, লৌকিক গল্প, কৌতুক কথন এবং পালার বিষয়ভিত্তিক গান পরিবেশন ও গানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। বিশেষ করে রাধা-কৃষ্ণের পালার জনপ্রিয় গায়েন খোরশেদ আলম বয়াতি ও আকলিমা বেগম রচিত গান বিচারগানে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। খোরশেদ আলম বয়াতি রচিত একটি গানে কৃষ্ণ সম্পর্কে যেমন বর্ণনা করা হয়েছে, তেমনি কৃষ্ণের সাথে রাধার সম্পর্কের বিষয়টিও চিত্রিত হয়েছে। গানটি হচ্ছে-

তুমি মোর জীবন সাথী, রূপ দেখিয়া তাই মাতি,

নাম ধরিয়া বাঁশরী বাজাই ॥

আমি যে নন্দেরই গোপাল, সব সখিদের হই রাখাল,

রাখাল রূপে ঘুরিয়া বেড়াই।

দেবতা মনে করে আমায়, যে জন নেয় ভক্তি ভরে,

যেয়ে তারে বাসনা পুরাই ॥ (খোরশেদ, ২০১৭ : পরিবেশনা)[৯]

এই গানটির মতো বিচারগানের জনপ্রিয় গায়েন আকলিমা বেগমের চমকপ্রদ একটি গান রয়েছে । যে গানটিতে মূলত রাধা ও কৃষ্ণের মধ্যকার প্রেম ও বিরহের বিষয় সুর-ছন্দ-কাব্যে চিত্রিত হয়েছে। এছাড়া গানে চিত্রিত রাধা-কৃষ্ণ মূলত লোকধর্মের রাধা-কৃষ্ণ। যেখানে ধর্মীয়-ঐশ্বিরিক বিষয় ছাপিয়ে মানবীয় রাধা-কৃষ্ণের কথা বলা হয়েছে। গানটি হচ্ছে-

যুগে যুগে তুমি আমার অন্তরটাকে করলে কালা,

দিলে জ্বালা নন্দের চ্যালা, দিলে জ্বালা নন্দের চ্যালা ॥

কী ঋণে বেঁধেছো আমায়, ঋণ শুধিতে পরানো যায়,

এত জ্বালা সহে না গায়, ওরে আমার নিঠুর কালা ॥ (আলেয়া, ২০১৭ : পরিবেশনা)[১০]

যাহোক পালাটিতে গায়েনদ্বয় ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিকতার বাইরেও জাগতিক-মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকেও রাধা-কৃষ্ণ পালায় দ্বিপাক্ষিক প্রতিযোগিতা করেন। গায়েনগণ আসরে একই বিষয় নিয়ে বহুমাত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে পালা পরিবেশনা করার কারণে দর্শক-শ্রোতার নিকট পালাটি বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠে। যা বিচারগানের সমৃদ্ধ বিষয়েরই স্বাক্ষ্য দেয়।

৩. ইসলামধর্ম বিশ্লেষণাত্মক পালাসমূহ

লোকনাটক বিচারগানে ধর্মবিশ্লেষণাত্মক পালার ক্ষেত্রে ইসলামধর্ম সংক্রান্ত পালাই বেশি প্রচলিত। যে পালাগুলো ইসলামধর্মের বিভিন্ন তত্ত্ব নিয় গভীরভাবে আলোচনা হয়ে থাকে। এই পালাগুলোতে ইসলাম ধর্ম মতে, স্রষ্টা, সৃষ্টি, ধর্মপ্রবর্তক, ইবাদত, ধর্মীয় আচার-বিচার, মৃত্যুর পর শেষ বিচার প্রভৃতি নিয়ে আলোচিত হয়। ইসলামধর্ম সংক্রান্ত মোট ১৫টি পালা রয়েছে, সেগুলো হচ্ছে- শরিয়ত-মারফত, হাশর-কেয়ামত, নবুয়েত-বেলায়েত, নুরতত্ত্ব-কারতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব-পারঘাটা, আদম-হাওয়া , আদম-শয়তান, আদি আদম-বনি আদম, আদি আদম-বিশ্ব নবি, আদম সৃষ্টি-নুর সৃষ্টি, আদম তত্ত্ব-দেহ তত্ত্ব আদম তত্ত্ব-নবি তত্ত্ব, নবি তত্ত্ব-মেরাজ তত্ত্ব, হায়াতুন্নবি-ওফায়াতুন্নবি ও নবি-সাহাবা পালা। এই পালাগুলোর মধ্যে শরিয়ত-মারফত, হাশর-কেয়ামত ও নবুয়েত-বেলায়েত পালা তিনটি বিষয়বস্তুর দিক থেকে বেশ স্বতন্ত্র হলেও অন্য পালাগুলোর বিষয়বস্তু প্রায় একই রকম। তাই অন্য পালাগুলোকে 'ইসলামধর্ম বিশ্লেষণাত্মক পালার আদম, হাওয়া, মুহাম্মদ, নবি ও শয়তান সংক্রান্ত পালাসমূহ' হিসেবে অভিহিত করা যায়। নিচে ক্রমান্বয়ে ইসলামধর্ম বিশ্লেষণাত্মক পালাসমূহ আলোচনা করা হলো।

শরিয়ত-মারফত পালা

বিচারগানের আসরে সর্বাধিক প্রচলিত-পরিবেশিত পালা হচ্ছে শরিয়ত-মারফত পালা। এই পালাটি বাংলাদেশের সমগ্র অঞ্চলেই পরিবেশিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ দেশের যে অঞ্চলে বিচারগান পরিবেশিত হয়, সে অঞ্চলেই শরিয়ত-মারফত পালা পরিবেশিত হয়। তাছাড়া বিচারগানের এমন কোনো গায়েন খুঁজে পাওয়া যাবে না, যিনি শরিয়ত-মারফত পালায় অভিনয় করেননি। এমনকি শরিয়ত-মারফত পালায় অভিনয়ের মাধ্যমে বিচারগানের আসরে গায়েনদের অভিনয়-জীবন শুরু হয়। কেননা পালাটি যেমন সহজ ও সার্বজনীন, তেমনি আসরে এর জনপ্রিয়তাও বেশি। শরিয়ত-মারফত পালাটি ফকির-মুন্সি বা ফকির-মোল্লা নামেও পরিচিত। পালাটিতে মূলত শরিয়ত বলতে ইসলামধর্মের বাহ্যিক আচার-আইনকে বোঝায়, যার প্রতিনিধিত্ব করে মসজিদ-মাদ্রাসার মোল্লা-মৌলভিরা। পক্ষান্তরে মারফত বলতে ইসলামধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বকে বোঝায়, যাতে রয়েছে ধর্মের গোপন বিষয়াদি। যার প্রতিনিধিত্ব

করে সাধু, পির, অলি-আওলিয়ারা। যারা মাজার-দরগায় বিশ্বাস করে এবং এর পক্ষে কাজ করে। মারফতের প্রতিনিধিত্বকারীরা ইসলামধর্মের প্রাতিষ্ঠানিক আচার-আচরণ-আইনের তোয়াক্কা করে না। শরিয়ত-মারফত পালায় এই দুই ঘরাণার বিশ্বাসীদের মধ্যকার পার্থক্য ও বিশ্বাস নিয়ে পাল্টা-পাল্টি যুক্তি-তর্ক ও গানে গানে লড়াই হয়। যেখানে মোল্লা ও ফকির একে-অপরকে নানা রকম 'ঠ্যাশ' দিয়ে থাকেন। কখনো কখনো হাসি-তামাশার মাধ্যমে একে-অপরকে ঠকিয়ে জিততে চায়। সাধারণত মারফতের পক্ষ থেকে শরিয়তের পক্ষকে যে প্রশ্ন করা হয়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে-

১. শরিয়ত কী? শরিয়তের বিধি-নিষেধ ও এর মধ্যকার নানান তাত্ত্বিক জটিলতা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়।

২. শরিয়তের বিধান যেমন- কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, নারীর পর্দা, যুদ্ধ-জিহাদ প্রভৃতি বিষয়ের উপরি ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়া হয় প্রতিপক্ষের গায়েনকে।

৩. শরিয়তের নানান বিধানের প্রবর্তনের কারণ ও তাৎপর্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়।

৪. শরিয়তের প্রতিনিধিত্বকারী ঐতিহাসিক বিভিন্ন ব্যক্তির জীবন ও কর্ম সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়।

৫. এছাড়া বর্তমানে শরিয়তের প্রতিনিধিত্ব করে এমন ব্যক্তি বিশেষ করে ইমাম, মুয়াজ্জিন, মোল্লা, ইসলামি বক্তাদের জীবন-যাপনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে স্যাটায়ারমূলক প্রশ্নও করা হয়।

অন্যদিকে শরিয়তের পক্ষের গায়েন মারফতের পক্ষের গায়েনকে যে সকল প্রশ্ন করেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-

১. মারফত কী? মারফতের উদ্দেশ্য কী? মারফতের উৎপত্তি কোথায় প্রভৃতি জানতে চাওয়া হয়।

২. মারফতের প্রতিনিধিত্বকারীরা কেন সামাজিক বা দৃশ্যমান ইবাদত যথা- কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ ও যাকাত পালন করেন না? তাদের গুপ্ত ইবাদত কী?

৩. মারফতের ফকিররা দাড়ি, টুপিসহ ইসলামের প্রকাশ্য রীতিনীতি কেন মানেন না?

৪. মারফতের লোকজন কেন মাজার ও গান-বাজনা নিয়ে মেতে থাকেন, এ সব নিয়েও প্রশ্ন করা হয়।

৫. এমনকি মারফতের প্রতিনিধিত্বকারী ফকির, সুফি, পিরদের জীবন-যাপনের রীতিনীতিকে স্যাটায়ার করে প্রশ্ন করা হয়।

লোকনাটক বিচারগানের অন্যান্য পালার মতোই বিচারগানের শরিয়ত-মারফত পালায় গায়েনগণ প্রশ্ন-উত্তর ও গানে-পাল্টা গানে একে-অপরকে পরাজিত করার চেষ্টা করেন। বিশেষ করে বিচারগানের শিল্পী-কলাকুশলীগণ বাস্তবিক জীবনদর্শনে শরিয়তের বিরোধীতা করেন এবং মারফতের চর্চা করে থাকেন। তাই তারা সব সময় শরিয়ত তথা মোল্লাতন্ত্রের বিরুদ্ধে গান ও কথায় সরব থাকেন। এ রকম একটি গান হচ্ছে-

কুলবিল মোমেনিন আরশে আল্লা,

এই তো আল্লার ঠিকানা,

মসজিদ ঘরে আল্লা থাকে না ॥

আলেম গেছে জালেম হইয়া কোরান পড়ে চণ্ডালে,

সতি-সাধুর ভাত জোটে না সোনার হার বেশ্যার গলে

যদি চিনিতো কোরান হইতো মানুষের কল্যাণ

মুখে মুখে সব মুসলমান কাজের বেলা ঠনঠনা ॥ (তপন, ২০২২ : ৪২১)[১১]

এই গানটিতে যেমন বিচারগানের প্রখ্যাত গায়েন মাতালকবি রাজ্জাক দেওয়ান শরিয়তপন্থী মোল্লাদের নানা বিষয় নিয়ে সমালোচনা করেছেন, তেমনি পালাটিতে শরিয়তপক্ষের গায়েনও বিভিন্ন গানের মাধ্যমে মারফত পক্ষকে টিপ্পনি কেটে থাকেন। এ রকম একটি গান হচ্ছে-

ভেবেছিলাম 'ফু' মারিলে যাইবো ফকির উইড়া,

এখন দেখি আমার মাথায় পড়ছে ফকির ঘুইরারে,

(হায় হায়) আমার তীর, আমার বুকে দিছে মাইরারে ॥ (লতিফ, ২০১৫ : পরিবেশনা)[১২]

এ রকম চমকপ্রদ বিষয়বস্তু ও প্রচলিত রীতিনীতির বিরুদ্ধে সংস্কারমূলক গানের জন্য শরিয়ত-মারফত পালাটি বিচারগানের দর্শকদের নিকট সর্বাধিক জনপ্রিয় পালা। মূলত বিচারগানের শরিয়ত-মারফত পালাটিতে ইসলামধর্মের দুটি ভিন্নধারার মতবাদকে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশনার মাধ্যমে দর্শকদের সামনে তুলে ধরেন গায়েনগণ। পালার শেষ পর্যায়ে গায়েনগণ দর্শকদের বার্তা দেন বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান নয় বরং ধর্মের সারবস্তু হচ্ছে মানব ও ঈশ্বর প্রেম।

চিত্র-১২ : বিচারগানের গায়েন (বাম থেকে) মাতালকবি রাজ্জাক দেওয়ান, মমতাজ বেগম ও শাহ আলম সরকার।

হাশর-কেয়ামত পালা

বিচারগানে পরিবেশিত আরেকটি গুরুগম্ভীর ও গুরুত্বপূর্ণ পালা হচ্ছে হাশর-কেয়ামত। এই পালার মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে জীব-জড়ের ধ্বংস-সাধন ও মানুষের পাপ-পূণ্যের চূড়ান্ত বিচার। হাশর ও কেয়ামত শব্দ দুটি ইসলাম ধর্মীয় এবং আরবি ভাষার হলেও পালাটিতে আন্তঃধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে প্রায়ই মহাপ্রলয় ও শেষ বিচার দিবসের আলোচনা করা হয়। হাশর ও কেয়ামত শব্দদ্বয়ের আভিধানিক অর্থ পাওয়া গেছে- 'হাশর অর্থ শেষ বিচারের দিন এবং কেয়ামত অর্থ প্রলয়ের দিন।' (এনামুল, ২০১০ : ২৮৭ ও ১২০৭) অন্যদিকে ইসলামধর্ম মতে, কেয়ামত মানে বিশ্বজগতের প্রলয় বা ধ্বংসের দিন আর হাশর মানে মানুষকে পুনরুত্থানের পর বিধাতা কর্তৃক মানুষের শেষ বিচারের দিন। তবে বিচারগানের গায়েনদের আধ্যাত্মিক ও বিশ্লেষণাত্মক আলোচনায় কেয়ামত ও হাশরের ভিন্ন ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়। তাদের মতে, কেয়ামত মানে প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুর দিন এবং জীবদ্দশায় মানুষের রোগ-শোক, সুখ-দুঃখ, শান্তি-শাস্তিকেই সতত হাশরের পরিণতি মনে করা হয়। বিচারগানের প্রয়াত গায়ক আব্দুর রশিদ সরকার ও শাহ আলম সরকার কর্তৃক হাশর-কেয়ামতের ভিসিডি ক্যাসেটে শাহ আলম সরকারের ভাষ্য মতে, 'ইসলামধর্মে মানুষের পুনরুত্থান ও বিচার যে বিষয়, হিন্দুধর্মে কর্মফল অনুযায়ী জন্মান্তরবাদের আবর্তন একই বিষয়।' (শাহ আলম, ২০০৭ : পরিবেশনা) এই পালায় হাশর-কেয়ামতের নানা রকম শরিয়তি ও মারফতি ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। পালার মূল বিষয়টি হচ্ছে মানুষের মৃত্যু ও তার পাপ-পূন্যের বিচার। পালাটিতে তাই দেখা যায়, গায়েনগণ বারবার মানব জীবনের সবচেয়ে ট্র্যাজিক বিষয় মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং পাপ-পূন্য বিষয়ে মানুষকে ধর্মীয় ও নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সর্তক করে দেয়। এ পালায়ও বিচারগানের অন্যান্য পালার মতো গায়েনদ্বয়ের মধ্যে প্রশ্ন ও উত্তরের প্রতিযোগিতা অব্যবহত থাকে। পালায় কতগুলো সাধারণ ও নির্ধারিত প্রশ্ন থাকে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-

ক. কেয়ামত কত প্রকার ও কী কী?

খ. কেয়ামতের পূর্বে পৃথিবীতে কতগুলো লক্ষণ দেখা দিবে? সেগুলো কী কী?

গ. পৃথিবীতে কখন কেয়ামত সংগঠিত হবে?

ঘ. পৃথিবীর কোথায় হাশর সংগঠিত হবে?

ঙ. হাশরের মাঠ কত বড় হবে এবং বিচারের আসনে কে বসবেন?

চ. হাশরের ময়দানে মানুষের জন্য সুপারিশ করবেন কোন ব্যক্তি?

ছ. ইসলামধর্ম মতে, আল্লাহ হাশরের ময়দানে কার বিচার সর্বপ্রথম করবেন?

জ. হিন্দুধর্ম মতে, কোন দেবতা প্রলয় বা ধ্বংসের মালিক?

ঝ. হাশরের ময়দানে মানুষ কিভাবে উঠবেন?

ঞ. হাশরের ময়দানে মানুষ নগ্ন হয়ে উঠবেন কেন?

এ রকম নানা বিশ্লেষণাত্মক প্রশ্নের পাশাপাশি পালার বিষয়ভিত্তিক গানও পরিবেশন করেন গায়েনগণ। গানের কথায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মৃত্যু ও পাপ-পূন্যবিষয়ক সতর্কবাণী থাকে। হাশরের পক্ষের গানে সাধারণত ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী মৃত্যু পরবর্তী জীবনের বিষয়ে সতর্কবাণী থাকে। যে সকল কাজ করলে পরকালে মানুষের মুক্তি ঘটবে সে সকল কাজের ব্যাপারে গানে অনুপ্রেরণা বা তাগিত দেয়া হয়। বিচারগানের আসরে বহুল পরিবেশিত এ রকম একটি গান হচ্ছে-

শোন ও মমিন ভাই কেউ রবে না, একদিন হবে আখের ফানা,
একদিন হবে আখের ফানারে, ও ভাই কোরানেতে গেল জানা ॥
রোজা কর, নামাজ পড়, পড় নবির কলেমা,
সেই দিন হাশরের দিন নবি বিনেরে,
পাপী উম্মতের আর কেউ রবে না ॥ (আকলিমা, ২০১৭ : পরিবেশনা)[১৩]

গানটির রচয়িতা ও সুরকার বিচারগানের বর্তমান প্রজন্মের জনপ্রিয় গায়েন আক্কাস দেওয়ান। হাশর পক্ষের এই গানটি বাংলাদেশের প্রায় সকল বিচারগানের গায়েনই আসরে গেয়ে থাকেন। গানটির কথার সাথে সাথে সুরও বেশ চমৎকার-মোহনীয়। হাশর পক্ষের গানের মতো বিচারগানে কেয়ামত পক্ষেরও বহু জনপ্রিয় গান রয়েছে। যে গানগুলো মানুষের মৃত্যু ও বিশ্বজগতের ধ্বংসের স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য বিভিন্ন বার্তা থাকে। বিচারগানের বেশ কিছু জনপ্রিয় গানের রচয়িতা ও সুরকার লতিফ সরকারের কেয়ামত পক্ষের একটি গান আসরে বেশ প্রচলিত। যে গানের মধ্যে মানুষের মৃত্যুর কথা বিভিন্নভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। গানটি হচ্ছে-

আমায় আতর-গোলাপ-চন্দন মেখে দে,
প্রাণসখি গো, শেষ বিয়ার গোসল দিয়া দে ॥
(সখি গো) বহুদিন পর আমার কাছে দীনবন্ধু চিঠি দিছে,
আমার প্রতি নজর পইড়াছে,
যাব বন্ধুয়ার মিলনে বিদায় দিও গানে গানে,
পাক কালামের বাণী কর্ণে দে ॥ (লতিফ, ২০১৭ : পরিবেশনা)[১৪]

এই গানটির একটি পঙক্তিতে বলা হয়েছে ‘আল্লাহ-রাসুল, বোল-হরিবোল যার যার প্রিয় নামটি সম্বল, ঐ নামের ধ্বনি শুনাইয়া দে।’ এই পঙক্তির মাধ্যমে এটা স্পষ্ট হয় যে পালাটি ইসলামধর্ম সম্পর্কিত হলেও হিন্দুধর্মসহ সকল ধর্মের বিশ্বাসের প্রতি সম্মান ও ভক্তি রেখে পালাটিতে আরোচনা করা হয়ে থাকে। পালায় সব ধর্মের প্রসঙ্গই ঘুরেফিরে

আলোচিত হয়। যাহোক পালাটির বিষয়বস্তু ধর্মের মৌলিক বিশ্বাসের সাথে যুক্ত থাকায় বিচারগানের আসরে খুবই জনপ্রিয়। এমনকি ক্রমেই পালাটির পরিবেশনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা বিচারগানের বিষয়-বৈচিত্র্যের সমৃদ্ধির প্রমাণ করে।

নবুয়েত-বেলায়েত পালা

যতগুলো বিষয়ভিত্তিক পালা বিচারগানের আসরে পরিবেশিত হয়, তার মধ্যে সবচেয়ে কঠিন ও নিগূঢ়তত্ত্ব সমৃদ্ধ পালা হচ্ছে নবুয়েত-বেলায়েত। পালাটি বাংলাদেশের সমগ্র অঞ্চলেই পরিবেশিত হয়ে থাকে। তবে পির-গোঁসাই ও মাজার প্রাঙ্গনেই পালাটি বেশি অনুষ্ঠিত হয়। কেননা এ পালার মাধ্যমেই নবি মুহাম্মাদ (স.)-এর নবয়েত প্রাপ্তি ও এর গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয় এবং বেলায়েতের প্রতিনিধিত্বকারী বর্তমানে গুরু-গোঁসাইদের মহত্ব তুলে ধরা হয়। তাই বাউল ও গুরুবাদী দর্শনে বিশ্বাসী মাজার ও তরিকপন্থী মানুষের নিকট এই পালার গ্রহণযোগ্যতা সর্বাধিক। বাউল ও গবেষক অরূপ রাহী নুবয়েত ও বেলায়েত পালার একটি আসরে উপস্থাপকের ভূমিকায় বলেন, 'বাংলাদেশের বাউল-ফকির-সহজিয়া-মুর্শিদি-মারফতি ধারায় নবুয়েততত্ত্ব ও বেলায়েততত্ত্ব সাধকদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি তত্ত্ব। যা উপলব্দি করার মাধ্যমে সাধকরা-ভক্তরা এক নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করেন।' (অরূপ রাহী, ২০১৮ : উপস্থাপনা) নবুয়েত-বেলায়েত বিষয় দুটি যেমন নিগূঢ়তত্ত্ব তেমনই এর বিষয়বস্তু ও বিস্তৃতিও বিশাল। তবে সহজভাবে নবুয়েত-বেলায়েত সম্পর্কে বলা হয়, নবুয়েত হচ্ছে নবিদের প্রাপ্ত পদবি ও ক্ষমতা আর বেলায়েত হচ্ছে অলি-আওলিয়া-পির-গোঁসাইদের প্রাপ্ত উপাধি ও ক্ষমতা যার মাধ্যমে ধর্মীয় মহামানবেরা যুগে যুগে সাধারণ মানুষের পারলৌকিক মুক্তির পাথেয় দান করে থাকেন। বিচারগানের দুই প্রখ্যাত গায়ক ছোট আবুল সরকার ও কাজল দেওয়ান নবুয়েত-বেলায়েতের একটি পালায় একে-অপরকে নবুয়েত ও বেলায়েতের মানে কী বা এর অর্থ কী জানতে চাইলে তারা দুজনই শব্দ দুটির অর্থ সম্পর্কে উত্তর দেন। বেলায়েত সম্পর্কে কাজল দেওয়ান বলেন, "আমি যদি সন্ধির মাধ্যমে বেলায়েত শব্দ সম্পর্কে বলতে চাই, তাহলে দেখা যাবে, 'বে' শব্দে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড, আয়াত শব্দ হলো কথা, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের কথা। সেই কথা কার, এই কথা হলো আমার আল্লাহ-তায়ালার।" (কাজল, ২০১৮ : পরিবেশনা) অনদিকে, গায়ক ছোট আবুল সরকার নবুয়েত সম্পর্কে বলেন, 'নবুয়েত অর্থ হলো নব ধন, নবি শব্দের অর্থ নতুন। নব ধন প্রাপ্ত হইয়া নতুন নতুন ঐশীবাণী আল্লার তরফ থেকে প্রাপ্ত হয়ে যারা শোনায় তাদেরকে নবি বলে।' (আবুল, ২০১৮ : পরিবেশনা) এ রকমভাবেই নবুয়েত-বেলায়েত পালার প্রতিটি আসরে গায়েনগণ নবুয়েত ও বেলায়েত সম্পর্কে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে থাকেন। যেখানে কতগুলো সাধারণ প্রশ্ন থাকে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-

ক. নবুয়েত মানে কী? কত প্রকার কী কী?

খ. বেলায়েত মানে কী? কত প্রকার কী কী?

গ. পৃথিবীতে নবুয়েত ও বেলায়েত কবে থেকে শুরু হয়েছে?

ঘ. যেহেতু বর্তমান যুগ বেলায়েতি যুগ, তাহলে এই বেলায়েতি যুগ কবে থেকে শুরু হয়েছে?

ঙ. নবির দেহে নবুয়েতের মহর কোথায় অঙ্কিত ছিলো? তিনি বেলায়েত সর্বপ্রথম কাকে দান করেছেন?

এ প্রশ্নগুলোও এই পালার সবচেয়ে সহজ ও সরল বললেই চলে। নবুয়েত-বেলায়েত পালায় এ রকম বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। বিচারগানের নিয়মিত দর্শক-শ্রোতা ও পির-গোঁসাইদের ভক্তবৃন্দ ছাড়া অন্যদের কাছে বুঝতে কখনো কখনো দুরূহ মনে হয়। এমনকি বিচারগানের গায়ক আরিফ দেওয়ান এ সম্পর্কে বলেন, 'বর্তমানে বিচারগানের সব গায়কও নবুয়েত-বেলায়েত পালাটি গাইতে পারেন না। কারণ এই পালাটি গাইতে গায়ককে গভীরতত্ত্ব সম্পর্কে জানতে হয়।' (আরিফ, ২০২১ : সাক্ষাৎকার) অর্থাৎ যে সকল গায়ক ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক গভীরতত্ত্ব সম্পর্কে বিজ্ঞ নয়, নবুয়েত-বেলায়েত পালায় পারদর্শি হন না। এছাড়া এ পালায় পরিবেশিত গানের কথাও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সমৃদ্ধ হয়ে থাকে। বাংলাদেশের প্রায় সকল বাউল ও সুফিকবিরাই নবুয়েত-বেলায়েত বিষয় দুটি নিয়ে অগণিত গান রচনা করেছেন। বাউলকবি লালন সাঁই থেকে শুরু করে আব্দুল হালিম বয়াতি, রজ্জব আলী দেওয়ান, জালাল উদ্দীন খাঁ, কারি আমির উদ্দিন, নূর মেহেদী আব্দুর রহমান, খালেক দেওয়ান, মালেক দেওয়ান, দেওয়ান আব্দুর রশিদ চিশতি, আব্দুর রশিদ সরকার, বড় আবুল সরকার, ছোট আবুল সরকার, মাতালকবি রাজ্জাক দেওয়ান, শাহ আলম সরকারসহ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। তবে বিচারগানের আসরে কিছুগান তুমুল জনপ্রিয় ও পরিবেশিত। বিশেষ করে খালেক দেওয়ান রচিত নবুয়েত পক্ষের একটি গান প্রায় শত বছর ধরে আসরে গাওয়া হয়, যা এখনও সমানভাবে জনপ্রিয়। গানটি হচ্ছে-

> বিশ্বের লাগিয়া এনেছ চাহিয়া, শান্তি সুধা ইসলাম
> হে বিশ্ব নবি নুরের ছবি
> ইসলাম রবি (তোমায়) হাজার সালাম ॥
> পাহাড় গারে হেরায় ছিলে কোন সাধনায়
> যেখানে মওলায় পাঠায় কোরান
> পাঠ কর এক্‌রা কাঁপিলো হেরা,
> অন্তর চেরা প্রভুর কালাম ॥ (হাসানুল, ১৯৯৯ : ৩০৮)[১৫]

গানটি যেহেতু নবুয়েত পক্ষের সেহেতু এখানে নবি মুহাম্মদ (স.)-এর স্তুতি করা হয়েছে। এই গানটির মতোই বেলায়েত পক্ষেও বহু চমৎকার গান বিচারগানের আসরে গায়েনগণ পরিবেশন করেন। বিশেষ করে এই গানগুলোতে গুরু বা পির-গোঁসাইদের স্তুতি করা হয়ে থাকে। বিচারগানে নবুয়েত-বেলায়েত পালাটি গভীরতত্ত্বনির্ভর হলেও এর বিষয়গত সমৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশের সব অঞ্চলেই পালাটি বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

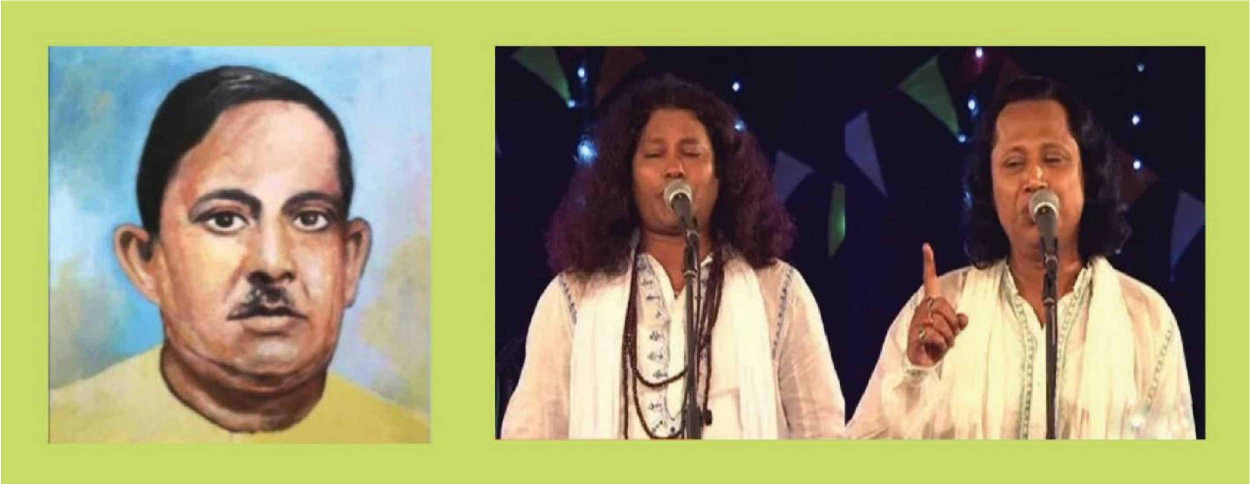

চিত্র-১৩ : (বাম থেকে) বাউলকবি জালাল উদ্দীন খাঁ এবং বিচারগানের গায়েন কাজল দেওয়ান ও ছোট আবুল সরকার।

নুরতত্ত্ব-কারতত্ত্ব পালা

বিচারগানের দর্শক-শ্রোতার নিকট একটি উচ্চমার্গীয় পালা হিসেবে পরিচিত নুরতত্ত্ব-কারতত্ত্ব পালা। পালাটি নুর-কার নামেও বেশ পরিচিত। তাছাড়া বলা সুবিধার্থে আসরে গায়েনগণ নুর-কার বলেই পালাটিকে উচ্চারণ করে থাকেন। লোকনাটক বিচারগানের ধর্ম বিশ্লেষণাত্মক পালাসমূহের মধ্যে তো অবশ্যই এমনকি সকল পালাগুলোর মধ্যে অন্যতম কঠিন একটি পালা হচ্ছে নুরতত্ত্ব-কারতত্ত্ব পালা। পালাটি তত্ত্বগত কারণে কঠিন হওয়ায় প্রাজ্ঞ দশক-শ্রোতা ছাড়া পালাটি সবাই বুঝেন না। পালাটিতে মূলত সেমিটিক (ইহুদি, খ্রিস্টান ও ইসলাম) ধর্ম মতানুসারে সৃষ্টিতত্ত্বের গভীর থেকে গভীরতর বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করা হয়। তবে পালায় প্রাসঙ্গিকভাবে ভারতীয় ধর্ম মতানুসারে সৃষ্টিতত্ত্বের বিষয়গুলোও আলোচনা করা হয়ে থাকে। এ পর্যায়ে আলোচনা করা যাক নুর ও কার বিষয় দুটি আসলে কী? সেমিটিক ধর্মমত ও বিচারগানের আসরে গায়েনদের আলোচনার ওপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, সমগ্র বিশ্বজগৎ সৃষ্টির আগে শুধুমাত্র অখণ্ড সত্তার অতিইন্দ্রিয়-অদৃশ্যমান অস্তিত্বশীল শক্তির পর্যায়কে 'নুর' বলা হয়। নুর শব্দটির বাংলা আলো করলেও নুরকে আলোর চেয়েও সূক্ষ্মতম অবস্থাকে বুঝায়। আর 'কার' হচ্ছে নুরের পরবর্তী ধাপ যেখানে বিশ্বজগতের দৃশ্যমান সবকিছু যখন আকারে রূপান্তরিত হয়েছে। অর্থাৎ আমরা যাকিছু দেখি ও অনুভব করি তাই কার এবং যা শুধু জ্ঞান দিয়ে বোধগম্য চির-শ্বাশত, চির-প্রাচীন, চির-নবীন অসীম শক্তি তাই হচ্ছে নুর। অল্পকথায় নুর ও কার বিষয় দুটির আসলে ব্যাখ্যা করা একেবারেই সম্ভব নয়। এখানে শুধু পালাটি বোঝার জন্য প্রাথমিক আলোচনা করার প্রয়াস করা হলো মাত্র। নুর ও কার সম্পর্কে বিচারগানের পৃষ্ঠপোষক ও নিয়মিত দর্শক হিমেল শাহ চিশতি বলেন,

> নুর হচ্ছে স্রষ্টা ও সৃষ্টির জ্যোতির্ময় মুহূর্ত যা সকল শক্তির আধার ও আলোর চেয়েও সূক্ষ্ম এবং কার হচ্ছে নুরের পরবর্তী পর্যায় যেখানে নুর বিভিন্ন আকারে বিশ্বজগতে প্রকাশ হয়েছে। এই বিষয় দুটি তাসাউফের অতি উঁচু স্তরের কথা, যা বিচারগানের আসরে ব্যাখা-বিশ্লেষণ করা হয়। গুরুরা ভক্তদের শিক্ষা দেয়ার জন্য এই পালার আয়োজন করে থাকেন। (হিমেল, ২০২৩ : সাক্ষাৎকার)

তার মানে নুরতত্ত্ব-কারতত্ত্ব পালায় ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা করা হয়। পালার আলোচ্য বিষয় থেকে এটিও স্পষ্ট যে পালাটি বিচারগানের সচরাচর পালাগুলোর মতো নয়। এটি নিঃসন্দেহে নিগূঢ়তত্ত্বনির্ভর একটি পালা। পালাটির বিষয় নুর ও কার সম্পর্কে বাংলার খ্যাতিমান বহু বাউলকবি গান রচনা করেছেন। এই বিষয় দুটি নিয়ে ফকির লালন সাঁইও গান রচনা করেছেন। আর বিচারগানের কিংবদন্তি কবিরাতো লিখেছেনই। এই পালাটি বিচারগানের আসরে অত্যন্ত মূল্যবান একটি পালা হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। পালাটি বেশ কঠিন হওয়ায় সব দর্শক-শ্রোতা পালাটি বুঝতে সক্ষম হন না। এ জন্য দেখা যায় পালাটি আসরে পরিবেশিতও কম হয়। এছাড়া সব গায়েনও পালাটিতে অংশগ্রহণের যোগ্য নয়। সাধারণত দেখা যায় যে সকল পির-গোঁসাইদের দরবারের ভক্তদের মধ্যে বেশির ভাগ নিগূঢ়তত্ত্ব সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখেন সেখানে এই পালাটি বেশি পরিবেশিত হয়ে থাকে। নুরতত্ত্ব-কারতত্ত্ব পালায় অভিনয় করে বহু গায়েন প্রশংসিত হয়েছেন। অতীতে ও বর্তমানে অনেক গায়কই পালাটিতে অংশগ্রহণ করেছেন এবং করছেন। তাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে, যেমন- মমতাজ বেগম, দলিল উদ্দিন বয়াতি, মাখন দেওয়ান, ফকির আবুল সরকার, ফকির শামীম সরকার, মোকসেদ সরকার, জীবন সরকার, শরিয়ত সরকার, আল-আমিন দেওয়ান, ছাপাতুল্লা ফকির, নাড়ু গোপাল হাজরা, দুলাল সরকার, সম্পা সরকার, নজরুল ইসলাম বয়াতি, সালাম সরকার, অলিদ মিয়া প্রমুখ। নুরতত্ত্ব-কারতত্ত্ব পালাটির গানগুলোও বেশ কঠিন ও গভীরতত্ত্বনির্ভর। তাছাড়া গানের ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগ বেশি হওয়ায় সাধারণের বুঝতে সমস্যা হয়। অডিও যুগে ধারণকৃত বেশ কিছু পরিবেশনা দর্শক-শ্রোতার নিকট বেশ জনপ্রিয় হয়েছিলো। তার মধ্যে লাল মিয়া বয়াতি-মমতাজ বেগম ও দলিল উদ্দিন বয়াতি-মাখন দেওয়ানের নুরতত্ত্ব-কারতত্ত্ব পালার অডিও ক্যাসেট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য পালার মতোই নুরতত্ত্ব-কারতত্ত্ব পালায় গায়েনদ্বয়ের মধ্যে প্রশ্ন-উত্তরের বিষয়টি থাকে। পালায় সাধারণত নুর কী, কার কী, এগুলোর প্রকারভেদসহ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচিত হয়। লাল মিয়া বয়াতি একটি নুরতত্ত্ব-কারতত্ত্ব পালায় নুর-পক্ষ থেকে কার-পক্ষের গায়েন মমতাজ বেগমকে প্রশ্ন করেন, কার কী, কত প্রকার ও কী কী? এই প্রশ্নের উত্তরে মমতাজ বেগম বলেন,

> সর্বপ্রথম আমার প্রতিপক্ষ যিনি নুরের ভূমিকায় গান রেখেছেন। প্রশ্ন করেছেন আমার কাছে সর্বপ্রথম কার হতে, যে কার, এই কার শব্দের অর্থটা কী? কার কয় প্রকার, কার কয়টা এবং উহা কী কী? প্রশ্ন অনেক, আমি তার জবাব করবো। কার শব্দের অর্থ স্তর, স্তর বাই স্তর, ক্লাস বাই ক্লাস। কার শব্দের অর্থ একটা স্তর, কার হলো বারটা...এক নাম্বার হলো অন্ধকার, দ্বিতীয়

ধন্ধকার, তৃতীয় নিরাকার, চতুর্থে কুয়াকার, পঞ্চমে জলকার, ছয় নাম্বারে যশকার, সাত নাম্বারে সম্প্রদানকার, আট নাম্বারে অপাদানকার, নয় নাম্বারে কুপুজিৎকার, দশ নাম্বারে ডেপিতকার, এগারোতে আকার, বারোতে গিয়া হইলো সাকার। (মমতাজ, ২০১৭ : পরিবেশনা)

গায়েনগণ পালায় প্রশ্ন-উত্তরের পাশাপাশি আলোচ্য বিষয়গুলোর ওপর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে থাকেন। এই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে গদ্য-কাব্য ছাড়াও গানের মাধ্যমে গায়েনদ্বয় আসরে উপস্থাপন করেন। আসরে নুর-কার সম্পর্কিত প্রতিটি গানই প্রায় কঠিন ও রূপকআশ্রয়ী। তবে গুরুবাদী ও তরিকপন্থীরা খুব সহজেই গানগুলো বুঝেতে পারেন। এই পালাটিতে পরিবেশিত গানেগুলোর মধ্যে বিচারগানের প্রয়াত কিংবদন্তি গায়েন আব্দুল হালিম বয়াতির কিছু গান গায়েনগণ বেশি পরিবেশন করে থাকেন। এ রকম একটি গান হচ্ছে-

জানে ভাবুক যারা, জানে সাধক যারা,
আছে নুরে নুর ঘেরা ৷৷
নুরে নবি পাকে পাঞ্জাতন,
একাকার হইতে হইলো পাঁচেরই গঠন ছিলো সেথায় পঞ্চ সিংহাসন,
ছিলো নুরে হল করা ৷৷ (লাল মিয়া, ২০২৭ : পরিবেশনা)[১৬]

এই গানটিতে যেমন নুর কী, নুরের বিভিন্ন অবস্থা ও ক্রমবির্বতনের পাশাপাশি নুরের শ্বাশত রূপ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি পালায় কার সম্পর্কেও বহু গানে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থাকে। অন্যান্য পালায় বিশেষ করে হাস্যরসাত্মক পালাসমূহের গানগুলো খুবই সহজ হলেও ধর্ম বিশ্লেষণাত্মক পালা সমূহের বেশির ভাগ গানগুলোই রূপক ও নিগূঢ়তত্ত্বনির্ভর হয়। তবে গানের এই বহুমাত্রিকতা বিচারগানের বিষয়কে বৈচিত্র্যময় করেছে।

দেহতত্ত্ব-পারঘাটা পালা

বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুল প্রচলিত একটি বাক্য হচ্ছে ‘যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে, তা আছে দেহভাণ্ডে’। অর্থাৎ বাউলরা দেহকে সবকিছুর আধার মনে করেন। আধ্যাত্মিক সকল সাধন-ভজনের কেন্দ্র হিসেবে তাদের নিকট দেহ উপসানালয়ের মতো বিবেচিত হয়ে থাকে। তাই দেখা যায় বাউলকবিদের রচিত অসংখ্য গানে দেহকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দেহকে ‘দেহঘড়ি’, ‘দেহঘর’, ‘দেহসাগর’, ‘দেহনদী’ প্রভৃতি নামে উল্লেখ করে গানে প্রতিকীভাবে বহু তত্ত্বকথা বলা হয়েছে। যেহেতু বিচারগানে সমস্ত বাউলগানই পরিবেশিত হয়, সেহেতু দেহতত্ত্বের প্রসঙ্গ আবশ্যিকভাবেই পরিবেশনাটিতে রয়েছে। বিচারগানে দেহতত্ত্ব সম্পর্কিত স্বতন্ত্র দুটি পালা রয়েছে। পালা দুটি হচ্ছে, আদমতত্ত্ব-দেহতত্ত্ব ও দেহতত্ত্ব-পারঘাটা। এ পর্যায়ে দেহতত্ত্ব-পারঘাটা পালাটি আলোচনা করা হবে। এই পালাটিতে বাউল ও সুফি দর্শনের বিশ্বাস অনুযায়ী দেহ সম্পর্কিত আধ্যাত্মিক সকল বিষয় আলোচিত হয়ে থাকে।

সেই সাথে পারঘাটা হচ্ছে মানুষের মৃত্যুর পর পারলৌকিক বৈতরণী পার হওয়াকে বুঝায়। তবে এই পারঘাটার দেহতত্ত্বের ব্যাখ্যায় নারীর কামসাগরে পুরুষের জয়-পরাজয়ের বিষয়টিকেও ইঙ্গিত করে থাকে। এই পালাটি বিচারগানের আসরে স্বতন্ত্র পালা হিসেবে খুবই সম্প্রতিকালে সংযুক্ত হয়েছে। দেহতত্ত্ব-পারঘাটা পালাটি বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে বেশি পরিবেশিত হয়। বিশেষ করে পালাটি নেত্রকোণা জেলাতে বেশি পরিবেশিত হয়ে থাকে। পালাটিতে অভিনয় করে বেশ পরিচিতি লাভ করেছেন, সালাম সরকার, হবিল সরকার, খাদিজা ভাণ্ডারী ও জেসমিন সরকারসহ প্রমুখ গায়েন। তবে পালাটির বিষয়বস্তু দেখে ধারণা করা যায় বাংলাদেশের যে কোনো বিচারগানের গায়েনই এই পালায় অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হবেন। পালাটিতে কতগুলো সাধারণ বিষয় রয়েছে, যেগুলো গায়েনগণ আসরে আরোচনা করে থাকেন। আলোচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- মানবদেহ কী দিয়ে তৈরি; মানবদেহে কতটি হাড় রয়েছে; দেহের মাঝে মক্কা, মদিনা ও বৃন্দাবন কোথায়; মানবদেহে বিধাতা কিভাবে থাকেন; দেহে জোয়ার-ভাটা হয় কিভাবে; নারীর দেহে মাসে মাসে রক্তক্ষরণ হয় কেন; কামসাগরের ঘাটে নারী নাকি পুরুষ বড়; দেহের কোথায় চন্দ্র-সূর্য আছে, তা কিভাবে উদয়-অস্ত হয়; মৃত্যুর পর বৈতরণী বা পুলসিরাত পার হতে গুরু কিভাবে সাহায্য করবেন; গুরু ও শিষ্যের মধ্যে কে কাকে পরকালে পার করে নিবেন; কোন সাধনার মাধ্যমে নারীর কামসাগরে গেলেও পুরুষের মরার ভয় নেই প্রভৃতি। এই বিষয়গুলো ছাড়াও এমন এমন কিছু বিষয় পারাটিতে আলোচিত হয়, যা অভিসন্দর্ভে উল্লেখ করতে দ্বিধা হয়। বিশেষ পালাটিতে রতিশাস্ত্রের কিছু আলোচনা রয়েছে যা গায়েনগণ আসরে অত্যন্ত খোলামেলাভাবে আলোচনা করে থাকেন। তবে এই বিষয়গুলো বিচারগানের আসরে খুবই সাধারণ ও স্বাভাবিক বিষয় হিসেবেই গণ্য হয়। হবিল সরকার ও খাদিজা ভাণ্ডারী অভিনীত দেহতত্ত্ব-পারঘাটা পালার আলোচনার একটি অংশের মাধ্যমেই বিষয়টি বোঝা যায় পালাটির আলোচনা কতটা খোলামেলা। পালাটির পরিবেশনায় হবিল সরকার বলেন,

> আল্লার রহমতে তোমার ভিতরে আছে, তোমার ভিতরে পানি মানে জোয়ারডা যেডা ঝরঝর করতেছে। যেমন আমার দাদির বয়স ৮০-৯০ বছর এহন এই বেডির নদীর মইধ্যে তো কিচ্ছু নাই, এইডা সবটাই শুকনা। (হবিল, ২০২২ : পরিবেশনা)

পালাটিতে হবিল সরকারের এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে খাদিজা ভাণ্ডারী বলেন,

> বৃদ্ধ হয়ে গেলে মানুষের নদীর স্রোত নাকি ভাটি পইড়া যায়। কিন্তু আমি এই জায়গায় শুনছি, যারা সাধক এটা হতে পারে মহিলা, হতে পারে পুরুষ, তার যৌবনটা শেষ পর্যন্ত থাকে। বুড়া হয়ে গেলে সেটা ভাটায় পড়ে না, শুকায় না কোনো কিছু। বললো, আমার দাদি বুড়া অইয়া গেছে এহন তার নদী ভাটা পড়ছে। আসলে যারা সাধক তাদের নদী শুকায় না। (খাদিজা, ২০২২ : পরিবেশনা)

পালাটিতে যেমন দেহতত্ত্বনির্ভর রতিশাস্ত্রের বহু আলোচনা অত্যন্ত সাবলিলভাবে হয়, তেমনি অত্যন্ত গুরুগম্ভীরতত্ত্বনির্ভর বহু গানও আসরে গায়েনগণ পরিবেশন করেন। বিশেষ করে পরকালে চিরস্থায়ী সুখের স্থান স্বর্গ

বা জান্নাতে যাওয়ার জন্য মুক্তির পাথেয় বা পূন্য অর্জনে গানে গানে মানুষকে সজাগ কার হয়। এছাড়া গানে মানুষের জাগতিক জীবনকে খুব ক্ষণস্থায়ী শূণ্যময় হিসেবে বারবার অবগত করা হয়। আর এ রকম গান বিচারগানের বর্তমান গায়েনরা যেমন রচনা করছেন, তেমনি প্রয়াত গায়করাও লিখেছেন। এমনকি প্রখ্যাত বাউলকবি লালন সাঁইয়েরও এ রকম গান রয়েছে, যেগুলো দেহতত্ত্ব-পারঘাটা পালায় গাওয়া হয়। এই পালা সম্পর্কিত লালন সাঁইয়ের একটি গান হচ্ছে-

কে তোমার আর যাবে সাথে।
কোথা রবে ভাইবন্ধু সব
পড়বি যেদিন কালের হাতে ॥
নিকাশের দায় করে খাড়া
মারিবে আতশের কোড়া
সোজা করবে বেঁকা তেড়া
জোর জবর খাটবে না তাতে ॥ (মোবারক, ২০০৭ : ১৭৮)[১৭]

গানটিতে ফকির লালন সাঁই মানুষের জাগতিক জীবনের সারশূণ্যতার কথা যেমন বলেছেন তেমনি এই মায়াময় মিছে জীবনের মোহ ছেড়ে পরম প্রভুর স্মরণ নিতে বলেছেন। যার মাধ্যমেই পারলৌকিক মুক্তির কড়ি পাওয়া যাবে বলেই গানের শেষ অন্তরায় ইঙ্গিত দেয়। দেহতত্ত্ব-পারাঘাটা পালাটিতে দেহতত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের পাশাপাশি আত্মিক মুক্তির পথের নকশা ও উপায় সম্পর্কে গায়েনগণ ধর্মশাস্ত্র মতে আসরে আলোচনা করেন। ধর্মবিশ্বাসী দর্শক-শ্রোতা একনিষ্ঠ মনে গায়েনের পরিবেশনা উপভোগ করেন আর নিজের জীবনের সাথে মিলিয়ে নেন, এতে জীবন সম্পর্কে তাদের গভীর উপলব্ধি তৈরি হয়। আসরে গায়েন-দর্শকের এই মিথষ্ক্রিয়া সম্ভব হয় শুধুমাত্র বিচারগানের সমৃদ্ধ বিষয়ভিত্তিক পালাগুলোর জন্যই।

ইসলামধর্ম বিশ্লেষণাত্মক পালার আদম, হাওয়া, মুহাম্মদ, নবি ও শয়তান সংক্রান্ত পালাসমূহ

লোকনাটক বিচারগান পরিবেশনাটি যেহেতু একাধারে ধর্ম, সমাজ ও মানুষ সংক্রান্ত বিষয়াদি সমৃদ্ধ পরিবেশনা, সেহেতু ধর্মের কিছু মৌলিক বিষয়বস্তু নিয়েও পালা পরিবেশিত হয়ে থাকে। বিচারগানে ইসলামধর্ম ও হিন্দুধর্মের মৌলিক বিষয় নিয়ে আলাদা-আলাদাভাবে কিছু পালা তৈরি হয়েছে। যে পালাগুলো সারা বাংলাদেশেই পরিবেশিত হয়ে থাকে। হিন্দুধর্মের মৌলিক বিষয় কৃষ্ণ ও রাধা তত্ত্ব নিয়ে বিচারগানে যেমন পালা আছে, তেমনই ইসলামধর্মের কিছু মৌলিক বিষয় নিয়েও পালা রয়েছে। ইসলামধর্ম মতানুসারে, স্রষ্টা ও সৃষ্টি তত্ত্বের সাথে সম্পৃক্ত কতগুলো পালা রয়েছে। বিশেষ করে ইসলামধর্ম মতে স্রষ্টা ‘আল্লাহ’, প্রথম মানব ‘আদম’, প্রথম মানবী ‘হাওয়া’, সর্বশেষ নবি

'মুহাম্মদ', স্রষ্টার বার্তাবাহক 'নবি' ও সকল মন্দের ধারক-বাহক 'শয়তান' অর্থাৎ আল্লাহ, আদম, হাওয়া, মুহাম্মদ, নবি ও শয়তান সম্পর্কিত কতগুলো পালা রয়েছে। এর সাথে ইসলামধর্মের সকল নবি ও রাসুলের নানা বিষয়ও যুক্ত থাকে। তবে জীব-পরম পালায় পরম হিসেবে 'আল্লাহ' সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এই পালাটিতে অবশ্য আন্তঃধর্মীয় সকল বিধাতা নিয়েই আলোচনা করা হয়ে থাকে। ইতোপূর্বে জীব-পরম পালা সম্পর্কে অভিসন্দর্ভে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলাম ধর্মে বর্ণিত আদম, হাওয়া, মুহাম্মদ, নবি ও শয়তান সংক্রান্ত যে পালাগুলো বিচারগানে উপস্থাপিত হয়। সে পালাগুলো হচ্ছে-

ক. আদম-হাওয়া

খ. আদম-শয়তান

গ. আদি আদম-বনি আদম

ঘ. আদি আদম-বিশ্বনবি

ঙ. আদম সৃষ্টি-নুর সৃষ্টি

চ. আদমতত্ত্ব-দেহতত্ত্ব

ছ. আদমতত্ত্ব-নবিতত্ত্ব

জ. নবিতত্ত্ব-মেরাজতত্ত্ব

ঝ. হায়াতুন্নবি-ওফায়াতুন্নবি ও

ঞ. নবি-সাহাবা

এ পালাগুলোর সাথে নবুয়েত-বেলায়েত পালাটিরও বেশ সম্পর্ক রয়েছে। এই পালায় যেহেতু অলি-আওলিয়া-পির-ফকির-গোঁসাইয়ের নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে, তাই আদম, হাওয়া, মুহাম্মদ, নবি ও শয়তান সংক্রান্ত পালাগুলোর সাথে আলোচনা না করে নবুয়েত-বেলায়েত পালাটি আলাদাভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কেননা আদম, হাওয়া, মুহাম্মদ, নবি ও শয়তান সংক্রান্ত পালাগুলো একে-অপরের সাথে খুব বেশি সম্পর্কিত এ জন্য এই পালাগুলো একটি চক্রের মধ্যে আলোচনার উপযোগী। এই পালাগুলো একই ঘরানার হওয়ায় প্রত্যেকটি পালার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলে পালাগুলো সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা পাওয়া যাবে এবং পালাগুলো বিষয়গত বৈচিত্র্যও স্পষ্ট হবে।

আদম-হাওয়া পালা

সেমিটিক ধর্ম (ইহুদি, খ্রিস্টান ও ইসলাম) মতানুসারে আদম ও হাওয়া মানব জগতের প্রথম মানব-মানবী। তাদের থেকেই বিশ্বের সমস্ত মানুষের উৎপত্তি ও বিকাশ। আল্লাহ প্রথমে আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করে জান্নাতে রাখেন পরে তাঁর বাম পাজরের বাঁকা হাড় থেকে হাওয়া (আ.)-কে সৃষ্টি করেন। পরে তারা আল্লাহর হুকুম অমান্য করে নিষিদ্ধ ফল 'গন্ধম' খেয়ে বেহেস্ত থেকে বিতারিত হয়ে দুনিয়ায় প্রেরিত হন। তারপর আজকের এই মানবজগৎ। সেমিটিক ধর্মের এই মানব সৃষ্টির ইতিহাস ও বিকাশ নিয়ে এবং আদম ও হাওয়া দুটি চরিত্রের পক্ষে অভিনয়ের মাধ্যমে বিচারগানের গায়েনগণ পালা পরিবেশন করেন। যেখানে গায়েনগণের মধ্যে হতে পুরুষ গায়েন আদমের ভূমিকায় এবং হাওয়ার ভূমিকায় কোনো নারী গায়েন গান করেন। পুরো পালায় গায়েনদ্বয় যার যার পক্ষের পালা আদম বা হাওয়ার শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পালা পরিবেশন করেন। পালায় আদম ও হাওয়া পক্ষের গায়েন নিজের চরিত্রকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করতে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক নানান যুক্তি দিয়ে থাকেন। গায়েনদ্বয় নিজ পক্ষের পালাকে বড় প্রমাণ করার চেষ্টার পাশাপাশি বিপক্ষের গায়েনের বিষয়কে ছোট করতেও সব সময় আসরে সচেষ্ট থাকেন। এই পালাটি প্রথম মানব-মানবীনির্ভর পালা হলেও আসরে প্রতিযোগিতার সুবিধার্থে গায়েনগণ নারী-পুরুষের ভূমিকা থেকেও কথা বলেন। কেননা আদম পুরুষ যিনি গোটা পুরুষ জাতির মূল, অন্যদিকে হাওয়া নারী যিনি পুরো নারী জাতির মূল হিসেবে বিবেচিত হন। পালায় গায়েনগণ নিজের পক্ষকে বিজয়ী করতে কতগুলো বিষয়কে উপজীব্য করে বিপক্ষের গায়েনকে খোঁটা দিয়ে থাকেন। যেমন-আদম প্রথম মানুষ এবং তাঁর বাম পাঁজরের হাড় থেকে হাওয়ার সৃষ্টি, সুতরাং হাওয়ার চেয়ে আদম শ্রেষ্ঠ। আদম যখন বেহেস্তে একা ছিলো তখন তাঁর একঘেয়েমী লেগেছিলো, হাওয়ার সৃষ্টির পর আদম আনন্দিত হয়, সুতরাং হাওয়াই প্রাণশক্তির আধার। হাওয়ার ছলনায় আদম গন্ধম খেয়ে বেহেস্ত থেকে বিতারিত হয়েছে, তাই হাওয়া অপরাধী। আদমের ইচ্ছের কারণেই যদি হাওয়ার সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাহলে সকল দায়ভার আদমের ওপর অর্পিত হয়। এ রকমভাবে আসরে গায়েনদ্বয় একে-অপরকে দোষারোপ করে স্বপক্ষের পালাকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। আসরে যুক্তি-তর্কের পাশাপাশি গায়েনগণ স্ব স্ব পক্ষের বিষয়ের স্তুতিমূলক গানও পরিবেশন করে থাকেন। যেমন-

> হাওয়া বিবির জন্য আদম চেতন পেয়েছে,
> তাই আদম পেল দম, সে যে চক্ষু মেলেছে ॥
> বেহেস্তে থাকিয়া আদমের আনন্দে দিন যায়,
> হঠাৎ একদিন আদমের মনে কী জানি কী চায়,
> দেখিয়া হাওয়ারও রূপ আদমে হইল বেকুব,
> হাওয়া বিবির রূপে আদম পাগল হয়েছে ॥ (আকলিমা, ২০২০ : পরিবেশনা)[১৮]

গানটিতে ‘হাওয়া’র পক্ষ থেকে গায়েন আকলিমা বেগম ‘হাওয়া’র স্তুতি বর্ণনার পাশাপাশি আদমের প্রতি হাওয়ার অবদানের কথাও বর্ণনা করেছেন। গানের সারমর্ম হচ্ছে আদমের চেয়ে হাওয়াই শ্রেষ্ঠ। এই গানটিতে যেমন হাওয়ার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে, তেমনি আদমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণেও বহুগান বিচারগানের আসরে গায়েনগণ পরিবেশনা করেন। যেহেতু বিচারগানের পরিবেশনায় প্রধানতম বিষয় হচ্ছে স্ব স্ব পালাকে জয়ী করা, সেহেতু প্রতিটি পক্ষেরই স্তুতিমূলক গান গায়েনগণ রচনা করেন এবং পরিবেশনা করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে বিচারগানের প্রতিটি পালার প্রতিটি বিষয়ই অনন্য তার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের জন্য।

আদম-শয়তান পালা

বিচারগানের এ পালাটিতে ইসলামধর্ম মতে সকল কুমন্ত্রণাদাতা ও আল্লাহর আদেশ অমান্যকারী শয়তান, যে আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) কে অসৎ পরামর্শ দিয়ে নিষিদ্ধ ফল ‘গন্ধম’ খাওয়ান। যার কারণে আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) জান্নাত থেকে বিতারিত হন। এমনকি সেমিটিক ধর্ম বিশ্বাস অনুযায়ী শয়তান বর্তমানেও সমগ্র মানব জাতিকে বিপথগামী করেন। এই অভিশপ্ত শয়তান ও প্রথম মানব আদম (আ.)-কে নিয়ে বিচারগানের আদম-শয়তান পালায় গায়েনগণ প্রতিযোগিতা করে থাকেন। পালায় দেখা যায়, গায়েনগণ আদম বা শয়তানের পক্ষে পালা নিয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ দাবি করেন। সেই সাথে একে-অপরকে দোষারোপ করেন। গায়েনগণ আদম-শয়তান পালা করতে যেয়ে কতগুলো সাধারণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকেন। যে বিষয়গুলো ঘুরেফিরে পালাটিতে আলোচিত হয়। সে বিষয়গুলো হচ্ছে-

ক. শয়তানপক্ষের গায়েন দাবি করেন, শয়তান আগুনের তৈরি আর আদম মাটির তৈরি, মাটির চেয়ে আগুন শক্তিশালী তাই শয়তান শ্রেষ্ঠ। অন্যদিকে আদমপক্ষের গায়েন দাবি করেন, আদম আল্লাহর নিজ চেহারায় তৈরি তাই আদম শ্রেষ্ঠ।

খ. আদমকে সিজদাহ না করার কারণে শয়তান অভিশপ্ত হয়েছে সুতরাং আদম শয়তানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, এমনটাই দাবি করেন আদমপক্ষের গায়েন।

গ. শয়তান আল্লাহ ছাড়া কাউকে সিজদাহ করেনি, তাই শয়তান ঠিক করেছেন, এমনটাই দাবি করেন শয়তানপক্ষের গায়েন।

ঘ. শয়তানপক্ষের গায়েন, শয়তানকে আদমের চেয়ে বয়সে বড় দাবি করে আদমকে ছোট হিসেবে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন।

ঙ. আদমপক্ষের গায়েন, শয়তানকে নিজের অনুগত দাস হিসেবে মনে করেন এবং শয়তানকে হেয়পতিপন্ন করেন।

উপরিউক্ত বিষয়গুলো নিয়ে গায়েনগণ আসরে গদ্য-কাব্য-গানে প্রতিযোগিতা করেন। লোকনাটক বিচারগানে আদম-শয়তান পালাটিকে দেশের প্রায় সকল গায়েনই অভিনয় করে থাকেন। কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে, প্রখ্যাতদের মধ্যে আব্দুল হালিম বয়াতি, রজ্জব আলী দেওয়ান, কিয়ামদ্দিন বয়াতি, মাখন দেওয়ান, আয়নাল বয়াতি, শংকর দাস বাউল, অসীম দাস বাউল, খালেক দেওয়ান, মালেক দেওয়ান, আনোয়ার দেওয়ান প্রমুখ। বর্তমানে এই পালাটিতে অভিনয় করে সুনাম অর্জন করেছেন বড় আবুল সরকার, শাহ্ আলম সরকার, মুক্তা সরকার, মমতাজ বেগম, আকলিমা বেগম, আলেয়া বেগম, ফারুক সরকার, কাজল দেওয়ান, মালেক সরকার, সাত্তার সরকার ও এম.এ. ফারুকসহ প্রমুখ গায়েন উল্লেখযোগ্য। আদম-শয়তান পালাটি বাংলাদেশের প্রায় সমগ্র অঞ্চলেই পরিবেশিত হয়ে থাকে। পালাটি বেশির ভাগই পির-গোঁসাই ও মাজার-মন্দিরের মেলায় অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তবে অডিও, ভিসিডি ও বর্তমানে ইউটিউবের মাধ্যমেও পালাটি পরিবেশিত হয়। পালায় আদম ও শয়তান কেন্দ্রিক বিভিন্ন প্রশ্ন গায়েনগণ একে-অপরকে করে থাকেন। প্রয়াত আব্দুর রশিদ সরকার ও মমতাজ বেগমের পরিবেশনায় আদম-শয়তান পালা থেকে প্রশ্ন-উত্তরের বিষয়ের প্রামাণ্য দেয়া যেতে পারে। এই পালাটিতে মমতাজ বেগম, আব্দুর রশিদ সরকারকে প্রশ্ন করেন আদম কত প্রকার ও কী কী? এই প্রশ্নের উত্তরে আব্দুর রশিদ সরকার বলেন,

> আমার কাছে প্রশ্ন করেছে, আদম কয় প্রকার? আদম পাঁচ প্রকার- আদি আদম, বুনি আদম, বাণী আদম, সফি আদম, দমসে আদম। আদি আদম- খোদা নিজেই খোদ খোদা, দমসে আদম- যে দমের সঙ্গে আছে, সফি আদম- আরশে মহল্লায় যার ছবি...আর বাণী আদম হলো- কলবের ভিতরে যে রূহ আকারে যে দেওয়া হয়েছিলো, আল্লার বাণী হিসেবে, হুকুম হিসেবে ঐটা হলো- বাণী আদম। আর বুনি আদম- আদমের বুনিয়াদ হইতে যারা পরস্পর জন্মগ্রহণ করেছে, তারা হলো বুনিয়াদ আদম। এখন প্রশ্ন করেছে, আদি আদম হইতে গেলে, কী সাধনার প্রয়োজন? আদি আদমকে আল্লাপাক আমানত হিসেবে ইনসাফ দিয়েছে, সেই ইনসাফ করে যেই ইনসান, ইনসাফ করে চলতে পারে, আমার আল্লা বলেন, তিনি আমার আদমে আইস্যা পৌঁছতে পারে। অর্থাৎ আমার জাতের সঙ্গে পৌঁছতে পারে। তাই যখনই তুমি চলো, উঠতে-বসতে-খাইতে-শুইতে সাধনার ক্ষেত্রে রাজনীতির ক্ষেত্রে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে, দৈহিক ক্ষেত্রে, সমস্ত ক্ষেত্রে যিনি ইনসাফ করে চলতে পারেন, তিনিই কেবল আদিতে পৌঁছতে পারে, আদতে পোঁছতে পারে। এই আমি কথার জবাব দিলাম। (রশিদ, ১৯৯৫ : পরিবেশনা)

পালায় যেমন আদম সম্পর্কে নানা রকম প্রশ্ন করা হয়, ঠিক তেমনি শয়তান সম্পর্কেও প্রশ্ন করা হয়। পালাটিতে সবচেয়ে চমকপ্রদ বিষয় হচ্ছে ‘শয়তান’-এর পক্ষ নিয়ে প্রতিযোগিতা করা। শুধু তাই নয় ‘শয়তান’ পক্ষের গায়েন ধর্মীয় তত্ত্ব ও যুক্তি দিয়ে মানুষের চেয়ে শয়তানকে বড় হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। এমনকি অনেক গায়েন শয়তানকে নিষ্পাপ দাবি করতেও দ্বিধা করেন না। পালায় প্রচলিত বহু বিশ্বাসকে গায়েনগণ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি

করেন। আদমপক্ষের গায়েন যদি যুক্তি-তর্কে দুর্বল হন তাহলে শয়তানপক্ষের গায়েন শয়তানকে বড় প্রমাণ করে আসরে বিজয়ী হয়ে যান। পালাটিতে শয়তানের স্তুতি করে বহু গানও পরিবেশিত হয়। যেমন-

(ওরে) আমি শয়তান হইলাম সৃষ্টির সেরা,
(ওরে) কিছু নয় আমারে ছাড়া,
আমি শয়তান ফেরেস্তার উপরে বলি তোরে,
আমারে কে চিনিতে পারে ॥
(ওরে) বেহেস্তে হাওয়া-আদম,
খাওয়াইছিলাম আমি গন্ধম,
গন্ধম খাইয়া জান্নাতি পোশাক গেলো পড়ে,
সাড়ে তিনশ বৎসর ধরে কাঁদলি দুইজন জারেজারে,
শয়তানের সেই দাগায় পড়ে ॥ (পরশ, ২০২০ : পরিবেশনা)[১৯]

গানটিতে শুধু শয়তানের স্তুতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। গায়েন পরশ আলী দেওয়ান শয়তানের মাধ্যমে বিধাতাকেও চ্যালেঞ্জ করেছেন। এই গানের একটি পঙক্তিতে বলা হয়েছে ‘আমারে দেখলে বেটা খোদায়ও ভয় করে’। এখানে শয়তান বলতেছে তাকে দেখলে খোদায়ও ভয় করে! বিচারগান যে প্রান্তিক-জনগোষ্ঠী তথা লোকসমাজের মানুষের মুক্তবুদ্ধির মুক্তআসর সেটাই এই গানে প্রমাণ করে। বিচারগানের এই রকম বহুমাত্রিক বিষয়ের জন্যই পরিবেশনাটি বাংলাদেশের লোকনাটকের মধ্যে অন্যতম সমৃদ্ধ একটি পরিবেশনা হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

আদি আদম-বনি আদম পালা

বিচারগানের আদি আদম ও বনি আদম পালাটিতে মূলত ইসলামী বিশ্বাস তথা সেমিটিক ধর্ম মতানুসারে আদি আদম মানে বিধাতার জাত নুর হতে যে আদম বা আদমের আদি রূপ বা অবস্থা আর বনি আদম মানে প্রথম মানব আদম (আ.) হতে আজবধি সকল মানুষ নিয়ে আলোচনা করা হয়। অর্থাৎ আদি আদম বলতে ঈশ্বরের জাতি সত্তা হতে সৃষ্ট আদম ও বনি আদম বলতে আদমের বংশধর বা সমগ্র মানব জাতিকে বুঝায়। বিচারগানের প্রবীণ শ্রোতা ও গ্রাম্য মশলিশিগানের গায়ক সাঈদ আলী বিশ্বাস বলেন, ‘আহাদ হইতে আদমের উৎপত্তি আর আদম হইতে পুরা মানব জাতি। বিচারগানের আদি আদম-বনি আদম পালায় এই বিষয়গুলো নিয়েই গান গায়।’ (সাঈদ, ২০২১ : সাক্ষাৎকার) বিচারগানের গায়েনগণ দর্শকদের মাঝে স্বয়ং বিধাতার আদি সত্তা হতে সৃষ্ট আদম ও সমগ্র মানব জাতির প্রতিনিধিত্ব করে পালায় প্রতিযোগিতা করে থাকেন। আদি আদম-বনি আদম পালাটি লোকনাটক বিচারগানের আসরে

পরিবেশিত পালাগুলোর মধ্যে অন্যতম কঠিন একটি পালা। এই পালাটি নিগূঢ়তম আদ্যাত্মিকতা নির্ভয় হওয়ায় বিচারগানের সব গায়েনও পালাটিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন না। এছাড়া বিচারগানের উচ্চমার্গীয় তথা প্রাজ্ঞ দর্শক-শ্রোতা ব্যতীত এই পালাটির তত্ত্বকথা সবাই বুঝেন না। এজন্য দেখা যায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি পালা হওয়া সত্ত্বেও যে কোনো আসরে পালাটি পরিবেশিত হয় না। সাধারণত সমৃদ্ধ পরিবেশনাস্থলে আদি আদম-বনি আদম পালাটি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বিচারগানের আসরে যে সকল বিষয়ভিত্তিক গান পরিবেশিত হয় তার মধ্যে আদম সংক্রান্ত গানগুলো অত্যন্ত গভীর আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ। বাংলা অঞ্চলে যে সকল কালজয়ী বাউলকবিগণ গান লিখেছেন তাদের মধ্যে ফকির লালন সাঁই থেকে শুরু করে জালাল উদ্দিন খাঁ, আব্দুল হালিম বয়াতি, পাঞ্জু শাহ ফকির, আহমদ শাহ, রজ্জব আলী দেওয়ান, খালেক দেওয়ান, মালেক দেওয়ান, আব্দুর রশিদ সরকারসহ প্রমুখ আদমতত্ত্বের ওপর গান রচনা করেছেন। বিশেষ করে সুফিকবি দেওয়ান আব্দুর রশিদ চিশতি রচিত উচ্চমার্গীয় গান রয়েছে। যে গানগুলো বিচারগানের আসরে নিয়মিত গাওয়া হয়ে থাকে। তাঁর আদম সংক্রান্ত একটি বিখ্যাত গান হচ্ছে-

আমি ডুব দিয়ে রূপ দেখিলাম প্রেম নদীতে,
আল্লা, মহম্মদ, আদম, তিনজনা এক নূরেতে (১)।
সে সাগর অকূলের, আদি অন্ত নাহি তার,
নিঃশব্দে আছিল সিন্ধু আদিতে-,
আচানক দিয়ে নাড়া, শব্দ করিল খাড়া,
সেইত সৃষ্টির গোড়া আদিতে আদিতে। (দেওয়ান রশিদ, ১৯৮৪ : ৪৪-৪৫)[২০]

এই গানটির ভাষা, রূপক-আশ্রয়ী শব্দ, নিগূঢ়তত্ত্ব দেখেই বোঝা যায় যাচ্ছে গানটি সহজ বোধগম্য নয়। কেউ যদি দীর্ঘদিন বাউল ও সুফিবাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত না থাকেন, তিনি হয়তো গানটি বুঝতেই পারবেন না। এই অভিসন্দর্ভটি রচনাকালে বেশ কয়েকজন পির-গোঁসাই ও দর্শক-শ্রোতার সাথে গানটি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, তাতে মনে হয়েছে তারা প্রায় সবাই গানটির ভাবার্থ সম্পর্কে পরিষ্কার নয়। আবার কেউ কেউ বুঝেও আধ্যাত্মিকতার দোহাই দিয়ে ব্যাখ্যা করতে অপারগতা প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ এই গানটির মাধ্যমেই বোঝা যাচ্ছে আদি আদম-বনি আদম পালাসহ আদম সংক্রান্ত পালাগুলো বেশ কঠিন। তবে বিচারগানের আসরে সহজ পালাগুলোর পাশাপাশি এই কঠিন পালাগুলোর উপস্থিতি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এতে সব শ্রেণির দর্শক-শ্রোতার চাহিদা পূরণে পরিবেশনাটি সক্ষম হয়েছে।

আদি আদম-বিশ্বনবি পালা

বিচারগানের এই পালাটিতেও বিধাতার আদি সত্তা থেকে সৃষ্ট আদম ও বিশ্বনবি মুহাম্মদ (স.)-কে নিয়ে ইসলামী বিশ্বাস তথা সেমিটিক ধর্ম মতানুসারে গায়েনগণ পালা উপস্থাপন করে থাকেন। যেখানে বিধাতার সৃষ্টির গোড়ার কথা বিশ্লেষণ এবং বিশ্বনবি (স.)-এর সৃষ্টি-জন্ম ও তাঁর জীবনের ওপর শরিয়ত ও মারফতি দৃষ্টিকোণ থেকে পালায় গায়েনগণ আলোচনা করেন। ইসলামধর্ম বিশ্লেষণাত্মক পালার আদম, হাওয়া, মুহাম্মদ, নবি ও শয়তান সংক্রান্ত পালাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত পালা হচ্ছে আদি আদম-বিশ্ব নবি পালা। এই পালাটি নিগূঢ়তত্ত্বের দিক থেকে মধ্যম মানের হওয়ায় সব শ্রেণির দর্শক-শ্রোতা বুঝতে পারেন। একপক্ষে যেমন আদম (আ.), অন্যপক্ষে হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে নিয়ে পালাটি পরিবেশিত হয়। তবে এখানে আদম (আ.) বলতে মাটির আদমের পূর্বে বিধাতার নুর থেকে সৃষ্ট বা জ্যোতির্ময় আদমকে বুঝায় আর বিশ্বনবি বা হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ইহজাগতিক জীবনের বাইরে তার নুর জগতের বিষয়াদি নিয়ে আসরে গায়েনগণ আলোচনা করে থাকেন। পালায় আলোচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে আদি আদম কী? আদি আদমের প্রকারভেদ, আদি আদমের ক্রমবির্বতন, আদি আদমের সাথে পরম ঈশ্বরের সম্পর্ক কী, বিশ্বনবি তথা হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর নুর সৃষ্টি, আল্লার সাথে মুহাম্মাদ (স.)-এর সম্পর্ক, মুহাম্মদ (স.)- কে দুনিয়ায় প্রেরণ ও তাঁর জীবনের সকল বিষয়সহ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই পালাটি আধ্যাত্মিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হওয়ায় বাংলাদেশের প্রায় সমগ্র অঞ্চলেই পরিবেশিত হয়ে থাকে। সরাসরি দর্শক সম্মুখে পালাটি বেশি পরিবেশিত হলেও অডিও, ভিসিডি ও বর্তমানে ইউটিউব মাধ্যমেও পরিবেশিত হয়। আদি আদম-বিশ্বনবি পালাটিতে বিচারগানের প্রায় সকল গায়েনই অভিনয় করে থাকেন। এই পালাটিতে অংশগ্রহণকারী কয়েকজন সুনামধন্য গায়েনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে, যেমন- আব্দুর রশিদ সরকার, বড় আবুল সরকার, ফকির আবুল সরকার, শাহ আলম সরকার, মফিজ দেওয়ান, খোরশেদ আলম বয়াতি, হানিফ সরকার, জালাল সরকার, সুনীল কর্মকার, শরিয়ত সরকার, অসীম দাস বাউল, শংকর দাস বাউল, হুমায়ুন সরকার, রুমা সরকার, সালাম সরকার, অলিদ মিয়া, জসীম সরকার, নেওয়াজ দেওয়ান, আয়নাল বয়াতি, মৌসুমী বাউল, বাতেন সরকার, লতিফ সরকার প্রমুখ। প্রকৃতপক্ষে আদি আদম-বিশ্বনবি পালাটিতে প্রায় সকল গায়েনই অংশগ্রহণ করে থাকেন। এই পালাটিতে পরিবেশিত গানগুলোও অত্যন্ত চমৎকার। পালায় বিচারগানের কিংবদন্তি গায়কদের রচিত গানের পাশাপাশি বাউলকবি লালন সাঁইয়ের গানও পরিবেশিত হয়। তবে এই পালা সম্পর্কিত আব্দুর রশিদ সরকার রচিত একটি গান বিচারগানের আসরে বেশ জনপ্রিয়। গানটি হচ্ছে-

> নবীজির কুদরতের শান
> যদি কাগজ হইতো সাত আসমান।

লেইখা শেষ করা যায় না তার নামেরই ব্যাখ্যা

এসমে আহম্মদ হুজুর পরানও সখা ॥ (রশিদ, ২০২০ : ২৯)[২১]

এই গানটিতে নবি মুহাম্মদ (স.)-এর জাগতিক জীবনের চেয়ে আধ্যাত্মিক জীবন সম্পর্কেই বেশি বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া গানটি নবি সম্পর্কিত হওয়ায় আদি আদম-বিশ্বনবি পালা ছাড়াও বিচারগানের নবি সম্পর্কিত সব পালাতেই গাওয়া হয়ে থাকে। বিচারগানের বিষয়ভিত্তিক পালাগুলোর বেশ কিছু গান রয়েছে যা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য তৈরি করে।

আদম সৃষ্টি-নুর সৃষ্টি পালা

সেমিটিক ধর্ম মতানুসারে তথা ইসলামধর্মের বিশ্বাস অনুসারে সৃষ্টিতত্ত্বের নানান বিষয়কে উপজীব্য করে আদম সৃষ্টি-নুর সৃষ্টি পালাটি তৈরি হয়েছে। ইসলামী সৃষ্টিতত্ত্বে 'নুর' বা আলো বিষয়টি আদি ও মৌলিক একটি বিষয়। ইসলামধর্মের বিধাতা 'আল্লাহ' সর্বপ্রথম তাঁর নুর থেকে মুহাম্মাদি নুর সৃষ্টি করেন। ক্রমান্বয়ে সেই নুর বিভাজন করে আদম থেকে শুরু করে বিশ্বজগতের সবকিছু সৃষ্টি করেন। বিচারগানের আদম সৃষ্টি ও নুর সৃষ্টি পালাটিতে মূলত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুর সৃষ্টি কিভাবে হয়েছে, কবে হয়েছে প্রভৃতি বিষয় নিয়ে অন্যান্য পালার মতোই দ্বিপাক্ষিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আদম সৃষ্টি ও নুর সৃষ্টি পালাটি পরিবেশিত হয়। তবে পালাটিতে ভারতীয় উপমহাদেশের হিন্দুধর্মসহ অন্যান্য ধর্মের মতানুসারে সৃষ্টিতত্ত্বের বিষয়াদিও আলোচিত হয়ে থাকে। আদম সৃষ্টি-নুর সৃষ্টি পালাটি বিচারগানের গায়েন, পৃষ্ঠপোষক ও দর্শক-শ্রোতার নিকট খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি পালা হিসেবে বিবেচিত হয়। বিচারগানের পৃষ্ঠপোষক পির-গোঁসাইদের বাড়িতে এই পালাটি অত্যন্ত ভক্তিসহকারে পরিবেশিত হয়ে থাকে। তাছাড়া এই পালাটিতে যে সকল গায়েন অভিনয় করতে সক্ষম তাদেরকে খুবই শ্রদ্ধার চোখে দেখেন পরিবেশনার আয়োজকগণ। এই সকল পালার পরিবেশনাকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জ্ঞানচর্চার আসর বলা যেতে পারে। পালায় যে সকল আলোচনা করা হয় তার ধর্মীয় ভিত্তি ছাড়া বস্তুনিষ্ঠ কোনো ভিত্তি নেই বললেই চলে। তবুও পালাটিকে লোকসমাজে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হয়। মানবজাতির আদিমতম জানার বাসনা, সে কোথায় থেকে এসেছে এবং কোথায় যাবে। এই বিষয়গুলোর সন্ধান করতে যেয়ে মানুষ অসংখ্য তত্ত্বের জন্ম দিয়েছে, এখনও মানুষ নিরন্তর সন্ধানের মধ্যেই রয়েছে। মানুষের শ্রেণিভেদে এই সন্ধান প্রক্রিয়া যেমন ভিন্ন ভিন্ন, তেমনি প্রত্যাশা পূরণের মুগ্ধতাও ভিন্ন ভিন্ন হয়। সাধারণত ধর্মীয় বিশ্বাসের কাছেই মানুষ বেশি মাথা নত করে, বিশেষ করে প্রাতিষ্ঠানিক ও বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞানের অভাবেই মানুষ ধর্মের নিকট বেশি নত হয়। যেহেতু প্রাচীনকাল থেকেই ধর্ম সৃষ্টিতত্ত্বের বিষয়ে নানা মিমাংসা দিয়েছে, সেহেতু কিছু মানুষ তা সন্দেহাতীতভাবে মেনেও নিয়েছে। বিচারগানের সাথে সংশ্লিষ্ট মানুষও ধর্ম বিশ্বাসকে

নেয়া জনগোষ্ঠী। সুতরাং খুব সহজেই বিচারগানের আসরে সৃষ্টিতত্ত্বনির্ভর আদম সৃষ্টি-নুর সৃষ্টি পালাটি জনপ্রিয়তা পেয়েছে। পালাটি বাংলাদেশের প্রায় সমগ্র অঞ্চলেই পরিবেশিত হয়। এছাড়া অডিও, ভিসিডি, ভিডিও ও আধুনিক সম্প্রচার মাধ্যম ইউটিউবেও পালাটি উপস্থাপিত হয়ে থাকে। তবে পালাটি নিগূঢ়তত্ত্বনির্ভর হওয়ায় বিচারগানের সকল গায়েন পালাটিতে অভিনয় করার যোগ্যতা রাখেন না। সাধারণত যে সকল গায়েন বিজ্ঞ-বিচক্ষণ তারাই কেবল এই পালাতে অভিনয় করতে পারেন। পালাটি গভীর আধ্যাত্মিকতত্ত্বনির্ভর হওয়ায় আসরে গায়েনগণ একে-অপরকে যে প্রশ্ন ও উত্তর দেন তাও খুব কঠিন হয়ে থাকে। এই পালার আসরে আলোচিত তত্ত্বগুলো অনেকের পক্ষে বোঝা সম্ভব হয় না। আদম সৃষ্টি-নুর সৃষ্টি পালায় প্রশ্ন-উত্তরের প্রামাণ্য হিসেবে সুনীল কর্মকার ও বারেক বৈদেশী পরিবেশিত একটি পালার উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। এই পালাটিতে বারেক বৈদেশী নুর সৃষ্টির পক্ষ থেকে সুনীল কর্মকারকে প্রশ্ন করেন, আদম (আ.)-কে মাটি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, তাহলে মানুষের শরীর পানি দিয়ে ধৌত করলে কাদা হয়ে গলে যায় না কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে আদম সৃষ্টির পক্ষ থেকে সুনীল কর্মকার বলেন,

> হাদিস তার দুইটি মত দিয়েছে, তার একটি মত, আদমের এই দেহ তৈরি করার জন্য আল্লাহু তায়ালা প্রধান চাইরজন ফেরেস্তাকে হুকুম করেছিলেন মাটি আনার জন্য। সবাই ঘুরে আসলেন, অবশেষে আজরাইল (আ.) এনেছিলেন মাটি। এই মাটি যখন খাম্বির করা হয়, পানি দিয়া, পানি মিশাইয়া। আদমের এই দেহটা আগুন, পানি, বাতাস, মাটি, ছাফা নুরে তৈরি। কিন্তু যখন খাম্বির করা হয় আল্লাহ ফেরেস্তাকে বলেছিলেন, বেহেস্ত হইতে একটি নহর, সেই নহর থেকে পানি এনে আদমের দেহ তৈরির যে মাটি, সেই মাটির খাম্বির তৈরি করা হোক। এই বেহেস্ত হইতে পানি এনে আদমের এই দেহটা মাটির সেই খাম্বির করা হয়। এই জন্য আদমের এই দেহ যতই সাবান লাগানো হয় ততই পরিষ্কার হয়। আরেকটি মত দিয়েছেন, যে আদমের এই দেহ তৈরি করে এমন একটি বার্নিশ এর মধ্যে দেওয়া হয়েছে, যে জন্য এটা পানিতেও নষ্ট হয় না। এই বার্নিশটি নুরের বার্নিশ। (সুনীল, ২০১৮ : পরিবেশনা)

এই প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, মানব সৃষ্টির যে তত্ত্ব বিচারগানের আসরে আলোচিত হয়, তা একেবারেই ধর্মবিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল। এই বিষয়গুলো বিজ্ঞান বা বস্তুনিষ্ঠ যুক্তির নিকট গ্রহণযোগ্যতা হারায়। তবে লোকবিশ্বাস ফোকলোরের গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান হওয়ায় এই বিষয়গুলোকে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। পালাটিতে মানবসৃষ্টির সম্পর্কে গানে গানেও আলোচনা করা হয়ে থাকে। যেমন-

> মাটির কায়া ছেড়ে যদি পালাইয়া যাইতে হবে,
> কেন হলো তবে জনম, কেন হলো তবে ॥
> এই যে সকল মাটির গড়া, রঙ্গে পরিপাটি করা,
> ভিতরেতে প্রাণমনোরা ঠেকছে মায়ার লোভে,
> কুমারিয়া পোকার মতো ঘর বাঁধিয়া সবে,
> আপনারই রূপ চাহিয়া বিশ্বরূপে মিশাইবে ॥ (সুনীল, ২০১৮ : পরিবেশনা)[২২]

এই গানটি যেমন মানুষের ক্ষণস্থায়ী দেহের বিষয়ে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, তেমনি বিচারগানের আসরে এ রকম বহু গান গায়েনগণ পরিবেশন করেন। গায়েনগণ আসরে বিষয়ভিত্তিক গানের জবাবে পাল্টা গানও গেয়ে থাকেন। প্রতিটি গানই পালার বিষয়বস্তুকে আসরে উপস্থাপন করে। সুতরাং বিচারগানের পালাগুলোর বিষয়ে বৈচিত্র্য আনতে গানের ভূমিকাও অনস্বীকার্য।

আদমতত্ত্ব-দেহতত্ত্ব পালা

এই পালাটিতেও আদম, হাওয়া, মুহাম্মদ, নবি ও শয়তান সংক্রান্ত অন্যান্য পালার মতোই আলোচ্য বিষয়বস্তু প্রায় একই রকম হয়ে থাকে। এখানে কেবল একটি বিষয় অতিরিক্ত আলোচনা করা হয়, সেটি হচ্ছে মানুষের দৈহিক গঠন ও সৃষ্টি রহস্য। পালায় সাধারণত প্রশ্ন করা হয়, আদম (আ.)-কে কী দিয়ে তৈরি করা হয়েছে কিংবা হাওয়া (আ.)-এর সৃষ্টির রহস্য কী? মানুষের শরীরে কয়টি হাড়? কোন কোন হাড় 'আল্লাহ' মানুষের শরীর থেকে অপসারণ করেছেন, কেন করেছেন? প্রভৃতি প্রশ্ন ও বিষয়াবলি এই পালাটিতে গায়েনগণ আলোচনা করে থাকেন। পালাটির বিষয়বস্তু আদম, হাওয়া, মুহাম্মদ, নবি ও শয়তান সংক্রান্ত পালাগুলোর মতো হওয়ায় আদমতত্ত্ব-দেহতত্ত্ব পালাটিকে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা বেশ কঠিন। অভিসন্দর্ভে যেহেতু পূর্বেও একই বিষয়ভিত্তিক পালা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, সেহেতু এখানে বিশেষ কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে। আদমতত্ত্ব-দেহতত্ত্ব পালাটির পরিবেশনা সাধারণত পির-গোঁসাইদের বাড়ি ও মাজারের ওরশ মাহফিলে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। পালার বিষয়বস্তু বেশ কঠিন হওয়ায় বিচারগানের সব গায়েন যেমন অভিনয় করতে পারেন না, তেমনি সকল দর্শক-শ্রোতাও পালার আলোচিত তত্ত্বকথা বুঝতে পারেন না। এজন্য দেখা যায় পালাটি বেশ তত্ত্বনির্ভর হওয়া সত্ত্বেও আসরে অন্যান্য পালাগুলোর মতো বেশি পরিবেশিত হয় না। পালায় আদম (আ.)-এর সৃষ্টি সংক্রান্ত আলোচনার পাশাপাশি মানবদেহ সম্পর্কে যে সকল আলোচনা করা হয়, তার বেশির ভাগেরই বৈজ্ঞানকি কোনো ভিত্তি নেই, বরং বিজ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক। এছাড়া এমন কিছু আলোচনা পালায় হয়, যেগুলোতে বস্তুবাদী মানুষের কাছে কুসংস্কার বা অন্ধবিশ্বাস মনে হতে পারে। বিচারগানের নিয়মিত দর্শক-শ্রোতার প্রায় সকলেই অবশ্য আসরে আলোচিত সকল কথাই বিশ্বাস করে থাকেন। তারা পালার প্রত্যেকটি কথাই ভক্তিসহকারে বিশ্বাস করেন এবং আসরে প্রতি মুহূর্তে গায়েনের কথায় অভিভূত হন। আদমতত্ত্ব-দেহতত্ত্ব পালাটির পরিবেশনা থেকে জানা গেছে, বিচারগান সংশ্লিষ্ট প্রায় সবাই বিশ্বাস করেন আরবি হরফের নকশা অনুযায়ী মানবদেহ গঠন করা হয়েছে। এবং নকশার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা লুকিয়ে আছে। এই বিষয়টি সত্য নাকি মিথ্যা সেটি বিবেচ্য বিষয় নয়। লোকধর্মের অনেক বিশ্বাসই বিচারগানের আসরে চর্চিত হয়ে থাকে। এখানে যেহেতু আলোচ্য বিষয় আদমতত্ত্ব ও দেহতত্ত্ব, সেহতেু বিচারগানের আসরে বিষয়টি

যেভাবে উপস্থাপন করা হয়, সেভাবেই উল্লেখ করা প্রয়োজন। বিচারগানের বহু গান রয়েছে যেখানে মানুষের দেহগঠন সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়। বিচারগানের কিংবদন্তি গায়ক ও লোককবি খালেক দেওয়ান রচিত একটি গানে আরবি হরফের দেহের নকশা সংক্রান্ত বর্ণনা পাওয়া যায়। গানটি বিচারগানের আসরে গায়েনগণ প্রায়ই গেয়ে থাকেন। গানটি হচ্ছে-

ত্রিশ হরফে কোরান জারি চল্লিশে দেহ তৈয়ারী
আদম তনের বিচার করি, ভব সিন্ধু ধর পাড়ি ॥
আলিফেতে নাক হইল বে হরফে মুখ তৈয়ার
তে হরফে তালু পয়দা করিলেন পাক পরোয়ার
ছে হরফে চোখ হইল, জিমে জিহবা বানাইল
হে হরফে হাড় হইল, খে হরফে শিরের খুপরি ॥ (খালেক, ১৯৯৯ : ৯৫)[২৩]

এই গানটিতে যেভাবে দেহগঠনের বর্ণনা করা হয়েছে, এর বাইরেও বহু গায়েনের বহু গান রয়েছে। সে গানগুলোর বর্ণনার সাথে আবার এই গানে বর্ণিত নকশার মিল পাওয়া যায় না। বিশেষ করে বিচারগানের আসরে মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর উপজেলার ঝিটকা শরিফ অঞ্চলের সুফিকবি ও সাধক দেওয়ান আব্দুর রশিদ চিশতি নিজামির খেলাফতপ্রাপ্ত শিষ্য খাজা শাহ মো. মনছুর আলী আল চিশতি নিজামি রচিত গ্রন্থ 'ছের্‌রোল কোরআন বা আকাশ বাণী'-তে আরবি হরফে নকশা করা মানবদেহের একটি চিত্র রয়েছে। এই চিত্রটির কথা বিচারগানের গায়েনগণ আসরে প্রায়ই আলোচনা করে থাকেন। চিত্রটি কে করেছেন, এ সম্পর্কিত কোনো তথ্য গ্রন্থটিতে নেই। শুধু চিত্রের নিচে লেখা রয়েছে 'মোরসেদ প্রদত্ত'। এতে ধারণা করা যায় মো. মনছুর আলী, তাঁর গুরু দেওয়ান আব্দুর রশিদ চিশতির নিকট থেকে হয়তো চিত্রটি প্রাপ্ত হয়েছেন। তবে বিচারগানের পৃষ্ঠপোষক ও পির হযরত হিমেল শাহ চিশতি নিজামির নিকট থেকে জানা গেছে, আরবি হরফে চিত্রিত মানবদেহের এই নকশাটি সুফি-বাউলরা শত শত বছর যাবৎ গুরু-শিষ্য পরম্পরায় প্রাপ্ত হয়েছেন। নিচে 'ছের্‌রোল কোরআন বা আকাশ বাণী' গ্রন্থে প্রকাশিত মানবদেহের আধ্যাত্মিক চিত্রটি যুক্ত করা হলো।

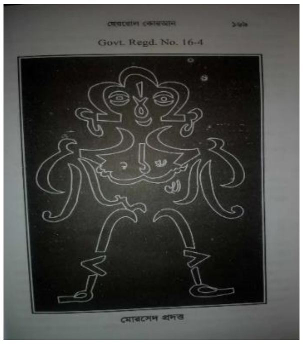

চিত্র-১৪ : মো. মনছুর আলী রচিত 'ছের্‌রোল কোরআন বা আকাশ বাণী' গ্রন্থের ১৬৯ পৃষ্ঠা থেকে ছবিটি সংগৃহীত।

বিচারগানের আদমতত্ত্ব-দেহতত্ত্ব পালাটিতে ধর্মনির্ভর যে বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের সাথে তার অনেক কিছুই মিলে না। আর যদি মিলেও সেটা অনেকাংশেই পরক্ষ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে সংযোগ স্থাপন করতে হয়। ফোকলোরের গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান হচ্ছে লোকধর্ম। সুতরাং আদমতত্ত্ব-দেহতত্ত্ব পালার অনেক কিছুকেই লোকধর্ম হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে। কিংবা বিষয়টি একজন নাট্যগবেষকের নিকট অজ্ঞাত জ্ঞান হতে পারে। বিষয়টি যা হোক এটি যে বিচারগানের একটি পালাকে সমৃদ্ধ করেছে তাতে সন্দেহ নেই।

আদমতত্ত্ব-নবিতত্ত্ব পালা

বিচারগানের আদম, হাওয়া, মুহাম্মদ, নবি ও শয়তান সংক্রান্ত পালাগুলোর মধ্যে আদমতত্ত্ব-নবিতত্ত্ব পালাটি অত্যন্ত গভীর বিশ্লেষনাত্মক ও কঠিন পালা। এই পালাটি সাধারণত বিচারগানের বিজ্ঞ দর্শক-শ্রোতারাই বেশি পছন্দ করেন। এই পালাটিতে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সকল শক্তির আধার ও বিকাশ নিয়ে আলোচনা করা হয়। পালায় আদমতত্ত্বে আল্লাহ থেকে শুরু করে সকল সৃষ্টির সৃষ্টিতত্ত্বসহ মানব জাতি ও নবি-রাসুল সম্পর্কে বিস্তর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে গায়েনগণ অভিনয় করে থাকেন। এই পালাটিতে আদম, হাওয়া, মুহাম্মদ, নবি ও শয়তান সংক্রান্ত প্রায় সকল বিষয়ই আলোচিত হয়। এই বিষয়সমূহের পালাগুলো যেহেতু বিষয়বস্তুর দিক থেকে খুব কাছাকাছি সেহেতু যে কোনো পালা নিয়ে আলোচনা করতে গেলেই অন্য পালাগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। যাহোক, আদমতত্ত্ব-নবিতত্ত্ব পালাটিতেও সেমিটিক ধর্ম তথা ইসলামধর্মের প্রথম নবি ও মানুষ হযরত আদম (আ.) ও সর্বশেষ নবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সৃষ্টি ও তাদের জীবনী নিয়ে গায়েনগণ আসরে আলোচনা করে থাকেন। পালাটি যেহেতু ইসলামধর্ম মতে দুজন মহাপুরুষকে নিয়ে পরিবেশিত হয়, সেহেতু ধর্মবিশ্বাসী মানুষের নিকট পালাটি বেশ গ্রহণযোগ্য ও মূল্যবান হিসেবে গন্য হয়। তাছাড়া বিচারগান বাউল-সুফিবাদনির্ভর হওয়ায় পরিবেশনাসংশ্লিষ্ট লোকজনের নিকট আদমতত্ত্ব-নবিতত্ত্ব বিষয় দুটি খুবই পরিচিত ও চর্চিত বিষয়। বাংলাদেশের প্রায় সকল বাউল-সুফিকবিরা আদমতত্ত্ব ও নবিতত্ত্বকে উপজীব্য করে গান রচনা করেছেন। বিশেষ করে কালজয়ী বাউলকবি লালন সাঁই থেকে শুরু করে দেওয়ান আব্দুর রশিদ চিশতি, জালাল উদ্দীন খাঁ, খালেক দেওয়ান, মালেক দেওয়ান, রজ্জব আলী দেওয়ান, কাজী বেনজীর হক চিশতি, মাতালকবি রাজ্জাক দেওয়ান, আব্দুর রশিদ সরকার, বড় আবুল সরকার, ছোট আবুল সরকার, পাঞ্জু শাহ, গওহার শাহ, আজিজ শাহ প্রমুখের রচনায় আদমতত্ত্ব ও নবিতত্ত্বের গান পাওয়া যায়। বিশেষ করে বিচারগানের আসরে বাউলকবি লালন সাঁই ও সুফিকবি দেওয়ান আব্দুর রশিদের গান আদমতত্ত্ব-নবিতত্ত্ব পালায় অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে গায়েনগণ গেয়ে থাকেন। দেওয়ান আব্দুর রশিদ চিশতি রচিত এ রকম বহুল পরিবেশিত একটি গান রয়েছে, গানটি হচ্ছে-

দিন থাকিতে মনে মানুষে ধর,
এই কালেবে আল্লা, আদম নবী সবুদ কর।
আল্লার নূরেতে নবী, তাঁর নূরেতে আদম সফি,
দেখবি যদি নূর তাজল্যা, চেতন মানুষ ধর,
সেই নূরেতে জগৎ ঘেরা যদি চিনতে পার,
নূর সাধিলে নিরাঞ্জনকে, চিনা যাবে তার। (দেওয়ান রশিদ, ১৯৮৪ : ৪৮-৪৯)[২৪]

গানটিতে আল্লাহ, আদম ও নবি মুহাম্মদ সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে, তা শরিয়তি-ইসলামের সাথে একেবারেই সম্পর্ক নেই। গানে বলা হয়েছে, মানুষের মাঝে তথা মানুষের অন্তরেই আল্লাহ, আদম ও নবি মুহাম্মদ নামক তিন শক্তির তিন আধার রয়েছে। যা চেনার জন্য, বোঝার জন্য একজন সিদ্ধগুরুর নিকট আত্মসর্মপণ করার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ আদমতত্ত্ব-নবিতত্ত্ব পালাটিতে মূলত নিজকে চেনার কথাই বলা হয়েছে। যাহোক বিচারগানের আসরে যেহেতু এই পালাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ পালা হিসেবে বিবেচিত হয়, সেহেতু পালাটি যেমন জনপ্রিয় তেমনি ব্যাপক প্রচলিতও বটে। পালাটিতে বিচারগানের বিজ্ঞগায়েনরাই বেশি অভিনয় করে থাকেন। বর্তমানে পালাটিতে অংশগ্রহণ করে বিশেষভাবে পরিচিত গায়েনরা হচ্ছেন, বড় আবুল সরকার, ছোট আবুল সরকার, ফকির আবুল সরকার, সুনীল কর্মকার, সুশীল সরকার, কার্তিক সরকার, তারাবালী দেওয়ান, সালাম সরকার, হুমায়ুন সরকার, শরিয়ত সরকার, রুমা সরকার, আলেয়া বেগম, মুক্তা সরকার, আকলিমা বেগম, কাজল দেওয়ান, মিরাজ দেওয়ান, আক্কাস দেওয়ান, নেওয়াজ দেওয়ান, আলমাছ সরকার, সাত্তার সরকার, আনোয়ার দেওয়ান, ফরহাদ সরকার প্রমুখ। পালাটি গুরুবাদী-তরিকপন্থীদের নিকট খুবই গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় দেশের প্রায় সমগ্র অঞ্চলেই পালাটি পরিবেশিত হয়ে থাকে। তবে পালাটি বেশ নিগূঢ়তত্ত্বরিনর্ভর হওয়াতে একেবারে সাধারণ দর্শক-শ্রোতার জন্য বোধগম্য হয় না। এজন্য দেখা যায় সচরাচর সব আসরে পালাটি পরিবেশিত হয় না। আদমতত্ত্ব-নবিতত্ত্ব পালাটি প্রধানত পির-গোঁসাইদের বাড়ি ও মাজারপ্রাঙ্গণে ওরশ মাহফিল উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। পালাটির সমৃদ্ধ বিষয় যেমন দর্শক-শ্রোতার নিকট গ্রহণযোগ্য করেছে, তেমনি বিচারগানকেও বিচিত্র্যময় করেছে।

নবিতত্ত্ব-মেরাজতত্ত্ব পালা

এই পালাটিতে ইসলামধর্ম মতানুসারে, আল্লাহর প্রেরিত পুরষ যারা ধর্মের বাণী প্রচার ও মানুষের পারলৌকিক মুক্তির পথ দেখায় সেই নবিদের পক্ষ নিয়ে পালা পরিবেশিত হয়। আরেক পক্ষ আল্লাহর সাথে নবি মুহাম্মাদ (স.)-এর মিরাজ বা সাক্ষাৎ সম্পর্কিত বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে গায়েনগণ তুলনামূলক আলোচনা করে থাকেন। অভিসন্দর্ভে ইতোমধ্যেই আদম, হাওয়া, মুহাম্মদ, নবি ও শয়তান সংক্রান্ত পালাগুলোর মধ্যে নবিতত্ত্ব সম্পর্কে

আলোচনা করা হয়েছে, তাই এ পর্যায়ে মেরাজতত্ত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। ইসলামধর্মের বিশ্বাস অনুযায়ী বিধাতা 'আল্লাহ' ও বিধাতার প্রেরিত পুরুষ নবি মুহাম্মদ (স.)-এর মধ্যকার সাক্ষাতের ঘটনাকে মেরাজ বলে। মেরাজ অর্থ ঊর্ধ্বগমন। হযরত মুহাম্মদ (স.) ইসলামধর্মের বিধাতা আল্লাহর অনুগ্রহে বার্তাবাহক ফেরেস্তা হযরত জিবরাইল (আ.) ও হযরত মিকাইল (আ.)-এর সাথে বোরাক নামক বাহনে চড়ে সপ্তআকাশ ভেদ করে ঊর্ধ্ব-আকাশে অবস্থিত জান্নাত-জাহান্নামসহ পারলৌকিক বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেন এবং আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করেন। এই পুরো ঘটনাটি বিশ্বাসী মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন। যদিও পুরো ঘটনাটি বস্তুনিষ্ঠ মানুষের নিকট আজও প্রশ্নবিদ্ধ হয়। আর এই মেরাজের ঘটনা লোকধর্মে এসে নানাভাবে কল্পনার সংমিশ্রণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিচারগানে মেরাজতত্ত্ব যেভাবে আলোচনা করা হয় তা নিঃসন্দেহে লোকধর্মের একটি রূপ মাত্র। এছাড়া মেরাজতত্ত্ব বাংলা অঞ্চলে গুরুবাদী ধারার লোকজনের নিকট বিশেষায়িত একটি বিষয়। বাউল-সুফিরা মেরাজকে তাদের মতো করে ব্যাখ্যা করে থাকেন। অর্থাৎ বাউল-সুফিদের মেরাজতত্ত্বের সাথে শরিয়তি-ইসলামের সাথে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। বাউল-সুফিরা মনে করেন প্রত্যেক মানুষেরই এই পৃথিবীতে মেরাজ হওয়া সম্ভব। বিচারগানের কিংবদন্তি গায়ক আব্দুর রশিদ সরকার নবিতত্ত্ব-মেরাজতত্ত্ব পালার একটি পরিবেশনায় বাউলকবি নূর মেহেদী আব্দুর রহমানের গানের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, নবি মুহাম্মদ (স.) মূলত তাঁর দেহের মধ্যকার সপ্তআসমান ভেদ করে মানবীয় জান্নাতকে পরিদর্শন করে খোদাকে দর্শন করেছেন। মেরাজের এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বিভিন্ন বাউলকবিদের গানেও পাওয়া যায়। বিশেষ করে ফকির লালন সাঁইয়ের গানেও মেরাজের প্রসঙ্গ রয়েছে। তাঁর একটি গানের শেষ অন্তরায় মেরাজ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

> আচ্ছালাতুল মেরাজুল মোমেনীনা
> জানো সেই নামাজের বেনা
> বিশ্বাসীদের দেখাশোনা
> লালন কয় এই জীবনে ॥ (মোবারক, ২০০৭ : ৪৭৪)

এইগানটির মধ্যেও লালন সাঁই জাগতিক জীবনে গুরুভজন ও দেহসাধনের মাধ্যমে মানুষের মেরাজ সম্ভব সে কথাই বলেছেন। মূলত বিচারগানের গায়েনগণ বিশ্বাস করেন প্রত্যেক মানুষই আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে বিধাতার দর্শন লাভ করতে পারেন। নবিতত্ত্ব-মেরাজতত্ত্ব পালায় এই বিষয়গুলোই গায়েনগণ আলোচনা করে থাকেন। পালাটিতে মেরাজ সম্পর্কে কতগুলো প্রশ্ন করা হয়, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- নবি মুহাম্মদ (স.) কত বছর বয়সে মেরাজে গিয়েছিলেন? মেরাজের ব্যাপ্তিকাল কত বছর ছিলো? মেরাজে যাওয়ার সময় নবির বাহন কী ছিলো? নবি মেরাজে গিয়ে কী কী দেখেছিলেন? নবি মেরাজে যাওয়ার পথে কোন কোন নবির দেখা পেয়েছিলেন? নবি মেরাজ থেকে তাঁর অনুসারীদের জন্য কী কী নিয়ে এসেছিলেন? এই প্রশ্নগুলো ছাড়াও পালায় প্রাসঙ্গিক আরও অনেক প্রশ্ন গায়েনগণ

করেন। মেরাজতত্ত্বের এই বিষয়গুলো আসরে আলোচনার পাশাপাশি গায়েনগণ নবিতত্ত্বের বিষয়াদি আলোচনা করে থাকেন। পালাটি বেশ নিগূঢ়তত্ত্বনির্ভর হওয়ায় দর্শক-শ্রোতার নিকট অত্যন্ত মূল্যবান হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। পালাটিতে নবি মুহাম্মদ (স.)-এর এই ঊর্ধ্ব-আকাশে গমনের গল্পটি বিভিন্নভাবে আলোচিত হওয়ায় দর্শক-শ্রোতা বিশ্বাস করে মুগ্ধতায় রোমাঞ্চিত হয়। ফোকলোরের এই পৌরাণিক-ধর্মীয় আখ্যানগুলো বিচারগানে নিজস্ব আঙ্গিকে চর্চিত হয়, যা বাংলাদেশের ফোকলোরকেই সমৃদ্ধ করেছে।

চিত্র-১৫ : হায়াতুন্নবি-ওফায়াতুন্নবি পালার অডিও ক্যাসেটের প্রচ্ছদে (বাম থেকে) লাল মিয়া বয়াতি ও মাখন দেওয়ান।

হায়াতুন্নবি-ওফায়াতুন্নবি পালা

নবি মুহাম্মদ (স.) প্রবর্তিত ইসলামধর্ম কালক্রমে মতবিরোধের কারণে বহু সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে গেছে। এই মতবিরোধের নেপথ্যে রয়েছে ইসলামধর্মের ধর্মগ্রন্থ কোরান শরিফ ও হাদিসে বর্ণিত বিভিন্ন বিষয়াদির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পার্থক্য। এই ধর্মের বিভিন্ন তাত্ত্বিক বিভিন্ন রকম মতপোষণ করায় তৈরি হয়েছে বিশ্বাসের স্বাতন্ত্রতা। যেমন কোনো ইসলামধর্মের এক সম্প্রদায় বিশ্বাস করেন, নবি মুহাম্মদ (স.) মারা গেছেন। আবার কোনো কোনো সম্প্রদায় বিশ্বাস করেন তিনি মারা যান নি। নবি (স.) এখনো 'সূক্ষ্ম' অবস্থায় জীবিত আছেন। আবার কোনো কোনো সম্প্রদায় বিশ্বাস করেন নবি (স.) একই সঙ্গে জীবিত ও মৃত। তিনি সাধারণ মানুষের মতো মারা যাননি, তিনি কেবল লোকচক্ষুর আড়ালে পর্দা নিয়েছেন মাত্র। অর্থাৎ নবি মুহাম্মদ (স.) জীবিত নাকি মৃত এই বিষয়টি মুসলিম জাতির মধ্যে বহুপাক্ষিক যুক্তি-তর্কে বহু সম্প্রাদয়ের সৃষ্টি করেছে। যাতে রয়েছে আবার মারফতি বা গোপনীয় নানান তত্ত্বকথা। আর এই বিষয়গুলো নিয়েই গায়েনগণ যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে হায়াতুন্নবি-ওফায়াতুন্নবি পালাটি পরিবেশিত হয়। সহজ কথায় বলতে গেলে, হায়াতুন্নবি-ওফায়াতুন্নবি পালায় নবি মুহাম্মদ (স.) সাধারণ মানুষের মতো মারা গেছেন নাকি তিনি শ্বাশত জীবিত এই দুটি বিষয় নিয়ে দুই গায়েন প্রতিযোগিতা করে থাকেন। যাহোক, বিচারগানের আসরে পরিবেশিত পালাগুলোর মধ্যে যতগুলো কঠিন পালা রয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম কঠিন একটি

পালা হচ্ছে হায়াতুন্নবি-ওফায়াতুন্নবি পালা। পালাটির এক আসরে বিচারগানের গায়েন মাখন দেওয়ান মত প্রকাশ করেন হায়াতুন্নবি-ওফায়াতুন্নবি পালাটি একটি পালা। পালায় নবি মুহাম্মদ (স.)-এর জাগতিক জীবন নিয়ে যেমন আলোচনা করা হয়, তেমনি তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন নিয়েও আলোচনা করা হয়ে থাকে। গায়েনগণ পালায় নবি মুহাম্মদ (স.)-এর জীবদ্দশায় নানান ঘটনার পাশাপাশি তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা কেন্দ্রিক নানা রকম প্রশ্ন করে থাকেন। তাছাড়া নবি বলতে শুধু নবি মুহাম্মদ (স.)-কে বুঝায় না, এর গভীরতম ব্যাখ্যাও বিচারগানের আসরে আলোচিত হয়। প্রয়াত গায়েন মাখন দেওয়ান ও গায়েন লাল মিয়া বয়াতি পরিবেশিত হায়াতুন্নবি-ওফায়াতুন্নবি পালার পরিবেশনা থেকে জানা গেছে, মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে ‘আন্‌ফাস’ বা বাতাস-এ নবি মিশে মানুষের দেহে যাতায়াত করে। অর্থাৎ এই নবির আধ্যাত্মিকতা সুগভীর। নবি যে ‘আন্‌ফাস’ বা বাতাস-এ মিশে থাকে সে সম্পর্কে সুফিকবি হযরত সৈয়দ গওহার আলী চিশতির একটি চমৎকার গান রয়েছে, যেটি বিচারগানের আসরে গাওয়া হয়ে থাকে। গানটি হচ্ছে-

> আন্‌ফাসে মিশিয়া উরুজ, নজুলে আসে,
> নবি রয় আন্‌ফাসে মিশে ॥
> যদি নবি দেখতে কর বাসনা,
> তুমি মামহুদা নগরে গেলে পাইবা ঠিকানা,
> সে যে নুর সিতারায় ঝলক মারে,
> কাপ-কাওছিনে সে ॥ (গওহার, ২০০১)[২৫]

এই গানটির যে পঙক্তিসমূহ তাতে বুঝানো হয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যে জন্মগ্রহণকারী নবিই কেবল নবি নয় প্রতি মানুষের দেহের মাঝেও নবি রয়েছে। সেই নবির সন্ধান জানে কেবল আধ্যাত্মিক জ্ঞানে জ্ঞানী মানুষ। অর্থাৎ বিচারগানের অন্যান্য পালার মতোই এই পালার বিষয়বস্তুরও রয়েছে বিকল্পধারার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। আর এই ব্যাখ্যায় স্বাভাবিকভাবেই বাংলা অঞ্চলের বাউল-সুফিদর্শনের স্পষ্ট চিহ্ন পাওয়া যায়। সর্বোপরি বিচারগানের আসরে বহু বিষয়ের সম্মিলন ঘটার কারণেই পরিবেশনাটি এত বৈচিত্র্যময় হয়েছে।

নবি-সাহাবা পালা

ইসলামধর্ম বিশ্লেষণাত্মক পালাসমূহের মধ্যে অন্তভূক্ত করা হয়েছে এমন আরেকটি পালা হচ্ছে নবি-সাহাবা পালা। এ পালাটি বিচারগানের আসরে খুব বেশি প্রচলিত ও প্রদর্শিত না হলেও বিচারগানের কুশীলব ও দর্শক-শ্রোতাদের নিকট নবি-সাহাবা পালাটি খুবই ভাব-গাম্ভীর্যপূর্ণ একটি পালা হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। এই পালায় মূলত ইসলামধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (স.) ও তাঁর জীবদ্দশায় অনুসারী বা সাহাবাদের নিয়ে আলোচনা করা হয়ে

থাকে। যেখানে নবির জীবন ও কর্ম এবং সাহাবাদের জীবন ও কর্মের ওপর নানা রকম ঐতিহাসিক-দালিলিক আলোচনা করেন গায়েনগণ। গায়েনদের প্রধান উদ্দেশ্য থাকে দর্শক-শ্রোতাদের মাঝে নবি মুহাম্মদ (স.) ও তাঁর সাহাবাদের শিক্ষা প্রচার করা। এই পালাটিতে সাহাবাদের প্রশংসার পাশাপাশি কিছু সমালোচনাও করা হয়। বিশেষ করে নবি মুহাম্মদ (স.)-এর মৃত্যুর পর কোনো কোনো সাহাবার কর্মকাণ্ডকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়। তবে হযরত আলি (রা.)-এর মহানুভবতা ও তাঁর আধ্যাত্মিকতার সর্বোচ্চ প্রশংসা করা হয়ে থাকে। কারণ বিচারগানের কুশীলব-দর্শক-শ্রোতা ও এই পরিবেশনার পৃষ্ঠপোষকগণ হযরত আলি (রা.)-কে নবি মুহাম্মদ (স.)-এর পরে আধ্যাত্মিক দর্শনের শীর্ষ গুরু মান্য করেন। এ জন্য নবির সাহাবা হযরত আলি (রা.)-কে নিয়ে বহুগানও রচনা করেন বিচারগানের গায়েনগণ।

এছাড়া পালাটিতে বিষয়ভিত্তিক বহুগান গায়েনগণ পরিবেশন করে থাকেন। বিশেষ করে বাউল-সুফিদের আধ্যাত্মিক বিশ্বাস অনুসারে নবিতত্ত্বের ওপর রচিত গানগুলো পালাটিতে বেশি পরিবেশিত হয়। বিশেষ করে বিচারগানের কিংবদন্তি গায়েন মাতালকবি রাজ্জাক দেওয়ান রচিত গানগুলোতে নবি ও সাহাবাদের জীবনচরিত ফুটে উঠেছে। তাঁর রচিত নবি-সাহাবা সম্পর্কিত এ রকম একটি গান হচ্ছে-

> কে এলো কে এলো মা,
> আমিনার কোলে
> আঁধার কাটিয়া মরু ছেদিয়া
> শান্তি সুধা ঝরনা বইয়া ধরা তলে ॥
> আরশ কুরছি লৌহ কলম ধোয়ায় যাহার পা
> ধন্য পিতা আব্দুল্লা মাতা আমিনা
> নিয়া পাক পাঞ্জাতন এলো গোল বদন
> পাহাড় পর্বত সাগর নদী ঐ নামে দোলে ॥ (তপন, ২০২২ : ৫০)[২৬]

গানটিতে নবি-সাহাবা পালার বিষয়বস্তুর সফল প্রয়োগ ঘটেছে। কেননা এই গানে নবি মুহাম্মদ (স.)-এর প্রসঙ্গ যেমন রয়েছে, তেমনি তাঁর অনুসারী সাহাবীদেরও নাম উল্লেখিত হয়েছে। গানের মূল বিষয় অবশ্য নবি মুহাম্মদ (স.)-এর স্তুতি। নবি-সাহাবা পালাটিতে গায়েনগণ অন্যান্য পালাগুলোর মতোই দ্বিপাক্ষিক প্রতিযোগিতা করে থাকেন। যেখানে বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন ও উত্তরের বিষয়গুলো থাকে। পালায় নবি মুহাম্মদ (স.) ও তাঁর সাহাবীদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবননির্ভর বিভিন্ন প্রশ্ন-উত্তরের অবতারণা করা হয়। মূলত পালাটিতে নবি ও সাহাবীদের জীবন ও কর্ম আলোচনার মাধ্যমে গায়েনগণ দর্শক-শ্রোতাদের মহানুভবতার শিক্ষা দেন। আর আসরে পালার বিষয়বস্তুর কারণে দর্শক-শ্রোতা একাগ্রচিত্তে গায়েনদের পরিবেশনা উপভোগ করেন।

যাহোক, ইসলামধর্ম বিশ্লেষণাত্মক পালার আদম, হাওয়া, মুহাম্মদ, নবি ও শয়তান সংক্রান্ত পালাসমূহের দশটি পালা (আদম-হাওয়া, আদম-শয়তান, আদি আদম-বনি আদম, আদি আদম-বিশ্বনবি, আদম সৃষ্টি-নুর সৃষ্টি, আদমতত্ত্ব-দেহতত্ত্ব, আদমতত্ত্ব-নবিতত্ত্ব, নবিতত্ত্ব-মেরাজতত্ত্ব, হায়াতুন্নবি-ওফায়াতুন্নবি ও নবি-সাহাবা পালা) ইসলামধর্ম সম্পর্কিত হলেও অন্যান্য ধর্মের বিষয়াদি উদাহরণ-উপমা হিসেবে চলে আসে। বিশেষ করে খ্রিস্টধর্মের প্রবর্তক ও ইসলামধর্মের নবি ঈসা (আ.) বা যিশু খ্রিস্ট্রের কথা যেমন আলোচিত হয়, তেমনই হিন্দুধর্মের অবতার শ্রীকৃষ্ণসহ সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়। তার উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ইসলামধর্ম মতানুসারে সৃষ্টিতত্ত্ব যখন বিশ্লেষণ করা হয়, তখন প্রায়ই হিন্দুধর্মের সৃষ্টিতত্ত্বের কথাও উচ্চারিত হয়। বিচারগানের গায়েনগণ ইসলামধর্মের সৃষ্টিতত্ত্ব বা আল্লাহ, মুহাম্মাদ ও আদম সম্পর্কে আলোচনা কালে প্রায়ই একটি তত্ত্ব বলেন, সেটি হচ্ছে- 'আল্লাহ-মুহাম্মদ-আদম তিনজনা এক দম।' ঠিক সাথে সাথেই গায়েনগণ বলে থাকেন, হিন্দুধর্মে ঠিক তেমনই 'ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব তিনজনায় এক জীব।' গায়েনদের ভাষ্য মতে, ইসলামধর্ম ও হিন্দুধর্মের উৎপত্তি ও সৃষ্টিতত্ত্বের কথা একই কেবল প্রকাশ ও আচার ভিন্ন। প্রকৃতপক্ষে বিচারগানের প্রতিটি পালাতেই ধর্মনিরপেক্ষতার বাণী প্রচারিত হয়।

চিত্র-১৬ : আদমতত্ত্ব-দেহতত্ত্ব পালায় বড় আবুল সরকার ও শাহ আলম সরকার।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আত্মীয় সম্পর্কিত পালাসমূহ

লোকনাটক বিচারগানের বিষয়ের ক্ষেত্রে আত্মীয় সম্পর্কিত পালাসমূহ ভিন্ন বৈচিত্র্যে পরিবেশনারটির দর্শক-শ্রোতার নিকট ধরা দেয়। ধর্ম বিশ্লেষণাত্মক পালাসমূহে যেমন ধর্মীয় তত্ত্বীয় ও আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। পক্ষান্তরে বিচারগানের আত্মীয় সম্পর্কিত পালাসমূহে অনেক বেশি মানবিক গুণাবলি, মানুষে মানুষে সম্পর্ক ও কর্তব্যের বিষয়গুলো বেশি আলোচিত হয়ে থাকে। তবে এ পালাগুলোতে তত্ত্ব ও তর্কের প্রয়োজনে ধর্মীয় প্রসঙ্গ চলে আসে। আত্মীয় সম্পর্কিত পালাসমূহে আটটি পালা অন্তভূক্ত করা যায়, সেগুলো হচ্ছে- নারী-পুরুষ, বাবা-মা, বাবা-ছেলে, বাবা-মেয়ে, মা-ছেলে, মা-মেয়ে, ভাই-ভাই ও মামী ভাগিনা পালা। এই পালাগুলো মূলত বৈবাহিক ও রক্তীয় সম্পর্কের হয়ে থাকে। তবে নারী-পুরুষ পালাটি সামগ্রিকভাবে মানব জাতির দুটি প্রজাতি নর-নারীর মধ্যকার সৌহার্দ ও দ্বান্দ্বিকতাসহ নানান বিষয় আলোচিত হয়। নিচে আত্মীয় সম্পর্কিত পালাসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হলো।

নারী-পুরুষ পালা

বিচারগানের নারী-পুরুষ পালাটি একটি চমকপ্রদ বিষয়। পালাটিতে সমাজ বিশ্লেষণাত্মক বিষয়কে আশ্রয় করে নারী-পুরুষের পক্ষ নিয়ে গায়েনদ্বয় প্রতিযোগিতা করে থাকেন। কিন্তু পালায় গায়েনগণ যে সকল প্রশ্ন করেন তার মধ্যে যেমন সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নারী নাকি পুরুষ শ্রেষ্ঠ তা নিয়ে প্রশ্ন করা হয়, তেমনি ধর্মীয় বিষয়ে নারী-পুরুষের বড়ত্বের বাহাসও হয়। এক্ষেত্রে আন্তঃধর্মীয় নানা কাহিনিনির্ভর প্রশ্ন-উত্তরের চ্যালেঞ্জ করেন একে-অপরের প্রতি গায়েনদ্বয়। গায়েনগণ কোরান, হাদিস, গীতা, মহাভারত, রামায়ণ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও বাইবেলে বর্ণিত যে সকল চরিত্রের মধ্যে নারী-পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব পাওয়া যায়, সে সম্পর্কে ‘প্যাঁচ’ দিয়ে প্রশ্ন করেন। এই প্রশ্নগুলোর মধ্যে কিছু সাধারণ ও নির্দিষ্ট প্রশ্ন রয়েছে। যেমন-

ক. বিনা অপরাধে সীতাকে রাম কেন বনবাসে দিলো?

খ. কৃষ্ণ যদি এতই বড় হবে, তবে কৃষ্ণের নাম কেন রাধার পায়ের তালুতে লিখেছিলো?

গ. পুরুষ যদি খারাপই না হবে, তবে কেন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করেছিলো?

ঘ. নারী যদি বড় না হবে, কোন কারণে তবে মা কালীর পায়ের নিচে মহাদেব থাকে?

ঙ. পুরুষ যদি বড় না হবে, তবে আদমের বাম পাঁজরের হাঁড় থেকে কেন হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

চ. নারী যদি ছলনাময়ী তার প্রমাণ হাওয়ার কারণেই আদম গন্ধম ফল খেয়ে বেহেস্ত থেকে বিতারিত হয়েছে, তাই নয় কী?

ছ. হযরত হাসান (রা.)-এর বিষপানে মৃত্যুতে দায়ী নারী, তাই নয় কী?

উপরি উক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও নারী ও পুরুষের দৈহিক, জৈবিক ও সামাজিকসহ বিভিন্ন অবস্থানের ভিত্তিতেও নারী বা পুরুষের পক্ষাবলম্বনকারী গায়েনগণ নিজেকে শ্রেষ্ঠ দাবি করে একে অপরকে চ্যালেঞ্জ করেন। দৈহিকভাবে সুবিধা, অসুবিধা বা প্রতিবন্ধকতার নানান দিকের খুটিনাটির খুঁত ধরে নিজেকে শ্রেষ্ঠ দাবি করে থাকেন গায়েনগণ। সাধারণত দেখা যায়, পুরুষ গায়েন যৌনতায় বা সঙ্গমে নিজেকে কর্তৃত্বপরায়ণতার কথা উল্লেখ করেন, তেমনি নারীকে 'খোঁটা' দেয় তার মাসিককে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে আখ্যায়িত করে। অন্যদিকে নারী গায়েন নিজের গর্ভধারণ ও সন্তান জন্মদানেরর ক্ষমতাকে বিশেষ যোগ্যতা হিসেবে উল্লেখ করে নিজেকে পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দাবি করেন। পুরুষ কর্তৃক নারীর ভরণপোষণকে এক ধরণের দাসত্বের সাথে তুলনা করে পুরুষ গায়েন নারী গায়েনকে বিদ্রুপ করে থাকেন। এছাড়া সামাজিকভাবে পুরুষ ক্ষমতার শীর্ষে এমনটাই বড়াই করেন পুরুষ পক্ষের গায়েন। নারী পক্ষের গায়েনও যুক্তিতে পিছিয়ে থাকেন না। বাংলাদেশসহ বিশ্বের নানান দেশের বর্তমান নারীদের ক্ষমতায়নকে ইঙ্গিত করে নিজেকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে উপস্থান করেন নারী পক্ষের গায়েন। বিচারগানের নারী-পুরুষের এই দ্বিপাক্ষিক লড়াইয়ের চমকপ্রদ ও তুমুল জনপ্রিয় একটি অডিও ক্যাসেট রয়েছে, আব্দুর রশিদ সরকার ও মমতাজ বেগমের পরিবেশনায় রের্কডকৃত। এক সময় এই অডিও ক্যাসেটটি গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে বাজতো। অডিও ক্যাসেটটির পরিবেশনাতে বিচারগানের বিষয় বৈচিত্র্যের অনন্যতা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। পালাটিতে আব্দুর রশিদ সরকার পালায় জেতার জন্য বিপক্ষের বিষয় নারীদেরকে কথার যুক্তির পাশাপাশি গানের ভাষাও হেয়পতিপন্ন করেন। এই পালায় পরিবেশিত পুরুষপক্ষের একটি গান হচ্ছে-

(ওরে) না খাওয়াইয়া খাওয়ায় দেইখা তাইতে একটু আদর করি,
মেয়ের দল পোষা বেড়াল রয় চিরকাল স্বামীর বাড়ি ॥
(আরে) মেয়ের লোকের জাতের ধারা,
তারা সময় পাইলে বেড়ায় পাড়া,
গোপন কথা শুনতে তারা ইচ্ছুক ভারি,
শোনা মাত্র নয় বাড়ি ছড়াইয়া দিব ছেড়ি কিংবা থাকুক বুড়ি ॥ (রশিদ, ১৯৯৫ : পরিবেশনা)[২৭]

গানটিতে নারীদের পদে পদে ভুল ধরা হয়েছে। গানে নারীদের বিদ্রুপ করে পোষা বিড়াল হিসেবে ঠাট্টা করা হয়েছে। তবে এই গানের জবাবে নারীপক্ষের গায়েন মমতাজ বেগমও পুরুষদের বিদ্রুপাত্মক কথা বলেছেন। রশিদ সরকার যেমন নারীদের পোষা বিড়াল বলেছেন, তেমনি মমতাজ বেগম পুরুষদের নারীর চাকর বলে কটাক্ষ করেছেন। পালায় মমতাজ বেগমও গানে গানে পুরুষ পক্ষকে খোঁটা দিয়ে কথা বলেছেন। তাঁর পরিবেশিত গানগুলোর মধ্যে মাতালকবি রাজ্জাক দেওয়ান রচিত একটি গান রয়েছে। মমতাজ বেগম পরিবেশিত গানের কথার সাথে অবশ্য

মাতালকবি রাজ্জাক দেওয়ানের গানের বই 'মাতাল রাজ্জাক গীতিমালা'য় প্রকাশিত গানের সাথে কথার বেশ পার্থক্য লক্ষ্য করা গেছে। তাই বই থেকে গানটির একটি অন্তরা নিচে দেয়া হলো। এই অন্তরার মধ্যেই নারীর কাছে পুরুষের অসহায়ত্বের চিত্র বর্ণিত হয়েছে।

কত পুরুষ ছাগল-ভেড়া মাইয়ার কাছে পড়ছে ধরা
হইয়া সকল দিশাহারা খায় ঘোলা পানি
মাতাল রাজ্জাকে কয় নোনা জলে খাল বাকলা থাকে নি
ঐ রূপ সাগরে নাইতে গিয়া বাবুল তুই খাইলি চুবানি ॥ (তপন, ২০২২ : ৩৭২)

মমতাজ বেগম ও আব্দুর রশিদ সরকার পরিবেশিত এই পালাটির চুম্বক অংশ অভিসন্দর্ভের পরিশিষ্টে দেয়া হয়েছে, যাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় নারী-পুরুষ পালাটি যেন বিদ্রুপ আর খোঁটায় ভবপুর একটি পালা। মোদ্দাকথা হচ্ছে বিচারগানের বিষয়ভিত্তিক অন্যান্য পালার মতই নারী-পুরুষ পালায়ও গায়েনগণ গানে, কথায় ও তত্ত্বে একে অপরকে ঠকানোর চেষ্টা করে থাকেন। সেই সাথে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ দুটি চরিত্র নারী ও পুরুষের যাপিত জীবনের নানাদিক নিয়ে দুই গায়কের যৌক্তিক লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে বিচারগানের দর্শকগণ ভিন্ন বৈচিত্র্যের পালা উপভোগ করতে পারেন। যা বিচারগানকে বিষয় বৈচিত্র্যের দিক থেকে বেশ সমৃদ্ধ করেছে। এমনকি নারী-পুরুষ পালায় পরিবেশিত গানেও অন্যান্য পালার চেয়ে ভিন্ন আঙ্গিকের কথা, সুরের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। বিচারগানের পালাগুলোতে সাধারণত গুরুগম্ভীরতত্ত্বনির্ভর বিষয়াদি থাকে। তবে নারী-পুরুষ পালায় এসব তত্ত্বের পাশাপাশি চটুল কথা ও যুক্তি থাকে। যেখানে গানের মধ্যে বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে নারী বা পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করা হয়। মূলত নারী-পুরুষ পালাটি বিষয়বস্তুর কারণেই সারা বাংলাদেশে জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

চিত্র-১৭ : অডিও ক্যাসেটের প্রচ্ছদে বিচারগানের গায়েন আব্দুর রশিদ সরকার ও মমতাজ বেগম।

আত্মীয় সম্পর্কিত পালার বাবা, মা, ছেলে ও মেয়ে সংক্রান্ত পালাসমূহ

প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশনা লোকনাটক বিচারগানে যেমন ধর্মীয় বিষয় নিয়ে দ্বিপাক্ষিক লড়াই হয়, তেমনি মানুষের প্রাত্যহিক নানান বিষয় নিয়েও পাল্লা হয়ে থাকে। বিশেষ করে বিচারগানে কিছু পালা রয়েছে, যেগুলোতে মানুষের মধ্যকার আত্মীয়তার বন্ধনের গুরুত্ব ও পারস্পারিক অধিকার সম্পর্কে আলোচিত হয়। যাতে ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিশ্বাস-প্রথার ভিত্তিতে যুক্তি-তর্ক করেন গায়েনগণ। এই পালাগুলোকে 'আত্মীয় সম্পর্কিত পালা' হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। যার মধ্যে বাবা, মা, ছেলে ও মেয়ের পারস্পারিক সম্পর্ক কেন্দ্রীক পালা পরিবেশিত হয়। এ পালাগুলো হচ্ছে বাবা-মা, বাবা-ছেলে, বাবা-মেয়ে, মা-ছেলে ও মা-মেয়ে পালা। সাধারণত দেখা যায়, পালাগুলোতে আত্মীয়তা ও রক্তীয় বন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে একে-অন্যের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য কেমন হওয়া উচিত, কী করা উচিত এবং কী করা উচিত নয় সেই বিষয়গুলো আলোচিত হয়। এই আলোচনার যুক্তিকে শাণিত করতে বিভিন্ন ধর্মীয় তত্ত্ব ও পৌরাণিক কাহিনিকে আশ্রয় করা হয়। পালাগুলোর মূল প্রতিযোগিতা হয় একে-অপরের প্রতি কর্তব্য পালন ও অবহেলার অভিযোগ-অনুযোগের ওপর ভিত্তি করে। গায়েনদ্বয় নিজের পালার বিষয়কে প্রতিযোগিতায় বিজয়ী করতে কিছু সাধারণ যুক্তি দিয়ে থাকেন, সেগুলো হচ্ছে-

ক. মা গর্ভধারণ করে সন্তান জন্ম দেন, তাই মাপক্ষের গায়েন নিজেকে বড় দাবি করেন।

খ. পিতার বীর্যদানই প্রকৃতপক্ষে সন্তান জন্মদানের প্রধান শক্তি এমনটা যুক্তি দিয়ে বাবাপক্ষের গায়েন নিজেকে বড় দাবি করেন।

গ. বাবা-মা, ছেলে-মেয়েকে জন্ম দিয়ে লালন-পালন করে তাই সন্তানের ওপর বাবা-মায়ের বড়ত্ব দাবি করেন গায়েনগণ।

ঘ. মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত তাই সন্তানকে দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে কঠিন শাস্তির হুশিয়ারি দেন মাপক্ষের গায়েন।

ঙ. ছেলে-মেয়ে পক্ষের গায়েনগণ বাবা-মায়ের বিভিন্ন দোষ-ক্রুটি ধরাসহ বাবা-মা সন্তানের প্রতি দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন বলে অভিযোগ করে থাকেন।

উপরি উক্ত যুক্তি ও অভিযোগকে সুদৃঢ় করার জন্য কোরান, হাদিস ও রামায়ণে বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনাকে উদারহণ হিসেবে উপস্থাপন করে থাকেন। তার মধ্যে কোরানে বর্ণিত সুরা-বনী ইসরাঈরেলের ২৩-২৪ আয়াত, হাদিসে বর্ণিত বাবা-মায়ের প্রতি কর্তব্য সংক্রান্ত নির্দেশ এবং রামায়ণে বর্ণিত রামের প্রতি পিতার বনবাস সংক্রান্ত আদেশ পালন অন্যতম। এছাড়া হযরত ওয়ায়েস করনি (র.) ও বায়োজিত বোস্তামি (র.) এর মায়ের প্রতি খেদমতের দৃষ্টান্ত গায়েনগণ পালায় আলোচনা করেন। তবে বিচারগানের ধর্ম বিশ্লেষণাত্মক পালাগুলোর মত এই পালাগুলো দর্শক-

শ্রোতাদের নিকট এতটা জনপ্রিয় নয়। এমনকি আত্মীয় সম্পর্কিত পালাগুলো বিচারগানের প্রধান আয়োজকস্থল মাজার, মন্দির ও পির-গোঁসাইয়ের বাড়িতেও খুব বেশি পরিবেশিত হয় না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, বাবা, মা, ছেলে ও মেয়ে সংক্রান্ত পালাগুলো অডিও, ভিসিডি, সিডি ও বর্তমানে ইউটিউব কেন্দ্রিক মাধ্যমে পরিবেশিত হয়। এক্ষেত্রে অবশ্য পালাগুলোর বেশ জনপ্রিয়তা ও দর্শক-দর্শন রয়েছে।

বাবা-মা পালা

লোকনাটক বিচারগানের আত্মীয় সম্পর্কিত পালার বাবা, মা, ছেলে ও মেয়ে সংক্রান্ত পালাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে প্রচলিত ও জনপ্রিয় পালা হচ্ছে বাবা-মা পালা। এই পালায় বাবা ও মায়ের গুরুত্ব এবং তাদের প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী হওয়া উচিত সেই বিষয়গুলো নিয়ে গায়েনগণ আসরে প্রতিযোগিতা করে থাকেন। বাবা-মা পালাটিতে আলোচনার সুবিধার্থে আত্মীয় সম্পর্কিত পালার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করা হলেও এই পালাটির ধর্মীয় গুরুত্বও রয়েছে। কেননা পালাটিতে বাবা-মা সম্পর্কিত বহু আদেশ-উপদেশ ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আসরে আলোচিত হয়ে থাকে। এই পালাটিতে প্রধানত বাবাপক্ষে পুরুষ গায়েন ও মাপক্ষে নারী গায়েন অভিনয় করেন। তবে নারী-পুরুষ উভয় গায়েনই বাবা বা মায়ের ভূমিকায় অভিনয় করতে পারেন। পালায় গায়েনদ্বয় স্বপক্ষের পালাকে বিজয়ী করার জন্য কতগুলো সাধারণ যুক্তি উপস্থাপন করে থাকেন। যে যুক্তিগুলোর মধ্যে বাবা ও মায়ের মধ্যে কে বেশি সন্তানের জন্য ত্যাগ-তিতিক্ষা করেন সেই বিষয়গুলো তুলে ধরেন। বাবা-মা পালাটির বিপুল পরিবেশনা না থাকায় দেশের সব গায়েন এই পালায় অভিনয় করেন না। যারা করেন তারাও অনেকটা অনিয়মিতভাবে করে থাকেন। বাংলাদেশে ভিসিডি-সিডি আমলে বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছিলো আব্দুর রশিদ সরকার বনাম আলেয়া বেগমের ধারণকৃত বাবা-মা পালাটি। এই পালায় আব্দুর রশিদ সরকারের ভাষ্য মতে, তারা দুজনেই পালাটি প্রথম করেছেন। বর্তমানে অবশ্য বেশ কয়েকজন গায়ক বাবা-মা পালাটি করেন, তাদের মধ্যে বড় আবুল সরকার, লতিফ সরকার, শাহ আলম সরকার, ছোট রজ্জব আলী দেওয়ান, কাজল দেওয়ান, শেফালী সরকার ও লিপি সরকার প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। আসরে গায়েনগণ স্বপক্ষের পালা বাবা বা মায়ের গুরুত্বকে বড় করে উপস্থাপন করতে বাবা-মায়ের গুণকীর্তন করে চমৎকার-চমৎকার পরিবেশন করে থাকেন। বাবা ও মাপক্ষের দুটি গানের দুটি 'অন্তরা'-কে পর পর উল্লেখ করলে বোঝা যাবে কী রকম গানের মাধ্যমে পালাটিতে প্রতিযোগিতা করা হয়। মাপক্ষের গানের একটি অন্তরা হচ্ছে-

> যত রকম প্রেম-পিরিতি পৃথিবীতে রয়,
> সবচেয়ে উত্তম প্রেম মায়ের সাথেই হয়,
> সেই মায়েরে বড় হয়ে কেমনে ভুলে যাই ॥ (শেফালি, ১৯৯৯ : পরিবেশনা)

মাপক্ষের এই গানটির মতোই বাবাপক্ষের গানেও বাবার মহত্ব ও অবদান বর্ণিত হয়, যেমন-

যখন তুমি ছিলে বাবা কিবা মায়ের কোলে,
শিশু হতে কিশোর-কিশোরী মনে কী আর পড়ে,
বই-খাতা আর আহার দিতে কত কষ্ট বাবা করে ॥ (কাজল, ১৯৯৯ : পরিবেশনা)

পালার গানগুলোর মাধ্যমে গায়েনগণ যেমন বাবা ও মায়ের বড়ত্বের বর্ণনা করেন, তেমনি প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমেও বাবা ও মায়ের অবদানের বিষয়গুলো আসরে বর্ণিত হয়। বিশেষ করে পালাটিতে মায়ের বড়ত্বকে তুলে ধরতে গায়েনগণ সন্তান গর্ভধারণ ও জন্মদানের বিষয়গুলো উপস্থাপন করেন আর বাবার বড়ত্বকে তুলে ধরতে সন্তানের ভরণপোষনের বিষয়গুলো যুক্তিসহকারে আসরে উপস্থাপন করে থাকেন। তবে পালাটিতে সকল যুক্তি-তর্ক ও প্রতিযোগিতাকে ছাপিয়ে বাবা-মায়ের মহত্ব-বড়ত্বকেই গায়েনগণ বর্ণনা করেন। যার মাধ্যমে দর্শক-শ্রোতাকে বাবা-মায়ের প্রতি কর্তব্যপরায়ণ করতে চেষ্টা করেন গায়েনগণ। সর্বোপরি বাবা-মা পালাটির বিষয়বস্তু জীবনমুখী হওয়ায় এটিকে গুরুত্বপূর্ণ পালা হিসেবে অভিহিতি করা যায়।

চিত্র-১৮ : বিচারগানের গায়েন (বাম থেকে) আকলিমা বেগম, নীলা পাগলী ও শেফালী সরকার।

বাবা-ছেলে পালা

বাবা-ছেলে পালাটি লোকনাটক বিচারগানের আত্মীয় সম্পর্কিত পালাসমূহের মধ্যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পালা হিসেবে বিবেচিত হয়। এই পালাটি বিচারগানের আসরে রক্তীয় সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ বাবা ও ছেলের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে গায়েনগণ আলোচনা করে থাকেন। বিচারগানের অন্যান্য পালার মতোই এ পালাটিতেও দ্বিপাক্ষিক পদ্ধতিতে গায়েনদ্বয় আসরে প্রতিযোগিতা করেন। পালাটিকে আত্মীয় সম্পর্কিত পালাসমূহের মধ্যে আলোচনার সুবিধার্থে অন্তর্ভূক্ত করা হলেও এই পালায় ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ের প্রসঙ্গও আলোচিত হয়ে থাকে। বিশেষ করে গায়েনগণ ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বাবা ও ছেলের মধ্যকার সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত সে বিষয়গুলো ব্যাখা-বিশ্লেষণ করে থাকেন।

পালাটিতে আলোচনার বিষয়গুলোর মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হচ্ছে- বাবার প্রতি ছেলের দায়িত্ব ও কর্তব্য; ছেলের প্রতি বাবার দায়িত্ব ও কর্তব্য; বাবা ও ছেলের একে-অপরের প্রতি কেমন আচরণ করা উচিত; ছেলের প্রতি বাবায় অসন্তুষ্ট হলে পরকালে ছেলের কেমন শাস্তি হবে; ছেলের ভরণপোষণ না করলে বাবার কী শাস্তি হওয়া উচিত; বাবার ভরণপোষণ না করলে ছেলের কী শাস্তি হওয়া উচিত; মৃত্যুর পর বাবা ও ছেলের মধ্যকার সম্পর্ক কেমন হবে প্রভৃতি। মূলত গায়েনদ্বয় এই বিষয়গুলো নিয়েই পালাটিতে কথা ও গানের মাধ্যমে প্রতিযোগিতা করেন। এছাড়া ধর্মীয় ও পৌরাণিক বিভিন্ন গল্পের উদাহরণ দিয়ে আসরে গায়েনগণ দর্শক-শ্রোতাকে বাবা ও ছেলের মধ্যকার সম্পর্কের গুরুত্ব বুঝানোর চেষ্টা করে থাকেন। পালায় গায়েনগণ একে-অপরকে পরাজিত করার চেষ্টা করলেও কেউ-কাউকে হেয়পতিপন্ন করে কথা বলেন না। বিচারগানের হাস্যরসাত্মক পালাসমূহের মধ্যে যেমন চটুলতা রয়েছে, আত্মীয় সম্পর্কিত পালাসমূহ তথা বাবা-ছেলে পালাতে চটুল বিষয়াদি একেবারেই নেই। বরং বাবা-ছেলে পালাটি বেশ গুরুগম্ভীর ও ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ। বিচারগানের এই গুরুত্বপূর্ণ পালাটি ঠিক কবে উদ্ভব হয়েছে তা নিশ্চিত করে বলা না গেলেও কাছাকাছি সময় সম্পর্কে ধারণা করা যায়। পালাটির ভিসিডি ক্যাসেটের রেকর্ড থেকে জানা যায়, আনুমানিক ২০০০-২০০৫ সালের মাঝামাঝি কোনো সময়ে সর্বপ্রথম বাবা-ছেলে পালাটি আসরে পরিবেশিত হয়। এছাড়া মুন্সিগঞ্জ জেলার বড় আবুল সরকার ও লতিফ সরকারের অভিনীত একটি পালা থেকে জানা গেছে, এই দুই গায়েনই সর্বপ্রথম এই পালাটিতে অভিনয় করেছেন। এমনিতেই বিচারগানের ধর্ম বিশ্লেষণাত্মক পালাগুলো বেশি জনপ্রিয় হওয়ায় অন্যান্য পালাগুলো তুলনামূলক আসরে কম জনপ্রিয়। তারওপর বাবা-ছেলে ধরণের পালাগুলো বিচারগানের মূল পরিবেশনাস্থল মাজার-মন্দির প্রাঙ্গণে পরিবেশিত না হওয়ায় পালাটি দেশে তুলনামূলক কত পরিবেশিত হয়। তবে সাধারণ দর্শক-শ্রোতার নিকট বিকল্পধারার পালা হিসেবে পরিচিত হওয়ায় অনেকেই পালাটি পছন্দ করে থাকেন। এজন্য দেখা যায় বিচারগানের দ্বিমাত্রিক আয়তনের আসর সিডি, ভিসিডি ও বর্তমানে ইউটিউব মাধ্যমে অনেক গায়েনই বাবা-ছেলে পালাটিতে অভিনয় করে দর্শক-সম্মুখে উপস্থাপন করেন। এ যাবৎ যতগুলো ভিডিও হিসেবে পালাটি পাওয়া গেছে, তার মধ্যে বড় আবুল সরকার ও লতিফ সরকার পরিবেশিত পালাটিকে বেশ সমৃদ্ধ পরিবেশনা হিসেবে বিবেচনা করা যায়। এই দুই গায়েনের পরিবেশিত বাবা-ছেলে পালায় বাবা ও ছেলের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে বহুমাত্রিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ রয়েছে। পালার দুটি পক্ষই সামাজিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে একে-অপরকে প্রশ্ন ও উত্তর করেছেন। যার মাধ্যমে বাবা ও ছেলের একে-অপরের প্রতি কার কী কর্তব্য তার বার্তা দর্শক-শ্রোতার সাথে সহজেই পৌঁছেছে। তবে পালায় বাবা-ছেলে সম্পর্ককে আশ্রয়কে করে ধর্মীয় স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে গায়েনদ্বয় আলোচনা করেছেন। বিশেষ করে নবি মুহাম্মদ (স.) কর্তৃক তাঁর পালিত পুত্র হযরত জায়েদ (রা.)-এর স্ত্রী হযরত জয়নব (রা.)-কে বিয়ে করার বিষয়টি আসরে গায়েনগণ আলোচনা করেছেন। পালাটিতে লতিফ সরকার

প্রশ্ন করেন নবি মুহাম্মদ (স.)-এর কী উচিত হয়েছে তাঁর পালিত পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করা? এই প্রশ্নের উত্তরে বড় আবুল সরকার বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে বলেন, নবি মুহাম্মদ (স.) তাঁর পালিত পুত্রের স্ত্রীকে আল্লাহর হুকুমে বিয়ে করেছেন। সুতরাং এই বিয়ে অপরাধ হিসেবে গন্য নয়। পালায় এই বিষয়টি কেবল গদ্য-কথা আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, লতিফ সরকার এই বিষয়টি একটি গানের মাধ্যমেও আসরে পরিবেশন করেন। আসরে পরিবেশিত সেই গানটি হচ্ছে-

বাপে নিলো পুত্রবধূ এই কেমন ঘটনা,
এ যে নয় গো মুখের কথা আল-কোরানের ঘোষণা ॥
নবির পালক পুত্র ছিলো, জায়েদ বলে নাম তাঁর হইলো,
জয়নবকে বিয়া করিলো, বিয়া টিকলো না ॥ (লতিফ, ২০২৩ : পরিবেশনা)[২৮]

লতিফ সরকার পরিবেশিত এই গানটিতে ইসলামধর্মের নবি মুহাম্মদ (স.) সম্পর্কিত স্পর্শকাতর বিষয়টি যেভাবে খোলামেলা আলোচনা করেছেন, তা সত্যি বিস্ময়কর। কেননা বর্তমানে বাংলাদেশে তো ধর্ম সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করাই বেশ ঝুঁকির, সেখানে বিচারগানের আসরে এমন আলোচনা সত্যি সাহসিকতার পরিচয় বটে। তবে এ কথাটিও সত্য বিচারগানের সংশ্লিষ্ট লোকজন মানে কুশীলব, পৃষ্ঠপোষক ও দর্শক-শ্রোতাদের নিকট এগুলো খুবই স্বাভাবিক ও সাধারণ বিষয় হিসেবেই বিবেচিত হয়ে থাকে। বিচারগান বাংলাদেশের এমন একটি লোকপরিবেশনা যেটির আসরকে প্রান্তিক-জনগোষ্ঠীর মুক্তচিন্তার মুক্তমঞ্চ বলা যেতে পারে। যাহোক, বিচারগানের আত্মীয় সম্পর্কিত এই বাবা-ছেলে পালাটিও বিষয় হিসেবে পরিবেশনাটিতে যুক্ত হওয়ায় পরিবেশনাটি যেমন বৈচিত্র্যময় হয়েছে, তেমনি সমৃদ্ধও হয়েছে।

মা-ছেলে পালা

বিচারগানের আসরে সংযোজিত নতুন পালাগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি পালা হচ্ছে মা-ছেলে পালা। পালাটির শিরোনামের মধ্যেই বোঝা যাচ্ছে, পালাটির আলোচ্য বিষয়বস্তু মা ও ছেলের মধ্যকার সম্পর্কের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। এছাড়া মা ও ছেলের একে-অপরের মধ্যকার দায়িত্ব ও কর্তব্য কী হওয়া উচিত সে সম্পর্কে দর্শক-শ্রোতাকে সচেতন করাই পালাটির অন্যতম উদ্দেশ্য। যদিও লোকনাটক বিচারগানের বহু পালায় মা ও ছেলে সম্পর্কিত বহু গান পরিবেশিত হয়ে থাকে, তবু স্বতন্ত্র পালা হিসেবে মা-ছেলে পালাটির বেশ গুরুত্ব রয়েছে। কেননা পরিবার তথা মানব সভ্যতায় মা ও ছেলে বিষয়টি অবিচ্ছেদ্য একটি বিষয়। পালাটিতে যে সকল বিষয় আলোচিত হয় তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমাজে প্রতিফলিত হয়। মা-ছেলে পালার পরিবেশনা-কৌশল অন্যান্য পালা থেকে কিছুটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বিচারগানের প্রায় সবগুলো পালাতেই গায়েনগণ বিপক্ষের বিষয়কে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে চাইলেও মা-

ছেলে পালায় এমনটি হয় না বললেই চলে। দুই পক্ষের গায়েনই স্ব স্ব পালার বিষয়ের সাথে সাথে বিপক্ষের গায়েনের পালার বিষয়টিকেও গুরুত্বসহকারে আসরে উপস্থাপন করেন। বিশেষ করে যিনি ছেলে চরিত্রে অভিনয় করেন তিনি পুরো পরিবেশনাটিতে মা-চরিত্র ও মা-চরিত্রে রূপদানকারী গায়েনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পালাটিতে প্রায় সব সময়ই মা-চরিত্রে নারী গায়েন অভিনয় করেন এবং ছেলে-চরিত্রে পুরুষ গায়েন অভিনয় করে থাকেন। পালাটির বিষয়বস্তু গুরুগম্ভীর ও সম্মানীয় হলেও পালাটি এখনও দর্শক-সম্মুখে সরাসরি পরিবেশনে তেমন জনপ্রিয়তা পায়নি। বেশ কয়েকজন বিচারগানের গায়েন ও দর্শকের তথ্য মতে পালাটি বর্তমানে ইউটিউব কেন্দ্রিক পরিবেশনার মধ্যেই বেশি জনপ্রিয়। তবে এ কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় পালাটির বিষয়বস্তুর কারণে ধীরে ধীরে সব রকম আসরেই পরিবেশিত হবে। এই অভিসন্দর্ভ রচনাকালে যতগুলো মা-ছেলে পালাটির ভিডিও পরিবেশনা পাওয়া গেছে, তার মধ্যে লতিফ সরকার, আকলিমা বেগম ও আলেয়া বেগম-ইয়ামিন সরকারের পরিবেশিত পালাগুলো দর্শক-দর্শনে প্রশংসিত হয়েছে। পালাটিতে মা ও ছেলে পক্ষের গায়েন মূলত মায়ের স্তুতিমূলক গান পরিবেশন করেন, তবে কিছু কিছু গান রয়েছে যার মধ্যে ছেলের কল্যাণ কামনার পাশাপাশি ছেলের কর্তব্যের ব্যাপারে দিক-নির্দেশনা থাকে। আলেয়া বেগম ও ইয়ামিন সরকারের পরিবেশিত মা-ছেলে পালায় ইয়ামিন সরকার পরিবেশিত সবকটি গানেই মায়ের গুণকীর্তন ও ভক্তি নিবেদনের বার্তা রয়েছে। ইয়ামিন সরকার পরিবেশিত গানগুলোর একটিতে মা সম্পর্কে বলা হয়েছে-

> মা গো আমার জনম দুঃখী মা,
> আমার জন্য আর কেঁদো না ॥
> চোখের পানি ঝরলে, ব্যথা লাগে দিলে,
> সেই বেদনা সইতে পারি না ॥ (ইয়ামিন, ২০২০ : পরিবেশনা)[২৯]

এই গানটির মতোই পালার প্রত্যেকটি গানের বাণী যেমন স্তুতি ও উপদেশমূলক, তেমনি গানের সুরগুলোও করুণ ও হৃদয়স্পর্শী। পালায় গায়েনগণ অন্যান্য পালাগুলো মতোই একে-অপরকে প্রশ্ন করেন এবং উত্তর দেন। প্রশ্ন ও উত্তরগুলো মূলত মা ও ছেলের একে-অপরের প্রতি কী কী কর্তব্য পালন করা উচিত সেগুলোই বেশি থাকে। এছাড়া মায়ের মহত্ব ও বড়ত্ব তুলে ধরতে কিছু নির্দিষ্ট প্রশ্ন করা হয়। আকলিমা বেগম ও লতিফ সরকার পরিবেশিত মা-ছেলে পালায় আকলিমা বেগম, লতিফ সরকারকে প্রশ্ন করেন একজন ছেলে তার মায়ের দুধের ঋণ শোধ করতে পারেন কিনা? এই প্রশ্নের উত্তরে লতিফ সরকার বলেন, না কখনোই একজন মায়ের দুধের ঋণ শোধ করা সম্ভব নয়। এই প্রশ্ন ও উত্তরের মধ্যেই বোঝা যাচ্ছে গায়েনদ্বয় মায়ের বড়ত্ব ও অবদানকে আসরে বর্ণনা করে থাকেন। এই পালাটিতে মায়ের কথা অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে উচ্চারিত হওয়ায় এবং মায়ের প্রতি মানুষের শ্বাশত ভালোবাসা থাকায় আসরে অনেক দর্শক-শ্রোতাই পরিবেশনা শুনে অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়েন। বিশেষ করে যে সকল দর্শক-শ্রোতার

মা মৃত্যুবরণ করেছেন, সে সকল দর্শক-শ্রোতা বেশি কান্নাকাটি করেন। অনেক দর্শকই আছেন যারা মা সম্পর্কিত গান শুনে কাঁদতে কাঁদতে 'দশা ধরা' পর্যায়ে চলে যান। সারকথা হচ্ছে, মা-ছেলে পালাটি অনেক বেশি জীবনঘনিষ্ঠ পালা হওয়ায় মানুষের হৃদয়কে বেশি স্পর্শ করতে পারে। আর এই কারণেই বিচারগানের আসরে মা-ছেলে পালাটি ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হচ্ছে। সুতরাং বিষয় হিসেবে মা ও ছেলে বিচারগানের বিষয়-বৈচিত্র্যকে আরও বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে।

ভাই-ভাই পালা

বাংলাদেশের লোকনাটের প্রত্যেকটি আঙ্গিকেই ভাই-ভাই সম্পর্ক নিয়ে বিভিন্ন চরিত্র বিভিন্ন গল্পে উপস্থাপিত হয়। বিচারগান খুবই সমৃদ্ধ লোকনাট্যাঙ্গিক এবং এই পরিবেশনাটি প্রতিনিয়ত বৈচিত্র্যময় বিষয়কে আত্মীকরণ পদ্ধতিতে আরও সমৃদ্ধ হচ্ছে। এই আত্মীকরণ প্রক্রিয়ায় নতুন নতুন পালা সংযুক্তির মধ্যে ভাই-ভাই পালা একটি চমকপ্রদ বিষয়। বিচারগানের ত্রিমাত্রিক আসরে ভাই-ভাই পালার পরিবেশনা হয়েছে এমন কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে বিচারগানের দ্বিমাত্রিক আসরে অর্থাৎ সিডি, ভিসিডি, টেলিভিশন ও ইউটিউবে বিচারগানের গায়করা পালাটি পরিবেশন করেছেন, এ সংক্রান্ত কিছু ভিডিও পাওয়া গেছে। তবে এ পর্যন্ত মুন্সিগঞ্জের শাহ আলম সরকার ও লতিফ সরকার ছাড়া অন্য কারও পরিবেশিত ভাই-ভাই পালার ভিডিও পাওয়া যায়নি। ভাই-ভাই পালার উদ্ভাবকও শাহ আলম সরকার ও লতিফ সরকার । বাংলাদেশে বিচারগানের আসরে পালা হিসেবে ভাই-ভাই পালার উদ্ভাবন প্রসঙ্গে পালার পরিবেশনায় লতিফ সরকার বলেন,

> আজকের গানের পালা ভাই-ভাই। আপনারা একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন শাহ্ আলম সরকারের সাথে যখন কোনো গান বা পালা হয়, অন্যান্য শিল্পীর চাইতে আমরা দুই ভাই চেষ্টা করি কিছু নতুনত্ব তুলে ধরার জন্য। এমন ভাই-ভাই পালা বাংলাদেশের মধ্যে আর হয় নাই, এই সর্বপ্রথম। পালাও ভাই-ভাই, আমরা গাইতেও আইছি ভাই-ভাই। দুই ভাই গবেষণা করে, চিন্তা-ভাবনা করে এই পালাটা বাইর করছি। (লতিফ, ২০১৮ : পরিবেশনা)

লোকনাটক বিচারগানে যে নতুন নতুন পালা সংযোজিত হয় তারই প্রামাণ্য পাওয়া যায় এই ভাষ্য অনুযায়ী। তবে একথাও সত্য শাহ আলম সরকার ও লতিফ সরকার ছাড়া অন্য কোনো গায়েন ভাই-ভাই পালাটি করেছেন এমন কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। পালার বিষয়বস্তু ও পরিবেশনার ঋদ্ধতা থেকে অবশ্য নিশ্চিতভাবেই আশা করা যায় পালাটি ধীরে ধীরে বিচারগানের আসরে প্রচলিত ও বিকশিত হবে। যাহোক এ পর্যায়ে বিচারগানের ভাই-ভাই পালাটির বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করা যাক। পালাটির নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে ভাই ও ভাইয়ের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে যে পালায় গায়েনদ্বয় কথায়-গানে প্রতিযোগিতা করেন তাই ভাই-ভাই পালা। পালায় এই ভাই ও ভাই বিষয়টি শুধুমাত্র রক্তীয় বন্ধনের সম্পর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ভাই-ভাই বলতে রক্তীয় ভাই, জ্ঞাতী সম্পর্কের ভাই, ধর্মীয়

সম্পর্কের ভাই, আধ্যাত্মিক বা তরিকার ভাই ও বিশ্বমানবতার সম্পর্কের ভাইকে বুঝানো হয়েছে। পালায় গায়েনগণ এই বিষয়গুলোকে নিয়েই আলোচনা করে থাকেন। পালার প্রধানতম উদ্দেশ্য হচ্ছে ভাই-ভাইয়ের সম্পর্ককে সুদৃঢ় করা। আর গায়েনগণ এই উদ্দেশ্যকে তুলে ধরার জন্য কতগুলো বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন। ভাই-ভাই সম্পর্ক সুমধুর থাকলে যেমন সুফল পাওয়া যায়, তেমনি এই সম্পর্ক বিষাক্ত হলে জীবনে নানাবিধ সমস্যা এসে হাজির হয়, সে বিষয়টিও গায়েনগণ আসরে আলোচনা করেন। ভাই-ভাই পালার আলোচ্য বিষয়গুলোর সারমর্ম নিচে তুলে ধরা হলো-

ক. জগতে ভাই হচ্ছে বিপদে-আপদে শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী।

খ. ভাই-ভাইয়ের সম্পর্ক সুদৃঢ় থাকেলে সকল অপশক্তি নিঃচিহ্ন হয়।

গ. ভাই যদি ভাইয়ের শত্রু হয় তাহলে তার ক্ষতির জন্য আর কোনো শত্রু লাগে না।

ঘ. জগতে ধন-সম্পদের কারণে ভাইয়ে-ভাইয়ে সম্পর্ক নষ্ট হয়।

ঙ. ভাই-ভাইয়ের মধ্যে শ্রদ্ধা-ভালোবাসা থাকা উচিত।

চ. ভাই হারালে ভাইয়ের অভাব কখনো পূরণ হয় না।

ছ. ধর্মীয়ভাবেও ভাই-ভাইয়ের সম্পর্কের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়।

জ. স্ত্রীর জন্য ভাই-ভাইয়ের সম্পর্ক নষ্ট যেন না হয়।

ঝ. পিতার অবর্তমানে বড় ভাই পিতৃতুল্য মর্যাদার।

ঞ. পিতার অবর্তমানে বড় ভাইয়ের কর্তব্য ছোট ভাইয়ের ভরণপোষণ করা।

এই বিষয়গুলো গায়েনগণ একে-অপরের প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে আসরে আলোচনা করেন। এ সময় বিভিন্ন গল্পের উদাহরণ, বাস্তবিক ঘটনার উদাহরণ, ধর্মীয় নির্দেশনা বর্ণনা করেন। আর বিচারগানের আসরে আবশ্যিক বিষয়ভিত্তিক গানের পরিবেশনা অবশ্যই থাকে। শাহ আলম সরকার ও লতিফ সরকার পরিবেশিত ভাই-ভাই পালায় বেশ কিছু প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। পালায় প্রশ্ন-উত্তরের মধ্যে দুয়েকটির উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। ভাই-ভাই পালায় লতিফ সরকার, শাহ আলম সরকারকে প্রশ্ন করেন, পৃথিবীর ইতিহাসে এক ভাই ছিলো যিনি কিনা বড় ভাইয়ের পায়ের খড়ম সিংহাসনে রেখে রাজ্য শাসন করেছেন। সেই বড় ভাই ও ছোট ভাই কারা? এই প্রশ্নের উত্তরে শাহ আলম সরকার জানান, এই ঘটনার ছোট ভাই হচ্ছেন ভরত, যিনি কিনা বড় ভাই রামের পায়ের খড়ম সিংহাসনে রেখে রাজ্য শাসন করেন। গায়েন শাহ আলম সরকার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে রামায়ণে বর্ণিত রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, দশরথ, সীতা প্রমুখ চরিত্র রাম-সীতার বনবাস ও ভরতের রাজ্য শাসন সংক্রান্ত কাহিনিটি বর্ণনা করেন। এছাড়া পালায় শাহ আলম সরকারও লতিফ সরকারের নিকট বেশ কয়েকটি প্রশ্ন করেন। তার মধ্যে একটি হচ্ছে-

শাহ আলম সরকার জানতে চান, কোন নবির চার পুত্রের মধ্যে তিন ভাই জান্নাতে যাবেন কিন্তু এক ভাই জাহান্নামে যাবেন? এই প্রশ্নের উত্তরে লতিফ সরকার জানান, হযরত নূহ (আ.)-এর চার পুত্রের মধ্যে অর্থাৎ সেই চার ভাইয়ের মধ্যে এক ভাই পিতার কথা অমান্য করায় জাহান্নামে যাবেন। পালায় ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ভাই-ভাইয়ের বন্ধনের দৃঢ়তা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। পালায় দেখা যায়, গায়েনগণ হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের ভাই সংক্রান্ত দৃষ্টান্তমূলক কাহিনিগুলোর উদারহণ দেন। পালাটিতে ভাই-ভাইয়ের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে কান্নাজড়িত কণ্ঠে শাহ আলম সরকার ইসলামের ইতিহাসের বিয়োগাত্মক ঘটনা নিয়ে রচিত মীর মোশাররফ হোসেনের 'বিষাদ সিন্ধু' উপন্যাসের আলোকে হযরত হাসান (রা.) ও হযরত হোসেন (রা.)-এর মধ্যকার ভাতৃত্বের দৃঢ়তা নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনা করতে করতে শাহ আলম সরকার এক পর্যায়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। অর্থাৎ ভাই-ভাই পালার প্রতিটি মুহূর্তের পরিবেশনাই ভাই-ভাই সংক্রান্ত বিষয় নিয়েই হয়ে থাকে। গদ্য ও কাব্য কথার সাথে সাথে পালায় গানে গানেও গায়েনগণ ভাই-ভাই সম্পর্কের গুরুত্ব সম্পর্কে বার্তা দিয়ে থাকেন। পালায় পরিবেশিত লতিফ সরকারের একটি গান হচ্ছে-

ভাই বড় ধন, রক্তের বাঁধন,
যদিও পৃথক হয় রমণীর কারণ ॥
ছিলো কত মহাসুখ, ভাইয়ে ভাইয়ে রেখে বুক,
কত নীশি এক বিছানায় করেছি শয়ন,
এখন সুন্দর ভাবী এনে ঘরে, ভাই আমায় রাখে দূরে,
আগের মতো ভাই আমারে করে না যতন ॥ (লতিফ, ২০১৮ : পরিবেশনা)[৩০]

গানটিতে ভাই-ভাই সম্পর্কের গভীরতা নিয়ে যেমন বলা হয়েছে, তেমনি এই সম্পর্ক নষ্ট করতে পারে এমন বিষয়াদি সম্বন্ধেও সতর্ক করা হয়েছে। অর্থাৎ পালায় যে বিষয়বস্তু গানেও তা গায়েন বর্ণনা করেছেন। পালাটিতে ভাই-ভাই সম্পর্কের গুরুগম্ভীরতার কারণে পরিবেশনা অনেক বেশি রাশভারী হলেও অনেক হাস্যরসাত্মক বিষয়ও প্রাসঙ্গিকক্রমে পালায় আলোচিত হয়। পালায় দেখা যায় ভাই-ভাইয়ের সম্পর্কের মধ্যকার ঝামেলাকে গায়েনগণ স্যাটায়ার করে উপস্থাপন করেছেন। এ সময় গ্রামবাংলায় প্রচলিত কিছু হাস্যরসাত্মক গল্প বলার মাধ্যমে ভাই-ভাইয়ের সম্পর্কের বহুমাত্রিকতা নিয়ে আলোচনা করেন গায়েনগণ। ভাই-ভাই সম্পর্ক যে শুধু প্রেমময়-মধুময় নয়, এই সম্পর্কের মধ্যে রয়েছে তিক্ততা-বিষাক্ততা সে বিষয়টিও পালায় গায়েনগণ উপহাসের ছলে উপস্থাপন করে থাকেন। শাহ আলম সরকার ও লতিফ সরকারের ভাই-ভাই পালায় শাহ আলম সরকার দুই ভাইয়ের মধ্যে সম্পদ বন্টন নিয়ে হাস্যরসাত্মক গল্প বলেন। তবে গল্পের শেষে এসে ভাই-ভাইয়ের সম্পর্ক যেন শটতা-প্রতারণার না হয়, সেটি বুঝিয়েছেন। পালাটির বিষয়বস্তুর গুরুত্বের দিক বিবেচনায় বিচারগানের অনেক দর্শক-শ্রোতাই পালাটিকে দারুণভাবে

পছন্দ করেছেন। তাদের ভাষ্য মতে, বিচারগানে ধর্মীয় পালার পাশাপাশি এই পালাগুলো আরও বেশি বেশি করা উচিত। কারণ হিসেবে মানুষের মাঝে আত্মীয়তা সম্পর্কের গুরুত্বকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ মানুষ যেহেতু পরিবার-সমাজ নিয়ে নিকট আত্মীয় নিয়ে বসবাস করেন, সেহেতু এই সম্পর্কগুলোর বিশেষ যত্ন নেয়া উচিত। তাই ভাই-ভাই পালার মতো বেশি বেশি পালা হওয়া উচিত বলেই দর্শকরা মনে করেন। তবে এ রকম পালা সরাসরি দর্শক-সম্মুখে না হওয়ায় কিছুটা আফসোসও করেন। প্রকৃতপক্ষেই লোকনাটক বিচারগানে নতুন নতুন বিষয়ভিত্তিক পালা সংযোজনের ফলে বিচারগান অবশ্যই সমৃদ্ধ হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিচারগানে ভাই-ভাই পালাটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। আর নতুন পালার সংযুক্তিতে বিষয়-বৈচিত্র্যের দিক থেকে পরিবেশনাটি আরও বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে। আশা করা যায়, বিচারগানের লোককবিদের গুরু-শিষ্য পরম্পরায় ভাই-ভাই পালার মতো নতুন পালাগুলো দিনে দিনে আরও সমৃদ্ধ হবে, পক্ষান্তরে সমৃদ্ধ হবে লোকনাটক বিচারগান।

মামী-ভাগিনা পালা

বাংলা লোকনাটক ও লোকসংগীতের ধারায় মামী ও ভাগিনা চরিত্র দুটি বহুভাবে চিত্রিত হয়েছে। এই দুটি চরিত্রনির্ভর লোকনাট্য পরিবেশনাগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের জেলা রংপুরে বিষহরির গানে সর্বাধিক প্রচলিত। মামী-ভাগিনা চরিত্র দুটি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশনা তর্জাগানেও রয়েছে। বাংলাদেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় ও প্রচলিত প্রতিযোগিতামূলক লোকনাট্য পরিবেশনা বিচারগানে এই চরিত্র দুটি পালা-আকারে থাকবে এটা খুবই স্বাভাবিক বিষয়। কেননা এই দুটি চরিত্রের মধ্যে লোকসমাজের নানা গল্প-গাঁথা রয়েছে। এই চরিত্র দুটিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন লোকপরিবেশনায় যেমন গুরুগম্ভীর বিষয়াদি রয়েছে, ঠিক তেমনি বহু চটুল বিষয়ও বিদ্যমান থাকে। বাংলা অঞ্চলে মামী ও ভাগিনা সম্পর্কটি যদিও মাতা-পুত্রের সম্পর্কের মতোই সম্মানীয় মনে করা হয়, তবু দেখা যায়, এই সম্পর্ক নিয়ে অনেক অশ্লীল ও কুৎসামূলক গল্প জনমানুষের মধ্যে প্রচলিত। যে সম্পর্কের মধ্যে অবৈধ সম্পর্কের বিভিন্ন চিহ্নও পাওয়া যায়। বিচারগানের পালায় মামী-ভাগিনা চরিত্র দুটির সাথে রাধা-কৃষ্ণের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। কেননা লোকধর্ম বিশ্বাস অনুযায়ী রাধা ও কৃষ্ণ সম্পর্কে মামী ও ভাগিনা। এই সম্পর্ককে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। কখনো কৃষ্ণ স্বয়ং প্রভু আর রাধা প্রকৃতি রূপে পূজিত হয়, আবার কখনও নিছকই মানবীয় প্রেমিক-প্রেমিকা রূপে চিত্রিত হয়। বরং রাধা-কৃষ্ণ ধর্মীয় চরিত্রের চেয়ে বাংলা অঞ্চলের লোকমানুষের নিকট তারা প্রেমের গল্পের চরিত্র হিসেবেই বেশি চর্চিত হয়। যেখানে রাধা মামী আর কৃষ্ণ ভাগিনা তাদের প্রেমের কাহিনি নিয়ে হাজারও লোকপরিবেশনা বাংলাদেশে রয়েছে। লোকনাটকের চরিত্র হিসেবে যদিও গণনাযোগ্য কিন্তু লোকসংগীতে রাধা-কৃষ্ণ বা মামী-ভাগিনাকে নিয়ে কত যে গান রচিত হয়েছে, তার যেন গণনাযোগ্য সংখ্যা নেই বললেই চলে। অর্থাৎ রাধা-

কৃষ্ণ এবং মামী-ভাগিনা একে-অপরের পরিপূরক দুটি চরিত্র। রাধা-কৃষ্ণ চরিত্র দুটি বাদ দিয়েও মামী-ভাগিনা কেন্দ্রিক বহু জনপ্রিয় গানও রয়েছে। যে গানগুলো বহু লোকনাটকের পরিবেশনায় পরিবেশিত হয়ে থাকে। এ রকম একটি জনপ্রিয় গানের কথা হচ্ছে-

ঐ দেখা যায় সোনার ভাইগনা আমার বাড়ি আসেরে,

পাগল করিলো ভাগিনারে ॥

তোমার মামার কাঁধের গামছা, তোমার কাঁধে কেন দেখিরে ॥

তোমার মামার হাতের ঘড়ি, তোমার হাতে কেন দেখিরে ॥ (গবেষক, ২০২৩ : সংগ্রহ)[৩১]

এই গানটিতে প্রচ্ছন্নভাবে মামী ও ভাগিনার মধ্যে অযাচিত প্রেমের গল্পের কথাই বলা হয়েছে। এই রকম সম্পর্ককে নির্দেশ করে এবং রাধা-কৃষ্ণের মধ্যকার প্রেমের নানান ব্যাঞ্জনানির্ভর গল্প নিয়েই বিচারগানের মামী-ভাগিনা পালাটি বিচারগানের আসরে পরিবেশিত হয়ে থাকে। লোকনাটক বিচারগানে মামী-ভাগিনা পালাটি খুব বেশি দিন যাবৎ সংযোজিত হয়নি। পালাটি হয়তো ৮-১০ বছর আগে বিচারগানের আসরে প্রথম পরিবেশিত হয়। পালাটি বেশ চটুল হওয়ায় বিচারগানে বিজ্ঞ দর্শক- শ্রোতা পছন্দ করেন না। তাই হয়তো সরাসরি দর্শক-সম্মুখে পরিবেশিত হওয়ার তথ্য পাওয়া যায় না। তবে অডিও, ভিডিও, সিডি, ভিসিডি ও বর্তমানে ইউটিউব কেন্দ্রিক মাধ্যমগুলোতে গায়েনগণ পালাটি পরিবেশন করে থাকেন। বিচারগানের গায়েনদের মধ্যে চটুল পালাগুলোর জন্য সুপরিচিত ড়ায়েন হচ্ছে মালেক সরকার ও নীলা পাগলী। এই গায়েনের ভাষ্য মতে, তারাই সর্বপ্রথম বিচারগানের মামী-ভাগিনা পালাটিতে অভিনয় করেছেন। তারা মনে করেন, বিচারগানের গুরুগম্ভীর পালাগুলোর পাশাপাশি 'রঙ-রস' ভরা পালাও থাকা উচিত। এতে করে দর্শক-শ্রোতা ভিন্ন রসের স্বাদ পাবেন। এবং তাদের একঘেয়েমী কাটবে। মামী-ভাগিনা পালার একটি পরিবেশনার শুরুতে মামীপক্ষের গায়েন নীলা পাগলী বলেন,

> বিশেষ করে রঙ-রসের পালা গাওয়ার উদ্দেশ্য হলো, আমরা মাঝে মাঝে রঙ-রস এই জন্য দেই, আমরাও এই গান গেয়ে আনন্দ পাই, শ্রোতারাও এই গান শুনে আনন্দ পাায়। এই জন্য আমরা কিছু কিছু রসের পালা নিয়ে আপনাদের পাশে হাজির হই। (নীলা, ২০১৮ : পরিবেশনা)

গায়িকা নীলা পাগলীর কথা অনুসারে এটাই প্রমাণিত হয় যে, মামী-ভাগিনা পালাটির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে দর্শক-শ্রোতাকে হাস্যরসের মাধ্যমে বিনোদিত করা। তবে এই হাস্যরসের মাঝেই সমান্তরালভাবে ধর্মীয়-আধ্যাত্মিক শিক্ষা আলোচিত হয়। নীলা পাগলী ও মালেক সরকার পরিবেশিত মামী-ভাগিনা পালাটিতে অবশ্য চটুলতার চেয়ে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যতাই বেশি প্রকাশ পেয়েছে। কেননা তাদের অভিনীত পালাটিতে মামী অর্থে রাধা ও ভাগিনা অর্থে কৃষ্ণকেই নির্দেশ করা হয়েছে। পালায় কৃষ্ণকে পরম স্রষ্টা বা প্রেমিক আর রাধাকে জীব বা প্রেমিকা রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে এর মধ্যে নানান প্রাসঙ্গিক আলোচনার ফলশ্রুতিতে কখনো কখনো মানবীয় প্রেমের ইঙ্গিতে চটুলতার

অবতারণা হয়েছে। নীলা পাগলী ও মালেক সরকার মামী-ভাগিনা পালায় অভিনয়কালে মামী ও ভাগিনার পক্ষ থেকে একে-অপরকে কতগুলো প্রশ্ন-উত্তর করেছেন। সেগুলোর সারাংশ করলে নিচের বিষয়গুলো চিহ্নিত হয়।

ক. মামী-ভাগিনার মধ্যকার প্রেমের জন্য কে বেশি দায়ী?

খ. মামীর জন্য ভাগিনার কাতরতা কী অন্যায় নয়?

গ. মামী ও ভাগিনার প্রেম কী জগতের মানুষ মেনে নিবে?

ঘ. ভাগিনা কী উপহারে মামীকে খুশি রাখবে?

ঙ. মামী-ভাগিনার প্রেম যদি ধরা পড়ে যায়, তবে লোকসমাজে কী জবাব দিবে?

চ. ভাগিনা রূপী কৃষ্ণ কার জন্য বাঁশি বাজায়?

ছ. পৃথিবীতে এখনও কী রূপে রাধা-কৃষ্ণের লীলা চলমান রয়েছে।

জ. রাধা-কৃষ্ণের মধ্যে প্রেমের গুরু কে?

ঞ. স্বয়ং প্রভু কৃষ্ণ জীবের সাথে কী লীলা করেন?

মামী-ভাগিনা পালাটিতে কাব্য-কথার সাথে সাথে অন্যান্য পালার মতোই গানে গানেও গায়েনগণ পালায় প্রতিপক্ষকে পরাজিত করার চেষ্টা করেন। তাছাড়া বিচারগানের প্রতিটি গানের মাধ্যমে পালার বিষয়বস্তু বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়ে থাকে। এ রকম একটি চমৎকার গানের উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। গানটি মামী-ভাগিনা পালাতে গেয়েছেন নীলা পাগলী। গানটি হচ্ছে-

> তুমি আমার নন্দের ছেলে হও ভাগিনা,
> তোমার-আমার কথা নিয়ে গান করে রচনা ॥
> ভাইগনা বাঁশি বাজায়, বাঁশি বাজাইয়া ভাইগনা মনটারে কাঁদায়,
> কার নামে বাঁশি, কেউ তো বুঝে না ॥ (নীলা, ২০১৮ : পরিবেশনা)[৩২]

মামী-ভাগিনা পালার এই গানটিতে মামী ও ভাগিনার অযাচিত প্রেমের দিকেই নির্দেশ করে। তবে একথাও সত্য যে গানের কথার নিগূঢ় অর্থ করতে গেলে রাধা ও কৃষ্ণকেই খুঁজে পাওয়া যায়। কারণ গোকূলে বসে বাঁশি বাজানো সংক্রান্ত পুরাণ বাংলা অঞ্চলে বহুল প্রচলিত। এছাড়া গানের মধ্য দিয়ে মামী-ভাগিনার প্রেমের দৃঢ় আকুলতাও বর্ণিত হয়েছে। মূলকথা হচ্ছে লোকনাটক বিচারগানের পালা হিসেবে মামী-ভাগিনা পালাটি নিঃসন্দেহে বিচারগানের বিষয় বৈচিত্র্যে নতুনত্ব এনে দিয়েছে। যদিও বিচারগানের বহু দর্শক-শ্রোতা মামী-ভাগিনা পালাটিকে চটুল পালা হিসেবেই মনে করেন। এমনকি এমন দর্শক-শ্রোতাও রয়েছেন যারা কিনা এই ধরণের পালাকে অবজ্ঞা করে থাকেন। এবং তারা কখনো পালাটি দেখেন না বা শুনেন না। তারা সাধারণত বিচারগানের ধর্ম বিশ্লেষণাত্মক পালাসমূহসহ গুরুগম্ভীরতত্ত্বনির্ভর পালাগুলো উপভোগ করেন। এছাড়া এই পালাগুলো বিচারগানের প্রধান পরিবেশনাস্থল মাজার,

মন্দির ও দরবার শরিফে পরিবেশনের প্রামাণ্য পাওয়া যায়নি। অনেক গুরু-গোঁসাই এই পালাগুলোকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতেও দ্বিধাবোধ করেন না। এ রকমই এক প্রবীণ দর্শক মো. আরফান দয়াল তাঁর নিকট মামী-ভাগিনা পালা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন,

> মামী-ভাগিনা পালা নামে যে পালা আছে, তাই আজকে প্রথম শুনলাম। তবে শুনছি বিচারগানের কিছু কিছু শিল্পী এই ধরণের পালা করে। এই সব পালা আমার পছন্দ না। একথাও ঠিক অনেকেই এই সব পালা পছন্দও করেন। (আরফান, ২০২৩ : সাক্ষাৎকার)

একথাও ঠিক বাংলাদেশের অঞ্চলভেদে বিচারগানের বহু পালার সৃষ্টি হয়েছে। সব অঞ্চলে সব পালা পরিবেশিত হয় না। এ জন্য অনেক সাধারণ দর্শকের পক্ষে বিচারাগনের প্রায় ৭০টি পালা সম্পর্কে না জানাটাই স্বাভাবিক বিষয়। দর্শক-শ্রোতাভেদে পছন্দ-অপছন্দের পালা থাকবে, এটা হতেই পারে। তবে এই ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের পালা বিচারগানে আছে বলেই বিষয়-বৈচিত্র্যের দিকে থেকে লোকনাটক বিচারগানের বিষয়-বৈচিত্র্য এত সমৃদ্ধ।

চিত্র-১৯ : মামী-ভাগিনা পালায় পরিবেশনারত অবস্থায় নীলা পাগলী ও মালেক সরকার

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হাস্যরসাত্মক পালাসমূহ

বিচারগানের পরিবেশনার প্রধান উদ্দেশ্য ধর্মের বাণী প্রচার ও আন্তঃধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করা। অথবা বলা যেতে পারে ধর্মকে আশ্রয় করে মানবতাবাদের দর্শন প্রচারই বিচারগানের মূল উদ্দেশ্য। আর এ জন্য ধর্মের বিভিন্ন বিষয়বস্তু নিয়ে বিভিন্ন পালা পরিবেশিত হয়। পালা পরিবেশনাকালে নানা আখ্যান-উপাখ্যান ও বিভিন্ন গান গাওয়া হয়, যার মাধ্যমে হাসি-কান্নাসহ নানা রকম পরিস্থিতি তৈরি হয়। তবে বিচারগানে এমনও কিছু পালা রয়েছে, যেগুলোর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে দর্শক-শ্রোতাদের হাস্যরসের স্বাদ দেওয়া। যেখানে লোক হাসানোটাই প্রধান বিষয়। এ জন্য কিছু চটুল ও স্থুল বিষয়বস্তুকে প্রাধান্য দিয়ে কিছু পালার সৃষ্টি হয়েছে। তার মধ্যে শালা-দুলাভাই, শালী-দুলাভাই, দেবর-ভাবী, ননদ-ভাবী, বিয়াই-বিয়াইন, দুই বিয়াইন, বাইদা-বাইদানী, দুই বাইদানী, দাদা-নাতি, দাদা-নাতিন, দাদি-নাতি, দাদি-নাতিন, নানা-নাতি, নানা-নাতিন, নানি-নাতি, নানি-নাতিন, জামাই-বউ বা স্বামী-স্ত্রী, জামাই-শ্বশুর, জামাই-শাশুড়ি, বউ-শ্বশুর, বউ-শাশুড়ি, বুড়ি-ছোকরা ও বুড়ি ছুকরি বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য। এ পালাগুলোতে গায়েনগণ সাধারণত প্রেম ও যৌনতা মিশ্রিত কথাবার্তায় লোক হাসানোর চেষ্টা করেন। অনেক গায়েন আবার এই পালাগুলোর তীব্র বিরোধীতা ও নিন্দা করেন থাকেন। তাদের মতে, এপালাগুলো বাউল, সুফি ও বৈষ্ণববাদের সাথে মানানসই নয়। এমনকি এসব পালার বিরোধীতা করে বিচারগানের কিংবদন্তি গায়েন মাতালকবি রাজ্জাক দেওয়ান রচিত বহুল জনপ্রিয় একটি গানও রয়েছে। সেটি হচ্ছে-

আমিতো লাজে মরি, কী যে করি গলায় দঁড়ি দিয়া,
বিপদে পইড়াছি বড় বাউলগান শিখিয়া ॥
ভেবেছিলাম গানের জগৎ খুবই একটা ভালো
আমি গান শিখিব বাউল হবো জ্বালবো জ্ঞানের আলো
দেখলাম বাউল হইয়া গানে গিয়া কপাল বড় পোড়া
এই গান গাইয়া বেড়ায় ইতর ফাতরা যারা ॥ (তপন, ২০২২ : ১৬৮-১৬৯)[৩৩]

এই গানটির মাধ্যমে প্রয়াত গায়ক মাতালকবি রাজ্জাক দেওয়ান বিচারগানের সাথে জড়িত কুশীলবদের নানা রকম অসামাজিক-অনৈতিক কার্যকলাপসহ বিভিন্ন অনিয়ম-অসঙ্গতির কথা তুলে ধরেছেন। গানের একটি পয়ারে তিনি স্পষ্টভাবে ক্যাসেটে ধারণকৃত শালী-দুলাভাই, নানা-নাতিন ও বাইদা-বাইদানি পালার সমালোচনা করেছেন। যদিও বিচাররগানের অনেক গায়েন মাতালকবি রাজ্জাক দেওয়ানের এই মতামতের বিরোধীতা করেন। তাদের যুক্তি, তারা দর্শক-শ্রোতার মনোরঞ্জনের জন্য অভিনয়ের খাতিরে এসব হাস্যরসাত্মক পালা করে থাকেন। এতে তারা দোষের

কিছু দেখেন না। বরং তারা মনে করেন, এর মাধ্যমে বিচারগানের ঋদ্ধতাই বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ধর্মীয় গুরুগম্ভীর পালার পৌনঃপুনিকতার একঘেয়েমী দূর হয়েছে। হাস্যরসাত্মক পালায় গান গেয়ে আকলিমা বেগম, মিনারা বেগম, মালেক সরকার, খোরশেদ আলম বয়াতি, নীলা পাগলী, আঁখি সরকার, গণি সরকার, ছোট রজ্জব আলী দেওয়ানসহ বেশ কয়েকজন গায়েন দর্শক জনপ্রিয়তা পেয়েছেন। এমনকি এ পালাগুলোর পরিবেশনায় খুব অল্প সংখ্যক গায়েনই অংশগ্রহণ করে থাকেন। এ পর্যায়ে হাস্যরসাত্মক পালাগুলো আলোচনার মাধ্যমে বিচারগানের বিষয়-বৈচিত্র্যের শৈলী সন্ধান করা যেতে পারে।

শালা-দুলাভাই পালা

পালার শিরোনামের মধ্যেই বোঝা যাচ্ছে শালা-দুলাভাই পালাটি চমৎকার একটি হাস্যরসাত্মক পালা হবে। যুগ যুগ ধরে শালা ও দুলাভাই সম্পর্কটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আড্ডা ও চাতুরীপনার পরিবেশে হাসি-তামাশার রসদ যুগিয়েছে। বাংলাদেশে বাস্তবিক কিংবা শৈল্পিক ভুবনে বিভিন্নভাবে শালা ও দুলাভাই সম্পর্কটি অবতারণা হয়ে থাকে। শালা ও দুলাভাই প্রসঙ্গটি শুধুই লোকসমাজে প্রচলিত তা নয়, এই বিষয়টি মূলধারার বহু শিল্পেও ব্যবহৃত হয়। বিশেষ করে চলচ্চিত্র ও নাটকে এই দুইটি চরিত্রের অহরহ ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং লোকসংস্কৃতির সমৃদ্ধ মাধ্যম লোকনাটকে চরিত্র হিসেবে শালা ও দুলাভাই বিষয় দুটির উপস্থিতি থাকবে এটাই স্বাভাবিক। বাংলাদেশের প্রায় প্রত্যেকটি লোকনাট্যাঙ্গিকের মধ্যেই শালা-দুলাভাইয়ের চরিত্র চিত্রিত হয়েছে। এ চরিত্র দুটি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই গল্পের শাখা-প্রশাখা হিসেবে হাসি-তামাশার রসদ রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শুধু শালা-দুলাভাই কেন্দ্রিক পূর্ণ আখ্যান লোকপরিবেশনায় পাওয়া যায় না বললেই চলে। তবে এক্ষেত্রে লোকনাটক বিচারগান ব্যতিক্রম হিসেবে গন্য হয়। কেননা বিচারগানে শালা ও দুলাভাইয়ের সম্পর্ককে আশ্রয় করে স্বতন্ত্র পালার উদ্ভব হয়েছে। যে পালাটির নামই হলো শালা-দুলাভাই পালা। হাস্যরসাত্মক অন্যান্য পালাগুলো থেকে এই পালাটির ব্যতিক্রমী দিক হচ্ছে, এটিতে চুটলতা থাকলেও অশ্লীলতা তুলনামূলক অনেক কম। পালায় অবশ্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উক্তির মাধ্যমে প্রেম, প্রণয় ও যৌনতাকে ইঙ্গিত করে গায়েনগণ হাস্যরসের উদ্রেক করার চেষ্টা করেন। শালী-দুলাভাই বা বাইদা-বাইদানী পালায় যেমন গায়েনগণ যৌনতাকে উপজীব্য করে একে-অপরকে স্থূলভাবে আক্রমণ করেন, শালা-দুলাভাই পালায় তেমনটি না হয়ে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রকে আশ্রয় করে একে-অপরকে আক্রমণ করে থাকেন। মূলকথা হচ্ছে এই পালাটির হাস্যরস। পালায় হাস্যরসের জন্য গায়েনগণ কতগুলো উপায় অবলম্বন করে থাকেন। যার মাধ্যমে হাসির পরিস্থিতি তৈরি হয় এবং দর্শক-শ্রোতা বিনোদিত হয়। বাংলাদেশের বেশ কয়েকজন গায়েনের অভিনীত শালা-দুলাভাই পালার পরিবেশনা পর্যবেক্ষণ করে পালাটির আলোচ্য বিষয়গুলো চিহ্নিত করা গেছে। পালায় যিনি দুলাভাই চরিত্রে অভিনয়

করেন, তিনি শালাপক্ষের গায়েনকে উদ্দেশ্য করে ‘ঠ্যাশ’ মারেন। যেমন- শালা তোমার চরিত্র ভালো না; তুমি অল্প বয়সে মেয়েদের পেছনে ঘুরোঘুরি করো; তোমাদের বংশ খারাপ এজন্য তোমার বোনও খারাপ; এতো বছর বিয়ে করলাম অথচ কোনো কিছু উপহার পর্যন্ত দিলে না; শালা তুমি তো খারাপই তোমার বাবা মানে আমার শ্বশুর হচ্ছে আরো খারাপ। দুলাভাইপক্ষ থেকে এ রকম আরো অনেক ‘ঠ্যাশ’-এর প্রত্যুত্তরে শালাপক্ষের গায়েনও পাল্টা ‘ঠ্যাশ’-এর কথা বলেন। যেমন- দুলাভাই তোমাদের বংশ যে কত ভালো তা সবাই জানে, তোমরা হচ্ছো চোরের বংশ; আর চরিত্র তো তোমার ফুলের মতো পবিত্র আমার বোনকে ছাড়াও তুমি বছর বছর বিয়ে করো; তোমার স্বভাব তো একমাত্র কুকুরের সাথেই মিলে। এ রকম আরো বহু ‘ঠ্যাশ’ শালাপক্ষ থেকে দেয়া হয়ে থাকে। গায়েনগণ ‘ঠ্যাশ’ পাল্টা ‘ঠ্যাশ’-এর মাধ্যমে শালা-দুলাভাই পালায় চটুলতায় পরিপূর্ণ করে তুলেন। আর তাতেই দর্শক-শ্রোতারা হাসি-আনন্দের রসদ পেয়ে যান। হাস্যরসাত্মক পালার সুনামধন্য গায়ক মালেক সরকার ও খ্যাতিমান গায়ক পাগল মনিরের পরিবেশিত শালা-দুলাভাই পালার এক পরিবেশনায় মালেক সরকার শালাপক্ষ থেকে পাগল মনিরকে শ্লেষ করে বলেন, ‘কিছু আছে দুলাভাই, আর কিছু আছে দুলাগাই, আবার কিছু আছে দুলাঘাই। গাই, ঘাই আর দুলাভাই। এইটার মধ্যে ব্যাপারটা বুঝতে হবে।’ (মালেক, ২০১৭ : পরিবেশনা) তার মানে শালা-দুলাভাই পালায় গায়েনদ্বয় একে-অপরকে চরিত্র ধরে শ্লেষাত্মক কথাবার্তা বলে থাকেন। এই পালাটিতে পাগল মনিরও মালেক সরকারকে বিদ্রূপাত্মক কথা বলে পালার প্রতিযোগিতায় নিজের পক্ষকে জয়ী করতে সচেষ্ট থাকেন। পালার এক পর্যায়ে পাগল মনির শালাপক্ষের গায়েন মালেক সরকারকে বলেন যে, আমি ৫০ হাজার টাকা দিয়ে তোমার বোনকে বিয়ে করেছি। তোমার বোন আমার দাসী-বাদী, তাকে আমি যেভাবে খুশি ব্যবহার কবরো তাতে তোমার কী? তোমার বোন আমার পায়ের জুতা। আর তুমি তো রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতা, এই দুলাভাই তোমাকে পড়াশোনা করিয়েছে। এ রকমভাবেই গায়েনগণ একে-অপরকে ঠাট্টাচ্ছলে আক্রমণ করেন। পালার প্রতিটি মুহূর্তেই ‘ঠ্যাশ’ পাল্টা ‘ঠ্যাশ’-এর পরিবেশনায় পালা হয়ে ওঠে হাস্যরসের আসর। পালায় হাস্যরসের উদ্রেকের পেছনে পালার গানগুলোর বেশ ভূমিকা রয়েছে। পালার প্রতিটি গান শালা-দুলাভাই সম্পর্কের মধ্যকার খুটিনাটি বিষয়াদি বর্ণিত হয়। যার মধ্যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম টিপ্পনীও থাকে। নিচের গানটির পঙক্তিগুলোতে সেই বর্ণনাই পাওয়া যায়।

> আমার শালাটা বোকা, থাকে গো একা,
> বুঝাইলে সে বুঝ মানে না, দিতে চায় ধোকা ॥
> আমি কত করে বুঝাই আমার শালাকে ডাকিয়া,
> বুঝ মানে না আমার শালা দূরে যায় সরিয়া।
> আমি আর কত বুঝাই, আমি খাই মোর কামাই,
> এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ায় খায় কত ধাক্কা ॥ (মনির, ২০১৭ : পরিবেশনা)[৩৪]

এই গানটির কথার বিষয়বস্তুর মতো নানা বিষয় নিয়ে বিচারগানের এই চমকপ্রদ পালাটি আসরে পরিবেশিত হয়ে থাকে। লোকনাটকের বিষয়বস্তু যতো চটুলই হোক না কেন পরিবেশনার প্রতিটি গানেই সুর ও তালের আবেদন থাকে প্রগাঢ়। পালার পরিবেশনায় দেখা যায়, কখনো কখনো গায়েনগণের দ্বিপাক্ষিক তত্ত্ব-তর্কের লড়াই ম্রিয়মান থাকে কিন্তু পালার অনন্য-অসাধারণ গানগুলোর জাদুকরী শক্তিতে দর্শক-শ্রোতা পরিবেশনায় মুগ্ধ হয়ে থাকেন। আর বিচারগানের দর্শকপ্রিয়তার অন্যতম কারণ হচ্ছে পরিবেশনাটির বৈচিত্র্যময় পালাসমূহ। শালা-দুলাভাই পালা তেমনই একটি বৈচিত্র্যময় পালা।

শালী-দুলাভাই পালা

বিচারগানের বিষয়-বৈচিত্র্যের মধ্যে সবচেয়ে হাস্যরসত্মক পালা হচ্ছে শালী-দুলাভাই পালা। পালাটি অনেক বেশি চটুল বা হালকা মেজাজের হয়ে থাকে। চিরাচরিত বাঙালি সমাজে রসপূর্ণ সম্পর্ক হিসেবে পরিচিত শালী-দুলাভাইয়ের মধ্যকার সম্পর্ককে তামাশা বা চাতুরীর সাথে বিচারগানে পালাটি পরিবেশিত হয়। শালী-দুলাভাই পালার পরিবেশনায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সূক্ষ্ম বা স্থুলভাবে যৌন ইঙ্গিতে ভরা কথাবার্তার আধিক্য থাকে। পালাটিতে সব সময় দুলাভাইপক্ষে গান করেন একজন পুরুষ গায়েন আর শালীপক্ষে গান করেন একজন নারী গায়েন। গায়েনগণ শালী ও দুলাভাই চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকদের মাতিয়ে রাখেন। এ পালাটির দর্শক গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে নির্দিষ্টতা রয়েছে। সাধারণত বিচারগানের ধর্ম বিশ্লেষণাত্মক পালাগুলো বিজ্ঞদর্শকদের নিকট বেশি জনপ্রিয় হয়। আর হাস্যরসাত্মক পালাগুলো তুলনামূলকভাবে অল্প বয়সী ও উপরিতলের চিন্তা-ভাবনার মানুষই বেশি পছন্দ করেন। এক্ষেত্রে দেখা যায়, পির-গোঁসাইপন্থী বা তরিকতপন্থী দর্শক-শ্রোতাবৃন্দ শালী-দুলাভাইয়ের মত পালাগুলো পছন্দ করেন না। এ কারণে এ সমস্ত পালা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বিশেষত মাজার, মন্দির ও পির-গোঁসাইদের বাড়িতে আয়োজিত হয় না। এ পালাগুলো প্রধানত বারয়ারি মেলা কিংবা পারিবারিক অনুষ্ঠান পরবর্তী সময়ে যেমন- বিয়ে, সুন্নতে খাৎনা, মুখেভাত বা অন্নপ্রাশন শেষে আয়োজিত হয়। যেখানে দর্শক-শ্রোতাগণ নিছক বিনোদন খোঁজেন। এ পালাগুলোতে কেউ কোনো গুরুগম্ভীরতত্ত্ব শুনতে চায় না। তাছাড়া শালী-দুলাভাই পালায় কুশীলবগণ নানা রকম অশ্লীল কথাবার্তা ও অঙ্গভঙ্গি করে থাকেন। শালী ও দুলাভাইপক্ষের গায়েনগণ একে-অপরকে ঠাট্টাচ্ছলে রমণ-রসাত্মক কথাও বলে থাকেন। এমনকি পালাটিতে গায়েনদ্বয় প্রশ্নও করেন খুবই হালকা ও উপরিতলনির্ভর। প্রশ্নগুলোতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যৌন-কামনা-বাসনাই বেশি থাকে। সামগ্রিকভাবে শালী-দুলাভাই পালার প্রশ্ন-উত্তরের বিশ্লেষণ করলে কতগুলো সাধারণ বিষয় পাওয়া যায়। যেমন-

১. দুলাভাইয়ের নজর ভালো না কেন?

২. শালীর চলন ভালো না কেন?

৩. দুলাভাই স্বামীর মত নাকি ভাইয়ের মত?

৪. শালী বউয়ের মত নাকি বোনের মত?

৫. শালী বিয়ে করা যায় কিনা? বিয়ে করা গেলে কখন করা যায়?

৬. দুলাভাই কোন কাজ করলে তার স্ত্রী তালাক হয়ে যায়?

৭. শালী কোন কাজ করলে নরকে যাবে?

৮. দুলাভাইয়ের প্রতি শালীর কী কী দায়িত্ব?

৯. শালীর প্রতি প্রতি দুলাভাইয়ের কী কী দায়িত্ব?

১০. শালী-দুলাভাইয়ের সম্পর্কটা কেমন হওয়া উচিত?

উপরি উক্ত প্রশ্নগুলো মূলত বিভিন্ন আঙ্গিকে গায়েনদ্বয় একে-অপরকে করে থাকেন। যুক্তি-তর্কের নানা পর্যায়ে বিভিন্ন ধর্মের উপমা দেন এবং সামাজিক প্রথা বা রীতিনীতি নিয়ে আলোচনা করে থাকেন। কখনো কখনো দেখা যায়, শালী ও দুলাভাইপক্ষের গায়েনদ্বয় পালায় গানের মাধ্যমেও একে অপরকে পরাস্ত করার চেষ্টা করেন। পালা কেন্দ্রিক এ সকল গানগুলোর কথায় প্রতিপক্ষের শরীরের প্রতি নানান অশ্লীল ইঙ্গিত যেমন থাকে, তেমনি কিছু দোষ-ত্রুটির বর্ণনাও থকে। কিছু কিছু গানও রীতিমত অশ্লীলতায় ভরা, যে গানগুলো সচরাচর যেখানে-সেখানে গাওয়াও সমাজে অপরাধ হিসেবে গন্য। কিন্তু পালা চলাকালীন দর্শক-শ্রোতাগণ এ গানগুলো সাধারণভাবেই গ্রহণ করে থাকেন। শালী-দুলাভাই পালায় দুলাভাইপক্ষ থেকে পরিবেশিত তুলনামূলক কম অশ্লীল ও উপস্থাপনযোগ্য একটি গান হচ্ছে-

> রঙ্গিলা শালী আমার, ও শালীরে আমার, কেন আমার মন পাগল করলিরে,
>
> ঘন্টায় ঘন্টায় বদলায় পোশাক, দেখিয়া তা হইলাম অবাক, খায় আবার বিড়ি-তামাক।
>
> লজ্জায় বাঁচিনা, বর্তমান শালীদের কিছু বলাই চলে না ॥ (মালেক, ২০১৮ : পরিবেশনা)[৩৫]

এই গানটিতে বর্ণিত বিষয়গুলো দেখেই বোঝা যাচ্ছে শালী-দুলাভাই পালাতে কী পরিমাণ চুটলতা-স্থুলতার উপস্থিতি রয়েছে। পালায় গায়েনদ্বয় প্রতিয়োগিতার সময় একে-অপরকে এমন সব কথার তীর ছুড়ে দেন যে, কোনো নতুন দর্শক তা শুনলে বিব্রত হতে পারেন। তবে বিচারগানের নিয়মিত দর্শক-শ্রোতার নিকট শালী-দুলাভাই পালাটির আলোচ্য বিষয়াদি খুবই স্বাভাবিক ও রোমাঞ্চকর। এই পালাটি আসরে পরিবেশনাকালে হাস্যরসের পরিস্থিতি তৈরিতে এর বিষয়বস্তুই মূখ্য ভূমিকা পালন করে। সুতরাং বিচারগানের বিষয়-বৈচিত্র্যকে সমৃদ্ধ করতে শালী-দুলাভাই পালার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

দেবর-ভাবী পালা

বিচারগানের হাস্যরসাত্মক পালাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ও চমকপ্রদ পালাটি হচ্ছে দেবর-ভাবী পালা। পালাটির লড়াইয়ের বিষয় হচ্ছে বাঙালি সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য দুটি চরিত্র দেবর ও ভাবী। এ দুটি চরিত্র বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির লোকনাট্য ও লোকসংগীতে নানাভাবে উপস্থাপিত হয়। লোকনাট্য পরিবেশনায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যৌনতায় ভরা ঘটনা ও কথাবার্তাকে আশ্রয় করে চরিত্র দুটি উপস্থাপিত হয়। তবে কখনো কখনো মাতা-পুত্রের সম্পর্কের মতো শ্রদ্ধা ও স্নেহকে প্রাধান্য দিয়েও চরিত্র দুটি মঞ্চে পরিবেশিত হয়ে থাকে। বিচারগানেও গায়েনগণ দেবর-ভাবী পালাটি নিয়ে এই দুই উপায়েই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। বিচারগানের দেবর-ভাবী পালাটি যেমন এক শ্রেণির দর্শক-শ্রোতার নিকট বেশ জনপ্রিয়, তেমনি পালাটি নানা কারণে সমালোচিতও বটে। বিশেষ করে বিচারগানের বিজ্ঞ গায়ক, পির-গোঁসাই, ভক্ত ও দর্শক-শ্রোতা এই পালাটির তীব্র বিরোধীতা করে থাকেন। এ জন্য পালাটি কখনোই মাজার-মন্দির কিংবা পির-গোঁসাইদের বাড়িতে আয়োজিত হয় না। যদিও অনেক গায়ক পালাটির সর্বজনিন গ্রহণযোগ্যতার জন্য নানাভাবে ধর্মীয় তত্ত্ব ও পৌরাণিক কাহিনির উদাহরণ দিয়ে দেবর-ভাবী সম্পর্কের গভীরতা ও পবিত্রতার পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করে থাকেন। বিশেষ করে পালাটিতে গায়েনগণ হাদিস ও রামায়ণের উদ্ধৃতি দিয়ে কথা বলেন। তথাপি পালার বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে যৌনতা সম্পর্কিত অশ্লীল কথাবর্তা চলে আসে। এজন্যই হয়তো পালাটি একই সঙ্গে জনপ্রিয় ও সমালোচিত। দেবর-ভাবী পালায় গভীর ও আধ্যাত্মিক কোনো আলোচনা থাকে না বললেই চলে। এই পালায় মূলত সম্পর্কের ভিত্তিতে একে-অপরের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্যের বিষয়গুলো আলোচিত হয়। দেবর ও ভাবী এই দুটি চরিত্রের সম্পর্ক নিয়ে বিশ্লেষণাত্মক প্রশ্ন করা হয়। পালাটির মধ্যে কিছু সাধারণ প্রশ্ন থাকে। এই প্রশ্নগুলোর সারাংশ করলে নিম্নের বিষয়গুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ক. দেবর-ভাবীর সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত?

খ. দেবরের প্রতি ভাবীর কর্তব্য কী?

গ. ভাবীর প্রতি দেবরের কর্তব্য কী?

ঘ. দেবর ও ভাবীর মধ্যে যে প্রেম তা কোন প্রকারের প্রেম?

ঙ. দেবরের প্রতি ভাবী কী মায়ের ভূমিকা পালন করবে নাকি বউয়ের ভূমিকা পালন করবে?

চ. হাদিসে দেবর-ভাবীর ব্যাপারে কী সর্তক করা হয়েছে?

ছ. সীতা ও লক্ষণের মধ্যকার যে দেবর-ভাবীর সম্পর্ক জগতের সব দেবর-ভাবীকে কেন সে রকম হওয়া উচিত?

তবে বিচারগানের দেবর-ভাবীর প্রায় প্রত্যেকটি পালায়ই গায়েনগণ দেবর হিসেবে লক্ষণ ও ভাবী হিসেবে সীতার দৃষ্টান্তের উদাহরণ দিয়ে থাকেন। সেই সাথে গায়েনগণ রাম, লক্ষণ ও সীতার মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে কোনো না

কোনো প্রশ্ন করেন। এ রকম প্রশ্ন-উত্তর পাওয়া যায়, পুরোনো অডিও ক্যাসেটে রের্কডকৃত সুরুজ মিয়া বয়াতি ও আকলিমা বেগমের উপস্থাপনায় দেবর-ভাবীর একটি পালায়। পালাটিতে ভাবীপক্ষের গায়েন আকলিমা বেগম প্রশ্ন করেন-

> আমি জানতে চাই, ও দেওরা, তুমি বইলো তো এমন একজন ভাবী ছিলো আর ভাই ছিলো, তাদের দুইজনকে তার বাবা-মা বনবাসে পাঠিয়ে দেয় জঙ্গলে। তারা রাজত্ব ছাইড়া দিয়া যখন জঙ্গলে যাইতে লয় তখন সেই ভাইয়ের ছিলো ছোট একটি ভাই, রাজত্ব বাদ দিয়া, ত্যাগ কইর‌্যা, শান্তিকে ত্যাগ কইর‌্যা উনি চলে যাইতে চাইল তার ভাইয়ের সঙ্গে। অবশেষে তার ভাইয়ের সঙ্গে গেল। কিন্তু বনের ভিতরে গিয়া দেখা গেল, তার ভাই, তার ভাবী ছিলো, সেই ভাবীকে অনেকগুলো লোকে আটক কইর‌্যা নিয়া যায় এক জায়গায়। ধইর‌্যা নিয়া যাওয়ার পরে সেই ভাবীকে ছুটাইবার জন্য তার প্রাণ পর্যন্ত চলে গিয়েছিলো। সে মৃত্যুবরণ পর্যন্ত করেছিলো। অবশেষে সে আবার জীবিত হয়েছে। আমি জানতে চাই, সে ভাবী কে, দেওর কে এবং ভাইটাই কে ছিলো? সুন্দরভাবে এর জবাব দেওয়ার চেষ্টা করবেন। (আকলিমা, ১৯৯৯ : পরিবেশনা)

এই প্রশ্নের উত্তরে পালাটিতে বিপক্ষের গায়েন সুরুজ মিয়া বয়াতি রামায়ণের রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার ঘটনাটি বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ঘটনার ভাবী হচ্ছেন সীতা, দেবর হচ্ছেন লক্ষ্মণ এবং ভাই হচ্ছেন রাম। (আকলিমা বেগমের প্রশ্নের জবাবে সুরুজ মিয়া বয়াতির উত্তর অভিসন্দর্ভের পরিশিষ্টে যুক্ত করা হয়েছে) দেবর-ভাবী পালাটিতে গদ্য ও কাব্য কথার পাশাপাশি বহু চটুল গানও পরিবেশন করেন গায়েনগণ। কোনো কোনো গান এমনও আছে যা পরিবেশনাস্থল ছাড়া সমাজে গাওয়ার অনুপযোগী। এই পালাটির গানগুলোতে চটুলতার পাশাপাশি অবশ্য যৎসামান্য নীতিকথা বা ভক্তি-সম্মানের বিষয়গুলোও থাকে। এ রকম একটি গান হচ্ছে-

> আমার প্রাণের ভাবীজান, দেবরেরও পরাণের পরাণ,
> ভাবী বিনে এই দেবরের বাঁচে না গো প্রাণ ॥
> বড় ভাবী মায়ের সমান, করো ভাই সম্মান,
> বুকের দুধ খাওয়াইয়া ভাবী দেবরকে বাঁচান ॥ (লতিফ, ২০১৭ : পরিবেশনা)[৩৬]

চটুলতা-অশ্লীলতা কতটা নগ্ন হতে পারে এই গানটিই যেন একটি চূড়ান্ত উদাহরণ। গায়েন লতিফ সরকার গানের এক পঙক্তিতে বলেছেন, 'বড় ভাবী মায়ের সমান, করো ভাই সম্মান' আবার আরেক পঙক্তিতে বলেছেন, 'বুকের দুধ খাওয়াইয়া ভাবী দেবরকে বাঁচান'। গানে একই সঙ্গে দেবর যেমন ভাবীকে মায়ের মতো বলে সম্মান দিচ্ছেন, আবার বাঁকাভাবে কামনার ইঙ্গিতও দিচ্ছেন। এই পালাটিতে ধর্মীয় ও পৌরাণিক কাহিনির উদাহরণ দিয়ে গায়েনগণ নিজের পক্ষের যুক্তিকে শক্ত অবস্থানে ধরে রাখার চেষ্টা করেন। সেই সঙ্গে দর্শক-শ্রোতাদের মাঝে দেবর-ভাবীর মধ্যকার সম্পর্ককে পবিত্র বন্ধন হিসেবে আখ্যায়িত করে প্রচার করেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ও বিভিন্ন মাধ্যমে বিচারগানের আসরে দেবর-ভাবী পালাটি এখনও পরিবেশিত হয়। পালাটিতে অনেক গায়েনই অভিনয় করেন। তবে দেবর-ভাবী পালার গায়েন হিসেবে অডিও ক্যাসেটের যুগে মালেক সরকার, আকলিমা বেগম, গনি সরকার ও পাগল

মনির প্রমুখ জনপ্রিয় ছিলেন। বর্তমানে লতিফ সরকার, ছোট রজ্জব আলী দেওয়ান, শেফালী সরকার ও লিপি সরকার জনপ্রিয়তার দিক থেকে সর্বাগ্রে রয়েছেন। বিচারগানে দেবর-ভাবী পালার বিষয়বস্তুর চটুলতা-স্থুলতার পাশাপাশি গানের কথা ও সুরের ভিন্নতাই বিচারগানের বিষয়গুলোকে বৈচিত্র্যময় করেছে।

ননদ-ভাবী পালা

হাস্যরসাত্মক পালাসমূহের আরেকটি জনপ্রিয় পালা হচ্ছে ননদ-ভাবী পালা। এ পালাটিও হাস্যরসাত্মক অন্যান্য পালার মতোই স্থুল হাস্যরসে ভরা, যেখানে মৃদু অশ্লীলতা রয়েছে। এ পালায় মূলত আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ ননদ ও ভাবীর মধ্যকার চিরাচরিত বিষয়গুলোকে ঠাট্টাচ্ছলে গায়েনগণ আসরে উপস্থাপন করে থাকেন। ননদ-ভাবী পালায়ও বিচারগানের অন্যান্য পালার মতোই দুজন গায়েন পরিবেশনা উপস্থাপন করেন, তবে এই পালায় দুজন গায়েনই থাকেন নারী। সাধারণত দেখা যায়, যিনি বয়সে বড় তিনি ভাবী চরিত্রে আর যিনি বয়সে ছোট হন তিনি ননদ চরিত্রে অভিনয় করেন। তবে চরিত্র বিভাজনে বয়সের বিষয়টি সুনির্দিষ্ট নয়। বিচারগানের অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক পালার মতোই গায়েনদ্বয় নিজের পক্ষের পালাকে জেতানোর জন্য আসরে যুক্তি উপস্থাপন করে থাকেন। যুক্তি-পাল্টা যুক্তির পাশাপাশি গায়েনগণ নিজের পালার বিষয়ের প্রশংসামূলক গান গেয়ে থাকেন। এ সকল গানের ভাষাতে অশ্লীলতা ও যৌনতা মিশ্রিত বিষয়াদি থাকে। দেখা যায়, এক গায়েন অন্য পক্ষের পালার ত্রুটি ধরলে আরেক পক্ষের গায়েনও পাল্টা ত্রুটি খুঁজে বের করেন। ননদ-ভাবী পালায় গায়েনগণ বিপক্ষের পালার চরিত্রের সমালোচনা করার পাশাপাশি কতগুলো প্রশ্ন করে থাকেন। ননদ-ভাবী পালায় প্রচলিত কিছু প্রশ্ন ও সমালোচনামূলক বিষয় নিম্নরূপ-

ননদের প্রতি ভাবীর প্রশ্ন ও সমালোচনা :

ক. ননদ তোমার চলাফেরা ভালো না, তুমি পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াও।

খ. ননদ তোমার জন্য পাড়ার ছেলেরা নষ্ট হচ্ছে।

গ. ননদ তোমার কী লজ্জাও করে না? শুধু খাও আর ঘুমাও।

ঘ. ননদ এতো সাজগোজ করো কার জন্য? তোমার ভাইয়ের নিকট কিন্তু নালিশ করবো।

ঙ. ননদ তোমার চরিত্র ভালো না, পাশের বাড়ির জনৈক ছেলের সাথে তোমার কিসের সম্পর্ক?

ভাবীর প্রতি ননদের প্রশ্ন ও সমালোচনা :

ক. ভাবী তুমি সারারাত জেগে কী কর? দিনের বেলা ঘুমাও কেন?

খ. ভাবী তুমি শ্বশুর বাড়ি থেকে বাবার বাড়ি জিনিসপত্র পাচার কর।

গ. ভাবী তুমি ভাই থাকতে অন্য ছেলের সাথে গল্প কর কেন?

ঘ. ভাবী তোমার চেহারা ভালো না, চরিত্র ভালো না, তোমার বংশও ভালো না।

ঙ. ভাবী তুমি আমাদের বাড়ি আসার পর থেকে আমাদের সংসারে অশান্তি লেগেছে।

ননদ-ভাবী পালায় এ রকম সাধারণ বিষয়াদি নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যমূলক কথাবার্তা বলে গায়েনগণ একে-অপরকে পরাজিত করার চেষ্টা করেন। দেশে এই পালাটিতে অনেক শিল্পীই অভিনয় করেছেন। তার মধ্যে আকলিমা বেগম, শেফালী সরকার, লিপি সরকার ও মিনারা বেগম বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। এই শিল্পীদের মধ্যে লিপি সরকার ও শেফালী সরকার অভিনীত ননদ-ভাবী পালার একটি ভিসিডি ক্যাসেট এক সময় গ্রামবাংলায় বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছিলো। পালাটিতে লিপি সরকার ও শেফালী সরকারের পরিবেশনার কিছু অংশে ননদ-ভাবী পালার মধ্যকার স্বরূপ পাওয়া যায়, যেখানে চারিত্রিক দ্বান্দ্বিকতা, ঠাট্টা-তামাশা ও মৃদু অশ্লীলতা রয়েছে। এই পালাটিতে ভাবীপক্ষ থেকে গায়েন শেফালী সরকার পালার প্রযোগিতায় বিজয়ী হওয়ার জন্য ননদকে আক্রমণাত্মক বেশিকিছু কথা বলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-

> সংসারে যিনি বড় হয়, বড় গুণ তারই হয়, যার বড় গুণ থাকে। তো ভাগ্যক্রমে আমি আজকের লিপি সরকারের ভাবী। ভাবীর যেই দায়িত্ব, যেই কর্তব্য ননদের প্রতি থাকে, যেই শাসন থাকে, এই শাসন যেই ননদী মানে, সেই হলো ভালো ননদ। আর যেই ননদ মানে না, হ্যারে আবার দুয়েকটা চড়-থাপর দিয়া সাইজ করতে হয়। তো দেখি আমার ননদ কী রকম, দেখি আমার কথা শুনে কিনা? (শেফালী, ২০১৭ : পরিবেশনা)

উপরি উক্ত কথার জবাবে শেফালী সরকারকেও আসরে বেশ কড়া কথা বলেন ননদপক্ষের গায়েন লিপি সরকার। বিশেষ করে পালায় ঠাট্টাচ্ছলে গায়েনদ্বয় একে-অপরের প্রতি বিভিন্ন রকম দোষারোপ করেন। ননদ বলেন ভাবীর চরিত্র খারাপ, আবার ভাবীও বলেন ননদের চরিত্র খারাপ। ননদ-ভাবী পালাটিতে বেশ চটুল ও স্থূল কথার গানও পরিবেশিত হয়। বিশেষত গানের মধ্যে যৌনতাসংশ্লিষ্ট কথার পাশাপাশি উপদেশ ও বিদ্রুপের বিষয়গুলো থাকে। এছাড়া গানে গায়েনদ্বয় নিজের পক্ষের বিষয়কে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করতে যেয়ে অপর পক্ষের বিষয়কে ছোট করে উপস্থাপন করেন। ননদ-ভাবী পালায় পরিবেশিত গানগুলোতে যে চটুলতার উপস্থিতি রয়েছে, তার প্রমাণ পাওয়া যায় নিচের গানটির পঙক্তিগুলোতে-

> ওলো ছোট ননদী সন্ধ্যার পরে ঘুরতে যাইও না,
> সন্ধ্যার পরে ঘুরতে যাইয়া ছ্যাকা খাইও না ॥
> আমি তোমার বড় ভাবী, আমার কাছে ঘরের চাবি,
> ভাবীর দাবি উড়াই দিও না ॥ (শেফালী, ২০১৭ : পরিবেশনা)[৩৭]

ননদপক্ষের গায়েনও এই গানটির মতোই চটুলতাপূর্ণ কথাবার্তায় আসরে গান পারিবেশন করে থাকেন। ননদ-ভাবী পালার প্রতিটি আসর মূলত কথা ও গানের চুটুলতায় হাস্যরসে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। যার কারণে বিচারগানের দর্শক-শ্রোতাও শিল্পরসের স্বাদ নিতে লোকনাটক বিচারগানের ননদ-ভাবী পালাটি উপভোগ করেন।

হাস্যরসাত্মক পালার বিয়াই ও বিয়াইন সংক্রান্ত পালাসমূহ

বাঙালি সংস্কৃতিতে সম্পর্কের তামাশায় ভরা দুটি চরিত্র বিয়াই-বিয়াইন। এ চরিত্র দুটির মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে বাঙালি সমাজে নানা রকম রসবোধ বা হাস্যরসিকতা রয়েছে। আর বিচারগানের এই দুটি চরিত্রের মাধ্যমে বৈচিত্র্যপূর্ণ দুটি পালা তৈরি হয়েছে। পালা দুটি হচ্ছে বিয়াই-বিয়াইন ও দুই বিয়াইন। পালা দুটির পরিবেশনা কৌশল ও বিষয়বস্তু প্রায় একই রকম। এ দুটি পালার মধ্যে প্রধানত ঠাট্টা-মশকরা, যৌনটিপ্পনী, আত্মীয়তার অধিকারে মৃদু খোঁটা/খোঁচা ও একে-অপরকে হাস্যচ্ছলে অপমান করার প্রবণতা থাকে। দেখা যায়, গায়েনদ্বয় এই বিষয়গুলো অবলম্বন করে হাস্য-কৌতুকের আঘাতে একে-অপরকে আসরে পরাজিত করতে চায়। বিয়াই-বিয়াইন পালায় গায়েনগণ একে-অপরকে প্রেম ও কামের নানা রকম প্রস্তাব দেন। আবার কখনো কখনো গায়েনদ্বয় চরিত্রের অহমিকা দেখিয়ে প্রেমকে প্রত্যাখান করেন। অন্যদিকে দুই বিয়াইন পালায় গায়েনগণ অভিনয়ের খাতিরে নানা রকম অভিযোগ ও অপবাদ-অপমানমূলক কথাবার্তা বলে থাকেন। হয়তো এক পক্ষের গায়েন অন্য পক্ষের বিয়াইনের গায়েনকে 'চরিত্রহীন-নষ্টা' বলে গালি দেন, এর পক্ষান্তরে হয়তো অন্যজন তাকে আবার 'লোভী-চুন্নী-বেশরম' বলে গালি দেন। পালা দুটির পরিবেশনায় সব সময় বিয়াই-বিয়াইন পালায় একজন পুরুষ ও আরেকজন নারী গায়েন অভিনয় করেন। অন্যদিকে দুই বিয়াইন পালার অভিনয়ে দুই গায়েনই নারী গায়েন থাকেন। বিয়াই-বিয়াইন সংক্রান্ত পালায় লীলা পাগলী ও পাখি সরকার খুবই জনপ্রিয় গায়েন। বিচারগানের প্রবীণ দর্শক-শ্রোতাদের ভাষ্য মতে, 'এই পালা দুটি এক সময় বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বিয়ে বাড়িতে ও মালাই বিক্রেতার মাইকে উৎসবমুখর পরিবেশে বাজানো হত। দর্শক-শ্রোতাও বেশ উপভোগ করতো।' অবশ্য বর্তমানে আধুনিক প্রচার মাধ্যম ইউটিউবেও কোনো কোনো গায়ক-গায়িকা পালাগুলো ধারণ করে প্রচার করেন। পালায় পরিবেশিত গানের কথার শব্দ চয়নও খুবই চমকপ্রদ হয়ে থাকে। যার মধ্যে চরিত্র দুটি সম্পর্কে প্রচলিত বিষয়গুলো বিদ্যমান থাকে। নিচে বিয়াই-বিয়াইন পালা ও দুই বিয়াইন পালা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

বিয়াই-বিয়াইন পালা

অশ্লীলতা ও স্থূলতার্নিভর বিভিন্ন লোকপরিবেশনা লোকসংস্কৃতি তথা ফোকলোরের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে স্বীকৃত। লোকসমাজের প্রতিটি বিষয়ই কৃত্রিমতা বিবর্জিত ও স্বাভাবিক প্রকাশের ফলাফল। এ কারণে লোকগবেষণায় এই বিষয়গুলো এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব তো নয়ই বরং বর্জন করা অনুচিত। ফোকলোরে অশ্লীলতার উপস্থিতি প্রসঙ্গে ড. মযহারুল ইসলাম বলেন, 'অটোগ্রাফ বইয়ের কবিতা, মারজিনালিয়া বই, কিছু এপিটাফ, শিকলী চিঠি, লেট্রিনালিয়া প্রভৃতির সৃষ্টি লিখন পদ্ধতিতে, কিন্তু এগুলো ফোকলোর হিসেবে স্বীকৃত।' (মযহারুল, ২০২০ : ৪) এখানে যে লেট্রিনালিয়া বিষয়টি রয়েছে, তার অর্থ হচ্ছে শৌচাগারের কবিতা। আর এই কথাটিও সত্য যে, শৌচাগারের কবিতার মধ্যে বিপুল পরিমাণ অশ্লীলতার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নিতে হয় ফোকলোরের মধ্যে অশ্লীল বিষয়াদিও অন্তর্ভূক্ত। আর বিচারগানের হাস্যরসাত্মক পালাসমূহের মধ্যে অনেক পালাই রয়েছে যেখানে অশ্লীলতার উপস্থিতি রয়েছে। এই অশ্লীলতাপূর্ণ পালাগুলোর মধ্যে বিয়াই-বিয়াইন পালা অন্যতম। বাংলাদেশে বিচারগানের আসরে বিয়াই-বিয়াইন পালাটি ঠিক কবে থেকে যুক্ত হয়েছে, সেটি নিশ্চিতভাবে বলা না গেলেও পালাটির কিছু ভিডিওপরিবেশনা থেকে ধারণা করা যায় ১০-১২ বছর আগে পালাটির উৎপত্তি হয়েছে। সেই সাথে বিয়াই-বিয়াইন পালার বিভিন্ন পরিবেশনা পর্যবেক্ষণ করে এটাও বলা যায় পালাটিতে সর্বপ্রথম অভিনয় করেছেন ছোট রজ্জব দেওয়ান ও লিপি সরকার। এখন আলোচ্য বিষয় হচ্ছে বিচারগানের এই হাস্যরসাত্মক অশ্লীলতায় ভরা পালাটিতে কোন কোন বিষয় আালোচিত হয়। অন্যান্য পালাগুলোর মতোই বিয়াই-বিয়াইন পালাতেও শিরোনামের দ্বিপাক্ষিক বিষয় নিয়ে গায়েনগণ কথা ও গানের যুক্তিতে আসরে প্রতিযোগিতা করে থাকেন। পালাটিকে বিচারগানের হাস্যরসাত্মক পালাসমূহের অন্তর্ভূক্ত করা হলেও পালাটি আত্মীয় সম্পর্কিত পালাসমূহের মধ্যেও আলোচনা করা যায়। কিন্তু পালায় হাস্যরসের উপস্থিতি বেশি হওয়ায় হাস্যরসাত্মক পালাসমূহের অন্তর্ভূক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। পালায় পরিবেশনাকালে গায়েরনগণ কতগুলো নির্দিষ্ট বিষয় আলোচনা করে থাকেন। সেই বিষয়গুলো হল- বিয়াই ও বিয়াইনের মধ্যকার সম্পর্কের মধ্যে প্রেম ও কামের উপস্থিতি; বিয়াই ও বিয়াইনের মধ্যে কে বেশি সুন্দর বা সুন্দরী; কার মধ্যে কত বেশি গুণ রয়েছে; একে-অপরের চরিত্র ধরে সমালোচনা করা; বিয়াই ও বিয়াইনের মধ্যে কে বেশি প্রেমাসক্ত; কামশক্তিতে বিয়াই ও বিয়াইনের মধ্যে কে বেশি বলবান; দুই জনের পারিবারিক বিষয়াদি নিয়ে একে-অপরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করাসহ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে গায়েনগণ প্রতিযোগিতা করে একে-অপরকে পালায় পরাজিত করার চেষ্টা করেন। বিয়াই-বিয়াইন পালায় গায়েনগণ এই বিষয়গুলো আলোচনাকালে নানা রকম অশ্লীল কথাবার্তার সাথে অশ্লীল গল্পও পরিবেশন করেন। এই বিষয়টির প্রামাণ্য হিসেবে ছোট রজ্জব দেওয়ান ও লিপি সরকার পরিবেশিত বিয়াই-বিয়াইন পালা থেকে উদাহরণ দেয়া যায়। পালায় লিপি সরকার, ছোট রজ্জব দেওয়ানকে

বিয়াই হিসেবে অপমান করতে যেয়ে ছাগল, বলদ, পাঠা, শূকর প্রভৃতি বলতে যেমন দ্বিধা করেননি, তেমনি বিয়াইয়ের চারিত্রিক স্বভাব নিয়েও কথা বলেন। এর পাল্টা জবাবে ছোট রজ্জব দেওয়ান পাঠা প্রসঙ্গ টেনে বলেন, পাঠার কাজ কী, তা জানতো? বিয়াই কিন্তু বিয়াইনকে তাই করবে। এখানে অনেকটা পরিশিলিত ভাষায় বলা হলেও ছোট রজ্জব দেওয়ান বেশ নগ্ন বা স্থুল ভাষায় বিষয়গুলো বলেন। এছাড়া লিপি সরকার পালায় এক পর্যায়ে ছোট রজ্জব দেওয়ানকে 'খোঁটা' দিতে গিয়ে বলেন,

> বিয়াই বাংলাদেশের বুকে এত নারী থাকতে আপনে বিয়াইনের পিছে কেন ঘুরঘুর কইরা ঘুইরা বেড়ান! অ্যা! আপনি কী আর কাউকে চোখে দেখেন না? এই বাংলাদেশে কী আর কেউ নাই? বিয়াইনের পাছে পাছে, লেঙ্গুরের পিছে পিছে ঘুরতে হইব! অ্যা, এইটা কোন স্বভাব!...কী বলবো, চিকার গন্ধ শরীর ভরা।... দোষ ছাড়া গুণ দেখি না তোমার ভেতরে।' (লিপি, ২০১৮ : পরিবেশনা)

লিপি সরকারের এই তুচ্ছাত্মক কথার জবাবে ছোট রজ্জব দেওয়ানও বেশ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে লিপি সরকারকে 'খোঁচা' দেন। ছোট রজ্জব দেওয়ান পালার এক পর্যায়ে লিপি সরকার বা বিয়াইনকে কাম-উত্তেজিত ছাগীর সাথে তুলনা করেন। তার মানে বোঝাই যাচ্ছে পালাটিতে অশ্লীলতা-স্থুলতা কোন পর্যায়ে পৌঁছায়। তবে এ কথাও সত্য বিচারগানের এই পালাগুলোর অশ্লীলতা-স্থুলতা গায়েন-দর্শক-শ্রোতাদের নিকট খুবই স্বাভাবিক বিষয়। এমনকি এ রকম অশ্লীলতা-স্থুলতা পালায় থাকে বলেই এক শ্রেণির দর্শক-শ্রোতা এই হাস্যরসাত্মক পালাগুলো পছন্দ করেন। বরং কোনো গায়েন যদি এই পালাগুলো পরিবেশনাকালে চটুল কথাবার্তা না বলেন, সেক্ষেত্রে দর্শক-শ্রোতা আশাহত হন। কারণ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অনেকের কাছে এ বিষয়গুলো বিনোদনের বিষয় হিসেবে স্বীকৃত। পালায় এই বিষয়গুলো গদ্য-কাব্য কথায় আলোচনার পাশাপাশি গানে গানেও বর্ণিত হয়। এই গানগুলোর পঙক্তিগুলোও বেশ চটুলতায় ভরা। এ রকম একটি গানের উদারহণ হচ্ছে-

> কী খাওয়া খায়রে বিয়াইন লেটকি মারিয়া,
> ফুটবলের মতো বিয়াইন গেছে ফুলিয়া ॥
> আগে তো ভালো আছিলা এখন কেমনে মোটা হইলা,
> নাকি কিছু পুশ করিলা কও না খুলিয়া ॥ (রজ্জব, ২০১৮ : পরিবেশনা)[৩৮]

এই গানটির মতোই বিয়াই-বিয়াইন পালার প্রায় প্রতিটি গান। যেখানে বিয়াইপক্ষ থেকে বিয়াইনকে কামনা-মিশ্রিত কথাবার্তায় 'খোঁচা' দেন, আবার বিয়াইনও তার পালা পক্ষ থেকে বিয়াইকে তামাশার সুরে যৌনতা-মিশ্রিত কথায় টিপ্পনী কাটেন। মূলকথা হচ্ছে পালাটিতে বিয়াই-বিয়াইনের সম্পর্ককে উপজীব্য করে যৌনতা কেন্দ্রিক হাসি-তামাশা করা হয়। আর হাসি-তামাশার গল্পচ্ছলে অশ্লীল কথাবার্তা আলোচিত হয়ে থাকে। যেহেতু লোকসমাজে এই অশ্লীলতা স্বাভাবিক ও গ্রহণযোগ্য, সেহেতু বিচারগানের বিয়াই-বিয়াইন পালাটির সংযোজন নিঃসন্দেহে স্বাভাবিক বলে গন্য।

সেই সাথে নতুন বিষয়ের পালা হিসেবে লোকনাটক বিচারগানকে বিয়াই-বিয়াইন পালাটি বৈচিত্র্যময় পরিবেশনা হিসেবে সমৃদ্ধ করেছে।

দুই বিয়াইন পালা

হাস্যরসাত্মক পালার বিয়াই ও বিয়াইন সংক্রান্ত পালাসমূহের দ্বিতীয় পালাটি হচ্ছে দুই বিয়াইন পালা। অভিসন্দর্ভে পূর্বে বিয়াই-বিয়াইন পালাটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া দুই বিয়াইন পালা সম্পর্কে প্রথমেই সামান্য আলোচনা করা হলেও এ পর্যায়ে বিচারগানের স্বতন্ত্র পালা হিসেবে দুই বিয়াইন পালার পরিবেশনা ধরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। হাস্যরসাত্মক অন্যান্য পালার মতোই দুই বিয়াইন পালাও বেশ চটুল ও হাস্যরসাত্মক। পালাটির বিষয়বস্তু হচ্ছে বিয়াইন ও বিয়াইনের মধ্যকার সম্পর্কের নানাবিধ বিষয়। পালার বিয়াইন বলতে বৈবাহিক সম্পর্ক জনিত যতগুলো দিক রয়েছে সব দিক থেকে বিয়াইন হিসেবে গন্য হয়। তবে গায়েনগণ পরিবেশনার সুবিধার্থে বিভিন্ন সময় সম্পর্কের দিক থেকে বিয়াইন পরিচয় ধারণ করেন। পালায় সব সময় দুইজন নারী গায়েন দুই বিয়াইন চরিত্রে অভিনয় করেন। পালাটিতে অভিনয়কালে গায়েনগণ এমন সব খোঁটা বা যুক্তি উপস্থাপন করেন, যার প্রত্যেকটিই প্রায় চটুলতা ও অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ। দুই বিয়াইন পালায় গায়েনগণ এমন এমন কথাবার্তা বলেন, যেগুলো বাস্তবিক জীবনে সুশীল সমাজে উপস্থাপনের অনুপযোগী। তবে এখানে গবেষণার প্রয়োজনে বা বিচারগানের বিষয়-বৈচিত্র্যের বহুমুখী দিক বিশ্লেষণের জন্য পরিশীলিতভাবে বর্ণনা করা হবে। বাংলাদেশে এই পালাটিতে খুব বেশি গায়েন অভিনয় করেছেন এমনটি নয়। যে সকল গায়েন দুই বিয়াইন পালায় অভিনয় করেছেন তাদের মধ্যে পাখি সরকার ও নীলা পাগলী জনপ্রিয়তার শীর্ষে রয়েছেন। এছাড়া ধারণা করা যায় বাংলাদেশে সম্ভবত তারাই দুজনই সর্বপ্রথম দুই বিয়াইন পালাটিতে অভিনয় করেছেন। পালাটি প্রায় ১৫ বছর আগে ভিসিডিতে ধারণ করা হয়েছিলো। যেহেতু এই হাস্যরসাত্মক পালাগুলো বিচারগানের মূল পরিবেশনাস্থল মাজার, মন্দির ও পির-গোঁসাইদের বসতবাড়িতে অনুষ্ঠিত হয় না, সেহেতু দুই বিয়াইন পালার পরিবেশনা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভিসিডি ও বর্তমানে ইউটিউব কেন্দ্রিক হয়ে থাকে। এ পর্যায়ে আলোচনা করা যাক দুই বিয়াইন পালার আলোচনার প্রসঙ্গগুলো কী কী? দুই বিয়াইন পালা পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে নিচের আলোচ্য প্রসঙ্গগুলো চিহ্নিত করা গেছে।

ক. গায়েনগণ বিয়াইন চরিত্র থেকে অন্য বিয়াইনকে তার চরিত্রের বিষয়ে সমালোচনা করেন।

খ. এক বিয়াইন আরেক বিয়াইনকে তার ভাইয়ের সাথে অবৈধ সম্পর্কের জন্য দায়ী করেন।

গ. অলস, অকর্মণ্য ও পেটুক বলে একে-অপরকে গালি দেন।

ঘ. ঠাট্টাচ্ছলে একে-অপরকে মারতে উদ্ধত হন।

ঙ. বেড়াতে এসে দীর্ঘদিন আহার ধ্বংস করার 'খোঁটা' দেন।

চ. শারীরিক গঠন নিয়ে বিদ্রুপ করেন।

ছ. বিয়ের বয়স হয়েছে কিন্তু বিয়ে হয় না বলে 'খোঁটা' দেন।

জ. দুলাভাইয়ের বোন সম্পর্কের বিয়াইনকে আরেক বিয়াইন তার বোনকে নির্যাতনের অভিযোগ করেন।

ঝ. একে-অপরকে বিভিন্ন উপহার প্রদানের 'খোঁটা' দেন।

ঞ. গায়েনদ্বয় একে-অপরকে ঝগড়াটে বলে নিজেই আবার ঝগড়া বাঁধান।

পালায় এই বিষয়গুলো আলোচনার জন্য গায়েনগণ কিছু চটুল প্রশ্নও করে থাকেন। তবে অন্যান্য পালার মতো কোনো তত্ত্বনির্ভর প্রশ্ন গায়েনগণ করেন না। সাধারণত দেখা যায়, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের মধ্যে দ্বন্দ্বমূলক বিষয়াদি নিয়েই গায়েরগণ একে-অপরকে প্রশ্ন করেন। পাখি সরকার ও নীলা পাগলী পরিবেশিত দুই বিয়াইন পালায় এ রকম বহু প্রশ্ন-উত্তর রয়েছে। পালায় পাখি সরকারের একটি প্রশ্ন ছিলো-

> আচ্ছা, বেয়াইন তোমার কাছে একটা প্রশ্ন রাখি, তুমি তার সুন্দর জবাব করবে। সেই যে তোমার বোইনেরে বিয়া দিছো আমার ভাইয়ের কাছে, ঐ যে বোইনের লগে আইছো আমাগো বাড়িতে, আর তো যাওনের খবর লইলা না। বেড়ানোরও তো একটা সীমা আছে, তাই না? তিন বেলা খালি খাও।...কইওতো বেয়াইন তুমি যাইবা না, থাকবা? যদি থাকো তোমার বোইনেরে বিদায় কইরা দিয়া থাকবা, আর যদি যাও গা, তাইলে আল্লারওয়াস্তে আগে থাকতেই যাও গা।' (পাখি, ২০১৮ : পরিবেশনা)

এই প্রশ্নের উত্তরে নীলা পাগলীও পরাস্ত হবার নয়, তিনি জানান, তার বোন গর্ভবতী তাই তার সেবা-যত্ন করতে বোনের স্বামীর বাড়িতে আছেন। আর এই বাড়িতে দুলাভাইয়ের বোন কে? তার কথায় কিছু যায়-আসে না। এই পালাটিতে চটুল কথাবার্তার পাশাপাশি বহু চটুল গানও রয়েছে। পালাটিতে আরেকটি ভিন্নতা হচ্ছে পালায় কয়েকটি গান রয়েছে, যার সুর জনপ্রিয় গান থেকে হুবহু নকল করা। শুধুমাত্র পালার বিষয়ভিত্তিক কথা জুড়ে দিয়ে আসরে পরিবেশন করেছেন। এমনকি দুয়েকটি গানে হিন্দিগানের সুর সংযোজন করা হয়েছে। তবে গানের কথায় এতোটাই চটুলতা ও অশ্লীলতা যে চমৎকার সুর ছাপিয়ে গানের কথাই বিশেষভাবে দর্শক-শ্রোতার মনে চিহ্নিত হবে। এ কথাও স্বীকার করতে হয় গানের কথা চটুল না হলে গায়েনের কথাবার্তার সাথে মানানসই হতো না। তার মানে পালায় গায়েনের যেমন কথার বাহার, তেমনি তার গানের সমাহার। পালায় পাখি সরকার পরিবেশিত একটি গানে তার সত্যতা মিলে।

> আমার ভাইয়ে তোর দুলাভাই, তুই আমার ভাইয়ের শালী,
> আমার ভাইয়ের সাথে এত করোস ক্যান ঢলাঢলী ॥
> তোর বোইনের তো বাচ্চা পেটে স্বাস্থ্য-গতর ভালো না,

এই সুযোগে গরম রাখছোস আমার ভাইয়ের বিছানা ॥ (পাখি, ২০১৮ : পরিবেশনা)[৩৭]

বিচারগানের বিষয় কতটা বৈচিত্র্যময় এই গানটি তার স্পষ্ট প্রমাণ দেয়। এই পালাটিতে গুরু-শিষ্য, রাধা-কৃষ্ণ ও জীব-পরম পালার মতো ধর্মীয় ও গুরুগম্ভীরতত্ত্বনির্ভর পালা যেখানে রয়েছে, সেখানে দুই বিয়ান পালার মতো চটুল ও স্থূল পালাও আছে। করুণ রসের পালা যেমন আছে, তেমনি হাস্যরসের পালাও বিচারগানে রয়েছে। অর্থাৎ বিষয়ের বহুমাত্রিকতা বিচারগানের বিষয়-বৈচিত্র্যময়তাকে সমৃদ্ধ করেছে।

হাস্যরসাত্মক পালার বাইদা-বাইদানী সংক্রান্ত পালাসমূহ

বাইদা-বাইদানী সংক্রান্ত পালাগুলো লোকনাটক বিচারগানের বিষয় বৈচিত্র্যতায় অনন্যতা এনে দিয়েছে। কারণ বিষয়বস্তুর দিক থেকে বিচারগানের অন্য পালাগুলোর মধ্যে আন্তঃসাদৃশ্য রয়েছে। আর বাইদা-বাইদানী সংক্রান্ত পালাগুলো একেবারেই ভিন্ন বিষয়ের সম্মিলনে নির্মিত ও পরিবেশিত হয়ে থাকে। বাইদা-বাইদানী সংক্রান্ত পালায় সাধারণত দুটি পালা হয়ে থাকে। যথা- ক. বাইদা-বাইদানী ও খ. দুই বাইদানী। এ দুটি পালাতে মূলত বাংলাদেশের বেদে সম্প্রদায়ের জীবন ও জীবিকার নানা বিষয় গায়েনগণের পরিবেশনার মাধ্যমে আসরে চিত্রায়িত হয়। বেদে সম্প্রদায়ের জীবন-যাপনের যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট রয়েছে, তা পালাগুলোতে গায়েনগণের যুক্তি-তর্ক ও গানে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। পালায় সাধারণত বেদেদের পারিবারিক জীবন, জীবিকার পদ্ধতি, প্রেম-ভালোবাসা, সুখ-দুঃখ প্রভৃতিকে উপজীব্য করে গায়েনদ্বয় কমেডি ধাঁচে অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শক-শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করে থাকে। এ সব পালায় দেখা যায়, গায়েনদ্বয় ঠাট্টাচ্ছলে অনেক অশ্লীল কথাবার্তা বলেন এবং অশ্লীল শব্দে রচিত গান গেয়ে থাকেন। অবশ্য পরিবেশনায় এই অশ্লীলতাকে এড়িয়ে যাওয়া মানে হচ্ছে বেদে সম্প্রদায়ের বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাওয়া। কেননা এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন-যাপনের সাথে গালি-গালাজ, যৌনসুরসুরিমূলক কথা একেবারেই স্বাভাবিক বিষয়। যদিও এই চিরাচরিত অশ্লীলতাকে বেদে সম্প্রদায় মোটেও খারাপ চোখে দেখেন না। আর এ সব বাস্তব চিত্রগুলোই বিচারগানের বাইদা-বাইদানী সংক্রান্ত পালাগুলোতে অভিনীত হয়। বাইদা-বাইদানী পালায় পুরুষ গায়েন বাইদার ভূমিকায় এবং মহিলা গায়েন বাইদানীর ভূমিকায় অভিনয় করেন। পালায় একে-অপরকে নানা রকম অভিযোগ-অভিমানের সুরে পরাস্ত করার চেষ্টা করে থাকেন। এমনকি কখনো কখনো গায়েনদ্বয় একে-অপরকে ঠাট্টাচ্ছলে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজও করেন। গায়েনগণ একে-অপরকে যে সব প্রশ্ন করেন তার মধ্যেও অভিযোগ-দোষারোপ করে থাকেন। যিনি বেদের ভূমিকায় অভিনয় করেন, পালায় তাকে বেদেনীকে বলতে শোনা যায়, 'তুই তো ব্যাটা-ছেলেদের সাথে ঢলাঢলি করিস। তোর চরিত্র ভালো না।' অন্যদিকে বেদেনীপক্ষের গায়েনও কম বলেন না, তিনি বলেন, 'তুই তো কাপুরুষ, আমার কামাই খাস, নাউয়ে শুয়ে-বসে সময় কাটাস আর আমার চরিত্র নিয়ে

কথা বলিস! তোর এত বড় সাহস!’ একই রকমভাবে দুই বাইদানী পালাতেও গায়েনদ্বয় (দুজনই নারী শিল্পী থাকেন) একে-অপরকে নানা রকম ‘খোঁটা’ দেন, দোষারোপ করেন। এই পালাটিতে দেখা যায়, এক গায়েন অন্য গায়েনকে বলেন, ‘তুই তো পাড়ায় গিয়ে চুড়ি না বেচে, সিঙ্গা না লাগিয়ে, গাঁয়ের মোড়লের সাথে ভাব জমাস।’ অন্য পক্ষের গায়েন আবার পাল্টা জবাবে বলেন, ‘তুই তো বিড়ি খাস, আর জোয়ান পুরুষের মাথা খাস।’ এ রকম অভিযোগ আর নানা রকম প্রশ্নবাণে গায়েনগণ বাইদা-বাইদানী ও দুই বাইদানী পালায় অভিনয় করে থাকেন। এক সময় বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বাইদা-বাইদানী সংক্রান্ত পালার দুটি অডিও-ভিসিডির ক্যাসেট ব্যাপক জনপ্রিয় হয়েছিলো। তার একটি হচ্ছে খোরশেদ আলম বয়াতি বনাম আঁখি সরকারের বাইদা-বাইদানী পালা, আরেকটি হচ্ছে মিনারা বেগম বনাম আকলিমা বেগমের দুই বাইদানী পালা। যাহোক, হাস্যরসাত্মক পালার বাইদা-বাইদানী সংক্রান্ত পালা দুটি সম্পর্কে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

বাইদা-বাইদানী পালা

হাস্যরসাত্মক পালার বাইদা-বাইদানী সংক্রান্ত পালাসমূহের মধ্যে বাইদা-বাইদানী পালাটি অধিক জনপ্রিয়। **এই পালাটি** বাইদা-বাইদানী পালা নাম ছাড়াও রসিক বাইদা-রসের বাইদানী এবং রঙের বাইদা-ঢঙের বাইদানী নামেও সুপরিচিত। পালাটিতে বিচারগানের বহু গায়েন অভিনয় করেছেন। প্রত্যেক গায়েনই এই পালাগুলোর পরিবেশনার জন্য লোকসমাজে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছেন। পালাগুলো সরাসরি দর্শক-সম্মুখে যত না পরিবেশিত হয়, তার চেয়ে বেশি পরিবেশিত হয় অডিও এবং ভিডিও মাধ্যমকে উদ্দেশ্য করে। এই পালার জন্য বেশ কয়েকজন গায়েন সুনাম অর্জন করেছেন। তাদের মধ্যে খোরশেদ আলম বয়াতি, পাখি সরকার, মালেক সরকার, আকলিমা সরকার, হারুন সরকার, স্বপ্না সরকার, ছোট রজ্জব দেওয়ান ও লিপি সরকার অন্যতম। যেহেতু বাংলাদেশের বহু লোকনাট্যাঙ্গিকে প্রাচীনকাল থেকেই বেদে-বেদেনী বা বেদে সম্প্রদায় কেন্দ্রিক পরিবেশনা রয়েছে, সেহেতু বিচারগানে এই চরিত্রগুলো নিয়ে পালা থাকা খুবই স্বাভাবিক বিষয়। চন্দ্রকুমার দে সংগৃহীত ও ড. দীনেশ চন্দ্র সেন সম্পাদিত ‘মৈমনসিংহ গীতিকা’য় বেদে চরিত্রের গীতিকা বা লোকনাটকের বিশেষ আঙ্গিক রয়েছে। মৈমনসিংহ গীতিকার মহুয়া পালায় হুমরা বেদে নামক একটি চরিত্র রয়েছে। এই পালায় যেমন বেদে সম্প্রদায়ের জীবনের প্রতিচ্ছবি চিত্রিত হয়েছে, তেমনি বহু লোকনাট্যাঙ্গিকে বেদে চরিত্র বিভিন্নভাবে রূপায়িত হয়েছে। লোকনাটক বিচারগানে এই বেদে সম্প্রদায়ের আলেখ্য নিয়েই বাইদা-বাইদানী পালার নবসংস্করণ। বাইদা-বাইদানী পালায় মূলত বেদে সম্প্রদায়ের দুটি চরিত্র মানে স্বামী ও স্ত্রীর যাপিত-জীবনের নানা বিষয় দ্বিপাক্ষিক উপায়ে গায়েনগণ আসরে উপস্থাপন করেন। পালায় এক পক্ষে একজন পুরুষ গায়েন যিনি বাইদা বা বেদে চরিত্রে অভিনয় করেন, আর অন্য পক্ষে বাইদানী বা

বেদেনী চরিত্রে একজন নারী গায়েন অভিনয় করে থাকেন। পালায় প্রধানত দুইজন চরিত্র থাকলেও তাদের অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে তাদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নানান চরিত্র আখ্যান-উপাখ্যানে চিত্রিত হয়। বেদেদের জীবন যেহেতু যাযাবর এবং জীবিকা হচ্ছে সাপখেলা দেখানো ও কবিরাজী অষুধ বিক্রি করা, সেহেতু পালায় এই প্রসঙ্গগুলো খুব বেশি করে আলোচিত হয়ে থাকে। এই পালাটির পরতে পরতে বেদে ও বেদেনীর সাংসারিক বিষয়াদি নিয়ে ঠাট্টাচ্ছলে ঝগড়া হয়। এছাড়া তাদের যৌনজীবন নিয়ে একে-অপরকে টিপ্পনী কাটেন। বাইদা-বাইদানী পালায় বেদেপক্ষের গায়েন বেদেনীর নানা রকম দোষ ধরে 'খোঁটা' দেন, অন্যদিকে বেদেনীপক্ষের গায়েন বেদেকেও তার বিভিন্ন ধরণের ভুল-ত্রুটি চিহ্নিত করে 'খোঁটা' দেন। পালায় দেখা যায় বেদেপক্ষের গায়েন হয়তো বলছেন, বেদেনী তুমি গাওয়ালে গিয়ে শুধু ঘুরো নাকি পরপুরুষের সাথে অযাচিত প্রেমালাপ করো? তোমার তো চরিত্র ভালো না। এমন কথার প্রত্যুত্তরে দেখা যায়, বেদেনীপক্ষের গায়েন বলছেন, আমি কাজ করে তোমাকে এনে খাওয়াই সুতরাং গাওয়ালে গিয়ে কী করি না করি, সেটা নিয়ে তোমার কথা বলার অধিকার নেই। এ রকমভাবে গায়েনদ্বয় বিপক্ষের অভিনীত চরিত্র সম্পর্কে আপত্তিকর ও অভিযোগের সুরে কথা বলেন। পালায় বেদেপক্ষ থেকে যে সকল অভিযোগ করা হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- বেদেনীর চরিত্র ভালো নয়, বেদেনীর চেহারা ভালো না; বেদেনী অলস ও কাজে ফাঁকি দেয়; বেদেনীর শরীরে দুর্গন্ধ ও নোংরা স্বভাব; বেদেনীর বংশ ভালো না; বেদেনীর বাবার ধন-সম্পত্তি বলতে কিছু নেই প্রভৃতি। অন্যদিকে বেদেনীপক্ষ থেকেও বেদেকে বিভিন্ন অভিযোগের তীরে বিদ্ধ করেন। যেমন- বেদে পুরুষ হয়েও ঘরে বসে শুধু খায় আর খায়; বেদে ঠিক মতো বেদেনীকে ভালোবাসে না; বেদের স্বভাব ভালো না, সে একাধিক বিয়ে করে; বেদে জুয়া খেলে, গাঁজা খায়; বেদে সন্তানদের দেখাশোনা করে না; বেদে ঠিক মতো ভেষজ অষুধ যোগার করে না; বেদে বদমেজাজী-রাগী প্রভৃতি। পালায় এই বিষয়গুলো গায়েনদ্বয় হাস্যরসাত্মক উপায়ে একে-অপরকে বলে থাকেন। বাইদা-বাইদানী পালায় এ রকম চমৎকার দ্বিপক্ষীয় লড়াইয়ের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় খোরশেদ আলম বয়াতি ও পাখি সরকার অভিনীত একটি পালায়। এই পালাটির এ পর্যায়ে বাইদানীপক্ষ থেকে পাখি সরকার বলেন,

> এইবার বাইদায় খুব খেপছে। যেইনা বাইদ্যা আবার খেপছে! বিয়ার সুমায় কী কইছিলি? মানে বিয়ার সুমায় কইছিলাম যে, গাছে উঠছোস নাম, তোরে কামাই কইর‌্যা খাওয়ামু। এইডা কইছি ঠিক, কইছি সত্য কিন্তু তাই বইল্যা কী তুই কাম-কাইজও করবি ন্যা? বইয়্যা বইয়্যা তোর পাছাডা ফুইল্যা গেছে। আবার আমার সামনে নাইচ্যা নাইচ্যা দেহাস! এই কী, কী করস! এইবার বলতেছে, তোর বাবার সোনা-দানা, ধনরত্ন, টাকা-পয়সা সবই আছে কিন্তু আমার কাছে বিয়া দিলো ক্যান? এই একটা প্রশ্ন, আরেকটা প্রশ্ন অইল, ঐ যে সকালে যাস, আর রাইতে ঘরে আহোস। এই বাইদ্যা, ঐ যে সকালে যাই, আর রাইতে ঘরে আহি। সারাদিন আমি কী করি?...কী করি বা কেন দেরী করি, তার কারণ বলবো। আরেকটা কথা খুব সুন্দর কইছে, সারা রাইত বলে আমি বাইদ্যারে ঘুমাইতে দেই ন্যা। তয় ঘুমাইতে দিমু ক্যা? এই তোরে ঘুমাইতে দিমু ক্যা? আমি

এই যে সকালে যাই, আর রাইত কইর‍্যা আহি, সারাদিন পাড়ায় পাড়ায় চুড়ি বেচি। আমার আত-পাও ব্যতা করে না? তুই সারা রাইত আমার আত-পাও টিপ্‌পি ন্যা। ॥ (পাখি, ২০১৭ : পরিবেশনা)

পাখি সরকার পরিবেশিত পালার এই অংশ থেকেই বোঝা যাচ্ছে পালায় গায়েনগণ একে-অপরকে কী ভাষা ও যুক্তি প্রয়োগে পরাজিত করার চেষ্টা করেন। পালায় গায়েনদ্বয় একে-অপরকে অশ্লীল ভাষায় আক্রমণ করেন। এমনকি পালায় ব্যবহৃত ভাষা এতই স্থূল হয় যা পারিবারের সদস্যদের সাথে একসঙ্গে বসে পালাটি দেখাও সম্ভব নয়। পালায় সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় যৌনতা-মিশ্রিত কথাবার্তা। যৌন সম্পর্কিত এমন কোনো বিদ্রুপাত্মক ইঙ্গিত নেই, যা উভয় গায়েন করেন না। তবে এক্ষেত্রে সব সময়ই দেখা যায় বেদেপক্ষের পুরষ গায়েন এগিয়ে থাকেন। তার বিপক্ষের শিল্পী নারী হওয়ায় চটুল কথায় আক্রমণ করলেও দেখা যায় সামাজিক বাস্তবতার কারণে নারী গায়েন সব কথার উত্তর অশ্লীল বা চটুলভাবে দিতে পারেন না। বিচারগানের নিয়মিত দর্শক মজিবর রহমান বলেন,

বাইদা-বাইদানী পালা তো খুবই মজার একটি পালা। পালার প্রতি মুহূর্তে হাসি-তামাশা থাকে। পালাটি দেখতে খুব ভালো লাগলেও বাবা-মায়ের সাথে কিন্তু পালাটি দেখা সম্ভব না। পালায় খুবই নোংরা-নোংরা কথা থাকে। তবে হাসি-তামাশার জন্য ঠিক আছে। (মজিবর, ২০২৩ : সাক্ষাৎকার)

বাইদা-বাইদানী পালা সম্পর্কে যতজন দর্শক- শ্রোতার নিকট জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, প্রায় প্রত্যেকেই মজিবর রহমানের মতোই মতামত ব্যক্ত করেছেন। এছাড়া গবেষণা সম্পাদনকালে যতগুলো বাইদা-বাইদানী পালা দেখা হয়েছে, তার প্রত্যেকটি পালাতেই চটুলতা, যৌনতা ও অশ্লীলতার উপস্থিতি পাওয়া গেছে। সেই সাথে সাথে পালায় হাস্যরসেরও যথেষ্ট উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। পালাটিতে গায়েনদ্বয়ের প্রশ্ন-উত্তর ও কথাবার্তা যেমন চটুলতাপূর্ণ, তেমনি পালার প্রত্যেকটি গানই চটুলতায় পরিপূর্ণ। এমনকি কোনো কোনো গান তো এমন যে লোকসমাজে শুনলে অনভ্যস্ত দর্শক-শ্রোতা লজ্জা পেয়ে যাবেন। এ রকম একটি গান হচ্ছে-

ঢঙের বাইদানী, আমার সাথে আর দেখাইস না মাস্তানী,
চুপে চুপে কী করস তুই, (ওরে) আমি তা জানি ॥
পায়ে ধইরা বইছোস বিয়া মনে আছে নি,
জনম ভইরা কাম করিয়া আনবি মালপানি ॥ (খোরশেদ, ২০১৭ : পরিবেশনা)[৪০]

বাইদা-বাইদানী পালার প্রত্যেকটি আসরেই গায়েনগণ এ রকম চমকপ্রদ কথা, ভাষা, তালে-ছন্দে-সুরে ও মৃদু অশ্লীল কথাবার্তায় পরিবেশনা উপস্থাপন করেন। এ কথাটিও সত্য বাইদা-বাইদানী পালাটি নিয়ে অশ্লীলতার অভিযোগ থাকলেও এক শ্রেণির দর্শক-শ্রোতার নিকট পালাটি বিপুল জনপ্রিয়। তাছাড়া এ রকম পালা বিচারগানে আছে বলেই পরিবেশনাটি এত বৈচিত্র্যময় ও জনপ্রিয় হয়েছে।

দুই বাইদানী পালা

বিচারগানের বেশির ভাগ পালাগুলোতেই দুটি পৃথক বিষয় নিয়ে প্রতিপক্ষ হিসেবে দুজন গায়েন আসরে প্রতিযোগিতা করে থাকেন। শুধু তাই নয় অধিকাংশ পালাতেই নারী ও পুরুষ গায়েনগণ অভিনয় করেন। ব্যতিক্রম হিসেবে অল্প কয়েকটি পালা রয়েছে, যেখানে পালার বিষয়বস্তুর কারণে আবশ্যিকভাবেই পুরুষ-পুরুষ অথবা নারী-নারী গায়েনদ্বয়ের অভিনয় করতে হয়। তা না হলে পালার উপস্থাপনার স্বাভাবিক সৌন্দর্য ব্যবহত হয়। যেমন-ননদ-ভাবী, বউ-শাশুড়ি, দাদি-নাতিন, প্রভৃতি পালায় অবশ্যই দুজন নারী গায়েন আবশ্যক। তেমনিভাবে দুই বাইদানী পালাটিতে দুজন নারী গায়েনের অভিনয় করতে হয়। এর ব্যতিক্রম হলে পালাটি অনেকাংশেই দর্শক-শ্রোতার নিকট গ্রহণযোগ্যতা হারায়। ‘লোকনাটক বিচারগান : বিষয় ও আঙ্গিক বৈচিত্র্য’ শিরোনামের গবেষণাটি সম্পাদনকালে যতগুলো দুই বাইদানী পালা দেখা হয়েছে তার সবগুলো পালাতেই দুজন নারী গায়েন অভিনয় করেছেন। এছাড়া বেশ কয়েকজন বিচারগানের নিয়মিত গায়েন ও দর্শক-শ্রোতার সাথে কথা বলে জানা গেছে, দুই বাইদানী পালাতে নারী গায়েন ছাড়া কোনো পালা এখনও আসরে পরিবেশিত হয়নি। অভিসন্দর্ভের পূর্বেই বাইদা-বাইদানী পালা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বাইদা-বাইদানী পালাটিতে যদিও বেদে সম্প্রদায়ের জীবন-যাপন নিয়েই আলোচিত হয়, তবু দুই বাইদানী পালায় দেখা যায় এই বিষয়গুলোর পাশাপাশি নতুন কিছু বিষয় এসে যুক্ত হয়। তাছাড়া বাইদা-বাইদানী পালা অপেক্ষা দুই বাইদানী পালাটিতে চটুলতা ও অশ্লীলতা কম রয়েছে। সেই সাথে দুই বাইদানী পালায় তাদের যাপিত জীবনের কিছু দুঃখ-কষ্টের আখ্যানও আলোচিত হয়ে থাকে। দুই বাইদানী পালায় কিছু মেয়েলি বিষয়ের আলোচনাও হয় যেগুলো বাইদা-বাইদানী পালাতে অনুপস্থিত রয়েছে। এখন কথা হচ্ছে, দুই বাইদানী পালাটির উৎপত্তি কোথায় কিংবা কোন প্রক্রিয়ায় পালাটি লোকনাটক বিচারগানে আত্মীকরণ হয়েছে। বাইদা-বাইদানী পালায় আলোচনাকালে বলা হয়েছে, বাংলা লোকনাট্যাঙ্গিকের ধারায় প্রাচীনকাল থেকে বেদে সম্প্রদায়কে উপজীব্য করে বহু পারিবেশনা প্রচলিত ছিলো এবং বর্তমানেও রয়েছে। এছাড়া সাহিত্যের মূলধারায় অনেক প্রথিতযশা সাহিত্যিকও বেদেদের জীবন ও জীবিকানির্ভর বহু সাহিত্যকর্ম রচনা করেছেন। বিশেষ করে পল্লীকবি হিসেবে খ্যাত জসীম উদ্‌দীনের গীতিনাট্য ‘বেদের মেয়ে’ নাগরিক সাহিত্যাঙ্গন ছাড়িয়ে বাংলাদেশের ফোকলোরের বিভিন্ন শাখায় প্রভাব ফেলেছে। বিচারগানের দুই বাইদানী পালার এক পরিবেশনায় গায়েন আকলিমা বেগম পর পর দুটি আসরে কবি জসীম উদ্‌দীনের ‘বেদের মেয়ে’-এর কাহিনির বর্ণনাকে প্রামাণ্য হিসেবে নেয়া যায়। আকলিমা বেগম রেডিও-টেলিভিশনে প্রচারিত ‘বেদের মেয়ে’-এর পরিবেশনা দেখে-শুনে গল্পটি আসরে বলেন। যদিও তার গল্পের কাহিনির সাথে হুবহু জসীম উদ্‌দীনের ‘বেদের মেয়ে’ গীতিনাট্যের কাহিনির মিল পাওয়া যায়নি। তবু বলা যায় তিনি ‘বেদের মেয়ে’-এর কাহিনি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। মূলকথা হচ্ছে বিচারগানের দুই বাইদানী পালার সৃষ্টিতে দেশে প্রচলিত

বেদে কাহিনির প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। দেশে প্রচলিত দুই বাইদানী পালার পরিবেশনার তথ্যসন্ধান ও গায়েনদের ভাষ্য মতে ১৯৯৫-২০০০ সালের মধ্যে বিচারাগানে দুই বাইদানী পালাটির উদ্ভাবন হতে পারে। দর্শক-সম্মুখে সরাসরি পরিবেশিত পালাটির ইতিহাস জানা না গেলেও অডিও-ভিসিডিতে ধারণকৃত প্যালাগুলোর পর্যবেক্ষণ করে বলা যায়, এ যাবৎ পরিবেশিত দুই বাইদানী পালার ক্যাসেটের মধ্যে মিনারা বেগম ও আকলিমা বেগম পরিবেশিত পালাটির জনপ্রিয়তা শীর্ষে রয়েছে। বাইদা-বাইদানী পালায় যেমন তাদের সাংসারিক ও প্রেম-প্রণয় নিয়ে বেশি আলোচনা হয়, দুই বাইদানী পালায় তেমনটি হয় না। দুই বাইদানী পালায় সাংসারিক টানাপোড়েনের উপস্থিতি না থাকলেও রয়েছে জীবন-যাপনের দুঃখ-কষ্ট, একে-অপরের প্রতি নারীসুলভ ঠাট্টা-তামাশা, আছে গোপন প্রেম-প্রণয়ের পারস্পরিক 'খোঁটা'। বিচারগানে যেহেতু সুনির্দিষ্ট আখ্যান নেই, আছে বিচিত্র আখ্যানের সম্মিলন, সেহেতু দুই বাইদানী পালায়ও সুনির্দিষ্ট কোনো গল্প নেই। তবে আকলিমা বেগম ও মিনারা বেগম পরিবেশিত একটি দুই বাইদানী পালায় দুই বান্ধবীসুলভ বা একই নৌকার দুই নারীর কতগুলো ছোট ছোট গল্পের গাঁথুনীতে একটি গল্পের আখ্যান তৈরি হয়। তাহলে এ পর্যায়ে অনুসন্ধানের বিষয় বিচারগানের এই ব্যতিক্রমী পালাটিতে গায়েনগণ কোন কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন? দুই বাইদানী পালাটির পরিবেশনা পর্যবেক্ষণ করে ও গায়েনদের মতামতের ভিত্তিতে কতগুলো আলোচ্য বিষয় চিহ্নিত করা গেছে। সেগুলো হচ্ছে- বেদে জীবনে একজন নারীর সমস্যা ও সংকটের আলোচনা; বেদেনীদের জীবিকা নির্বাহের পদ্ধতি; বেদেনীদের সাজসজ্জা ও পোষাকের শখ পূরণ, বেদেনীদের প্রতি স্থানীয় প্রভাবশালীদের বল প্রয়োগ ও সহমর্মিতা; বেদেনীদের প্রেম ও বিরহ; বেদেনীদের বৈবাহিক জীবন ও বিভাজন প্রভৃতি। দুই বাইদানী পালায় আলোচনার বিষয় সম্পর্কে এক পরিবেশনায় গায়েন আকলিমা বেগম বলেন, 'আজ আমাদের পালার মধ্যে কিছু কথা থাকবে, বেদে ও বেদেনীরা কিভাবে চলে-ফিরে, তাদের কিভাবে থাকা-খাওয়া হয়, এই কথাগুলো আপনাদের সম্মুখে উত্থাপন করবো।' (আকলিমা, ২০২০ : পরিবেশনা) তার মানে হচ্ছে দুই বাইদানী পালাতে বেদেনীদের যাপিত-জীবনের সমস্ত বিষয় নিয়েই গায়েনদ্বয় আসরে আলোচনা করেন। আর এই আলোচনা বিচারগানের অন্যান্য পালার মতোই প্রশ্ন-উত্তরের পদ্ধতিতে গায়েনগণ করে থাকেন। এই পালাটি চটুল ও হাস্যরসাত্মক হওয়ায় ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কোনো তত্ত্বনির্ভর প্রশ্ন-উত্তর থাকে না। এই প্রশ্নগুলো হয় খুব জীবনঘনিষ্ঠ সাধারণ বিষয় নিয়ে যাতে বিচারগানের স্বাভাবিক নিয়ম বা 'খোঁটা' পদ্ধতি অনুসরণ করে। আকলিমা বেগম ও মিনারা বেগম পরিবেশিত দুই বাইদানী পালায়ও এই বিষয়টি দেখা গেছে। আকলিমা বেগম পালায় মিনারা বেগমকে টিপ্পনীসুলভ প্রশ্ন করেন, বেদেনী তুমি প্রতিদিন সকাল-সকাল ঘুম থেকে উঠে, সাজগোজ করে মোড়লের বাড়ি যাও কেন? তোমার উদ্দেশ্য কী? মোড়লের সাথে তোমার কী সম্পর্ক? এই প্রশ্নের জবাবে মিনারা বেগম জানায় তার উদ্দেশ্য সৎ, সে তার মালামাল বিক্রি করতেই যায়। তার কোনো ভিন্ন উদ্দেশ্য নেই। অর্থাৎ আকলিমা বেগম

যে তাকে প্রেমঘটিত টিপ্পনী কেটেছিলো মিনারা বেগম তা এড়িয়ে যান। পালায় এ রকম বিদ্রুপাত্মক প্রশ্ন-উত্তরের পাশাপাশি গানে গানেও বেদেনীদের জীবন-আলেখ্য বর্ণিত হয়। পালায় মিনারা বেগমের রচিত ও পরিবেশিত একটি গানে বেদেনীদের জীবনের ছবি প্রতিফলিত হয়েছে। গানে মিনারা বেগম বলেন,

আমরা বাইদানী, অভিমানী, কূলনাশিনীরে,
যথায় ঘুরিফিরিরে, বেচাকেনা মোদের পেশারে ॥
সংসার-স্বামী রেখে নৌকায় গাওয়াল করে ঘুরিরে,
রাখবেন চুড়ি-স্নো-পাউডার আরো কত কিছুরে ॥ (মিনারা, ২০২০ : পরিবেশনা)[৪১]

বেদেনী-জীবনের সমস্ত বিষয়াদি গানটিতে সাবলীলভাবে বর্ণিত হয়েছে। লোকনাটক তথা লোকসংগীতের এখানেই ঋদ্ধতা, সহজ কথায় সহজ সুরে লোকজীবনের না বলা কথাগুলো শিল্পীর বয়ানে বর্ণিত হয়। লোককবিদের দ্বারা লোকসমাজের কথা যখন আসরে বর্ণিত হয়, তখনই দর্শক-শ্রোতা পরিবেশনার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নেন। যার ফলশ্রুতিতে লোকপরিবেশনাটি দেশের লোকআয়তনের প্রতিটি জায়গাতেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এ জন্যই হয় তো বিচারগানের অন্যান্য পালার মতোই দুই বাইদানী পালাটি দর্শক-শ্রোতার নিকট জনপ্রিয় হয়েছে। আর বিষয়বস্তু হিসেবে বিচারগানে পালাটির উপস্থিতি পরিবেশনাটিকে বৈচিত্র্যময় করেছে।

হাস্যরসাত্মক পালার দাদা, দাদি, নানা, নানি, নাতি ও নাতিন সংক্রান্ত পালাসমূহ

বিচারগানের হাস্যরসাত্মক পালার মধ্যে দাদা, দাদি, নানা, নানি, নাতি ও নাতিন সংক্রান্ত কতগুলো পালা রয়েছে। পালাগুলো হচ্ছে-দাদা-নাতি, দাদা-নাতিন, দাদি-নাতি, দাদি-নাতিন, নানা-নাতি, নানা-নাতিন, নানি-নাতি ও নানি-নাতিন পালা। এই পালাগুলো দর্শকদের নিকট বেশ জনপ্রিয়। কেননা লোকআয়তনের অল্পশিক্ষিত বা নিরক্ষর মানুষজন গ্রামীণ পটভূমিতে সহজ-সরল বিষয়বস্তুর কৌতুকের মধ্যে বিনোদন খুঁজে নেয়। আর এই হাস্য-কৌতুকের জন্য বিচারগানের গায়েনগণ আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে রসিকতাপূর্ণ সম্পর্ক দাদা, দাদি, নানা, নানি, নাতি ও নাতিন নিয়ে বিভিন্ন রকম ঠাট্টাচ্ছলে দর্শকদের মনোরঞ্জন করে থাকেন। আর এই ঠাট্টা-মশকরার প্রধান উপাদান হচ্ছে যৌন-ইঙ্গিতপূর্ণ কথাবার্তা। এই পালাগুলোতে প্রায়ই দেখা যায়, গায়েনগণ বিয়ে, সঙ্গম ও সন্তান জন্মদানের বিষয়াদি নিয়ে একে-অপরের সাথে রসিকতা করেন। বিচারগানের এই পালাগুলোর সাথে বাংলাদেশের আরেকটি লোকনাট্যাঙ্গিক ‘গম্ভীরা’র কিছুটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জের জনপ্রিয় লোকনাটক গম্ভীরার প্রধান দুটি চরিত্র থাকে নানা ও নাতি। গম্ভীরাতে দেখা যায়, হাস্যরসকে আশ্রয় করে গানে ও কথায় পরিবেশনা উপস্থাপিত হয়। এমনকি দ্বিপাক্ষিক কিছু প্রশ্ন-উত্তর থাকে, যা কেবল পারস্পরিক হাসি-তামাশার জন্য। যেখানে একে-অপরকে প্রশ্নবাণে আঘাত বা আটকানো হয় না। কিন্তু বিচারগানের দাদা, দাদি, নানা, নানি, নাতি ও নাতিন

সংক্রান্ত হাস্যরসাত্মক পালাগুলোতে গায়েনগণ হাস্যরসকে প্রাধান্য দিয়ে একে-অপরকে নানা রকম প্রশ্ন করে ঠকানোর চেষ্টা করেন। এই পালাগুলোর প্রধান উদ্দেশ্য লোক-হাসানো হলেও বিচারগানের মূল যে আঙ্গিক গায়েনদ্বয়ের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক লড়াই তা ঠিকই বিদ্যমান থাকে। তবে এই হাস্যরসের লড়াইকে অনেক গায়কই ভালো চোখে দেখেন না। যা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। দাদি/নানি ভূমিকায় অভিনয়কারী বিচারগানের অন্যতম প্রধান গায়িকা নীলা পাগলীর এক পরিবেশনা থেকে জানা যায়, এই পালাগুলো তারা করেন মূলত দর্শকদের ভিন্ন স্বাদের আনন্দ দেয়ার জন্য। কেননা বিচারগানের নিয়মিত ও বহুল পরিবেশিত পালা থেকে বেড়িয়ে এসে একঘেয়েমী কাটানোর চেষ্টা করা হয়। এ পালাগুলো প্রসঙ্গে বিচারগানের স্বনামধন্য গায়িকা নীলা পাগলী এক পরিবেশনায় বলেন,

> এটা ভালো-মন্দের ব্যাপার না, এটা হইল মনের একটা আনন্দ। শ্রোতা নিয়া আমাদের খেলা-মেলা, পাবলিক নিয়া আমাদের খেলা-মেলা, শ্রোতা যেইটা পছন্দ করে, সেইটাই নিয়া আমরা হাজির হই। তো মনে কিছু করবেন না। (নীলা, ২০১৭ : পরিবেশনা)

যাহোক, বিচারগানের দাদা, দাদি, নানা, নানি, নাতি ও নাতিন সংক্রান্ত হাস্যরসাত্মক পালাগুলোর মধ্যে কতগুলো সাধারণ বিষয় রয়েছে, যেগুলো ঘুরেফিরে প্রায় প্রত্যেক পালাতেই দেখা যায়। পালাগুলোর আলোচ্য বিষয়ের সারাংশ করলে নিচের বিষয়গুলো পাওয়া যায়।

ক. দাদা/নানার বয়স হয়ে গেছে তবুও স্বভাব ভালো হয়নি।

খ. দাদি/নানি বুড়ি হয়ে গেছে কিন্তু রঙ-রস কমেনি।

গ. দাদা/নানা ও দাদি/নানির বয়স হওয়ায় এখন যৌবনমরা মানুষ।

ঘ. নাতি/নাতিন বয়সের দোষে অকাম-কুকাম করে বেড়ায়।

ঙ. নাতি/নাতিনের কামজনিত অপকর্মের পাহারাদার দাদা/নানা ও দাদি/নানি।

এই বিষয়গুলোকে ভিত্তি করেই কথাবার্তা ও ঠাট্টা-তামাশার শাখা-প্রশাখা বাড়িয়ে গায়েনগণ পরিবেশনা উপস্থাপন করে থাকেন। এসবের মধ্যে অবশ্য কখনো কখনো দুয়েকটি ধর্মীয় নীতিবাক্যও প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে গায়েনদ্বয় বলেন। এই পালাগুলো সরাসরি দর্শক-সম্মুখের চেয়ে ভিডিও পরিবেশনাতে বেশি প্রচলিত ও জনপ্রিয়। নিচে বিচারগানের হাস্যরসাত্মক পালার দাদা, দাদি, নানা, নানি, নাতি ও নাতিন সংক্রান্ত পালাগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

দাদা-নাতিন পালা

হাস্যরসাত্মক পালার দাদা, দাদি, নানা, নানি, নাতি ও নাতিন সংক্রান্ত পালাসমূহের মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় পালা হচ্ছে দাদা-নাতিন পালা। এই পালাটি বিষয়বস্তুর দিক থেকে নানা-নাতিন পালা সাথে অনেক বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ। নানা-নাতিন পালায় যেমন সম্পর্কের বিষয়টিকে উপজীব্য করে গায়েনগণ আসরে হাসি-তামাশা করেন, তেমনি দাদা-নাতিন পালায়ও সম্পর্ক কেন্দ্রিক নানান চটুলতাকে আশ্রয় করে আসরে হাস্যরসের উদ্রেক করে থাকেন। নানা-নাতিন পালায় নানা ও নাতিন মূলত ভিন্ন বাড়ির দুই সদস্যের মধ্যকার খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আসরে আলোচিত হয়। অন্যদিকে দাদা-নাতিন পালায় একই পরিবারভূক্ত দুই সদস্যের মধ্যকার সম্পর্কের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয়ের পাশাপাশি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের রসায়নে ঠাট্টাচ্ছলে আসরে পরিবেশনা উপস্থাপিত হয়ে থাকে। বাংলা অঞ্চলের লোকসমাজে দাদা-নাতিন সম্পর্ক ঘিরে বহু চটুল কথাবার্তা প্রচলিত রয়েছে। এই সমস্ত চটুল কথাবার্তাগুলো এই পালাটিতে উদাহরণ হিসেবে গায়েনগণ পরিবেশন করেন। বাংলাদেশের লোকনাট্যাঙ্গিকগুলোতে দাদা ও নাতিন চরিত্র দুটি বহুল চর্চিত বিষয়। এই চরিত্রগুলো লোকপরিবেশনাগুলোতে বিভিন্নভাবে চিত্রিত হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হাস্যরসাত্মক চরিত্র হিসেবেই পরিবেশিত হয়ে থাকে। চরিত্র দুটি নিয়ে লোকসমাজে বহু প্রবাদ বা হাসির গল্পও প্রচলিত রয়েছে। এমনকি চরিত্র দুটির সাথে চটুলতা ও অশ্লীলতা যেন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। ছোট একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি বোঝা যাবে। সাধারণত দেখা যায় গ্রাম-গঞ্জে ভারোত্তোলন বা ঠেলা ঠেলার সময় শ্রমিকরা বিভিন্ন ’ডাকের গান’ গেয়ে থাকেন। এ সময় একজন ডাকের প্রথম অংশ বলেন, আর অন্য সকলে দ্বিতীয় অংশ বলে কোনো বস্তুকে ঠেলা দেন। এই ‘ডাকের গান’গুলো প্রায়ই অশ্লীল ও রসিকতাপূর্ণ কথাবার্তা থাকে। এ রকমই একটি জনপ্রিয় ও বহুল প্রচলিত ‘ডাকের গান’ হচ্ছে- ‘দাদায় গেলো আম পাড়তে নাতিন গেলো সাথে, গাছের আম গাছে রইল পেট ভরলো তার রসে রে...।’ এই ‘ডাকের গান’-এর মাধ্যমেই বোঝা যাচ্ছে লোক-আয়তনে দাদা ও নাতিন চরিত্র দুটি অত্যন্ত চটুলতার সাথেই চর্চিত হয়। এছাড়া বাংলাদেশের জনপ্রিয় লোকনাটক ও লোকসংগীতের ধারাগুলোতেও দাদা ও নাতিন চরিত্র দুটি চটুলতার সাথেই পরিবেশিত হয়। তার ধারাবাহিকতায়ই লোকনাটক বিচারগানে দাদা ও নাতিন চরিত্র দুটি আত্মীকৃত হয়েছে। বিচারগানের প্রতিটি পালাতেই দাদা ও নাতিন প্রসঙ্গটি হাস্যরসাত্মক হিসেবে উপস্থাপিত হলেও স্বতন্ত্র পালা হিসেবে আনুমানিক নব্বইয়ের দশকে পালাটি সংযোজিত হয়। এই পালার উৎপত্তি প্রসঙ্গে বিচারগানের জনপ্রিয় গায়েন আকলিমা বেগম এক পরিবেশনায় জানান, দাদা-নাতিন পালাটি অডিও ক্যাসেটের প্রযোজক এম.এ মালেকের প্রযোজনা ও উদ্যোগে সর্বপ্রথম অডিও পরিবেশনায় অভিনীত হয়। পরে তারই উদ্যোগে ভিসিডিতে পুনরায় অভিনীত হয়। আর এই সর্বপ্রথম অভিনীত দাদা-নাতিন পালায় অভিনয় করেন আকলিমা বেগম ও মালেক সরকার। এছাড়া এই পালাটি বেশ চটুল ও অশ্লীল হওয়ায় সরাসরি দর্শক-সম্মুখে

পরিবেশিত হয় এমন তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে পালাটি অডিও এবং ভিডিও মাধ্যমে তুমুল জনপ্রিয় হয়েছিলো বলে জানা যায়। বর্তমানেও অনেক দর্শক-শ্রোতা আকলিমা বেগম ও মালেক সরকারের পরিবেশিত দাদা-নাতিন পালাটির প্রশংসা করে থাকেন। এছাড়া এই পালাটিতে অভিনয়ের জন্য নীলা পাগলীরও বেশ সুনাম রয়েছে। ভিসিডিতে ধারণকৃত দাদা-নাতিন পালার এক পরিবেশনায় নীলা পাগলী ও মালেক সরকার বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন। এই পালাটির জনপ্রিয়তার পেছনে কারণ হচ্ছে পালাটির চটুল ও হাস্যরসাত্মক বিষয়াদি। দাদা-নাতিন পালায় গায়েনগণ কতগুলো সাধারণ বিষয় নিয়ে প্রতিযোগিতা করেন। এই বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে- দাদা ও নাতিনের মধ্যে প্রেম-প্রণয়; দাদার সাথে দাদির কাম-কামনার চটুল বিশ্লেষণ; নাতিনের সাথে এলাকার যুবকদের প্রেম-প্রণয়ের স্থুল আলোচনা; দাদা ও নাতিনের বয়সজনিত ভুল-ভ্রান্তি প্রভৃতি। দাদা-নাতিন পালায় দেখা যায়, গায়েনগণ চরিত্রের পক্ষ থেকে একে-অপরকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যৌনতা সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে ঠাট্টা করেন। এই ঠাট্টা বা চাতুরীপনার সময় গায়েনদ্বয় নানা রকম গ্রামীণ হাসির গল্পের উদাহরণ দেন, সেই সাথে দাদা ও নাতিনের ব্যক্তিগত কিছু বিষয় নিয়ে একে-অপরকে প্রশ্ন করেন। এমনকি গায়েনদ্বয় চমৎকার-চমৎকার প্রবাদ বলেও বিপক্ষের গায়েনকে পরাস্ত করতে সচেষ্ট থাকেন। আকলিমা বেগম ও মালেক সরকার অভিনীত দাদা-নাতিন পালায় আকলিমা বেগম নাতিনের ভূমিকা থেকে দাদা চরিত্রের মালেক সরকারকে উদ্দেশ্য করে প্রচলিত একটি ‘মেছাল’ বলেন ‘আরে আমার আবাজাবা, এই মুখে বাতাসা খাবা।’ (আকলিমা, ২০১৬ : পরিবেশনা) এই মেছালের প্রত্যুত্তরে মালেক সরকারও গল্পচ্ছলে আকলিমা বেগমকে পরাস্ত করার চেষ্টা করেন। পালায় গায়েনদ্বয় গানের মাধ্যমেও একে-অপরকে শ্লেষ বা বিদ্রুপ করেন। এই পরিবেশনার চমৎকার একটি গান হচ্ছে-

কাজলবরণ রূপের নাতিন লো
কত ছেরা তোর পাছে,
তাই দেখিয়া এই দাদার মন ময়ূরের পেখম ধরছে রে ॥
আকাশে তোর ছায়া লো যেমন, জমিনে তোর বাড়ি,
জুয়ান-বুড়া সবাই মিলা তোরে লইয়া লাগছে কাড়াকাড়ি,
দেখলাম কত লোকে তোরে বিয়া করতে চায়,
সোনার থালে অন্ন থুইয়া গাছের পাতা খায় রে ॥ ((মালেক, ২০১৬ : পরিবেশনা)[৪২]

মালেক সরকারের এই গানে পরিবেশনার পরের আসরে আকলিমা বেগম ঠাট্টাচ্ছলে ‘হারামজাদা’ বলে মালেক সরকারকে গালি দেন। এছাড়া মালেক সরকারকে তিনি ‘বুড়া’, ‘বাতিল মাল’ বলেও টিপ্পনী কাটেন। পালায় মালেক সরকার নাতিন রূপী আকলিমা বেগমকে রমণ-প্রস্তাব দিলে আকলিমা বেগম তাকে দাদির সাথে শৃঙ্গারে যেতে বলেন। অর্থাৎ পালায় অত্যন্ত খোলামেলাভাবে যৌনতা সম্পর্কিত আলাপচারিতা হয়। এমন এমন যৌনমন্তব্য গায়েনদ্বয়

আসরে প্রয়োগ করেন যেগুলো অভিসন্দর্ভে উল্লেখ করতেও দ্বিধা হয়। এই সমস্ত চটুলতা বা স্থুলতা ফোকলোরের প্রতিটি শাখায় খুবই স্বাভাবিক বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয় থাকে। আর বিচারগানের গুরুগম্ভীর ও চটুল দুই রকমের পালাই রয়েছে, যার মাধ্যমে পরিবেশনাটি সব শ্রেণির দর্শক-শ্রোতার নিকট বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

নানা-নাতিন পালা

বাংলাদেশের ফোকলোর-অঙ্গনে নানা ও নাতিন সম্পর্কিত নানান লোকপরিবেশনা প্রচলিত রয়েছে। নানা-নাতিন প্রসঙ্গ লোকনাট্যাঙ্গিকগুলোতে সবচেয়ে বেশি চর্চিত হয়ে থাকে। এমনকি লোকনাট্যাঙ্গিকের প্রায় সবগুলো শাখাতেই নানা ও নাতিন চরিত্র দুটি রূপায়িত হয়। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে গ্রাম-বাংলায় নানা ও নাতিন সম্পর্কিত বহু চটকদার গল্প প্রচলিত রয়েছে। এদেশের গ্রামে-গঞ্জে-বন্দরে খোশগল্পের আসরে নানা ও নাতিন কেন্দ্রিক রসিকতায় মেতে থাকেন লোকসমাজের মানুষজন। যেহেতু নানা ও নাতিন চরিত্র দুটি এমনিতেই জীবন্ত চরিত্র হয়ে মুক্তমঞ্চের পরিবেশনার মতো অনানুষ্ঠানিকভাবে চিত্রিত হয়, সেহেতু এই চরিত্র দুটি লোকমঞ্চে শৈল্পিকভাবে উপস্থাপিত হবে এটাই স্বাভাবিক। বাংলাদেশে যতগুলো জনপ্রিয় লোকনাট্যাঙ্গিক রয়েছে তার মধ্যে বিভিন্ন রকম যাত্রার মধ্যে নানা ও নাতিন চরিত্র দুটি বেশি দেখা যায়। বিশেষ করে ভাসানযাত্রা ও সঙযাত্রায় নানা ও নাতিন চরিত্রের মাধ্যমে আসরে হাস্যরসাত্মক দৃশ্যগুলো মঞ্চায়িত হয়ে থাকে। প্রচলিত বহু লোকপরিবেশনায় যেহেতু নানা ও নাতিন চরিত্র দুটি রয়েছে, সেহেতু বিচারগানের মতো সমৃদ্ধ লোকনাট্যে এই চরিত্র দুটির সংযুক্তি ঘটবে এটাই স্বাভাবিক। ধারণা করা যায় ১৯৯০-২০০০ সালের মধ্যে নানা-নাতিন পালাটি বিচারগানের আসরে যুক্ত হয়েছে। তবে বহু আগে থেকেই নানা-নাতিন প্রসঙ্গটি বিচারগানের আসরে পালায় যুক্তি-তর্কের 'মেছাল' হিসেবে গায়েনগণ গল্প হিসেবে পরিবেশন করে থাকেন। এখনও নানা ও নাতিন পালা ছাড়াও বিচারগানের বহু গায়েন নানা ও নাতিন সম্পর্ককে উপজীব্য করে আসরে হাসি-ঠাট্টা করে থাকেন। মুন্সিগঞ্জ অঞ্চলের প্রখ্যাত গায়েন শাহ আলম সরকার আসরে নানা ও নাতিন প্রসঙ্গের গল্প বলে আসরে প্রায়ই হাস্যরসের উদ্রেক করে থাকেন। সেই সাথে প্রতিপক্ষের শিল্পীকে গল্পচ্ছলে 'খোটা' দিয়ে থাকেন। মূল বিষয় হচ্ছে নানা ও নাতিন সম্পর্কটি হাসি-তামাশার উপযোগী হওয়ায় গায়েনগণ এই প্রসঙ্গটি আসরে বারবার পরিবেশন করেন। বিচারগানের আসরে এ যাবৎ যতগুলো নানা-নাতিন পালা সুনাম অর্জন করেছে, তার মধ্যে আব্দুল গনি সরকার ও পাখি সরকারের পরিবেশিত পালাটির অবস্থান শীর্ষে রয়েছে। পালায় দেখা যায় নানা ও নাতিন কেন্দ্রিক এমন কোনো রসিকতা নেই যেন তারা করেননি। বিশেষ করে পালায় যৌনতা ও অশ্লীলতায় ভরা কথা ও গান রয়েছে সীমালঙ্ঘন পর্যায়ে। পালায় নানা চরিত্রে রূপদানকারী গায়েন আব্দুর গনি সরকার, নাতিন চরিত্রে অভিনয়কারী পাখি সরকারকে অন্য পুরুষের সঙ্গে মেলামেশার কলঙ্ক যেমন দেন, তেমনি আবার নানা হিসেবে

নিজেও নাতিনকে অযাচিত যৌন প্রস্তাব দেন। এ সবের পাল্টা জবাব হিসেবে পাখি সরকারও জোড়ালো ভূমিকা রাখেন। তিনি নানা রুপী আব্দুল গনি সরকারের যৌনক্ষমতা নিয়ে যেমন সন্দেহপোষণ করেন, তেমনি নানী তাকে হেয়পতিপন্ন করেন সেই বিষয়টিও আসরে বলে গায়েন গনি সরকারকে পরাস্ত করার চেষ্টা করেন। পালায় এই সমস্ত বাদানুবাদ খুবই স্বাভাবিক বিষয় হিসেবে আলোচিত হয়। তবে আসরে কোনো অভিনেতা বা গায়েনকে বিব্রত হতে দেখা যায়নি। পালায় আব্দুল গনি সরকার ও পাখি সরকার স্থুল আলোচনার পাশাপাশি একে-অপরকে যে সকল প্রশ্ন ও উত্তর করেন, তাও অতিমাত্রায় স্থুল ও অশ্লীল। এই পালাটিতে পাখি সরকারের প্রশ্নগুলোর মধ্যে একটি স্থুল পর্যায়ের প্রশ্নের প্রামাণ্য দেয়া যেতে পারে। পাখি সরকার আসরে প্রশ্ন করেন,

> আজকে প্রথমেই নানার কাছে একটা প্রশ্ন করি। প্রশ্ন না করলে তো ঝগড়া অইব না, কী বলেন? তারে খোঁচা দিয়া, রস বাইর করতে অইব, নাইলে বাইর অইব না। ও নানা তুমি কইও তো, নাতিনের প্রতি বা আমার প্রতি তোমার কর্তব্যটা কী? তুমি কইও নাতিনের প্রতি তোমার কর্তব্য কী? আরেকটা কথা আছে। ও নানা এই প্রশ্নডার খুব সুন্দর কইর‍্যা জবাব দিয়েন তো। আপনের কী মুসলমানী অইছে নি? কী কন এইডা তো জানতে অইব? নানা আপনে কইবেন, মুসলমানি হইছে নাকি মুসলমানি করাইতে হইব? কোদাল কিন্তু লইয়্যা আইছি, স্টেজের পিছে থুইছি। আপনে কইবেন আপনার মুসলমানি হইছে নি? আর নাতিনের প্রতি আপনের কর্তব্য কী? এই আপনের কাছে আমার দুটি প্রশ্ন। খুব সুন্দর করে জবাব করবেন। (পাখি, ২০২০ : পরিবেশনা)

নাতিনপক্ষের গায়েন পাখির সরকারের এই প্রশ্নের জবাবে আব্দুল গনি সরকার আসরে যা বলেন তা অতীব অশ্লীল ও অকথ্যও বটে। (আব্দুল গনি সরকারে উত্তরমূলক পরিবেশনাটুকু পরিশিষ্টে যুক্ত করা হয়েছে) গায়েন আব্দুল গনি সরকার নানাভাবে পাখি সরকারকে অশ্লীল কথায় আক্রমণ করে এক পর্যায়ে বলেন আমরা না হয় পুরুষ মানুষ আমাদের না হয় মুসলমানি করার জায়গা আছে, নারীদের মানে তোমার মুসলমানি করার উপায় কী? আসরে আব্দুল গনি সরকার বেশ কয়েকটি যৌন সম্পর্কিত চটুলগল্প পরিবেশন করেন, যার প্রত্যেকটি গল্পের সারাংশের মাধ্যমে পাখি সরকারকে আঘাত করা হয় যাতে পাখি সরকার লজ্জিত হয় এবং দ্বিপাক্ষিক লড়াইয়ে পরাজিত হন। এই পালাটির প্রত্যেকটি গান মানুষের যৌন-আদিমতার প্রতিচ্ছবি। অবশ্য পালার বিষয়বস্তু ও কথাবার্তার সাথে এ রকম গান না হলে মানানসইও হয় না। আব্দুল গনি সরকার ও পাখি সরকারের পরিবেশিত প্রত্যেকটি গল্প যেন কোনোটার চেয়ে কোনোটা কম না। যেমন- পাখি সরকার তার গানে বলেন,

> রূপে-গুণে আমি খুব সুন্দরী,
> সুন্দরী, খুব সুন্দরী ॥
> চুল পাকা, দাঁত পড়া, নানা তুমি,
> কেন আমায় দাও সুরসুরি ॥ (পাখি, ২০২০ : পরিবেশনা)[৪৩]

নানা-নাতিন পালাটিতে উপরের গানের জবাবে নানাপক্ষের গায়েন আব্দুল গনি সরকার নিচের গানটি আসরে পরিবেশন করেন।

তুমি আমার রঙ্গিলা নাতিন, আমি তোর নানা,
আমার সাথে ভাব না রাখলে হাঙ্গা (বিয়া) হবে না ॥
বুঝোছ না লো রসের নাতিন, একলা থাকবি আর কতদিন,
শুধু পাড়ায় বেড়াস হইয়া স্বাধীন, বুকে নাই ওড়না ॥ (গনি, ২০২০ : পরিবেশনা)[৪৪]

এই পালাটিতে কথা-পাল্টা কথা, গান-পাল্টা গান, অশ্লীল গল্প-পাল্টা অশ্লীল গল্পের পরিবেশনায় আব্দুল গনি সরকার ও পাখি সরকারের মতোই গায়েনগণ নানা-নাতিন পালাকে হাস্যরসে আনন্দময় করে তুলেন। আসরের প্রত্যেক দর্শক-শ্রোতাই হাস্যরসাত্মক পালায় পরিপূর্ণভাবে বিনোদিত হন। লোকসংস্কৃতিতে অশ্লীলতা খুবই স্বাভাবিক বিষয় হওয়ায় বিচারগানের নানা-নাতিন পালাটি অনায়াসে যুগ যুগ ধরে আসরে পরিবেশিত হচ্ছে। তাই বিষয় হিসেবে এই পালাটি নিঃসন্দেহে অনন্য।

দাদি-নাতি পালা

দাদি, ও দাদি,
শোন দাদি তোমায় বলি মান কইরো না,
দাদার জন্য চিন্তা কইরা আমায় ভুইলো না ॥
বুড়া বয়সে দাদির গেছে দাদায় মরিয়া
একলা ঘরে ঘুম আসে না কোল বালিশ জড়াইয়া,
সকাল হলে বলে আমায় নাতি কিছু বুঝে না ॥ (রজ্জব, ২০১৭ : পরিবেশনা)[৪৫]

লোকনাটক বিচারগানের দাদি-নাতি পালাটি কেমন হবে তা উপরের এই গানটির মাধ্যমেই বোঝা যায়। গানের কথায় যেমন রয়েছে স্থূলতা, চটুলতা ও টিপ্পনী তেমনি পালার পুরো পরিবেশনা জুড়েই এই বিষয়গুলো নানাভাবে আলোচিত হয়ে থাকে। লোকনাটক বিচারগানের হাস্যরসাত্মক পালার দাদা, দাদি, নানা, নানি, নাতি ও নাতিন সংক্রান্ত পালাসমূহের অন্যান্য পালার মতোই দাদি-নাতি পালাটি বিপুল হাস্যরসাত্মক। সেই সাথে পালাটি বিচারগানের দর্শক-শ্রোতার নিকট বেশ জনপ্রিয়ও বটে। পালাটি বিচারগানের আসরে ১৯৯৫-২০০০ সালের মাঝামাঝি সময়ে সংযোজিত হয়েছে বলে ধারণা করা যায়। কেননা পালাটি অডিও রেকর্ড যুগেও ধারণ করা হয়েছে। অডিও মাধ্যমে রেকর্ডকৃত একটি পালায় মিনারা বেগম ও মালেক সরকার অভিনয় করেছিলেন, যেটি দেশে বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিলো। এছাড়া ছোট রজ্জব দেওয়ান ও নীলা পাগলীর অভিনয়ে ভিসিডিতে ধারণকৃত দাদি-নাতি

পালার একটি পরিবেশনাও দর্শক-শ্রোতার নিকট প্রশংসিত হয়। পালাটিতে আত্মীয়তার সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতম স্বজন দাদি ও নাতির মধ্যকার বহুমাত্রিক সম্পর্ক নিয়ে গায়েনগণ দ্বিপাক্ষিক লড়াইয়ের মাধ্যমে আলোচনা করে থাকেন। বাংলা অঞ্চলের ফোকলোরের প্রায় সবকটি আঙ্গিকেই দাদি ও নাতি চরিত্র দুটি রয়েছে। বিশেষ করে লোকনাটকে দাদি ও নাতি চরিত্র দুটি হাস্যরসাত্মক চরিত্র হিসেবেই বেশি চিত্রিত হয়। বিচারগানেও হাস্যরসের বিষয়বস্তু হিসেবে দাদি ও নাতি চরিত্র দুটি আত্মীকৃত হয়েছে। দাদি-নাতি পালায় খুবই উপরিতলের বিষয়বস্তু নিয়ে গায়েনদ্বয় আলোচনা করে থাকেন। অন্য পালাগুলোতে যেমন গায়েনগণ একে-অপরকে প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করেন এবং পাল্টা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে নিজের সক্ষমতা তুলে ধরেন, দাদি-নাতি পালায় তেমনটি খুবই কম হয়। যেটুকু হয় প্রশ্ন-উত্তর পর্বে খুবই সামান্য ভূমিকা রাখে। দাদি-নাতি পালাটিতে মূলত গায়েনগণ পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে 'খোঁটা' ও পাল্টা 'খোঁটা'য় আসরে আলোচনা করেন। এতে করেই হাস্যরসের মাধ্যমে আসর প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। পালায় দাদা ও নাতি চরিত্রের গায়েনগণ কিছু নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে একে-অপরকে 'খোঁটা' দিয়ে থাকেন। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-

ক. দাদি বৃদ্ধা হয়ে গেছেন অথচ তার রঙ-রস কমেনি।

খ. নাতি তোমার অল্প বয়স তবু বড় বড় কথা বল কেন?

গ. দাদি বয়স ঢাকতে মুখে স্নো-পাউডার লাগায়, চুলে কলপ দেয়।

ঘ. নাতি পাড়ার মেয়েদের বিরক্ত করে, তাই তারা আমার নিকট নালিশ করে।

ঙ. দাদা মারা গেছেন অথচ দাদি প্রেমের গান গায়।

চ. দাদি একা একা পার্কে ঘুরো কেন? তোমার চরিত্র ভালো না।

ছ. নাতি সাবধানে কথা বলবে তোমাকে আমি আদর-যত্নে বড় করেছি।

জ. দাদির কোনো কাজ-কাম নেই শুধু খায় আর খায়।

ঝ. নাতি একটা অপদার্থ পড়াশোনা করে না।

ঞ. নাতি অল্প বয়সে বিয়ে করে দেহ নষ্ট করো না।

এই রকম 'খোঁটা' ও পাল্টা 'খোঁটা'র মাধ্যমে গায়েনগণ আসরে আলোচনার নতুন নতুন বিষয়ের অবতারণা করেন। আলোচনাকে আরো প্রাণবন্ত করে তুলে গায়েনদের পরিবেশিত নানান হাসির গল্প ও 'মেছাল'। শুধু তাই নয় গায়েনগণ একে-অপরকে পরাস্ত করতে চমৎকার-চমৎকার 'মেছাল'ও পরিবেশন করেন। দাদি-নাতি পালায় পরিবেশিত এ রকম চমৎকার একটি 'মেছাল' হচ্ছে-

> গুজায় চায় চিৎ অইয়া শুইতে, বোবায় চায় কথা কইতে, আর খুঁড়ায় চায় বল খেলতে, অন্ধে চায় একলা একলা রাস্তা দিয়া হাঁটতে! কিন্তু হাঁটতে যে চায়, কখন যে এক্সিডেন্ট হইয়া মারা যাবে, এইডা যুদি নাতি বুঝতো তইলে দাদিরে এতো কথা কইতো না। (নীলা, ২০১৭ : পরিবেশনা)

এই 'মেছাল'টি দাদি-নাতি পালায় নীলা পাগলী নাতি-চরিত্রে অভিনয়কারী ছোট রজ্জব দেওয়ানকে বলেন। অর্থাৎ পূর্বের আসরে ছোট রজ্জব দেওয়ান নীলা পাগলীকে বেশ কড়া কথা বলেন, যার জবাবে নীলা পাগলীর এই 'মেছাল'। পালাটিতে গায়েনগণ বেশ 'মেছাল' ও পাল্টা 'মেছাল' পরিবেশন করেছেন। এই পালাটিতে বিচারগানের অন্যান্য পালার মতো গুরুগম্ভীরতত্ত্ব না থাকলেও দাদি-নাতির মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে হাসি-তামাশাপূর্ণ আলোচনা থাকায় দর্শক-শ্রোতার নিকট বেশ গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। তবে এ কথাটিও ঠিক দাদি-নাতি পালাটি অডিও, ভিসিডি ও বর্তমানে ইউটিউব মাধ্যম ছাড়া সরাসরি দর্শক-সম্মুখে বেশি পরিবেশিত হয় না। বিচারগানের বেশ কয়েকজন দর্শক-শ্রোতার সাথে কথা বলে জানা গেছে, তারা কেউই সরাসরি আসরে পালাটি দেখেননি, তবে ভিসিডিতে দেখেছেন। এছাড়া দাদি-নাতি পালাটি বিষয়বস্তুর দিক থেকে চটুল হওয়ায় বিচারগানের মূল পৃষ্ঠপোষক পির-গোঁসাইদের বাড়িতে পরিবেশিত হয় না। পালাটি চটুল হলেও এর পরিবেশনার হাস্যরসের জন্য এক শ্রেণির দর্শক-শ্রোতার নিকট বেশ জনপ্রিয়। পালাটির অনন্য বিষয়ের কারণেই বিচারগানের স্বতন্ত্র পালার মর্যাদা পেয়েছে। যার কারণে বিচারগান লোকপরিবেশনা হিসেবে সমৃদ্ধ হয়েছে।

দাদি-নাতিন পালা

হাস্যরসাত্মক পালাসমূহের মধ্যে আরেকটি চমকপ্রদ পালা হচ্ছে দাদি-নাতিন পালা। এই পালাটিও বেশ চটুল ও স্থুল কথাবার্তায় ভরা। এছাড়া বিচারগানে আত্মীকৃত দাদি ও নাতিন চরিত্র দুটি বাংলাদেশের বেশির ভাগ লোকনাট্যাঙ্গিকে বিভিন্নভাবে চিত্রিত হয়ে থাকে। চরিত্র দুটি অবশ্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই হাস্যরসাত্মক হিসেবেই আসরে পরিবেশিত হয়। বাংলা অঞ্চলের সামাজিক-পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে দাদি ও নাতিন হচ্ছে ভারী বয়স্ক ও অল্প বয়স্ক দুই নারীর বন্ধুত্বের চরিত্রায়ন। যেখানে থাকে একে-অপরের মধ্যে শ্রদ্ধা, স্নেহ, আদর ও ভালোবাসার বহুমাত্রিক সম্পর্কের বন্ধন। দাদি ও নাতিন সম্পর্কের মধ্যে আরও একটি বিশেষ দিক রয়েছে সেটি হচ্ছে ঠাট্টা ও চাতুরীপনা। লোকনাটক বিচারগানের আসরে দাদি-নাতিন পালায় বিশেষভাবে এই হাস্যরসাত্মক বিষয়টিকেই প্রাধান্য দেয়া হয়ে থাকে। বিচারগানের আসরে ঠিক কবে থেকে এই পালাটি যুক্ত হয়েছে সেটি জানা যায়নি। তবে ভিসিডি আমলে পালাটি ভিসিডি কোম্পানি দ্বারা ধারণ করা হয়েছে। সেই হিসেবে ২০০০-২০০৫ সালের দিকে পালাটি ভিসিডিতে প্রথম ধারণ করা হয়ে থাকতে পারে। বাংলাদেশে এ যাবৎ যত গায়েন দাদি-নাতিন পালায়

অভিনয় করেছেন তার মধ্যে আকলিমা বেগম ও লিপি সরকার জুটির পরিবেশনা সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছে। দাদি-নাতিন পালাটির একটি বিশেষত্ব হচ্ছে পালাটিতে সব সময় নারী গায়েন অভিনয় করেন। যেহেতু পালার দুই পক্ষই নারী চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে সেহেতু নারী গায়েন অভিনয় করলেই মানানসই হয়। এছাড়া পালায় পুরুষ গায়েন অভিনয় করলে নারী গায়েনের মতো মেয়েলী বিষয় নিয়ে টিপ্পনী কাটতে পারেন না। পালায় অন্যান্য পালার মতো গায়েনদ্বয় প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে পরিবেশনা উপস্থাপন করলেও চরিত্র ধরে 'খোঁটা' ও টিপ্পনীর মাধ্যমে বেশি আলোচনা করেন। এছাড়া গায়েনদ্বয় বিভিন্ন হাস্যরসাত্মক গল্প ও 'মেছাল'-এর মাধ্যমে একে-অপরকে পরাস্ত করার চেষ্টা করেন। দাদি-নাতিন পালাটিতে কতগুলো সাধারণ 'খোঁটা' বা টিপ্পনী রয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- নাতিন তোমার অল্প বয়স সাবধানে চলাফেরা করবে; নাতিন তুমি পাড়ায় ঘুরে বেড়াও আর ছেলেদের মাথা নষ্ট কর কেন; নাতিন তুমি বেশি আমিষ খেও না, কারণ আমিষ খেলে রতিশক্তি বৃদ্ধি পায়, তোমার তো আবার স্বামী নেই; দাদির বয়স হয়েছে অনেক কিন্তু এখনও রঙঢঙ কমেনি; দাদি এই বয়সেও সকালে গোসল করো তোমার কী লজ্জা-শরম নেই; দাদি, দাদাকে রেখে অন্য পুরুষের সাথে পরকিয়া করে প্রভৃতি। এ রকম বহু টিপ্পনীর মাধ্যমে গায়েনদ্বয় একে-অপরকে শ্লেষ করেন। দাদি-নাতিন পালার একটি চমৎকার টিপ্পনীর উদাহরণ আকলিমা বেগমের পরিবেশনা থেকে দেয়া যায়-

> ও নাতিন, ঠোঁট পালিশ, গাল পালিশ, নেল পালিশ, যত পালিশ আছে সব পালিশ লাগাইও কিন্তু সময় মতো লাগাইও, অসময়ে লাগাইও না, তাইলে বিপদের সম্ভাবনা আছে। ও নাতিন, আমি অইলাম দাদি, বুড়া মানুষ আর তুমি অইলা নাতিন, তুমি এমনভাবে সংযত হইয়া থাইকো, তুমি নাতিন কোথাও আমার সাথে গেলে আমি য্যান তোমারে বাইরে নিয়্যা আবার ঘরে ফিরাই আনতে পারি। (আকলিমা, ২০১৬ : পরিবেশনা)

দাদি-নাতিন পালায় কথার টিপ্পনীতে যেমন হাস্যরসের উদ্রেক করে, তেমনি গানের ভাষা ও সুরে দর্শক-শ্রোতার মনে হাসির সঞ্চার করে। লিপি সরকার ও আকলিমা বেগমের পরিবেশিত দাদি-নাতিন পালায় চমৎকার একটি গান পরিবেশিত হয়েছে। যে গানগুলোর মধ্যে দাদি, নাতিন সম্পর্কে নানান হাস্যরসাত্মক কথায় পরিপূর্ণ। পালাটিতে গায়েনদ্বয় একজনের গানের জবাব অন্যজন পাল্টা গানের মাধ্যমেই দিয়েছেন। পালায় পরিবেশিত গানগুলোর মধ্যে একটি চমৎকার চটুল গান হচ্ছে-

> কলিকালের পোলাপান কুতকুতাইয়া চায়,
> ও মোর নাতিন লো, বাহির হইস না আলতা দিয়া পায় ॥
> (ও নাতিন লো) টেডি পোশাক গায় পরিয়া, ঠোঁট পালিশ গাল পালিশ দিয়া,
> গাল পালিশ কী সুন্দর মানায়,
> কোমরেতে বিছা দিয়া, টেডি জুতা পায় পরিয়া,

ঘুরিস না তুই সন্ধ্যারও বেলায় ॥ (আকলিমা, ২০১৬ : পরিবেশনা)[৪৬]

এই গানটির জবাবে পালাটিতে লিপি সরকারও একটি চমৎকার গান পরিবেশন করেন। তার গানেও আকলিমা বেগমের গানের মতোই চটুলতায় পরিপূর্ণ ছিলো। মূলকথা হচ্ছে, দাদি-নাতিন পালাটিতে হাস্যরসের উদ্রেক করতে গায়েনগণ সব রকম চটুলতা ও স্থূলতার আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন। আর এই চটুলতা-স্থূলতাই পালাটির প্রাণশক্তি, যার মাধ্যমে দর্শক-শ্রোতা বিনোদিত হয়। সর্বোপরি দাদি-নাতিন পালাটি বিষয় হিসেবে বিচারগানের আসরে অনন্য-অসাধারণ সংযুক্তি।

চিত্র-২০ : বিচারগানের গায়েন (বাম থেকে) লিপি সরকার, আব্দুল গনি সরকার ও পাখি সরকার।

হাস্যরসাত্মক পালার শ্বশুর, শাশুড়ি, জামাই ও বউ সংক্রান্ত পালাসমূহ

বিচারগানে শ্বশুর,শাশুড়ি, জামাই, বউ সংক্রান্ত পাঁচটি হাস্যরসাত্মক পালা রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে জামাই-বউ, জামাই-শ্বশুর, জামাই-শাশুড়ি, বউ-শ্বশুর ও বউ-শাশুড়ি। এই পালাগুলোও হাস্যরসাত্মক অন্যান্য পালার মতই স্থূল কথাবার্তায় পরিবেশিত হয়। যার মধ্যে পারিবারিক আন্তঃসম্পর্কের গভীরতা ও টানাপাড়েন নিয়ে আলোচিত হয়। জামাই-বউয়ের মধ্যে একে-অপরের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য কী হওয়া উচিত, বউ বা জামাই কর্তৃক শ্বশুর-শাশুড়ির জন্য কী কী করণীয় প্রভৃতি বিষয়াদি ধর্মীয় ও সামাজিক রীতি-নীতি কেন্দ্রীক যুক্তি সহকারে গায়েনগণ আলোচনা করেন। যাতে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, অভিযোগ-অভিমান, সুখ-দুঃখ, প্রেম-বিরহ, প্রতিবাদ-প্রতিহিংসা, ভুল-ক্ষমা বিষয়গুলো গায়েনদ্বয় কথায় ও গানে আসরে উপস্থাপন করে থাকেন। এরমধ্যে কখনো কখনো অযাচিত সম্পর্ক যেমন পরকিয়ার মত বিষয়ও উঠে আসে। দেখা যায়, জামাই-বউ পক্ষের গায়েন একে-অপরের চরিত্র নিয়ে কথা বলেন। আবার হয়তো গায়েন শ্বশুর বা শাশুড়ির পক্ষের গায়েনের প্রতি ব্যভিচারের অভিযোগ আরোপ করেন। অন্যদিকে এর প্রতিবাদ হিসেবে অন্য গায়েনও বিপক্ষের গায়েনের চরিত্র নিয়ে কথা বলেন। পালাগুলোর মধ্যে জামাই-বউ পালাটি

স্বামী-স্ত্রী পালা নামেও পরিবেশিত হয়, যদিও বিষয়স্তুর এক ও অভিন্ন। নিচে জামাই-বউ পালাসহ হাস্যরসাত্মক পালার শ্বশুর, শাশুড়ি, জামাই ও বউ সংক্রান্ত পালাসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

জামাই-বউ পালা

বাংলাদেশের লোকনাটকের প্রায় প্রতিটি আঙ্গিকেই জামাই-বউ বা স্বামী-স্ত্রী চরিত্র দুটি নানাভাবে উপস্থাপিত হয়ে থাকে। এই চরিত্র দুটির উপস্থিতি লোকনাটক বিচারগানেও দেখা যায়। বিচারগানে যেহেতু সবকটি পালা বিষয়ভিত্তিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পরিবেশিত হয়, তাই সব সময় দুটি বিপরীতমুখী বা প্রতিপক্ষ কেন্দ্রীক দুটি বিষয় থাকে। পালার বিষয় হিসেবে জামাই-বউ বা স্বামী-স্ত্রীও তেমনই দুটি বিপরীতমুখী চরিত্র। এই চরিত্র দুটি বৈবাহিকসূত্রে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ। তাই পালাটি আত্মীয় সম্পর্কিত পালা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু পালাটিতে হাস্যরসের আধিক্য থাকায় হাস্যরসাত্মক পালার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। যাহোক পালাটি সাধারণত দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়ে থাকে। তার একটি হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার প্রেমময় সম্পর্ক, আরেকটি হচ্ছে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক। এছাড়া পালায় স্বামী বা স্ত্রীর মধ্যে কে বড় বিষয়টি প্রমাণ করতে গায়েনগণ সচেষ্ট থাকেন। স্বামী বা স্ত্রী পক্ষের গায়েন ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক ও শারীরিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন যুক্তি উপস্থাপন করেন নিজের পক্ষকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার জন্য। পালাটিতে দেখা যায়, গায়েনগণ বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের বাণীকে অকাট্য দলিল হিসেবে পেশ করে নিজের পক্ষকে জেতানোর চেষ্টা করেন। গায়েনগণ প্রায়ই ধর্মীয় ও লৌকিক গল্প উপস্থাপন করেন স্বামী বা স্ত্রীর মহত্ব প্রমাণের জন্য। বিশেষ করে, নবি মুহাম্মদ (স.) ও তাঁর স্ত্রীদের মধ্যকার সম্পর্ক এবং রাম ও সীতার মধ্যকার সম্পর্ক প্রায়ই দৃষ্টান্ত হিসেবে গায়েনগণ আসরে বর্ণনা করে থাকেন। এছাড়া খ্রিস্টধর্মের স্বামীহীন মা মেরীর কথাও গায়েনের পরিবেশনায় আলোচিত হয়। পালাটিতে গায়েনগণ স্বামী-স্ত্রীর একে-অপরের প্রতি কী রকম দায়িত্ব-কর্তব্য থাকা উচিত তা আলোচনা করেন। কখনো কখনো গায়েনগণ নিজ পক্ষকে জেতানোর জন্য একপক্ষ অন্যপক্ষকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে থাকেন। স্বামী-স্ত্রী পালায় গায়েনদেরকে কতগুলো সাধারণ প্রশ্ন করতে দেখা যায়। তার মধ্যে কয়েকটি প্রশ্ন হচ্ছে-

ক. মানব ইতিহাসে প্রথম স্বামী-স্ত্রী কে?

খ. স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য কী কী?

গ. স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য কী কী?

ঘ. নবি মুহাম্মদ (স.)-এর কতজন স্ত্রী ছিলো? তাদের নাম কী?

ঙ. সীতা সতি হওয়া স্বত্ত্বেও রাম কেন তাকে বনবাসে দিয়েছিলো?

চ. নবি মুহাম্মদ (স.)-এর সবচেয়ে ছোট স্ত্রীর নাম কী? তাঁকে কতো বছর বয়সে বিয়ে করেন?

এরকম নানা চমকপ্রদ প্রশ্ন করার পাশাপাশি গায়েনগণ কিছু অসাধারণ গানের মাধ্যমে নিজ পক্ষের পালার শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা করেন এবং প্রশ্ন করে থাকেন। এই চমকপ্রদ পালাটি বিচারগানে প্রচলিত হলেও খুব বেশি পরিবেশিত হয় না। সাধারণত বারোয়ারি মেলা ও অডিও-ভিডিও মাধ্যমে পরিবেশিত হয়। কোনো ধর্মীয় আসরে পালাটি পরিবেশিত হয় না বললেই চলে। ছোট রজ্জব আলী দেওয়ানের পরিবেশনা থেকে জানা গেছে, স্বামী-স্ত্রী পালাটি বাংলাদেশে সর্বপ্রথম তিনি ও লিপি সরকার উপস্থাপন করেছেন। এ প্রসঙ্গে ভিসিডিতে স্বামী-স্ত্রী পালা পরিবেশনাকালে ছোট রজ্জব আলী দেওয়ান বলেন,

> আমাদের আজকের পালা হলো, যেটা আজ পর্যন্ত, এখনো বাংলাদেশে কেউ করেনি। আমি রজ্জব দেওয়ান এবং বাংলাদেশের উদীয়মান খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী লিপি সরকার, আমাদের আজকের পালা হলো স্বামী এবং স্ত্রী। (রজ্জব, ২০১৭ : পরিবেশনা)

অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী পালা ছোট রজ্জব আলী দেওয়ান ও লিপি সরকারের পরিবেশনার মধ্য দিয়ে বিচারগানে নতুন বিষয়ের একটি পালার সংযোজন হয়েছে। এই পালাটিতে স্বামী ও স্ত্রীর একে-অপরের প্রতি কী কী কর্তব্য ও তাদের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে দ্বান্দ্বিকতা রয়েছে তা গায়েনগণ আলোচনা করেন, তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, ছোট রজ্জব আলী দেওয়ান ও লিপি সরকারের প্রথম পরিবেশিত স্বামী-স্ত্রী নামক এই পালাটিতে। যা লিপি সরকারের পরিবেশনার একটি অংশেই স্পষ্ট হয়। পালাটির পরিবেশনায় বউ বা স্ত্রীপক্ষের গায়েন লিপি সরকার বলেন,

> আমরা দুটি শিল্পী উপস্থিত হয়েছি, আপনাদের মাঝে আজকে একটা পালা নিয়ে, যেই পালা কখনো স্টেজেও গাওয়া হয় নাই এবং কখনো ক্যাসেটে করাও হয় নাই। সেই দুটি পালা নিয়ে, সেই পালা হলো স্বামী আর স্ত্রী। এই স্বামী-স্ত্রীর পালায় স্বামী দেখাবে এই দুনিয়াতে স্বামীর গুণই বেশি নাকি কম, আর স্ত্রী দেখাবে স্ত্রীর গুণই বেশি নাকি কম। (লিপি, ২০১৭ : পরিবেশনা)[৪৭]

আসরে লিপি সরকার প্রথমেরই জামাই-বউ পালার বিষয়বস্তু নিয়ে যেমন অলোচনা করেন, তেমনি আগের আসরে ছোট রজ্জব দেওয়ানের 'খোঁটা'র দেয়ার জবাবে পাল্টা 'খোঁটা'ও দেন। আসরে দুই গায়েনের এই 'খোঁটা' ও পাল্টা 'খোঁটা'য় দর্শক-শ্রোতার মাঝে হাসির উদ্রেক করে। এছাড়া পালাটিতে চটুলতা, অশ্লীলতাপূর্ণ কথাবার্তাও লোকসমাজের অন্তর্ভূক্ত দর্শক-শ্রোতাদের বিনোদিত করে। আর বিশেষ করে জামাই-বউ পালার মতো সম্পর্ক কেন্দ্রিক পালা হওয়ায় বহু দর্শক-শ্রোতা আসরের যৌনসংশ্লিষ্ট আলোচনা শুনে আনন্দিত হয়। তবে পালাটিতে স্থুল বিষয়ের পাশাপাশি উপদেশমূলক অনেক সুন্দর-সুন্দর আলোচনাও হয়ে থাকে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্কের মাহাত্ম প্রকাশের জন্য কিছু গুরুগম্ভীর গানও গায়েনগণ আসরে পরিবেশন করেন। যেমন-

> ওরে স্ত্রী হয় ঘরের লক্ষী, ভক্তি কর তারে,
> নইলে পড়বা মহা-ফেরে ॥

স্ত্রীর মন রাখলে সন্তুষ্ট,

(ওরে) আল্লাপাক খুশি হয় লিখেছে পষ্ট,

স্ত্রীকে দিলে কষ্ট লক্ষ্মী যায় দূরে ॥ (লিপি, ২০১৭ : পরিবেশনা)[৪৮]

জামাই-বউ পালার বউপক্ষের গায়েন লিপি সরকারের এই গানটিতে মূলত বউ বা স্ত্রীর প্রতি জামাই বা স্বামীর দায়িত্ব-কর্তব্যের বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। যার প্রধান উদ্দেশ্য দর্শক-শ্রোতাকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্কের বিষয়ে সচেতন করা। পালাটিতে স্ত্রীর প্রতি নিবেদিত গানের মতো স্বামীর প্রতি নিবেদন করেও বহু গান পরিবেশিত হয়ে থাকে। সর্বোপরি জামাই-বউ বা স্বামী-স্ত্রী পালা সম্পর্কে বলা যায় পালায় বিষয়বস্তু ও গানের অসাধারণ মেলবন্ধনের ফলশ্রুতিতে পালাটি নিঃসন্দেহে অনন্য-চমৎকার।

জামাই-শাশুড়ি পালা

বিষয়-বৈচিত্র্যের দিক থেকে জামাই-শাশুড়ি পালাটি একটি চমৎকার বিষয় নিয়ে বিচারগানের আসরে পরিবেশিত হয়ে থাকে। লোকনাটক বিচারাগানেরর হাস্যরসাত্মক পালার শ্বশুর, শাশুড়ি, জামাই ও বউ সংক্রান্ত পালাসমূহের মধ্যে চটুলতা ও চাতুরীপনার দিক থেকে বেশ সমৃদ্ধ একটি পালা। পালাতে বৈবাহিক বন্ধনের সূত্র ধরে নিকট আত্মীয় জামাই ও শাশুড়িকে চরিত্র হিসেবে নিয়ে গায়েনগণ গদ্য, কাব্য ও সংগীতের মাধ্যমে আসরে শৈল্পিক প্রতিযোগিতা করেন। বিচারগানে সাধারণত হাস্যরসাত্মক পালাগুলোতে হাস্যরস ছাড়াও স্থূলতা ও অশ্লীলতা থাকে। কিন্তু জামাই-শাশুড়ি পালাটিতে যথেষ্ঠ হাস্যরসের উপাদান থাকলেও অশ্লীলতা বিষয়টি তুলনামূলকভাবে কম। এমনকি এই পালাটিতে যৌনতা সংশিষ্ট বিষয়াদিও নেই। পালাটিতে হাস্যরসেরও কমতি নেই। আর এই হাস্যরসের সৃষ্টিতে গায়েনগণ জামাই ও শাশুড়ির মধ্যকার বিভিন্ন রকম মজার ঘটনাকে উপজীব্য করেন। পালায় জামাই ও শাশুড়ি চরিত্রের প্রতি নানা রকম 'খোঁটা' ও বিদ্রুপ করার মাধ্যমে প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হতে চান। জামাই-শাশুড়ি পালাটিতে গায়েনদ্বয় পরিবেশনাকে প্রাণবন্ত করতে একে-অপরের খুঁটিনাটি দোষ-ত্রুটিকে হাসরসাত্মক উপায়ে আসরে তুলে ধরেন। পালায় গায়েনদ্বয় যে সকল দোষ একে-অপরের ওপর আরোপ করেন, তার মধ্যে প্রধান প্রধান হাস্যরসাত্মক দোষ-ত্রুটি হচ্ছে- জামাই একটা বলদ তার কাণ্ডজ্ঞান নেই; শ্বশুরবাড়িতে এসে কাউকে সালাম-আদাব দেয় না; জামাই দাঁত মাজে না; জামাইয়ের গা থেকে দুর্গন্ধ বের হয়; জামাইয়ের বংশ ভালো না; জামাই তার বউকে মারধর করে; শাশুড়ি কৃপণ জামাইকে আদর-যত্ন করেন না; শাশুড়ি জামাইকে অষুধ খাইয়ে বশ করার চেষ্টা করেছেন; শাশুড়ি জামাইকে কুবুদ্ধি দেয় যাতে সে তার বাবা-মায়ের ভরণপোষণ না করেন; শাশুড়ির চরিত্র ভালো না, সে শ্বশুরকে রেখে অন্য পুরুষে আসক্ত; শাশুড়ি বৃদ্ধা বয়সেও পার্লারে যায়; জামাই শাশুড়ির নিকট যৌতুক চায়; জামাই

শালা-শালীকে স্নেহ-ভালোবাসা দেয় না প্রভৃতি। এ রকম বিষয়গুলো গায়েনগণ ঠাট্টাচ্ছলে বলে আসরে হাসির উদ্রেক করার চেষ্টা করে থাকেন। বিচারগানের আসরে পরিবেশিত জামাই-শাশুড়ি পালা পর্যবেক্ষণ করলে এই বিষয়গুলোই মোটামুটি পাওয়া যায়। এছাড়া পালায় যে গানগুলো পরিবেশিত হয় তাতেও চটুল ও হাস্যরসাত্মক বিষয়গুলোই চিহ্নিত হয়। নিচের গানটির পঙক্তিতেও তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

যৌতুকের টাকার জন্য মেয়ে পাঠায় আমার বাড়ি,
(আমি) ছি ছি লজ্জায় মরি ॥
আমার মাইয়ার গুণ দেখিয়া তোর বাবায় করাইছে বিয়া,
ভালো বংশের মাইয়া দেইখা নিয়াছে বউ করি,
এখন কেন টাকার জন্য সকাল-বিকাল দৌড়াদৌড়ি ॥ (আকলিমা, ২০১৬ : পরিবেশনা)[৪৯]

শাশুড়িপক্ষের গায়েন আকলিমা বেগম এই গানটিতে জামাইপক্ষের গায়েনকে উদ্দেশ্য করে যেমন বিভিন্ন দোষারোপ ও বিদ্রুপ করেছেন, তেমনি তিনি কথা ও মজার মজার গ্রামীণ হাস্যরসের গল্প বলেও প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করার চেষ্টা করছেন। এই পালাটিতে জামাইপক্ষের গায়েন মালেক সরকারও পাল্টা যুক্তি ও গানের মাধ্যমে আসরে তার পালার বিষয়কে বিজয়ী করতে দারুণ ভূমিকা রেখেছেন। এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়, সেটি হচ্ছে বিচারগানের প্রায় প্রত্যেকটি পালাতেই যেমন প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে পালায় গায়েনগণ অভিনয় করেন, এই পালাটিতে তেমনটি দেখা যায়নি। জামাই-শাশুড়ি পালাতে গায়েনগণ প্রধানত একে-অপরকে ঠাট্টাচ্ছলে বিভিন্ন 'খোঁটা' ও পাল্টা 'খোঁটা' দেন, তাতেই পালাটি আসরে হাস্যরসের মাধ্যমে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। পালায় গায়েনদ্বয়ের ঠাট্টা-তামাশার ফলে দর্শক-শ্রোতাও বেশ বিনোদিত হয়। বিচারগানের আসরের এই চমৎকার পালাটির সংযুক্তির বিষয়ে এক পরিবেশনায় আকলিমা বেগম জানাান, প্রথমে পালাটি অডিও আকারে তিনি ও মালেক সরকার অভিনয় করেন, পরবর্তীতে ভিসিডিতে নতুন করে ধারণ করেন। জামাউ-শাশুড়ি পালাটি অডি-ভিডিও দুই মাধ্যমেই তুমুল জনপ্রিয় বলে জানা গেছে। তবে পালাটির বিষয়বস্তু চটুল হওয়ায় দর্শক-সম্মুখে মানে বিচারগানের মূল পরিবেশনাস্থল পির-গোঁসাইদের বাড়িতে পরিবেশিত হয় না। পালাটি চটুল হওয়ায় এর দর্শক-শ্রোতাও খুবই সাধারণ শ্রেণির মানুষ। বিচারগানে প্রায় ৭০টি পালা রয়েছে, যেগুলোর উদ্ভব হয়েছে দর্শক-শ্রোতার চাহিদার ওপর ভিত্তি করে। তাই সব রকম পালাই বিচারগানের আসরে গুরুত্ব বহন করে।

বউ-শাশুড়ি পালা

দুইটি নারী চরিত্রকে উপজীব্য করে হাস্যরসাত্মকভাবে বিচারগানের আসরে বউ-শাশুড়ি পালাটি পরিবেশিত হয়। পালাটিতে সব সময় দুজন নারী গায়েন অভিনয় করেন। আসরে দেখা যায় প্রায় সব সময় বয়োজ্যেষ্ঠ নারী গায়েন শাশুড়ির ভূমিকায় আর তুলনামূলক যে নারী কম বয়সের তিনি বউয়ের চরিত্রে অভিনয় করেন। এই পালাটিতে হাস্যরসাত্মক পালাগুলোর মতো যথারীতি চটুলতা, স্থূলতা, যৌনতা ও অশ্লীলতার মতো বিষয়াদির উপস্থিতি রয়েছে। অন্যান্য পালাগুলোতে যেমন পালার চরিত্রকে আশ্রয় করে প্রত্যক্ষভাবে যৌনতাবিষয়ক ইঙ্গিত করে কথা বলেন, তেমনি বউ-শাশুড়ি পালাতে দুটি চরিত্রই নারী হওয়ায় পরোক্ষভাবে যৌনতা সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে গায়েনগণ বিদ্রুপ করেন। প্রতিটি বিদ্রুপ অবশ্য ঠাট্টাচ্ছলে করা হয়ে থাকে। পালায় বউ ও শাশুড়ি চরিত্রে অভিনয়ের প্রয়োজনে গায়েনদ্বয় একে-অপরকে যেন দুই চোখে দেখতে পারেন না, এমন আচরণ করে থাকেন। চরিত্র দুটির মাধ্যমে দুই গায়েন পরিবার কেন্দ্রিক হাজারও অভিযোগ করেন। এই পালাটিতে গায়েনগণ বিচারগানের পরিবেশনা-পদ্ধতি প্রতিযোগিতার যথার্থ প্রয়োগ করেন। গ্রাম বাংলার চিরচেনা সাংঘর্ষিক সম্পর্কের কারণে এবং হাস্যরসের পরিবেশনায় বিচারগানের দর্শকদের নিকট পালাটি তুমুল জনপ্রিয়। পালাটিতে যত নারী গায়েন এ যাবৎ অভিনয় করেছেন তার মধ্যে আকলিমা বেগম ও লিপি সরকার বেশ সুনাম অর্জন করেছেন। বউ-শাশুড়ি পালাটি সরাসরি দর্শক-সম্মুখের চেয়ে অডিও-ভিডিও মাধ্যমেই বেশি জনপ্রিয় ও প্রচলিত। এই পালায় গায়েনগণ একে-অপরকে ঠাট্টচ্ছলে এমন সব কথা বলেন, যে কথাগুলো বাস্তবে হলে ভয়াবহ সংঘর্ষের মতো পরিস্থিতি তৈরি হবে। কিন্তু পালায় গায়েনদ্বয় ঠাট্টাচ্ছলে পরিবেশন করায় হাস্যরসের উদ্রেক করে। এটাই হয়তো ফোকলোরের শক্তি। এ রকম পরিস্থিতির উদাহরণ পাওয়া যায় আকলিমা বেগম ও লিপি সরকারের বউ-শাশুড়ি পালার একটি পরিবেশনায়। উক্ত পরিবেশনায় বউপক্ষ থেকে শাশুড়ি চরিত্রের আকলিমা বেগমকে বিভিন্ন রকম হেয়পতিপন্ন করার পর শাশুড়ির চাপার দাঁত ভেঙে ফেলবে বলে ঠাট্টাচ্ছলে হুমকি দেন। এর জবাব হিসেবে আকলিমা বেগমও বিভিন্নভাবে প্রতিবাদ-শ্লেষ করে বলেন,

> আমি এক্কেবারে টাস্কি লাইগ্যা গেলাম গা বউয়ের কথা শুইন্না। বাংলাদ্যাশ তো দূরের কথা সারাবিশ্বে এই রকম কোনো বই আছে কিনা, আমি তো বলতে পারি না। আপনার কী বলতে পারেন, এমন বউ কী আছে আর কোনো দেশে? অ্যার মত বউ আর দেখছেন কোনো দিন? কয় কী ! চেহারা যেমন-তেমন, উনার মুখের যা ভাষা! আহারে চুলতো পরে পরেই একেবারে পশম শুদ্দা পইরা যাইতে চায় কথার চোটে। দেখছেন না কী কয়? আগেই কইছি শাশুড়ি যেই কথা, মা সেই কথা। তুমি শাশুড়িদের খারাপ কথা বলতে গেলে, তুমি আগে মায়ের কথা চিন্তা কইরা নিও। আমারে কয়- চাপার দাঁত একটাও রাখবো না! আমি অইলাম পোলার মা, আর ও অইলো পোলার বউ। (আকলিমা, ২০২১ : পরিবেশনা)[৫০]

বউ-শাশুড়ি পালাটিতে দুই পক্ষের গায়েনদ্বয় একে-অপরকে এ রকমভাবেই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও বিদ্রুপ করে থাকেন। পালায় গায়েনদ্বয় কিছু সাধারণ বিষয় ধরে 'খোঁটা' দেন। যেমন- শাশুড়ি বলেন, বউ শুধু খায় আর ঘুমায়, বাড়ির

কাজ-কর্ম কিছু করে না; কতগুলো ছেলে-মেয়ে জন্ম দিয়ে তাদের দাদা-দাদির কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছে; শ্বশুরবাড়ি থেকে জিনিসপত্র বাবার বাড়িতে পাচার করে। অন্যদিকে বউ বলেন, শাশুড়ি মানুষ ভালো না, বউকে নির্যাতন করে; শাশুড়ি তখনও শ্বশুরের সাথে রঙ-তামাশায় সময় কাটায়; শুধু খায় আর পাড়া বেড়ায়; শাশুড়ি ঝগড়াটে-বদমেজাজী প্রভৃতি। এই বিষয়গুলো সাধারণত গায়েনগণ গদ্য-কথায় বর্ণনা করেন। তবে বিচারগান যেহেতু গীতপ্রধান পরিবেশনা সেহেতু পালার বিষয়বস্তু গায়েনদের গানেও প্রকাশ পায়। সে রকম একটি গানে আকলিমা বেগম শাশুড়িপক্ষ থেকে বউপক্ষের নানান দূর্বলতা প্রকাশ করেন। গানটিতে মূলত বউয়ের রান্নাবান্নার দোষ-ত্রুটি বর্ণিত হয়েছে। সে গানটি হচ্ছে-

ও বউ রান্দেরে কী জানি কী দিয়া,
লবন ছাড়া শাক রান্দে হলুদ বাটা দিয়া ॥
হাঁটু সমান পানি রাখছে শাকের ভিতরে,
শাকের ভিতর নাইমা বউয়ে হাপুরহুপুর করে ॥ (আকলিমা, ২০১৬ : পরিবেশনা)[৫১]

পালাটিতে গানের বিষয়বস্তুর মতোই বউ-শাশুড়ির যাপতি-জীবনের বিষয়গুলো চিত্রিত হয়। এ জন্য পালাটিতে পুরুষ দর্শকের চেয়ে নারী-দর্শকদের নিকট বেশি জনপ্রিয়। এছাড়া শুধু নারী চরিত্র কেন্দ্রিক পালা হওয়ায় পরিবেশনাটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। কেননা লোকনাট্যাঙ্গিক তথা প্রসেনিয়াম থিয়েটারে শুধু নারী চরিত্র কেন্দ্রিক নাটক খুব কম দেখা যায়। এ কারণে বিচারগানের পালার বিষয়বস্তু ছাড়াও বাংলানাটকের ধারায় বউ-শাশুড়ি পালাটি ব্যতিকমধর্মী ও অনন্য।

বুড়ি-ছোকরা পালা

বিচারগানের হাস্যরসাত্মক পালার মধ্যে বুড়ি-ছোকরা নামে একটি স্বল্প প্রচলিত পালা রয়েছে। এই পালাটি 'বুড়ির সাথে ছোকরার প্রেম' নামেও দর্শকমহলে পরিচিত। বুড়ি-ছোকরা পালাটির পরিবেশনা খুব বেশি না হলেও দর্শক-শ্রোতাদের নিকট বেশ জনপ্রিয়। বিচারগানের প্রধান পরিবেশনা-আয়তন ওরশ মাহফিল, বাৎসরিক মেলা কিংবা বারোয়ারি আয়োজনে পালাটি পরিবেশিত হওয়ার কোনো প্রামাণ পাওয়া যায়নি। তবে পালাটি ভিসিডিতে ধারণ করে প্রচারের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এমনকি বর্তমানে ইউটিউব কেন্দ্রিক বিভিন্ন চ্যানেলে এই পালার রেকর্ড প্রচার হয়ে থাকে। সেটিও অবশ্য খুবই অপ্রতুল। কেবল নীলা পাগলী ও ছোট রজ্জব আলী দেওয়ানের অভিনীত একটি পরিবেশনা পাওয়া গেছে। পালায় দেখা যায়, ছোট রজ্জব আলী দেওয়ান ছোকরার ভূমিকায় এবং নীলা পাগলী বুড়ির ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, ছোট রজ্জব আলী দেওয়ান বয়সের দিক থেকেও নীলা পাগলীর চেয়ে অনেক ছোট। অর্থাৎ বাস্তবেও বুড়ি-ছোকরা পালার গায়েনগণ বুড়ি বা বৃদ্ধা ও ছোকরা বা অল্প বয়স্ক যুবক হয়ে

থাকেন। পুরো পালাটিতে প্রেম ও কাম সংক্রান্ত নানাবিধ রসালো কথাবার্তায় ভরপুর। এছাড়া পালায় পরিবেশিত গানের কথায় চটুল কথাবার্তা রয়েছে। বুড়ি-ছোকরা পালায় নীলা পাগলী পরিবেশতি গানগুলোর কথায় চটুলতার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ রকম একটি গানের কথা হচ্ছে-

ছোকরা বলি তোরে, ছোকরা বলি তোরে,
প্রেম-পিরিতি আমার সনে ক্যান করতে চাসরে,
শোন ছোকরা বলি তোরে ॥
ছোট ছেলে কত আদর করেছিলাম তোরে,
এখন দেখি কানি চোখে চাস আমার দিকেরে ॥ (নীলা, ২০১৭ : পরিবেশনা)[৫২]

বুড়িপক্ষের গায়েন নীলা পাগলী পরিবেশতি এই গানের কথার মতোই বুড়ি-ছোকরা পালার গায়েনগণ বিভিন্ন চটুল-স্থুল কথাবার্তায় একে-অপরকে ঠকানোর চেষ্টা করেন। বুড়ি ও ছোকারা পক্ষের গায়েনদ্বয় স্ব স্ব পালার পক্ষে নানা রকম যুক্তি যেমন দেন, তেমনি বিপক্ষের পালাকে ছোট করতে বিভিন্ন পাল্টা যুক্তিও দিয়ে থাকেন। এছাড়া গানের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য এক গায়েন কর্তৃক আরেক গায়েনকে পালায় নির্ধারিত চরিত্র বা বিষয়ের ভুল-ত্রুটি ধরে 'খোঁটা' দেওয়া, বুড়ি-ছোকরা পালাটিতেও তা দেখা যায়। বুড়ি-ছোকরা পালাটিতে কতগুলো সাধারণ বিষয় রয়েছে, যার মাধ্যমে গায়েনদ্বয় একে-অপরকে 'খোঁটা' দিয়ে পরাজিত করার চেষ্টা করেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-

বুড়িপক্ষের গায়েন যা বলে 'খোঁচা' দেন :

ক. দুই দিনের ছোকরা তুমি অথচ তোমার নজর ভালো না।

খ. তোমাকে আমি কোলে নিয়েছি, আর সেই তুমিই আমাকে প্রেম নিবেদন কর।

গ. তোমার যত বড় মুখ না, তত বড় কথা। তোমার চরিত্র ঠিক কর।

ঘ. এই ছোকরা তোমাকে আমি জন্ম নিতে দেখেছি, আর সেই তুমি আমাকে গালাগালি কর।

ঙ. ছোকরা তোমার জন্য তো পাড়ার যুবতী মেয়েরা নিরাপত্তাহীনতায় থাকে।

ছোকরা পক্ষের গায়েন যা বলে 'খোঁটা' দেন :

ক. বুড়ি হয়ে গেছো, আজ কী কাল মারা যাবা অথচ এত রঙঢঙ কর কেন?

খ. কথাবার্তা শুনে তো মনে হয় তোমার চরিত্র সারাজীবনই খারাপ ছিলো।

গ. তোমার যে চেহারা কোনো মানুষ তো দূরে থাক পশুও তাকাবে না। আর আমাকে বল তোমার দিকে নজর দেই।

ঘ. জানি তো তোমার জন্য কত পুরুষের জীবন নষ্ট হয়েছে। তাদের মতো আমাকে ভেবো না।

ঙ. আমি ছেলে মানুষ তাই বুঝি আমার প্রতি এতো কুনজর। লাভ নেই বুড়ির প্রেমে আমি পড়বো না।

এ রকম ‘খোঁটা’-পাল্টা ‘খোঁটা’র মাধ্যমে পালাটিতে দুই পক্ষের গায়েন অভিনয় করে থাকেন। যাহোক বুড়ি-ছোকারা পালার বিষয়বস্তুর সারকথা হচ্ছে, বৃদ্ধা ও যুবকের মধ্যকার অসামঞ্জস্য সম্পর্কের টানাপোড়েন। যেখানে হাসি-ঠাট্টায় গায়েনগণ দর্শক-শ্রোতাকে হাস্যরসে মাতিয়ে রাখেন।

বুড়া-ছুকরি পালা

হাস্যরসাত্মক পালাসমূহের মধ্যে আরেকটি চটুল ও চমৎকার পালা হচ্ছে বুড়া-ছুকরি পালা। এই পালাটিও বিচারগানের বুড়ি-ছুকরা পালার অনুরূপ। বুড়া-ছুকরি পালাটি ‘বুড়ার সাথে ছুকরির প্রেম’ নামেও বিচারগানের আসরে বহুল পরিচিত। পালাটিতে মূলত বয়স্ক পুরুষের সাথে কম বয়সী নারীর প্রেম, প্রণয় ও বিয়ে সংক্রান্ত মধুর-তিক্ত বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা হয়ে থাকে। পালাটির পরিবেশনার প্রতিটি মুহূর্তে হাস্যরসের আবেশ থাকে। গায়েনগণ নানা রকম গল্প-কৌতুকে দর্শক-শ্রোতাকে বিনোদিত করার চেষ্টা করেন। এই বিনোদনের উৎস হিসেবে অসম বয়সের প্রেম-বিয়েকে উপজীব্য করা হয়। বুড়া-ছুকরি পালাটি খুব বেশি প্রচলিত না হলেও যে কয়েকজন গায়েন পালাটিতে অভিনয় করেছেন তাদের মধ্যে মালেক সরকার ও নীলা পাগলী বেশি প্রশংসিত হয়েছেন। এছাড়া বাংলাদেশে যত রকম বিচারগানের হাস্যরসাত্মক পালা রয়েছে, তার বেশির ভাগ পালাটিতেই এই দুই জনপ্রিয় গায়েন অভিনয় করেছেন। এ কথাও সত্য কোনো কোনো গায়েন ও দর্শক-শ্রোতা চটুল পালায় অভিনয় করার জন্য মালেক সরকার ও নীলা পাগলীকে আড় চোখে দেখেন। তবে মালেক সরকার ও নীলা পাগলীর মতো গায়েনের আন্তরিকতার জন্যই বিচারগানের বহু ব্যতিক্রমধর্মী হাস্যরসাত্মক পালার সৃষ্টি হয়েছে। যার জন্য বিষয়বস্তুর দিক থেকে লোকনাটক বিচারগান বর্তমানে এতো সমৃদ্ধ ও বিকশিত হয়েছে। এজন্যই বিচারগানের হাস্যরসাত্মক পালাসমূহ আলোচনাকালে মালেক সরকার ও নীলা পাগলীর অভিনয়ের প্রসঙ্গ চলে আসে। বিচারগানের বুড়া-ছুকরি পালার পরিবেশনা দেখে কতগুলো সাধারণ বিষয় চিহ্নিত করা যায়, যেগুলো ঘুরেফিরে পালায় গায়েনগণ আলোচনা করে থাকেন। সে বিষয়গুলো হচ্ছে-

ক. বুড়ো ও ছুকরির অসম প্রেমের সমালোচনা।

খ. বুড়োর বয়সজনিত কারণে শারীরিক দুর্বলতার প্রসঙ্গ।

গ. ছুকরির অল্প বয়স হওয়ায় বুদ্ধিহীনতার সমালোচনা।

ঘ. বৃদ্ধ বয়সে বুড়োর কামুকতার সমালোচনা।

ঙ. বয়সজনিত কারণে ছুকরির চঞ্চলতার সমালোচনা।

চ. একে-অপরের মধ্যে অসংলগ্ন আচরণের অভিযোগ।

ছ. মৃদু অশ্লীল ও যৌন-আশ্রয়ী কথাবার্তা।

জ. যৌন ক্ষমতা ও অক্ষমতার শ্লেষাত্মক আলোচনা।

ঝ. একে-অপরের চরিত্র নিয়ে অভিযোগ-দোষারোপ।

ঞ. ভরণপোষণ সংক্রান্ত অভিযোগ ও অভিমানের প্রসঙ্গ।

এই বিষয়গুলো পালায় আলোচনার জন্য গায়েণগণ প্রশ্ন-উত্তরের পাশোপাশি নানা রকম হাস্যরসাত্মক গল্প ও চটুল কথাবার্তায় পূর্ণ গানের উপস্থাপন করে থাকেন। প্রশ্ন-উত্তরের দৃষ্টান্ত হিসেবে মালেক সরকার ও নীলা পাগলী পরিবেশিত বুড়া-ছুকরি পালার দুয়েকটি প্রশ্ন-উত্তরের ধরণ আলোচনা করা যেতে পারে। পালায় একটি প্রশ্ন এমন ছিলো- একজন বুড়োকে কেন অল্প বয়স্ক একজন নারী বা ছুকরি বিয়ে করলো, কোন চাহিদার জন্য? প্রশ্নটি নীলা পাগলীর প্রতি মালেক সরকার করেন। এই প্রশ্নের জবাবে নীলা পাগলী জানায়, একজন বুড়োকে বিয়ে করার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, বুড়োর অনেক ধন-সম্পত্তি আছে তাই। বুড়ো বেশি দিন বাঁচবে না, বুড়োর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার ধন-সম্পত্তির মালিক হতে পারবে ছুকরি। এ রকম প্রশ্ন-উত্তরের পাশাপাশি পালায় মালেক সরকার ও নীলা পাগলী বুড়ো ও ছুকরির যৌন ক্ষমতা-অক্ষমতা নিয়েও কথা বলেন। যেমন- নীলা পাগলী, মালেক সরকারকে তার পালার চরিত্র বুড়োকে বলে সে ১০-১২টা বিয়ে করেছে, বুড়োর চরিত্র ভালো না। এর প্রত্যুত্তরে মালেক সরকার বলেন, আমার ক্ষমতা আছে বলেই এতোগুলো বিয়ে করেছি। এমনকি তোমাকেও বিয়ে করেছি। আর চরিত্র যদি খারাপই হবে তাহলে ছুকরি তুমি আমাকে বিয়ে করেছো কেন? এই রকম চটুল কথার্বাতার সাথে সাথে পালাটিতে বহু চটুল গানও পরিবেশিত হয়। গানগুলোর মাধ্যমে দর্শক-শ্রোতার হৃদয়ে হাস্যরসের উদ্রেক করে। এ রকম একটি গানের কথা হচ্ছে-

> শখের তোলা আশি টাকা ঐ ছেমরি তুই বুঝোছ না,
> দেখতে আমি বুইড়া হইলেও মনটা আমার বুইড়া না ॥
> তোর চোখেতে দেখলি আমার চুল-দাঁড়ি সব পাকা,
> পাকা চুলও কাঁচা হয়রে হাতে থাকলে টাকা,
> আমার সাথে বিয়া হইলে দেখবি আমি মন্দ না ॥ (মালেক, ২০২০ : পরিবেশনা)[৫৩]

বুড়া-ছুকরি পালায় পরিবেশিত মালেক সরকারের এই গানের মাধ্যমে পালার দুই চরিত্র বুড়ো ও ছুকরির মধ্যে যে মধুর ঝগড়া হয় সেটি বোঝা যায়। গানটি মূলত ছুকরির নানা রকম 'খোঁটা'র জবাবে বুড়াপক্ষের গান। এই রকম হাস্যরসাত্মক গান ও কথাবার্তার কারণে পালাটি বহু দর্শক-শ্রোতার নিকট জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এমনকি কোনো দর্শক-শ্রোতার নিকট বিচারগানের গুরুগম্ভীর পালার চেয়ে এই রকম হাস্যরসাত্মক পালাই বেশি জনপ্রিয়। এর অন্যতম কারণ অবশ্য দর্শকের চিন্তার গভীরতা ও পছন্দের তারতম্য। সাধারণত সে সমস্ত দর্শক-শ্রোতা গুরু-গোঁসাই

ভক্ত বা তরিকতের দীক্ষা গ্রহণ করেছেন তারা বিচারগানের ধর্ম বিশ্লেষণাত্মক পালাই বেশি পছন্দ করেন। তার মানে এই নয় তারা হাস্যরসাত্মক পালা পছন্দ করেন না। হাস্যরসাত্মক পালার জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ হচ্ছে, মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা সে হাসি-আনন্দ চায়। বিচারগানের হাস্যরসাত্মক পালা সম্পর্কে জানতে চাইলে বিচারগানের নিয়মিত দর্শক শাহিন টিটু বলেন,

> আমি বেশির ভাগ সময়ই গুরু-শিষ্য ও জীব-পরম পালা শুনি। এর কারণ প্রায় সব ওরশ মাহফিলে এই পালাগুলোই পরিবেশিত হয়ে থাকে। তবে পালার মধ্যে একটু-আধটু হাসি-তামাশা না থাকলে ভালোও লাগে না। (শাহিন, ২০২৩ : সাক্ষাৎকার)

মূল কথাই হচ্ছে, যে কোনো পরিবেশনার মধ্যে দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্য যদি সব রকম উপাদান না থাকে তাহলে পরিবেশনাটি তার আবেদন হারিয়ে ফেলে। এমনকি পরিবেশনাটিকে টিকে থাকতে দর্শক-শ্রোতার পছন্দের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হয়। নয়তো যে কোনো লোকপরিবেশনা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। লোকনাটক বিচারাগানের বৈচিত্র্যময় বিষয়বস্তুর জন্য বাংলাদেশের লোকআসরে এতো জনপ্রিয়। আশা করা যায়, পরিবেশনাটির বহুমাত্রিক বিষয়ের পালার কারণেই দীর্ঘদিন লোকসংস্কৃতির সমৃদ্ধ পরিবেশনা হিসেবেই টিকে থাকবে।

চিত্র-২১ : বুড়ি-ছোকরা পালার পরিবেশনার একটি মুহূর্ত

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জীবনবৃত্তান্তমূলক পালাসমূহ

বিচারগানের জীবনবৃত্তান্তমূলক পালাগুলোর সংযোজন দর্শক-শ্রোতাদের নিকট ভিন্নমাত্রার উপভোগ্য পরিবেশনা হয়ে ধরা দেয়। যা বিষয়ের ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্যময়তা এনে দেয়। এ পালাগুলোতে মূলত ধর্মীয় সাধু ব্যক্তিদের জীবন ও কর্ম নিয়ে গায়েনগণ আলোচনা করে থাকেন। বিচারগানের গায়কদের ভাষ্য মতে, ইসলামধর্মের প্রবর্তক নবি মুহাম্মদ (স.), হিন্দুধর্মের অবতার শ্রী কৃষ্ণ, অলি-আওলিয়া, পির-ফকির এবং সুফি-বৈষ্ণববাদী বাউলদের জীবনীনির্ভর পালা হয়ে থাকে। বিচারগানে বহুল প্রচলিত যে সকল মহান ব্যক্তিদের জীবনী নিয়ে পালা হয়, সে সকল মহান ব্যক্তিগণ হচ্ছেন- ইসলামধর্মের প্রবর্তক নবি হযরত মুহাম্মদ (স.), হিন্দুধর্মের অবতার শ্রী কৃষ্ণ, কাদেরিয়া তরিকার প্রবর্তক বড়পির হজরত আবদুল কাদের জিলানি (র.) (যিনি বড়পির নামেও পরিচিত), চিশতিয়া তরিকার প্রবর্তক হযরত খাজা মৈনদ্দিন চিশতি (র.) (যিনি খাজা বাবা নামেও পরিচিত), বাংলাদেশের বাউল সম্রাট ফকির লালন সাঁই ও তাঁর গুরু বাউল সিরাজ সাঁই। সিলেটের বিখ্যাত আওলিয়া শাহ জালাল (র.) ও শাহ পরান (র.)। এছাড়া বিচারগানের কিংবদন্তি গায়ক প্রয়াত আব্দুর রশিদ সরকার ওরফে রশিদ সাঁইয়ের জীবন নিয়ে পালার সন্ধান পাওয়া গেছে। বিচারগানের জীবনবৃত্তান্তমূলক পালাগুলো হচ্ছে- নবির জীবনী-কৃষ্ণের জীবনী, বড়াপির-খাজা বাবা, খাজা বাবা-নবিজি, লালন সাঁই-সিরাজ সাঁই, লালন সাঁই-রশিদ সাঁই ও শাহ জালাল-শাহ পরান পালা। এই পালাগুলোতে মূলত ধর্মীয় মহান ব্যক্তিদের মধ্যে হতে দুজনের জীবনী নিয়ে দুজন গায়েন পালা করে থাকেন। বাংলাদেশে সব চেয়ে বেশি পরিবেশিত জীবনবৃত্তান্তমূলক পালা হচ্ছে, বড়পির-খাজা বাবা। আর লালন সাঁই-রশিদ সাঁই পালাটি বিচারগানে একেবারেই নতুন সংযোজন। ২০১৯-২০২০ সালের দিকে ফরিদপুরের ফকির আবুল সরকার ও মানিকগঞ্জের সাত্তার সরকারের মাধ্যমে সর্বপ্রথম লালন সাঁই-রশিদ সাঁই নামের পালাটি পরিবেশিত হয়েছে। জীবনবৃত্তান্তমূলক পালাগুলো বিশ্লেষণ করলে কতগুলো বিষয় পাওয়া যায় বা পালায় আলোচিত-অভিনীত হয়। সেগুলো হচ্ছে- পালায় নির্ধারিত মহান ব্যক্তিদের জন্ম-মৃত্যু, শৈশব ও সারা জীবনের চমকপ্রদ ঘটনা, আধ্যাত্মিক শক্তি, ধর্মীয় অবদান, মোজেজা ও কেরামত (অলৌকিক নির্দশন) এবং তাদের বিবাহিত জীবনের ঘটনাসহ নানাবিদ বিষয়াদি। সেই সাথে পালাগুলোতে বিচারগানের পরিবেশনা রীতি অনুযায়ী গানও পরিবেশিত হয়। বন্দনা ও বিচ্ছেদগান বাদে আর সব গানই হয় পালায় নির্ধারিত মহান ব্যক্তির জীবনীভিত্তিক। তবে লালন সাঁই, সিরাজ সাঁই ও রশিদ সাঁই পালায় এই মহান ব্যক্তিদের রচিত গানই বেশি গাওয়া হয়ে থাকে। এ পর্যায়ে জীবনবৃত্তান্তমূলক পালাগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

নবির জীবনী-কৃষ্ণের জীবনী পালা

লোকনাটক বিচারগানের অনন্য একটি পালার নাম নবির জীবনী-কৃষ্ণের জীবনী। এখানে নবির জীবনী বলতে ইসলামধর্মের প্রবর্তক নবি মুহাম্মদ (স.)-এর জীবনী আর কৃষ্ণের জীবনী বলতে হিন্দুধর্মের অবতার শ্রী কৃষ্ণের জীবনীকে বুঝোনো হয়েছে। দুই মহামানবের আদর্শ সহস্রাধিক বছর যাবৎ পৃথিবীতে মানুষের মধ্যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। নবি মুহাম্মদ (স.) বর্তমান সৌদি আরবে জন্মগ্রহণ করেন এবং ইসলামধর্মের সৃষ্টি ও প্রচারে জীবন ব্যয় করেন। আর শ্রী কৃষ্ণের জন্ম বর্তমান ভারতে তিনি হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের নিকট স্বয়ং প্রভু ও পরম পূজনীয় মহামানব হিসেবে বিবেচ্য। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বাইরেও এই দুই মহামানবকে নিয়ে লৌকিক মানুষের মুখে মুখে ফেরে তাদের নানাবিধ গল্প-কাহিনি। এই কাহিনির বৃহৎ অংশই আবার অতিরঞ্জিত ও কাল্পনিকভাবে রূপায়িত হয়েছে। কারণ ফোকলোরের ধর্মই প্রাতিষ্ঠানিকতা ও বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস ছাপিয়ে নতুন মাত্রায় ঘটনার উৎপত্তি করা। এই দুই মহাপুরষকে নিয়ে লোকপর্যায়ে তথ্যগত ভুল-ভ্রান্তি তো রয়েছেই, এমনকি তাদের জন্ম সম্পর্কে বিতর্কহীন কোনো সিদ্ধান্ত নেয়াও যায় না, আসলে তারা কত তারিখে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। নবি মুহাম্মদ (স.)-এর জন্ম তারিখ নিয়ে বির্তকের বিষয়ে ড. মুহাম্মদ আবদুল হাননান বলেন,

> ঐতিহাসিকদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্য ৫৭০ খ্রিস্টাব্দ তাঁর জন্ম বছর বলে উল্লেখ করেন। প্রকৃতপক্ষে ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে পিতা আবদুল্লাহর ঔরসে ও মাতা আমেনার গর্ভে তিনি আগমন করেন। ৫৭১ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভূমিষ্ঠ হন। খ্রিস্টীয় পঞ্জিকা অনুযায়ী তাঁর জন্ম তারিখ ২০ এপ্রিল। আরবি হিজরি সন অনুযায়ী তারিখটি ৯ রবিউল আউয়াল। কোনো কোনো ইতিহাসবিদ বলেছেন, ১২ রবিউল আউয়াল। (হাননান, ২০১৬ : পত্রিকা)

অর্থাৎ যেখানে নবি মুহাম্মদ (স.)-এর জন্ম তারিখ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যেই বিরোধ রয়েছে, সেখানে লোকমানুষের মধ্যে তথ্যের অতিরঞ্জন থাকবে এটাই স্বাভাবিক। এমনকি মুহাম্মদ (স.)-এর জীবনে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা আমাদের বাংলা অঞ্চলে এসে 'ঠাকুরমার ঝুলি'র গল্পের মতো বহু গল্পই তৈরি হয়েছে। এ রকম অতিরঞ্জিত বহু ঘটনা বিচারগানের আসরে গায়েনগণ করে থাকেন। তবে বিচারগানের আসরে যে সমস্ত ঘটনা গায়েনগণ আলোচনা করেন তারা বাউল-সুফি দর্শনে বিশ্বাসী হওয়াতে মানবিক-প্রাণবিক কায়দায় প্রচার করেন। যার মাধ্যমে লোককবিগণ মানুষকে মানুষ হওয়ার শিক্ষা দেন। অন্যদিকে মুহাম্মদ (স.)-এর মতো শ্রী কৃষ্ণের জন্ম তারিখ সম্পর্কেও বস্তুনিষ্ঠ তথ্য বা ঐতিহাসিকদের মতবিরোধহীন কোনো তথ্য মিলে না। এর অন্যতম কারণ শ্রী কৃষ্ণের জন্মকাল হয় তো অতি প্রাচীন তাই। তবে কেউ কেউ মনে করেন 'শ্রী কৃষ্ণের জন্ম হয়েছিলো ৩২২৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ১৮ জুলাই।' (বিষ্ণু, ২০14 : পত্রিকা) মুহাম্মদ (স.) বা শ্রী কৃষ্ণের জন্ম তারিখ সংক্রান্ত মতভেদ নিয়ে আলোচনা এখানে কোনো মূখ্য বিষয় নয়। কিন্তু দুটি চরিত্র বিচারগানের পালায় যেভাবে আলোচিত হয় তাতে অতিরঞ্জন থাকে। তাই বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের বিষয়টিও খতিয়ে দেখা ছাড়া কিছু নয়। কারণ যেখানে ঐতিহাসিকদের তথ্যই বিতর্কহীন নয়

সেখানে ফোকলোর-অঙ্গনে তথ্যে ও বর্ণনার অতিরঞ্জন হবে এটাই স্বাভাবিক। তাছাড়া এই দুই মহামানবকে নিয়ে মানুষের মাঝে অতিভাবনারও যেন কোনো কূল-কিনারা নেই। ধার্মিকদের বিশাল একটি অংশ মনে করেন শ্রী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, মুহাম্মদ (স.) শুধু নবিই নয় আল্লাহর ছায়ারূপে ধরাধামে আগমণ করেছেন। আর এই বিষয়গুলো বেশি চর্চা হয় সুফি-বাউল তথা বিচারগানের সংশ্লিষ্ট মানুষজনের মধ্যে। শ্রী কৃষ্ণকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি বহুমাত্রিক ধ্যান-ধারণা বাংলা অঞ্চলে প্রচলিত। এ প্রসঙ্গে হিন্দধর্মগবেষক নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী বলেন,

> ‘কৃষ্ণ’ এই শব্দটি যে ধাতু থেকে নিস্পন্ন সেই ‘কৃষ্’ ধাতুর মানেও নাকি আকর্ষণ করা। মানুষটির চরিত্রও বিচিত্র। প্রথম জনে যদি বলেন কৃষ্ণ সেই পুরাণ পুরুষোত্তম, তবে দ্বিতীয় জন বলবেন- তিনি কপটের চূড়ামণি। তৃতীয় মানুষের দৃষ্টিতে ভারতীয় রাজনীতির প্রথম সুত্রধার বোধ হয় কৃষ্ণ। চাণক্যের আগে এমন ধুরন্ধর রাজনৈতিক নেতা আর দ্বিতীয় নেই। আবার চতুর্থ ব্যক্তি যখন কৃষ্ণের বৃন্দাবনী লাম্পট্যে বিচলিত, তখন কবি বলবেন কৃষ্ণের সেই বিশ্বমোহন লাম্পট্য তোমাকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করুক-ইত্যুক্তে ধৃতবল্লবী-কুচযুগসস্তু পাতু পীতাম্বরঃ। কেমন করে এমনটি হয় আমার জানা নেই। পরস্পর বিরোধী গুণের এমন সমবায় আর কোন দেবতা বা মানুষের মধ্যে দেখা যায়নি বলেই বোধ হয় কৃষ্ণের আকর্ষণ এই দু হাজার বছরেও অম্লান। (নৃসিংহপ্রসাদ, ১৩৯৮ : ২৩)

অর্থাৎ বাংলা অঞ্চলে শ্রী কৃষ্ণ যেন একই অঙ্গে বহু চরিত্রের প্রতিমা। যে প্রতিমা যুগে যুগে নানাভাবে নন্দিত হয়েছে। আর শ্রী কৃষ্ণকে নিয়ে বাংলাসাহিত্যের সকল শাখাতেই সাহিত্য রচিত হয়েছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের লোকনাটক ও লোকসংগীতে নানাভাবে চিত্রিত হয়েছে। শ্রী কৃষ্ণ সম্পর্কিত লোকনাটকের পরিবেশনাগুলোর মধ্যে কৃষ্ণযাত্রা, কৃষ্ণলীলা, নিমাই সন্ন্যাস, নৌকা বিলাস, রাধা-কৃষ্ণ পালা প্রভৃতি অন্যতম। এমনকি বিচারগানের নবির জীবনী-কৃষ্ণের জীবনী ছাড়াও শ্রী কৃষ্ণকে নিয়ে রাধা-কৃষ্ণ পালা ও সুবল-মিলন নামে আরো দুটি পালা রয়েছে। এই পালাগুলোর মধ্যে রাধা-কৃষ্ণ ও নবির জীবনী-কৃষ্ণের জীবনী পালা দুটি বর্তমানে আসরে পরিবেশিত হয়, অন্য পালাটি মানে সুবল-মিলন পালা আর আসরে পরিবেশিত হয় না। বিচারগানের রাধা-কৃষ্ণ পালাটি সর্বাধিক জনপ্রিয় পালা হলেও নবির জীবনী-কৃষ্ণের জীবনী পালাটি বর্তমানে ক্রমেই আসরে জনপ্রিয় হচ্ছে। এর অন্যতম কারণ হিসেবে বলা যায় রাধা-কৃষ্ণের পালাটিতে বিষয়বস্তুর দিক থেকে শুধু হিন্দুধর্মের বিষয় রয়েছে। অন্যদিকে নবির জীবনী-কৃষ্ণের জীবনী পালাটিতে দুইটি ধর্মের বিষয় থাকায় দর্শক-শ্রোতা ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বের আলোচনা শুনতে বেশি মনোযোগী হয়। এ পর্যায়ে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে এই দুইটি পালায় গায়েনগণ নবি মুহাম্মদ (স.) ও শ্রী কৃষ্ণের জীবনের কোন কোন বিষয় বেশি আলোচনা করেন। নবির জীবনী-কৃষ্ণের জীবনী পালায় যে বিষয়গুলো আসরে আলোচনা করা হয়, তার একটি তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হলো। তালিকাটি বিচারগানের গায়েন বারেক বৈদেশী, আলিদ মিয়া, সালাম সরকার, হবিল সরকার, সোহাগ সরকার, খাদিজা ভাণ্ডারী, আনোয়ার সরকার, মুকুল সরকার, জ্যোতি দেওয়ান প্রমুখের পরিবেশিত নবির জীবনী-কৃষ্ণের জীবনী পালার আলোচনার ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়েছে।

ক. নবি মুহাম্মদ (স.) ও শ্রী কৃষ্ণের জন্ম মুহূর্তের অলৌকিকতা।

খ. এই দুই মহাপুরুষের বৈবাহিক ও প্রেম-প্রণয়ের ঘটনা।

গ. তাদের ভক্তদের সাথে সম্পর্কের নানা ঘটনা।

ঘ. যুদ্ধ ও রণকৌশলে তাদের অংশগ্রহণ জয়-পরাজয়।

ঙ. নবি মুহাম্মদ (স.) ও শ্রী কৃষ্ণের নানান অলৌকিক ঘটনা।

চ. মানবিক পৃথিবী গড়ার জন্য তাদের অবদান।

ছ. ভক্ত বা অনুসারীদের জন্য তাদের ত্যাগ ও মমত্ব।

জ. তাদের মৃত্যুর পর বর্তমান অবস্থা বা এখনও তারা যেভাবে মহাজগতে বিরাজমান।

ঝ. তাদের অতিমানবীয় বিভিন্ন গুণাবলী।

এই তালিকায় বর্ণিত আলোচনার বিষয়ের উদাহরণ হিসেবে বারেক বৈদেশী ও অলিদ মিয়ার একটি পালার প্রশ্ন-উত্তরের দৃষ্টান্ত দিলেই প্রামাণ্য পাওয়া যাবে। নবির জীবনী-কৃষ্ণের জীবনী পালার এক পরিবেশনায় বারেক বৈদেশী কৃষ্ণের জীবনী সম্পর্কে জানতে চেয়ে অলিদ মিয়ার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেন-

> শ্রী কৃষ্ণের মুখের দিকে তাঁর মা-বাবা তাকায়া এমন একটা দৃশ্য দেখলো, দেইখা সাথে সাথে মা-বাবা হইয়া সন্তানের পায়ে ভক্তি দিলো। আমার একটু জানার বিষয় ঐ দিন কৃষ্ণের মা-বাবা, শ্রী কৃষ্ণের পায়ে যে ভক্তি দিলো কী কইয়া ভক্তিটা দিছিলো? আর মুখের মধ্যে কী দেখলো? (বারেক, ২০২৩ : পরিবেশনা)

কৃষ্ণের জীবনী পালার পক্ষ থেকে এই প্রশ্নের উত্তরে অলিদ মিয়া একটি শ্লোক পড়ে শোনান, যেটি পড়ে শ্রী কৃষ্ণের মা-বাবা শ্রী কৃষ্ণের পায়ে ভক্তি দেন। এবং তারা শ্রী কৃষ্ণের মুখের দিকে তাকিয়ে ত্রিজগতের সমস্ত কিছুর রূপ দর্শন করেন বলেও জানান। এছাড়া এই পালাটিতে অলিদ মিয়া, বারেক বৈদেশীকে নবির জীবনী থেকে জানতে চেয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন করেন। এর মধ্যে একটি হচ্ছে- নবি মুহাম্মদ (স.) মেরাজ থেকে আসার পরে তাঁকে কোন নারী সেজদাহ্ করেছিলো, সেই নারীর নাম কী? উত্তরে বারেক বৈদেশী বলেন, নারীটির নাম উম্মে হানি (উম্মে হানি বিনতে আবি তালিব, যিনি নবি মুহাম্মদ (স.)-এর চাচাতো বোন)। এ রকম নানান প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে নবির জীবনী-কৃষ্ণের জীবনী পালাতে দর্শক-শ্রোতার আগ্রহ ধরে রাখেন গায়েনগণ। নানান তত্ত্বকথার সাথে সাথে গায়েনগণ নবি ও কৃষ্ণ সম্পর্কিত নানান গান পরিবেশন করেন। যে গানগুলোর মধ্যে কোনো কোনো গান বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত। বিচারগানের আসর মানেই যেন মাতালকবি রাজ্জাক দেওয়ানের রচিত রাধা-কৃষ্ণবিষয়ক গানের রাজত্ব। কৃষ্ণের প্রতি প্রেমময় নিবেদনমূলক মাতালকবির একটি গান হচ্ছে-

> শ্যামের বাঁশি গো রাধার মন
> বন্ধুর সনে না হইল মিলন

ও সে আর যেন বাজায় না বাঁশি

আমারে কইরা হরণ গো রাধার মন ॥

প্রাণ সখি গো

ভেবেছিলাম খোপার ফুলে

বেঁধে রাখবো লম্বা চুলে গো

দিয়া দধি মাখন সোনার থালে

তারে করিতাম যতন গো ॥ (তপন, ২০২২ : ৩২৭)[৫৪]

লোকনাটক বিচারগানের নবির জীবনী-কৃষ্ণের জীবনী ও রাধা-কৃষ্ণ পালাসহ পরিবেশনাটির বিচ্ছেদগান পর্বেও প্রায়ই এই গানটি গায়েনগণ গেয়ে থাকেন। যে গানটির মধ্যে যেমন রয়েছে প্রভু কৃষ্ণের প্রতি প্রেম নিবেদন, রয়েছে প্রেমিক কৃষ্ণের প্রতি অভিমানের বিচ্ছুরণ, তেমনি রয়েছে মানব-মানবীর প্রেমের প্রচ্ছন্ন প্রলেপ। এ জন্য দেখা যায় প্রায় সকল মনোভাবের দর্শকের নিকট কৃষ্ণ বিভিন্ন রূপে হাজির হয়ে হৃদয়কে উদ্বেলিত করে দিয়ে যায়। পালায় কৃষ্ণের জীবনীর সাথে সাথে নবীর জীবনীর পক্ষ থেকে যে সকল গান আসরে পরিবেশিত হয়, সেই গানগুলোও বিচারগানের আসরে প্রমময় সুরে ঝংকার তুলে, কখনো কখনো গায়েন ও দর্শক-শ্রোতা ভেসে যায় নয়নজলে। বিচারগানের প্রতিটি পালা যেন কুশীলব ও দর্শক-শ্রোতার সকল আবেগ-অনুভূতির শৈল্পিক প্রকাশ।

বড়পির-খাজা বাবা পালা

বড়পির-খাজা বাবা পালাটি বিচারাগানের আসরে পরিবেশিত জীবনবৃত্তান্তমূলক পালাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত ও জনপ্রিয়। বাউল-সুফি মতবাদে বিশ্বাসী মানুষের নিকট হযরত আব্দুল কাদের জিলানি (র.) ও খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি (র.) অত্যন্ত সম্মানিত দুই সাধুপুরুষ। এই দুই সাধুপুরুষ গণমানুষের নিকট আওলিয়া হিসেবে বেশ পরিচিত। আওলিয়া অর্থ সিদ্ধ তাপস বা দরবেশ। (এনামুল, ২০১০ : ৮০) এছাড়া জাতি ধর্ম নির্বিশেষে হযরত আব্দুল কাদের জিলানি (র.)-কে ‘বড়পির’ হিসেবে এবং খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি (র.) ‘খাজা বাবা’ হিসেবেই অধিক পরিচিত। অভিসন্দর্ভে এই দুই সাধুপুরুষের সম্পর্কে আলোচনার সুবিধার্থে শুধু ‘বড়পির’ ও ‘খাজা বাবা’ সম্বোধন করেও আলোচনা করা হবে। বিচারগান যেহেতু সুফি-বাউল-গুরুবাদে বিশ্বাসী জনগোষ্ঠীর পরিবেশনা, তাই স্বাভাবিকভাবেই এই মতবাদের তাপস শ্রেণির মানুষের জীবনী ঘুরেফিরে আসরে পালার প্রতিযোগিতায় আলোচিত হয়। এই স্বাভাবিক নিয়মের ধারায় হযরত আব্দুল কাদের জিলানি (র.) ও খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি (র.)-এর জীবনীনির্ভর একটি প্রসিদ্ধ পালা হচ্ছে বড়পির-খাজা বাবা পালা। এই পালাটির আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে, সেটি হচ্ছে ভারতবর্ষে ইসলামধর্ম আগমনের পর থেকেই ওহাবী ধারার মোল্লা শ্রেণি নানাভাবে গান-বাজনাকে ফতুয়া

দিয়ে হারাম হিসেবে গন্য করার চেষ্টা চালিয়েছে, এমনকি এখনও তারা সেই প্রচেষ্টায় সচেষ্ট রয়েছে। আর গান-বাজনার ওপর থেকে এই আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য বিচারগানের কুশীলব, পির-ফকির-বাউলরা বড়পির ও খাজা বাবার গানের প্রতি প্রেমের দৃষ্টান্ত মানুষের মাঝে তুলে ধরেন। আর এই কারণে লোকনাটক যেহেতু সংগীতনির্ভর পরিবেশনা তাই প্রায় পালাতেই বড়পির ও খাজাবাবার প্রসঙ্গ আলোচিত হয়। বিশেষ করে বড়পির-খাজা বাবা পালাটিতে তাদের জীবনের সমস্ত ঘটনা আলোচিত হবে, এটাই স্বাভাবিক বিষয়। বড়পির-খাজা বাবা পালাটি অত্যন্ত গুরুগম্ভীর ও জনপ্রিয় হওয়ায় বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলেই পরিবেশিত হয়ে থাকে। এমনকি এমন কোনো বিচারগানের গায়েন পাওয়া যাবে না, যিনি কিনা বড়পির-খাজা বাবা পালাটিতে অভিনয় করেননি। কোনো কোনো গায়েনের এই পালায় অভিনয় করার জন্য গণমানুষের মধ্যে সুপরিচিতি রয়েছে। বড়পির-খাজা বাবা পালায় চমৎকার অভিনয়ের জন্য কয়েকজন গায়েনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে, যেমন-প্রয়াতদের মধ্যে আব্দুর রশিদ সরকার, পরশ আলী দেওয়ান, আব্দুস সাত্তার মহন্ত, মাতালকবি রাজ্জাক দেওয়ান, খালেক দেওয়ান, মালেক দেওয়ান, মাখন দেওয়ান, কিয়ামদ্দিন বয়াতি, অসীম দাস বাউল, শংকর দাস বাউল, দলিল উদ্দিন বয়াতি, আব্দুল হালিম বয়াতি, আয়নাল বয়াতি প্রমুখ। জীবিতদের মধ্যে বড় আবুল সরকার, ফকির আবুল সরকার, ছোট আবুল সরকার, মানিক সরকার, হেলাল সরকার, কাজল দেওয়ান, লতিফ সরকার, ছোট রজ্জব দেওয়ান, সুনীল কর্মকার, সুশীল সরকার, আলেয়া বেগম, মমতাজ বেগম, মুক্তা সরকার, মাসুদ সরকার, পাগল মনির, পাগল সোহরাব, আকলিমা বেগম, বিলকিস বানু, নীলা পাগলী, মালেক সরকার, কার্তিক সরকার, তরাব আলী বয়াতি, শরিয়ত সরকার, ফারুক সরকার, দেওয়ান বাবলী সরকার, রাজ্জাক দেওয়ান, কানন দেওয়ান, সোহাগ সরকার, হবিল সরকার, বারেক বৈদেশীসহ দেশের আরো অনেক গায়ক বড়পির-খাজা বাবা পালায় অভিনয়ের জন্য সুনাম অর্জন করেছেন। বড়পির-খাজা বাবা পালায় আলোচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয় এই দুই সাধুপুরুষের অলৌকিক ক্ষমতা বা কারামতের ঘটনাবলি। তাছাড়া তাঁরা কিভাবে ভক্তদের পরপারে উদ্ধার করবেন সে বিষয়গুলোও পালায় আলোচিত হয়। বিচারগানের আসরে আলোচনার জন্য এই দুই আওলিয়ার কতগুলো প্রচলিত অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শনের কাহিনি বা কারামতের গল্প গায়েনগণ করে থাকেন। অবশ্য এই প্রচলিত কারামতের গল্পগুলো বস্তুনিষ্ঠভাবে কতটুকু সত্য সে বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করা যায়। কিন্তু সে বিষয়টি অভিসন্দর্ভের আলোচ্য বিষয় নয়। বিচারগানের বিষয়-বৈচিত্র্যের অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় বড়পির-খাজা বাবা পালার আলোচিত বিষয় হিসেবে কারামতের প্রসঙ্গ এড়িয়ে পাওয়া যায় না। হয়তো এই কারামতে কোনো কোনোটা পুরাণ বা মিথ হয়ে গেছে কিংবা কোনো কোনোটা সত্য ঘটনাও হতে পারে। মূল কথা হচ্ছে এই কারামতগুলো ধর্মীয় ও লৌকিক বিশ্বাস হেতু বিচারগানের আসরে খুবই গুরুত্ব বহন করে থাকে। কারামতগুলো সাধারণত গায়েনগণ গুরু-শিষ্য পরম্পরায় ও কিছু জীবনীগ্রন্থ

থেকে পাঠ করে আয়ত্ত করেন। কারামত বিষয়টি নিয়ে যে মতভেদ রয়েছে সে প্রসঙ্গে বহু জীবনী গ্রন্থকাররা স্বীকার করেছেন এবং তা যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন। এ রকম একটি জীবনীগ্রন্থ 'গরীবে নেওয়াজ খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তি (রহ.)'। গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় লিখেছেন মুফতি মোহাম্মাদ শফি (র.), যেটির বাংলা অনুবাদ করেছেন মাওলানা মোহম্মাদ আবুল খায়ের সিদ্দিকী। এই গ্রন্থটিতে কারামত প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

> একথা সর্বজন বিদিত যে, কারামত অলী আবদালদের জন্য অতি সম্ভব এবং তাদের জন্য উহা বরহক ও সত্য। ইহা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই, অতিব দুঃখের বিষয় হল বর্তমান যুগে এক শ্রেণির লোক দেখতে পাওয়া যায় যারা বুযুর্গদের কারামত ও কাশফ বিশ্বাস করে না। (মোহাম্মদ আবুল, ২০০২ : ১৫৮)

এই বিষয়গুলো নিয়ে ধর্মীয় মতভেদ হেতু বিশ্বাস-অবিশ্বাস কিংবা বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণে টিকুক বা না টিকুক ফোকলোরের উপাদান হিসেবে ঠিকই বিচারগানের আসরে আজও সক্রিয়ভাবে টিকে আছে। এমনকি লোকসমাজের মধ্যে বহু মানুষ রয়েছে যারা বিচারগানের আসরে পরিবেশিত এই গল্পগুলো শুনে বিমোহিত হন। আসরে কারামতগুলো পরিবেশনাকালে গায়েন, কুশীলব ও দর্শক-শ্রোতা কোনো কোনো কারামতের করুণ বা হৃদয়স্পর্শী ঘটনায় বেদনাসিক্ত হয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। বিচারগানের বেশ কয়েকজন নবীন-প্রবীণ দর্শক-শ্রোতার সাথে আলোচনা করে জানা গেছে, তারা প্রায় সকলেই সাধু পুরুষদের কারামত মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন। এমনই একজন দর্শক মো. মোজাম্মেল হেসেন তিনি বলেন,

> অলি-আওলিয়াদের খেলা বোঝা খুবই কঠিন। তারা আল্লাহর হুকুমে সবই করতে পারেন। এমনি এমনি তো আর তারা জগতে অমর হয় নাই। তাদের বহু কারামতি আছে। বিচারগানের বয়াতিরা বানাইয়া-বানাইয়া বলেন না, ঘটনা অবশ্যই সত্য। (মোজাম্মেল, ২০২৩ : সাক্ষাৎকার)

মো. মোজাম্মেল হোসেনের বিশ্বাসের সাথে বিচারগানের গায়েন ছোট রজ্জব দেওয়ান অভিনীত বড়পির-খাজা বাবা পালায় তার নিজস্ব এক ঘটনার বর্ণনা মিলে যায়। ছোট রজ্জব দেওয়ান বলেন, তার এক সময় গলার স্বরে সমস্যা হয়েছিলো। আসরে দুয়েক পালা গান গাইলেই গলা বসে যেত। এ জন্য সে বহু চিকিৎসা করেন কিন্তু কোনো কাজ হচ্ছিলো না। শেষে সে মনস্থির করেন আজমিরে খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি (র.)-এর মাজারে গিয়ে রোগমুক্তি কামনা করবেন। তিনি খাজা বাবার দরবারে গিয়ে খাজা বাবার উসিছিলায় রোগমুক্তি কামনা করেন এবং অলৌকিকভাবে খাজা বাবার রওজা (কবর)-এর সামনে এক লোকের অনুরোধে গান গায়। গানটি ছিলো 'কেউ ফেরে না খালি হাতে খাজা তোমার দরবারে', এই গানটি গাইতে গাইতে ছোট রজ্জব দেওয়ানের গলা ভালো হয়ে যায়। তিনি বলেন, তার যেন মনে হচ্ছিলো, তিনি গান গাচ্ছেন আর তার গলা খুলে যাচ্ছে মানে গলার অসুখ ভালো হয়ে যাচ্ছে। এতো গেলো বিচারগানের গায়েন ছোট রজ্জব আলীর নিজস্ব অভিজ্ঞতার গল্প। যেটিকেও বিচারগানের সংশ্লিষ্ট লোকজন

কারামত হিসেবেই গন্য করেন। বড়পির ও খাজা বাবার এই কারামতগুলো লোকমানুষের মধ্যে খুবই গুরুত্ব বহন করে। এ প্রসঙ্গে বড়পির হযরত আব্দুল কাদের জিলানি (র.)-এর এক জীবনীগ্রন্থে পাওয়া যায়,

> ‘তাঁহার গোটা জীবনের সাধনা, তপস্যার আলোকরশ্মি বিভিন্ন কারামতের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। অসংখ্য কারামত তাঁহার জীবনকে মহিমান্বিত করিয়াছেন। এই সকল কারামত নিদর্শনই বড়পির (রহ.)-এর জীবনের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক। (মাজহার, ২০২১ : ১৩৭)

বিচারগানের আসরে পরিবেশিত কারামতের গল্পগুলোর মধ্যে কতগুলো অতিপ্রচলিত গল্প রয়েছে। যেগুলো ঘুরেফিরে বিভিন্ন গায়েনের মাধ্যমে আসরে বর্ণিত হয়। বিচারগানের আসরে কারামতের গল্প হিসেবে পরিবেশিত কতগুলো গল্প নিম্ন সংযোজিত হলো-

বড়পিরের কারামতের গল্প-১

এক সহায় বৃদ্ধা নারীর একমাত্র পুত্র সন্তান বিবাহের উদ্দেশ্যে নদীপথে গমণ করেন। বিবাহ শেষে আবার নৌকা দিয়ে বউ-বরযাত্রীসহ গৃহে ফিরতে গেলে নদীতে নৌকা ডুবে সকলেই মারা যায়। এ কথা জানতে পেরে ঐ বৃদ্ধা ১২ বছর ছেলে জন্য শোকে কান্নাকাটি করেন। একদিন বড়পির বৃদ্ধার অবস্থানের পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন বৃদ্ধার আকুল প্রার্থনায় বড়পির ১২ বছর আগে নদীতে ডুবে মারা যাওয়া সকলকে পুনরায় জীবিত করে দেন। মানে পূর্বের ন্যায় মৃত সকলে বরযাত্রী বেশে নদী থেকে নৌকা যোগে তীরে এসে পৌঁছান, যেন তাদের কিছুই হয়নি।

বড়পিরের কারামতের গল্প-২

বাগদাদ শহরে এক ইহুদি নারী পরপর ঊনিশ বার কন্যা সন্তান জন্ম দিয়েছেন। এমতাবস্থায় ঐ নারী আবার গর্ভবতী হওয়ায় তার স্বামী তাকে জানিয়েছেন, এবারও যদি তার গর্ভে কন্যা সন্তানের জন্ম হয় তাহলে তাকে তালাক দয়িে দিবেন। নারীটি দুঃখে ও ভয়ে কাতর হয়ে বড়পির হযরত আব্দুল কাদের জিলানি (র.)-এর পিতা হযরত আবু সালেহ মুসা (র.)-এর দরবারে যান। কারণ তিনি তৎকালীন সময়ে খ্যাতিমান পির ও অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। ইহুদি নারী যাবার সময় পিরের জন্য কিছু খাবার যেমন-দুধ, কলা প্রভৃতি নিয়ে যান। পিরের কাছে গিয়ে ইহুদি নারী পিরের নিকট সবিস্তারে বর্ণনা করেন এবং পুত্র সন্তানের জন্য দোয়া কামনা করেন। ইতোমধ্যেই পিরে নারীর দেয়া খাবার-দাবার খেয়ে ফেলেছেন। পিরে নারীর আর্জি শোনার পর ধ্যান করে জানায় নারীর গর্ভে এবারও কন্যা সন্তান এবং তিনি পুত্র সন্তানের বিষয়ে কিছু করতে পারবেন না। নারীটি এ কথা শুনে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরছিলেন, পথিমধ্যে বালক বড়পিরের সাথে দেখা, সে তখন অন্যান্য শিশুদের সাথে খেলাধুলা করছিলেন। সে নারীর কান্নার

কারণ জানতে চাইলে নারীটি সবিস্তারে বড়পিরকে বলেন। সব কথা শুনে বড়পির বলেন, যে পিরে দুধ-কলা খেয়ে কন্যা সন্তানের বদলে পুত্র সন্তান দান করার ক্ষমতা রাখেন না, তার নিকট গিয়ে দুধ-কলা ফেরত চান এবং বলেন পুত্র সন্তান যদি দিতে পারলেন না, তবে দুধ-কলা খেতে কী লজ্জা লাগলো না। আমি আমার দুধ-কলা ফেরত চাই। মহিলাটি আবার পিরের কাছে গিয়ে এমনটাই বললেন। এই কথা শুনে বড়পিরের পিতা বললেন, তোমাকে এই কথা কে শিখিয়ে দিয়েছে? নারীটি তখন বড়পিরের কথা জানায়। এক পর্যায়ে বড়পির সেখানে গেলে তাঁর পিতা আবু সালেহ বলেন, তুমি এই কথা বলেছো? বড়পির বলেন, হ্যা বলেছি, যদি পুত্র সন্তান না দিতে পারেন তবে দুধ-কলা খেলেন কোন আক্কেলে। তখন পিতা আবু সালেহ বড়পিরকে একটি থাপ্পর দেন। সেই থাপ্পরের পর বড়পির তাঁর পিতাকে জানায়, পিতা আপনি আমাকে একটি থাপ্পর দিয়েছেন, এতেই ইহুদি নারীর পেটের কন্যা সন্তানকে পুত্র বানিয়ে দিয়েছি এবং তার অন্য বড় ১৯ কন্যাকেও পুত্র বানিয়ে দিয়েছি। যদি আরেক থাপ্পর দেন তবে বাগদাদ শহরে কোনো নারীই রাখবো না। এই গল্পটি বিচারগানের গায়েনগণ আসরে সবচেয়ে বেশি বলে থাকেন।

বড়পিরের কারামতের গল্প-৩

বড়পিরের এক ভক্ত দীর্ঘদিন তার দরবারে থেকে সেবা-যত্ন করেন। এমতাবস্থায় বহু ভক্ত-অনুসারী সেই ভক্তের পরে এসেও সিদ্ধিলাভ করেন বা আওলিয়া হয়ে যান। কিন্তু সেই ভক্ত কিছু না পেয়ে বড়পিরের নিকট অভিযোগ করেন। সব শুনে বড়পির বললেন, তোমার জন্য আমার আর কিছু করার নেই। এ কথা শুনে ভক্ত রেগে দরবার ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন আর মনে মনে বলছেন বড়পিরের দরবারের ঘর-বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যাক। কিছুক্ষণ পরে যাবার বেলায় ঐ ভক্ত পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখেন বড়পিরের দরবার দাউদাউ করে আগুনে পুড়ছে। ভক্ত যেহেতু দীর্ঘদিন দরবারে ছিলো তাই তার মায়া লাগলো। সে ফিরে গিয়ে পানি দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করলো। কিন্তু কিছুতেই আগুন নিভে না। এক পর্যায়ে সে বড়পিরের নিকট আগুন নেভানোর বিষয়ে আকুতি জানায়, তখন বড়পির বলেন, যে আগুন লাগিয়েছে, সেই আগুন নেভাক। ভক্তের তখন বোধোদয় হয়, সে যেহেতু মনে মনে আগুন লাগানোর বাসনা করেছিলো, তাই আগুন লেগেছে, সেহেতু তাকেই আবার বলতে হবে আগুন নিভুক। তখন ভক্ত আগুন নেভানোর জন্য মনে মনে ইচ্ছাপোষণ করলে আগুন নিভে যায়। এই পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করে ভক্ত বুঝতে পারেন, বড়পির তাকে ইতোমধ্যেই আওলিয়া বানিয়ে দিয়েছেন। যা বড়পিরের অলৌকিক ক্ষমতার প্রদর্শন বা কারামতের বহিঃপ্রকাশ।

খাজা বাবার কারামতের গল্প-১

খাজা বাবা গান খুব পছন্দ করতেন। তিনি নিজেও গান গেয়ে স্রষ্টার প্রেমে মশগুল হয়ে থাকতেন। তিনি কোনো একটি কারণে টানা তিন দিন গান গায়নি। এই পরিস্থিতিতে তিনি বড়পিরের দরবারে যান। বড়পির খাজা বাবাকে দেখে জিজ্ঞোস করেন, হে মঈনুদ্দীন তোমার মুখ মলিন কেন? উত্তরে খাজা বাবা জানান, তিনি তিন দিন গান গায়নি তাই মন খারাপ। তখন খাজা বাবা গান গেয়ে বড়পিরকে শোনালে সেই গানের মহিমায় বা ভাবের ঢেউয়ে আসমান-জমিন কেঁপে কেঁপে নেচেছিলো এবং গানের প্রেমে বড়পির ঘেমে গেছিলেন। বড়পির তখন কম্পমান আসমান হাত দিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছিলেন এবং জমিনকে হাতের লাঠি দিয়ে ঠেকা দিয়ে শান্ত করেছিলেন। গান শেষে বড়পির খাজা বাবাকে বলেছিলেন আজ থেকে তোমার মতো গায়ক ও আমার মতো শ্রোতার জন্য গান অবশ্যই হালাল। এই কারামতের গল্পটি বিচারগানের গায়েনগণ ওহাবী মোল্লাদের জন্য গান হালালের অন্যতম দলিল হিসেবে উপস্থাপন করে থাকেন।

খাজা বাবার কারামতের গল্প-২

খাজা বাবা যখন ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখন কোনো এক জায়গায় তিনি আসন পাতেন। সেই আসনের বস্তুটি ছিলো একটি বাঘের চামড়া। বিচারগানের আসরে বর্ণিত হয়, খাজা বাবার নিকট ভারতীয় লোকজন শিষ্যত্ব বা তার অনুসারী হয়ে বা সুফিবাদের ভাষায় বাইয়াত গ্রহণ করে উক্ত বাঘের চামড়ায় বসেন। লোকজন ক্রমে ক্রমে বাইয়াত হন আর বাঘের চামড়ায় বসেন, মানে লোকজন বাঘের চামড়ায় বসেন আর বাঘের চামড়া বৃদ্ধি পায়। কত লোক চামড়ায় বসেছিলো তার সুনির্দিষ্ট সংখ্যা না থাকলেও গল্পে প্রচলিত হাজার হাজার বা লক্ষাধিক মানুষ বসেছিলো। এটিও খাজা বাবার কারামতের গল্প হিসেবে বিচারগানের আসরে গায়েনগণ পরিবেশন করেন।

খাজা বাবার কারামতের গল্প-৩

খাজা বাবা ভারত বর্ষে আসার পরে রাজা পৃথ্বীরাজ তাকে বাধা দেন। তখন খাজা বাবা পৃথ্বীরাজকে মোকাবেলা করার জন্য একটি ছোট পানির ঘটির মধ্যে একটি সাগরের পুরো পানিকে বন্দি করে ফেলেন, এতে পুরো সাগর শুকিয়ে যায়। এই কাজটি খাজা বাবা তার এক ভক্তের মাধ্যমে করান, ভক্তকে যেভাবে বলেন, ভক্ত সেভাবেই করেন। ভক্ত সাগরের নিকট গিয়ে তর্জনীর ইশারায় সাগরের সব পানিকে ঘটিতে চলে আসতে বলেন, এতেই সব পানি আপনা-আপনি ঘটিতে প্রবেশ করে। যদিও পরে ঘটনাক্রমে সেই পানি সাগরে ফিরিয়ে দেন। এতে সাগরের লবণাক্ত পানি

মিঠা পানিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এ পৌরাণিক ঘটনাটিও বিচারগানের আসরে খাজা বাবার কারামত হিসেবে বর্ণিত হয়।

উপরে উল্লেখিত বড়পির ও খাজা বাবার কারামতের গল্পগুলো বিচারগানের প্রায় সব গায়েনই আসরে উদাহরণ, দৃষ্টান্ত বা বড়পির ও খাজা বাবার মহত্ব হিসেবে বর্ণনা করে থাকেন। বিচারগানের আসরে পরিবেশিত হয় এ রকম কারামতের অসংখ্য গল্প রয়েছে। শুধু বড়পির-খাজা বাবা নয় জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বহু আধ্যাত্মিক সাধু-মহৎপুরুষের অলৌকিক ঘটনা পালায় বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিষয় বর্ণনাকালে গায়েনগণ পরিবেশন করেন। বড়পির ও খাজা বাবার কারামতের গল্পগুলো গায়েনগণ যেমন গদ্য-কাব্য বর্ণনায় দর্শক-শ্রোতার মাঝে বলেন, তেমনি এ সকল বিষয়ে অসংখ্য গানও রয়েছে যেগুলো আসরে গীত হয়। অভিসন্দর্ভের আঙ্গিক-বৈচিত্র্যের বিচ্ছেদগান নিয়ে আলোচনাকালে বড়পির-খাজা বাবার গান প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া অভিসন্দর্ভের শেষে টীকা ও পরিশিষ্টে বড়পির ও খাজা বাবা সম্পর্কিত কিছু গান সংযোজিত হয়েছে।

খাজা বাবা-নবিজি পালা

লোকনাটক বিচারাগনের জীবনবৃত্তান্তমূলক পালাসমূহের মধ্যে যে কয়টি পালা রয়েছে তার প্রত্যেকটি পালাই একটি-আরেকটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কেননা প্রতিটি পালায় দুইজন সাধুপুরুষ বা মহৎ ব্যক্তির জীবনী সন্নিবেশিত হয়েছে। যে দুইজন সাধু ব্যক্তির জীবনী নিয়ে পালাগুলো হয়, তাদের যেকোনো ব্যক্তির জীবনী পরিবর্তন করে অন্য কোনো ব্যক্তির জীবনীর সংযোজন করা যেতে পারে। খাজা বাবা-নবিজি পালার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। অভিসন্দর্ভে ইতোমধ্যেই নবির জীবনী-কৃষ্ণের জীবনী ও বড়পির-খাজা বাবা পালাদ্বয় আলোচনা করা হয়েছে। এখন আলোচনা করা হবে খাজা বাবা-নবিজি পালা। এখানে স্পষ্টভাবেই দেখা যাচ্ছে নবির জীবনী-কৃষ্ণের জীবনী ও বড়পির-খাজা বাবা পালাদ্বয়ের সাথে খাজা বাবা-নবিজি পালার দুই মহৎ ব্যক্তির জীবনীর সাদৃশ্য রয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, একই ব্যক্তির জীবনী ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির জীবনীর সাথে সংযুক্ত করে পালা আকারে বিচারগানের আসরে পরিবেশিত হয়ে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিদ্বয়ের জীবনী নিয়ে পালার বিষয়বস্তু কিছুটা পরিবর্তন করা গেলেও ব্যক্তির জীবনীর আলোচনা একই থাকে। শুধু ব্যক্তির পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সামান্য রদবদল করা যায় মাত্র। তবে এখানে একটি কথা থেকেই যায়, সেটি হচ্ছে মহৎ ব্যক্তির দর্শন ও ধর্মীয় বিশ্বাসের তারতম্যের কারণে পালার আলোচনায় কিছুটা ভিন্নতা আসে, এতে করে গায়েন ও দর্শক-শ্রোতা ভিন্ন স্বাদের আস্বাদন পায়। অভিসন্দর্ভের পূবেই যেহেতু হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি (র.) ও হযরত মুহাম্মদ (স.) সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে, তাই এখানে নতুন কিছু সংযোজন করা হয়েছে মাত্র। একদিকে নবি মুহাম্মদ (স.) ইসলামধর্মের প্রবর্তক অন্যদিকে খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি

(র.) একজন ইসলামী ভাবাদর্শে বিশ্বাসী তবে তিনি সুফিসাধক। বাংলাদেশের লোকনাটক বিচারগানের বেশির ভাগ দর্শক-শ্রোতা মুসলিম হওয়ায় খুব সহজেই নবি মুহাম্মদ (স.)-এর জীবনীর সাথে গায়েন ও দর্শক-শ্রোতা একাত্ম হতে পারেন, আবার হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি (র.) একজন উচ্চমার্গীয় সুফিসাধক হওয়ায় জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে তাকে শ্রদ্ধা করেন। এ জন্য খুব সহজেই সকল ধর্ম-শ্রেণি-পেশার মানুষের নিকট পালাটি গ্রহণযোগ্য ও জনপ্রিয়। এছাড়া পালাটি পির-ফকিরদের নিকট খুব প্রিয় হওয়ায় দেশের সকল দরবার শরিফের বার্ষিক ওরশ মাহফিলে নিয়মিতভাবে পরিবেশিত হয়ে থাকে। আর বিচারাগনের সংশ্লিষ্ট লোকজন পালাটির বিষয় দুইজন মহৎ ব্যক্তিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে ভক্তি ও স্মরণ করে থাকেন। খাজা বাবা-নবিজি পালা ছাড়াও বিচারগানের প্রতিটি পালাতেই খাজা বাবা ও নবি মুহাম্মদ (স.) সম্পর্কিত গানগুলো গাওয়া হয়ে থাকে। বিশেষ করে বিচারগানের বন্দনাপর্বে বন্দনা শেষে নবি মুহাম্মদ (স.) বা খাজা বাবার স্মরণে যে কোনো একটি গান গায়েনগণ প্রায়ই পরিবেশন করেন। তবে নবি মুহাম্মদ (স.) ও খাজা বাবার গান ছাড়া বড়পিরের গানও গায়েনগণ গেয়ে থাকেন। যেহেতু বিচারগান মানেই নবিজি ও খাজা বাবার গান অত্যাবশ্যকীয়, সেহেতু বিচারগানের কিংবদন্তি রচয়িতাগণ বহুগান এই দুইজন মহৎ ব্যক্তিকে নিয়ে রচনা করেছেন। আর এই গানগুলো সারাদেশে বিচারগানের আসর ছাড়াও সকল পরিবেশের মানুষের নিকট বিপুল জনপ্রিয়। এই সমস্ত কারণে খাজা বাবা-নবিজি পালাটি বিচারগানের আসরে বেশি প্রচলিত ও জনপ্রিয়। পালাটিতে দুইজন মহৎ ব্যক্তির জীবন ছাড়াও এই দুইজনের মধ্যকার কিছু সম্পর্ক নিয়েও আলোচনা করা হয়। যেমন-

ক. নবি মুহাম্মদ (স.) ও খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি (র.)-এর মধ্যে সম্পর্ক কী?

খ. খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি (র.) ভারতবর্ষে আসার জন্য কিভাবে নবি মুহাম্মদ (স.)-এর নিকট থেকে আদেশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন?

গ. নবি মুহাম্মদ (স.)-এর সাথে খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি (র.)-এর আধ্যাত্মিক আদান-প্রদান হয় কিভাবে?

ঘ. এই দুইজন মহৎ ব্যক্তির মধ্যে কার মর্যাদা বেশি?

ঙ. নবি মুহাম্মদ (স.) ২৫ বছর বয়সে বিয়ে করলেও খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি (র.) বৃদ্ধ বয়সে বিয়ে করেছেন কেন?

খাজা বাবা-নবিজি পালাতে এরকমভাবে এই দুইজন মহৎ ব্যক্তির মধ্যে তুলনামূলক বহু আলোচনা করা হয়ে থাকে। অন্যান্য পালায় গায়েনগণ জয়ী হওয়ার জন্য প্রতিপক্ষের পালার বিষয়বস্তুকেই যেমন হেয় করেন কিন্তু এই পালাটির দুটি বিষয়ই শ্রদ্ধেয় হওয়ায় কেউ হেয়পতিপন্ন করেন না। এর কারণ হচ্ছে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের স্পর্শকারতা রয়েছে। যাহোক খাজা বাবা-নবিজি পালাতে কোন বিষয়াদি আলোচনা করা হয়, তা একটি পালার গায়েনদের প্রশ্ন ও উত্তরের দৃষ্টান্ত দিলেই বোঝা যাবে। ময়মনসিংহ জেলার বিচারগানের গায়েন জেসমিন সরকার ও নেত্রকোণা

জেলার হবিল সরকারের পরিবেশিত খাজা বাবা-নবিজি পালার একটি পরিবেশনার প্রশ্ন-উত্তরের আলোচনার উদাহরণ হচ্ছে-

> **জেসমিন সরকারের প্রশ্ন :** জিজ্ঞাসা করতে চাই, আপনি জবাব করবেন, বনি ইসরাইল গোত্রের কত বছর পর আমার নবি করিম (স.)-কে পৃথিবীতে ভূমিষ্ট করা হয়েছে? আপনার যদি জানা থাকে বলবেন, ছোট্ট একটি প্রশ্ন রইল?
>
> **হবিল সরকারের উত্তর :** বনি ইসরাইল গোত্রের পাঁচশত বছর পরে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর আবির্ভাব হয়েছে। (জেসমিন ও হবিল, ২০২১ : পরিবেশনা)

খাজা বাবা-নবিজি পালার এই প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, পালায় ব্যক্তিদ্বয়ের জন্ম-মৃত্যু পর্যন্ত এমনকি মৃত্যুর পরও তাদের অবস্থান সম্পর্কিত ধর্মীয় বিশ্বাসের দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা হয়। এই পালাটিতেও বড়পির-খাজা বাবা পালার মতো কারামত বা অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা করা হয়ে থাকে। তবে এই অলৌকিক ঘটনাকে নবিদের বেলায় হলে তাকে মোজেজা বলে। মোজেজার আভিধানিক অর্থ 'অলৌকিক ঘটনা; লোকাতীত ঘটনা; নবি রসুলদের দিয়ে সংঘটিত অলৌকিক ঘটনা।' (ড. এনামুল, ২০১০ : ৯৯৯) পালাটিতে এই সমস্ত অলৌকিক ঘটনা বর্ণনার উদ্দেশ্য হচ্ছে দর্শক-শ্রোতার মনের মধ্যে মহৎ ব্যক্তিদের প্রতি উচ্চ ধারণা তৈরি করা। এখানে আবারও একটি কথা পুনর্ব্যক্ত করা উচিত সেটি হচ্ছে, এই অলৌকিক ঘটনার কোনো বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা নেই বা বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যায় অলৌকিক ঘটনাটি অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। তবে ফোকলোর-আয়তনের মানুষ ধর্মীয় সরল বিশ্বাসে এই সমস্ত অলৌকিক ঘটনা যুক্তি-তর্কহীনভাবে মেনে নেন। যার জন্যই হয়তো ঘন্টার পর ঘন্টা বা সারারাতব্যাপী দর্শক-শ্রোতা বিমোহিত চিত্তে পরিবেশনাটি উপভোগ করেন। পালা চলাকালীন গায়েনের সাথে সাথে বিভিন্ন ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় দর্শক-শ্রোতা হাসের-কাঁদেন। বিচারগানের আসরে দর্শক-শ্রোতার উপস্থিতি ও একাত্মতা দেখে মনে হয় আসরে যা পরিবেশন হয় তা যেন চির সত্য কাহিনি। বিচারগানের খাজা বাবা-নবিজি পালাসহ সকল জীবনবৃত্তান্তমূলক পালায় বর্ণিত সাধারণ ঘটনা, অলৌকিক ঘটনা অথবা গায়েনের সব বর্ণনা বিশ্বাস করেন কিনা এমন এক প্রশ্নের উত্তরে বিচারগানের নিয়মিত দর্শক-শ্রোতা বাবুল মৃধা বলেন,

> বিচারগান হচ্ছে ধর্মের গান, এর মধ্যে মিথ্যার কিছু নাই। তবে কিছু কিছু শিল্পী তো আছেই একটু-আধটু বাড়িয়ে কথা বলেন। তারপরও নবি-রাসুল-অলি-আওলিয়া-সাধু-ফকিরদের ব্যাপারে যা বলেন, বিশ্বাস না করলে তো ইমান থাকবে না।' (বাবুল, ২০২৩ : সাক্ষাৎকার)

বিচারগানের পরিবেশনায় খাজা বাবা-নবিজি পালার তত্ত্বকথায় দর্শকগণ যেমন নিঃশর্ত বিশ্বাস করেন, তেমনি এই পালা সম্পর্কিত বহু বিখ্যাত গানও তাদের পালায় একাত্ম করতে সহযোগিতা করে। এ রকম একটি বিখ্যাত গান রয়েছে ফরিদপুরের প্রয়াত বিখ্যাত বিচারগানের গায়েন আয়নাল বয়াতির, সেটি হচ্ছে-

> তোরা কে কে যাবি আমার সাথে ঐ জিয়ারতে,

রাসুল নামে পাল তুলিয়া দে, ও চল যাই মদিনাতে ॥

আল্লা নামের নৌকাখানি, রাসুল নামের পাল, মাঝি ভাই কইসা ধর হাল,

চেয়ে দেখো উতাল-পাথাল চলছে নদী পুবাল বাতাসে ॥ (আয়নাল, ২০১৪ : পরিবেশনা)[৫৫]

বিচারগানের এমন কোনো নিয়মিত গায়েন পাওয়া যাবে যিনি কিনা গানটি গায়নি, আর কোনো দর্শক-শ্রোতাও পাওয়া যাবে না যিনি আয়নাল মিয়া বয়াতির এই গানটি শুনেননি। গানটির কথা যেমন পালা অনুযায়ী অসাধারণ তেমনি গানের সহজ ও প্রাঞ্জল সুর যে কোনো মানুষকে আকৃষ্ট করে। আয়নাল মিয়া বয়াতি জীবদ্দশায় তিনি গানটি আসরে অসংখ্যবার পরিবেশন করেছেন। বর্তমানেও বিচারগানে বহু গায়েন গানটি আসরে পরিবেশন করে থাকেন। এই গানটি খাজা বাবা-নবিজি পালাসহ নবীতত্ত্বের পালাগুলোর জন্য অত্যাবশ্যকীয় একটি গান। সব মিলিয়ে বলা যায়,, পালার বিষয়বস্তু ও গানের জন্য বিচারগানের আসরে খাজা বাবা-নবিজি পালা অধিক জনপ্রিয়।

লালন সাঁই-সিরাজ সাঁই পালা

বাংলাদেশ ও পশ্চিম বঙ্গ ছাড়িয়ে এখন সারাবিশ্বে লালন সাঁই ও সিরাজ সাঁইয়ের পরিচিতি ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলা অঞ্চলে বাউল-সুফি-ফকির-গুরুবাদী ধারায় এই দুই মহৎ ব্যক্তি ভক্তদের নিকট পরম পূজনীয়। বিচারগানের সংশ্লিষ্ট লোকজন গুরুবাদে বিশ্বাসী হওয়ায় লালন সাঁই ও সিরাজ সাঁইকে আধ্যাত্মিক মহামানব রূপে ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন। লালন সাঁই ও সিরাজ সাঁই দুজনের মধ্যে গুরু-শিষ্য সম্পর্ক, সিরাজ সাঁই গুরু আর লালন সাঁই শিষ্য। এজন্য লালন সাঁই ও সিরাজ সাঁইয়ের মধ্যকার গুরু-শিষ্য সম্পর্ককে নিজেদের মধ্যে অনুকরণের শিক্ষা হিসেবে দৃষ্টান্ত মনে করায় বিচারগানের আসরে এই দুই ব্যক্তির জীবনী নিয়ে পালা তৈরি হয়েছে। লালন সাঁই ও সিরাজ সাঁইয়ের মধ্যকার সম্পর্ক প্রসঙ্গে অন্নদাশংকর রায় বলেন,

> "সাঁইজী" এখানে লালন সাঁই দরবেশ। যাঁর গুরু সিরাজ সাঁই দরবেশ। সাঁই এক্ষেত্রে শাহ শব্দের প্রতিশব্দ। কিন্তু লালন প্রভৃতি বাউল ফকিরদের গানে সাঁই হচ্ছেন তিনিই যিনি অন্তরে বিরাজ করছেন অথচ ধরতে গেলে ধরা দিচ্ছেন না। অন্য কথায় মনের মানুষ। (অন্নদাশংকর, ২০১৭ : ৬)

সিরাজ সাঁই ও লালন সাঁইয়ের মধ্যে গুরু-শিষ্য সম্পর্ক এটি সর্বজন বিদিত বিষয়। এ বিষয়টিতে কোনো সন্দেহের অবকাশ তো নেই-ই বরং কেউ সন্দেহপোষণ করলে সেটি বাউল ও গবেষকমহলে অপরাধ হিসেবে গন্য হয়। সিরাজ সাঁই ও লালন সাঁইয়ের মধ্যকার সম্পর্কের বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের ভাণ্ডার হচ্ছে এই দুইজনের রচিত গানসমূহ। বিশেষ করে লালন সাঁইয়ের বহু গানের ভণিতায় তিনি গুরু সিরাজ সাঁইয়ের নাম উল্লেখ করেছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে সিরাজ সাঁই ও লালন সাঁইয়ের জন্ম কোথায় বা তাদের বস্তুনিষ্ঠ কোনো জীবনী আছে কিনা? এ প্রসঙ্গে সত্যিকার অর্থেই বস্তুনিষ্ঠ তথ্য দেয়া কঠিন। কেননা দুইজনই লোককবি বা মরমিকবি এবং এখনকার মতো ২০০-৩০০ বছর আগে এতো

যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো ছিলো না। এজন্য এই ব্যক্তিদ্বয়ের সংগীতের মাধ্যমেই তাদের প্রচার ও প্রসার। এছাড়া গত প্রায় ২০০ বছর যাবৎ লোকমুখে তাদের সম্পর্কে নানাবিধ মিথ তৈরি হয়ে গেছে। যে সকল গবেষক সিরাজ সাঁই ও লালন সাঁইকে নিয়ে গবেষণা করেছেন তার বেশির ভাগই অনুমান ও পক্ষপাতদুষ্ট। সিরাজ সাঁইয়ের জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কে গবেষক সৈয়দ জাহিদ হাসান বলেন,

> সাধককূলশিরোমনি সিরাজ সাঁই আনুমানিক ১৭১৮ খ্রিস্টাব্দে (১১১৫ বঙ্গাব্দে) ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুণ্ডু থানার হরিশপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে (১১৯৫ বঙ্গাব্দে) তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল আনুমানিক আশি বছর। (সৈয়দ জাহিদ, ২০১৯ : ১৫)

এই গবেষকের মতোই বহু গবেষক সিরাজ সাঁইয়ের জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কে তথ্য দিয়েছেন। তার কোনোটাই সন্দেহাতীতভাবে অবশ্য নেয়া যায় না। তবে তাদের সমৃদ্ধ গবেষণার মাধ্যমে সিরাজ সাঁই ও লালন সাঁইয়ের জন্ম-মৃত্যুর সময় সম্পর্কে ধারণা তৈরি করা যায়। এছাড়া এই দুইজন সাধুপুরুষ সম্পর্কে মুখে মুখে নানা কথকতার প্রচলন রয়েছে। তবে কোনো কোনো মতামতকে কিছুটা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়, কিছু কিছু মতামতকে আজগুবি গল্প মনে হতে পারে। লালন সাঁইয়ের জন্ম ও সিরাজ সাঁইয়ের সাথে তাঁর সম্পর্ক প্রসঙ্গে বিচারগানের প্রখ্যাত গায়েন অসীম দাস বাউল বলেন,

> লালনের জীবনী তো সামান্য সময়ের মধ্যে শেষ করা যাবে না। তবে লালন শাহ, লালন শাহ না, আমি প্রথমেই বলেছি, কায়স্থ পরিবারে জন্ম। বাবার নাম হীরালাল, আর উনার নাম রেখেছিলো লালন। উনি তীর্থ-পর্যটনে গিয়ে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। আগেকার দিনের বসন্ত, রোগটা ছিলো খুব কঠিন ব্যাপার। এখনকার দিনে বসন্ত রোগ নিয়ে মানুষ এতো চিন্তা করে না। তাই তার সহচরী যারা ছিলো সকলেই লালনকে ফেলে আসলো। কিন্তু লালন ফকির, উনি পিছপা হলো না, উনি হাঁটতে লাগলেন নদীর তীর দিয়ে। ধল্লা নদীর তীর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কুষ্টিয়ার ছেউরিয়াতে নদীর কিনারে যখন পড়ে থাকলেন, যেখানে এখন নবপ্রাণ অফিস, লালন শাহর আখড়ায় যারা গেছেন, তারা নিশ্চয়ই জানেন, সেই নবপ্রাণ অফিসের মধ্যে আছে, লালন শাহর পড়ে থাকার সেই ঘাট। ঐ ঘাট থেকে মলম শাহর স্ত্রী তাকে কুঁড়িয়ে নিয়ে গেলো। এবং দরবেশ সিরাজ সাঁইজী পালকিবাহক যখন ছেউরিয়াতে আসলো, ছেউরিয়াতে আসবার পরে তখন সিরাজ সাঁইজীর নিকটে লালনকে সমর্পিত করে দিলেন মলম শাহর স্ত্রী। চাকা চাকা ঘা হয়ে গেছে বসন্ত রোগে। পোকা হয়ে গেছে তার মধ্যে। সিরাজ সাঁইজী কী করলেন, তার ঝুড়ির মধ্যে থাকতো ছাই, সেই ছাই দিয়ে লালনের সমস্ত শরীরে যখন মেখে দিলো, এক এক করে লালন ফকিরের সমস্ত রোগের ঘা সেরে গেলো। একটি চোখ তাঁর ভালো হলো না কোনো দিনের জন্যেও। একটি চোখ তাঁর অন্ধ থাকলো। সিরাজ সাঁইজীকে জিজ্ঞাসা করা হলো, একটি চোখ সাঁইজী তাঁর অন্ধ কইরা রাখা হইল কেন? তখন সাঁইজী বলেছিলেন, ও একটি চোখ দ্বারা একত্ববাদের ওপরে যা দর্শন করবে, তা দ্বারাই পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম-দল-মত একত্রিত করে একাকার করে মানুষ-মানবতা, মানব সংসার ইহার মধ্যে সমস্ত মানুষকে নিয়ে আসবে। আর যদি তার দুইটি চোখ থাকে, যদি দুই চোখ দেওয়া হয় তাহলে এই পৃথিবীতে ধর্ম-গোত্র-বৈষম্য কোনো কিছুই রাখবে না। এই কারণে তার একটি চক্ষু অন্ধ কইরা দেওয়া হলো। (অসীম, ২০১৬ : পরিবেশনা)

ফকির লালান সাঁই ও সিরাজ সাঁই সম্পর্কিত এই গল্পটির বস্তুনিষ্ঠ কোনো ভিত্তি না থাকলেও বিচারগানের আসরে এমন গল্প প্রায়ই গায়েনগণ বলে থাকেন। আর এ রকম শত-হাজার গল্প জীবনবৃত্তান্তমূলক পালাসমূহের সবগুলো পালাতেই আলোচিত হয়ে থাকে। এ পর্যায়ে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে লালন সাঁই-সিরাজ সাঁই পালাতে দুই পক্ষের গায়েনদ্বয় কী কী বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকেন। বিচারগানের আসরে লালন সাঁই-সিরাজ সাঁই পালায় অভিনয়কালে বিচারগানের গায়েন ফরিদপুরের আয়নাল মিয়া বয়াতি, ফকির আবুল সরকার, রাজবাড়ির অসীম দাস বাউল ও মানিকগঞ্জের বাউলকবি নূর মেহেদী আব্দুর রহমান প্রমুখের আলোচনা শুনে ও বিচারগানের দর্শক-শ্রোতার সাথে কথা বলে এই পালাটির গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়ের একটি তালিকা তৈরি করা হয়েছে, সেটি হচ্ছে-

ক. লালন সাঁই ও সিরাজ সাঁইয়ের জন্ম ও মৃত্যুর ইতিহাস।

খ. এই দুইজন বাউলকবির মধ্যকার সম্পর্কের নানাদিক।

গ. লালন সাঁইয়ের বসন্ত রোগ ও সুস্থতার ইতিহাস।

ঘ. লালন সাঁইয়ের পালক পিতা-মাতার অবদান।

ঙ. সিরাজ সাঁইয়ের নিকট লালন সাঁইয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণের ইতিহাস।

চ. লালন সাঁই-সিরাজ সাঁইয়ের জীবিকা নির্বাহের পেশা কী ছিলো?

ছ. এই দুই সাধকের মধ্যকার সম্পর্কের গভীরতা ও আধ্যাত্মিকতা।

জ. রতিসাধনা সম্পর্কে লালন সাঁই-সিরাজ সাঁইয়ের অভিমত কী, গানের ভিত্তিতে আলোচনা।

ঝ. এই দুই মহাপুরুষের আধ্যাত্মিক সাধনার পদ্ধতি।

ঞ. লালন সাঁই ও সিরাজ সাঁইয়ের অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা।

ট. লালন সাঁই-সিরাজ সাঁইয়ের মধ্যে গুণে কে বড়?

ঠ. এই দুই বাউলকবির বিভিন্ন গানের ওপর বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা।

এই বিষয়গুলো আলোচনা জন্য গায়েনগণ প্রধানত একে-অপরকে প্রশ্ন করেন এবং উত্তর দেন। অর্থাৎ সিরাজ সাঁই-লালন সাঁই পালায় বিচারগানের অন্যান্য পালার মতোই প্রতিপক্ষ শিল্পীকে পরাজিত করতে নানা রকম কৌশলী প্রশ্ন করে থাকেন। পালাটিতে দেখা যায়, যিনি লালন সাঁইয়ের ভূমিকায় অভিনয় করেন, তিনি নানান আধ্যাত্মিক বিষয় জানতে চেয়ে সিরাজ সাঁইয়ের ভূমিকায় অভিনয়কারী গায়েনের প্রতি প্রশ্ন করেন। বাংলাদেশে লালন সাঁই-সিরাজ সাঁই পালা পরিবেশনাগুলোর মধ্যে ফরিদপুরের আয়নাল মিয়া বয়াতি ও রাজবাড়ির অসীম দাস বাউল অভিনীত একটি ভিসিডিতে ধারণকৃত পালা দেশের গ্রামাঞ্চলে খুব জনপ্রিয় হয়েছিলো। এই পালায় অসীম দাস বাউল লালন সাঁইয়ের ভূমিকা হতে সিরাজ সাঁইয়ের ভূমিকায় অভিনয়কারী গায়েন আয়নাল মিয়া বয়াতিকে একটি প্রশ্ন করেন।

যার জবাবে আয়নাল মিয়া বয়াতি বলেন, 'তুমি বলেছো এগারোটি কার ছিলো, এগারটি রুদ্রই ছিলো এগারোটি কার।...অন্ধকার, ধন্ধকার, নূর কার, কূহকার, আকার, সাকার, দীপ্তিকার, কয়টা হইল, সাতটা। আর চারটি রয়েছে গোপনে।' (আয়নাল, ২০১৬ : পরিবেশনা) লালন সাঁই-সিরাজ সাঁই পালায় গায়েনগণ গদ্য-কাব্য কথায় প্রশ্ন-উত্তরের পাশাপাশি বহু প্রশ্ন লালন সাঁইয়ের গানের মাধ্যমেও করে থাকেন। দেখা যায় গায়েনগণ হয়তো লালন সাঁইয়ের একটি গানের মাধ্যমে প্রশ্ন করেছেন, পক্ষান্তরে বিপক্ষের গায়েন লালন সাঁইয়ের অন্য আরেকটি গানের মাধ্যমে উত্তর দিয়েছেন। এছাড়া কথায়ও উত্তর দেন। কিংবা গদ্য-কথায় কোনো প্রশ্নের উত্তর গদ্য বা গানের মাধ্যমেও গায়েনগণ দিয়ে থাকেন। মূল কথা হচ্ছে, বিচারগানের অন্যান্য পালায় যেভাবে গায়েনগণ প্রশ্ন ও উত্তর করেন, সেভাবেই লালন সাঁই-সিরাজ সাঁই পালায়ও করে থাকেন। এই পালাটির ব্যতিক্রম বিষয়টি হচ্ছে, প্রশ্ন-উত্তরের ক্ষেত্রে লালন সাঁইয়ের গানের পরিবেশনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কেননা লালন সাঁই-সিরাজ সাঁইয়ের গানের কথার মাধ্যমে তাদের দর্শন-চিন্তার সঠিক প্রকাশ হয়। আর তাদের দর্শন-চিন্তা আসরে আলোচনা করতে গেলে তাদের গানের বিকল্প নেই। এই পালাটিতে যে গানের মাধ্যমে প্রশ্ন করা হয়, তার একটি প্রামাণ্য হতে পারে রাজবাড়ির ফকির আবুল সরকার ও মানিকগঞ্জের বাউলকবি নূর মেহেদী আব্দুর রহমান বয়াতি পরিবেশিত একটি পালা। এই পালাটিতে লালন সাঁইয়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন ফকির আবুল সরকার এবং সিরাজ সাঁইয়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন বাউলকরি নূর মেহেদী আব্দুর রহমান। ফকির আবুল সরকার লালন সাঁইয়ের ভূমিকা থেকে লালন সাঁইয়ের বিখ্যাত একটি কামতত্ত্বের গান করেন, গানটি হচ্ছে-

> প্রেম রসিকা হব কেমনে।
> করি মানা কাম ছাড়েনা মদনে ॥
> এই দেহেতে মদন রাজা করে কাচারি
> কর আদায় করে লয়ে যায় হুজুরি
> মদন তো দুষ্ট ভারি তারে দাও তহশিলদারি
> করে সে মুন্সিগিরি গোপনে ॥ (আবদেল, ২০০৯ : ৩০১)[৫৬]

এই গানটি বর্ণিত হয়েছে লালন সাঁই তাঁর গুরু সিরাজ সাঁইয়ের নিকট কামের উপদ্রব থেকে মুক্তির পথ জানতে চেয়েছেন। কেননা কামের কারণে সাধক প্রেমের জগতে প্রবেশে বাঁধার সম্মুখীন হয়। এই প্রশ্নের যথার্থ উত্তরও সিরাজ সাঁই পক্ষের গায়েন বাউলকবি নূর মেহেদী আব্দুর রহমান দিয়েছেন। লালন সাঁই-সিরাজ সাঁই পালায় শুধু তাদের জীবনী বর্ণনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। জীবনবৃত্তান্তমূলক পালাসমূহের অন্যান্য যে সকল পালা রয়েছে, সেগুলোর সাথে এই পালাটির প্রধান ভিন্নতা হচ্ছে দর্শন। এই পালায় খুব বেশি করে বাউলদর্শন নিয়ে আলোচিত হয়। তাছাড়া লালন সাঁই ও সিরাজ সাঁই দুইজনই বাংলাদেশের মানুষ হওয়ায় এই ভূখণ্ডের মানুষের সাথে সহজেই

পালার দুইজন সাধুপুরুষের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। গানের কথা উপমা, ঘটনা, সুর, ছন্দ সবই আসরে উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাকে একাত্ম করতে সহায়তা করে থাকে। তার ওপর বাউলদর্শনের নিগূঢ়তত্ত্বকথার বাণী শোনার জন্য এই দর্শনে বিশ্বাসী দর্শক-শ্রোতা ভক্তি সহকারে আসরে উপস্থিত থাকেন। সব মিলিয়ে লালন সাঁই-সিরাজ সাঁই পালা দুইজন সাধুপুরুষের পালা হিসেবে দর্শক-শ্রোতার নিকট বিশেষভাবে নন্দিত হয়।

লালন সাঁই-রশিদ সাঁই পালা

লালন সাঁই-রশিদ সাঁই পালাটি বিচাররগানের আসরে একটি নতুন সংযোজন। জীবনবৃত্তান্তমূলক পালাসমূহের মধ্যে এই পালাটিও নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। অভিসন্দর্ভে পূর্বে লালন সাঁই-সিরাজ সাঁই পালায় লালন সাঁই প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এই পালাটিতে রশিদ সাঁই প্রসঙ্গে তুলনামূলক বেশি আলোচনা করা হবে। সেই সাথে লালন সাঁই-রশিদ সাঁই পালার এই দুই সাধকের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক ও তাদের দর্শন নিয়ে বিশ্লেষণ করা হবে। পালার শিরোনামে ‘রশিদ সাঁই’ নামটি ব্যবহার করা হলেও এই সাধক জীবদ্দশায় আব্দুর রশিদ সরকার নামেই পরিচিত ছিলেন। এমনকি তিনি নিজে কখনও ‘রশিদ সাঁই’ নামটি ব্যবহারও করেননি। এছাড়া এক সময় আব্দুর রশিদ সরকার ‘পাগলা রশিদ’ নামেও গণমানুষের নিকট পরিচিত হয়েছিলেন। এখন হয়তো তাঁর ভক্ত-অনুসারীদের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার কারণে রশিদ সাঁই নামে পরিচিতি পাচ্ছেন। এটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, তার নামের শেষে লালন সাঁই বা বাউলদের ‘সাঁই’ উপাধি যুক্ত করা হয়েছে। তাঁর গাওয়া গানের যত অডিও, ভিসিডি ও ভিডিও রয়েছে সব জায়গায় তাঁর নাম আব্দুর রশিদ সরকার। এমনকি ২০২০ সালে প্রকাশিত তাঁর গানের বই ‘রশিদগীতি : মানুষে আল্লাহ থাকে’, এখানেও তাঁর নাম আব্দুর রশিদ সরকার হিসেবেই প্রকাশিত হয়েছে। অন্যদিকে তাঁর সমস্ত গানেই আব্দর রশিদ সরকার বা রশিদ সরকার নামে ভণিতা করা হয়েছে। হয়তো পালার সৌন্দর্যের কারণে লালন সাঁই নামের সাথে মিলিয়ে রশিদ সাঁই লেখা হয়েছে। তবে একথাও সত্য লালন সাঁই-রশিদ সাঁই পালাটিতে গায়েনগণ তাকে আব্দুর রশিদ সরকার বা আব্দুর রশিদ সরকার আল চিশতি নিজামি নামেও উল্লেখ করেছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কে এই আব্দুর রশিদ সরকার ওরফে রশিদ সাঁই। তাঁর প্রথম পরিচয় হচ্ছে তিনি বাংলাদেশের বিচারগানের একজন কিংবদন্তি গায়ক ছিলেন। জীবদ্দশায় তিনি দর্শক-শ্রোতামহলে বিপুল জনপ্রিয় ছিলেন। আব্দুর রশিদ সরকার মানিকগঞ্জ জেলাধীন সিংগাইর উপজেলার আজিমপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম ১৯৫৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর এবং মৃত্যু ২০০৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি। আব্দুর রশিদ সরকার বিচারগানের গায়ক ছাড়াও একজন পির ও আওয়ামী-রাজনীতিক ছিলেন। তবে তাঁর মুখ্য পরিচয় ছিলো তিনি বিচারগানের খ্যাতিমান গায়েন বা গায়ক। আব্দুর রশিদ সরকারের সংগীতজীবন সম্পর্কে তাঁর প্রকাশিত সংগীতগ্রন্থে বলা হয়েছে-

রশিদ সরকার নিজে গান লিখতেন, সুর করতেন এবং গাইতেন। একাধারে তিনি গীতিকার, সুরকার এবং শিল্পী। উক্ত গুণের জন্য ওস্তাদ আনোয়ার দেওয়ান তাঁকে সরকার উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর রচিত গানের সংখ্যা ৫ শতাধিক। অডিও এবং ভিডিও মিলে ১৫০টি ক্যাসেট রয়েছে। এসব গানের মধ্যে রয়েছে বিচ্ছেদ, মুর্শিদি, নবীর শান, পাক-পাঞ্জাতনের শান, ভাবতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, পালাগান ইত্যাদি। দেশে-বিদেশে মঞ্চস্থ হয়েছে তাঁর অসংখ্য একক ও পালাগান। (রশিদ, ২০২০ : ৮)

অর্থাৎ লোকগান বা বিচারগানের প্রতিটি শাখায়ই প্রায় ছিলো সমান দক্ষতা। তাছাড়া বিচারগানের সমস্ত গায়েনের মধ্যে পালায় প্রতিপক্ষকে যুক্তি ও ধর্মতত্ত্বে কাবু করার জন্য তাঁর অবস্থান শীর্ষে ছিলো। তাঁর প্রখর যুক্তি ও ধর্মতত্ত্বের গভীর জ্ঞানের কারণে সর্বজন মহলে তিনি প্রশংসিত হতেন। এছাড়া তিনি ছিলেন বাউল-সুফি ধারার একজন বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। তাঁর পরিবেশিত বিচারগানের বহু অডিও, ভিসিডি ও ভিডিও রয়েছে, যেখানে তিনি এদেশের মোল্লাতন্ত্র, ওহাবী মতবাদ, ধর্মব্যবসা, ধর্মীয় উগ্রতা ও গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কথাবার্তা বলেছেন। সেই প্রতিবাদী কথাগুলো তিনি শুধু গদ্যেই বলেননি, তিনি তাঁর বহু গানের মাধ্যমেও বলেছেন। এ রকমই ধর্মীয় অন্ধত্ব ও ধর্মীয় উগ্রবাদী রাজনীতির বিরুদ্ধে তাঁর রচিত একটি গান হচ্ছে-

বি.জে.পি আর জামাতিরা, জাল ফেলেছে বিশ্বজোড়া
চেতন মানুষ যারা শুনো, চেতন মানুষ যারা ॥
কেউ মসজিদ ভেঙ্গে মন্দির গড়বে
কেউ মসজিদ-ই কায়েম রাখিবে
বিবাদ শুরু হয় এভাবে ভারত দিল নাড়া।
দুই দলের বিবাদে গেলো কত মানুষ মারা
মন্দির গড়বি মনের মতন
মানুষ গড়তে পারবি কী তোরা ॥ ঐ (রশিদ, ২০২০ : ১৫০-১৫১)[৫৭]

চমৎকার এই গানটিতে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর ধর্মীয় উগ্রতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হয়েছে। গানে ভারতের রাজনৈতিক দল বি.জে.পি এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল জামাতে ইসলাম ও ইসলামী ছাত্র শিবিরের কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। গানে আব্দুর রশিদ সরকার সকল ধর্মের উপরে মানুষের অবস্থানকে ঘোষণা করেছেন এবং ধর্ম রক্ষার নামে মানুষ হত্যা করাকে গুরুতর অপরাধ বলেছেন। গানটিতে বাংলাদেশের ধর্মীয় ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবির সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'রাজশাহী আর চিটাগাঙ্গে পড়ছে যে ছাত্ররা/করে ভার্সিটিতে গোলাগুলি/কেউ না তারা শিবির ছাড়া', গানটিতে বিভিন্নভাবে ধর্মান্ধতা ও উগ্রতার বিষয়ে বলা হয়েছে। গানের শেষ 'অন্তরা'য় এসে আব্দুর রশিদ সরকার মানুষকে সকলের উপরে স্থান দিয়ে বলেছেন, 'রশিদ সরকার নাই তার ধর্ম, হইছে ধর্ম ছাড়া/বুঝলে পরে মানবধর্ম/কিছুই নাই এই মানুষ ছাড়া। মূলকথা হচ্ছে, গানটির মাধ্যমে আব্দুর রশিদ সরকারের মানবিক ধর্মদর্শনের পাশাপাশি প্রগতিশীল রাজনীতির পরিচয় পাওয়া যায়। আব্দুর রশিদ সরকার বাউল-

সুফি দর্শনের ওপর শুধু নিজের জীবনকেই চালিত করেননি, তিনি এই মতবাদকে সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা করার নিমিত্তে জোড়ালোভাবে চেষ্টাও করেছেন। বিচারগানের প্রতিটি আসরে যেমন তিনি তাঁর আদর্শ প্রচার করেছেন, তেমনি একজন চিশতিয়া তরিকার পির হিসেবে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ফকির মওলা দরবার শরিফের মাধ্যমে ভক্তদের দীক্ষা দিয়েছেন। সংগীত, আধ্যাত্মিকতা ও রাজনৈতিক গুণের কারণে তিনি বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন। এছাড়া তিনি সারাজীবন থেকেছেন মাটির কাছাকাছি, করেছেন কৃষি কাজ। জীবন-যাপন করেছেন অতি সাধারণ। ধন-সম্পদের মোহ তাকে আবিষ্ট করতে পারেনি কিংবা বিলাসী-জীবনে নিজেকে ভাসিয়ে দেননি। বাউল ও সুফিবাদে বিশ্বাসী হওয়ায় এই দর্শনের সহজ পথকে বেছে নিয়ে সারাজীবন সহজ জীবন-যাপন করার চেষ্টা করেছেন। আব্দুর রশিদ সরকারের যাপিত-জীবনের ধরণ প্রসঙ্গে লালন সাঁই-সিরাজ সাঁই পালায় অভিনয়কালে ফরিদপুরের ফকির আবুল সরকার বলেন,

> পৃথিবীতে কালা বলতে একটা শব্দ আছে। উনার চাইতে কালা মানুষ আর আমার চোখে দেখি নাই। কী, না ভুল কইলাম? (দর্শকদের উদ্দেশ্যে) কিন্তু মানুষটা যদি জঙ্গলের মধ্যে যাইয়াও শুইয়্যা থাকতো, সেখানেও মানুষ যাইয়্যা ঘির্যা ধরতো। কী যেন গন্ধ তাঁর মধ্যে ছিলো। সুফিদের ভাবধারাটাই এ রকম। হ্যা, একটা কথা বলেছে দামি কথা। (অসীম দাস বাউলের উদ্দেশ্যে) যারা সমাজকে পরিষ্কার করে, তারা নিজেরে পরিষ্কার রাখার সময় পায় না। (ফকির আবুল, ২০১৯ : পরিবেশনা)

এটি স্পষ্ট যে আব্দুর রশিদ সরকার একজন বাউল-সুফিবাদ বিশ্বাসী মানুষ ছিলেন। তবে তাঁর গানের বাণীতে এবং যাপিত-জীবনে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সুফিবাদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই কারণেই হয়তো লালন সাঁই-রশিদ সাঁই পালায় দেখা যায়, লালন সাঁইকে বাউলপক্ষে রেখে আব্দুর রশিদ সরকারকে সুফিপক্ষে রাখা হয়েছে। লালন সাঁই-রশিদ সাঁই পালা শিরোনামে সর্বপ্রথম যে পালাটি পরিবেশিত হয়েছে, সেই পালাটি এভাবেই করা হয়েছে। পালায় অভিনয় করেছেন ফকির আবুল সরকার ও অসীম দাস বাউল। সর্বপ্রথম এই পালাটি মানিকগঞ্জের সিংগাইর উপজলোর আজিমপুর গ্রামের ফকির মওলা দরবার শরিফ প্রাঙ্গণে অভিনীত হয়েছে। পালাটিতে গায়েনগণ জানিয়েছেন, পালাটি নির্ধারণ করে দিয়েছেন আব্দুর রশিদ সরকারের পুত্র শফিউল বাশার। এছাড়া এই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অসীম সরকার আরো বলেন যে, রশিদ সরকার জীবদ্দশায় বিচারগানের উন্নতিকল্পে নতুন নতুন পালার উদ্ভাবন করতেন। আব্দুর রশিদ সরকারের উদ্ভাবিত একটি পালা হচ্ছে এজিদি ইসলাম-মুহাম্মদি ইসলাম। মূলত আব্দুর রশিদ সরকার ছিলেন বিচারগানের জন্য নিবেদিত প্রাণ একজন মানুষ। এখন আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, এই কিংবদন্তিতুল্য বিচারগানের গায়ক আব্দুর রশিদ সরকার ও বাউল লালন সাঁইকে নিয়ে যে পালাটি তাতে কী কী আলোচনা হয়েছে বা হয়। ফকির আবুল সরকার ও অসীম দাস বাউলের অভিনীত লালন সাঁই-রশিদ সাঁই পালা থেকে কতগুলো আলোচ্য বিষয় বিন্যাস করা হয়েছে। সেগুলো হলো-

ক. আব্দুর রশিদ সরকার ছিলেন সুফি ঘরণার সাধক আর লালন সাঁই ছিলেন বাউল ঘরাণার সাধক।

খ. লালন সাঁই ছিলেন গৃহত্যাগী বাউল এবং আব্দুর রশিদ সরকার ছিলেন গৃহী বাউল।

গ. লালন সাঁই জাগতিক জীবনের সাথে তেমন যুক্ত না থাকলেও আব্দুর রশিদ সরকার যুক্ত ছিলেন।

ঘ. আব্দুর রশিদ সরকারের গানে সুফিবাদের প্রভাব বেশি আর লালন সাঁইয়ের গানে বাউলবাদের প্রভাব বেশি।

ঙ. আব্দুর রশিদ সরকার ও লালন সাঁই দুজনেই মানবধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। তারা কেউই ধর্মীয় বিভেদ মানতেন না।

বিচারগানের আসরে লালন সাঁই-রশিদ সাঁই নামের পালাটির নব-সংযোজন নিঃসন্দেহে পরিবেশনাকে সমৃদ্ধ করেছে। এই নতুন পালাটি সম্পর্কে বিচারগানের একজন নিয়মিত ও উচ্চশিক্ষিত দর্শক-শ্রোতা অনন্ত কুমার বিশ্বাস বলেন,

> আমি শৈশব থেকেই বিচারগানের ভক্ত। আমি একাধিকবার আব্দুর রশিদ সরকারের বিচারগানের পরিবেশনা দেখেছি। তিনি নিঃসন্দেহে একজন ভালোমানের গায়ক ছিলেন। তাঁর সময়কার গায়কদের মধ্যে তিনি জনপ্রিয়তার শীর্ষে ছিলেন। তিনি একজন প্রগতিশীল মানুষও ছিলেন। তাঁর বহু গান ও কথা এখনও মানুষের মুখে মুখে ফেরে। আমার খুব ভালো লাগছে এ জন্য যে, আমি যার পালা দেখেছি, এখন তাঁকে নিয়েই আসরে পালা হচ্ছে। এই বিষয়টি খুবই ভালো লাগলো কারণ তাঁর জীবনী যদি নিয়মিতভাবে বিচারগানের মঞ্চে পরিবেশিত হয়, তাহলে তাঁর জীবনী থেকে মানুষ শিক্ষা নিতে পারবেন। (অনন্ত, ২০২৩ : সাক্ষাৎকার)

অনন্ত কুমার বিশ্বাস উপরি উক্ত বিষয় ছাড়াও আরো একটি বিষয় জানান সেটি হচ্ছে, লালন সাঁইয়ের গানের কথা ও সুর নিঃসন্দেহে অতুলনীয়, তবে আব্দুর রশিদ সরকারের গানের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বিশেষ করে আব্দুর রশিদ সরকারের কিছু কালজয়ী হয়ে গেছে। আব্দুর রশিদ সরকারের সাবেক স্ত্রী ও সংসদ সদস্য মমতাজ বেগম বহু আসরে রশিদ সরকারের গান পরিবেশন করেন এবং প্রশংসা করেন। এক কথায় এখনও গ্রাম-গঞ্জ ছাড়িয়ে নাগরিক মঞ্চেও আব্দুর রশিদ সরকারের গান লালন সাঁইয়ের গানের মতো ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হচ্ছে। আব্দুর রশিদ সরকারের তুমুল জনপ্রিয় একটি বিচ্ছেদগান হচ্ছে-

> সাধিয়া যৌবন বিলাইয়া এখন উপায় কিবা করি
> সোনাবন্ধু হইল দেশান্তরী
> আমায় পাগল বানাইয়া গো ॥
> মধু খাইবার যাইয়া সখী গো
> আমি খাইলাম বিষের বড়ি
> এখন বিষ উইঠাছে ব্রহ্মমূলে
> আমি উগরাইতে না পারি ॥ ঐ (রশিদ, ২০২০ : ৩০২)[৫৮]

এই গানের মতোই অসংখ্য গান আব্দুর রশিদ সরকারের রয়েছে। যে গানগুলো এখনও বিচারগানের আসরে গায়েনগণ পরিবেশনকালে গায়েন ও দর্শক-শ্রোতা কান্নায় ভেঙে পড়েন। অনেক আসরেই দেখা যায়, আব্দুর রশিদ সরকারের গানের সুরে সুরে তাঁর ভক্তবৃন্দ শোকে কাতর হয়ে পড়েন। কেউ কেউ আসরে কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান

হয়ে পড়েন। আব্দুর রশিদ সরকারের খ্যাতিমান গায়ক শিষ্যদের মধ্যে ছোট আবুল সরকার, জালাল সরকার সাধু, সাত্তার সরকার, আনোয়ার সরকার, আজগর সরকার ও আমজাদ সরকারসহ আরো অনেকেই তাঁর গানের সুরে আসরে কান্নায় ভেঙে পড়েন। সুতরাং একথা জোড়ালোভাবেই বলা যায়, বিচারগানে সংযোজিত লালন সাঁই-রশিদ সাঁই পালাটি নিঃসন্দেহে পরিবেশনাটিকে সমৃদ্ধ করেছে। এছাড়া মহাত্মা লালন সাঁইয়ের জীবনীর সঙ্গে এ যুগের একজন বাউল-সুফি সাধকের জীবনীর আলোচনার ফলে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা গণমানুষের নিকট বৃদ্ধি পাবে নিশ্চয়ই।

শাহ্ জালাল-শাহ্ পরান পালা

জীবনবৃত্তান্তমূলক পালাসমূহের মধ্যে শাহ জালাল-শাহ পরান পালাটি বিচারগানের আসরে যুক্ত হয়েছে খুব বেশি দিন হয়নি। বাংলাদেশে সুফি মতবাদে বিশ্বাসী মানুষ ছাড়াও জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে হযরত শাহ জালাল (র.) ও হযরত শাহ পরান (র.)-কে আধ্যাত্মিক মহাপুরুষ হিসেবে ভক্তি করেন। বাংলা অঞ্চলে এই দুই তাপসপুরুষ সম্পর্কে নানা রকম কথকতা প্রচলিত রয়েছে। তাদের সম্পর্কে কোনো কোনো গল্প বা ঘটনা বর্তমানে পৌরাণিক কাহিনিতে পরিণত হয়ে গেছে। অর্থাৎ লোকসমাজে এই দুই সুফিসাধক অতিমানবীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছে। হযরত শাহ জালাল (র.) ও হযরত শাহ পরান (র.) যে শুধুমাত্র লোকসমাজে পূজনীয় ব্যক্তিত্ব এমনটি নয়, তারা জাতীয় পর্যায়ের গুণী ব্যক্তিদের নিকটও পরম শ্রদ্ধার মানুষ। এর উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বাংলাদেশের প্রত্যেকটি জাতীয় নির্বাচনে বড় বড় রাজনৈতিক দলের নেতানেত্রীবৃন্দ হযরত শাহ জালাল (র.) ও হযরত শাহ পরান (র.)-এর মাজার জিয়ারতের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচরাণা শুরু করেন। অর্থাৎ এই দুই সাধুপুরুষ এই অঞ্চলের মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসের কাছে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু লোকনাটক বিচারগানের সাথে যুক্ত মানুষজন সুফি-বাউল মতবাদে বিশ্বাস করেন, সেহেতু হযরত শাহ জালাল (র.) ও হযরত শাহ পরান (র.)-কে পরম শ্রদ্ধার পাত্র হিসেবেই সম্মান করে থাকেন। এজন্য বিচারগানের আসরে এই দুই আধ্যাত্মিক মহৎ ব্যক্তিকে নিয়ে পালা হওয়া খুবই স্বাভাবিক বিষয়। অভিসন্দর্ভে ইতোমধেই নবি ও অলি-আওলিয়াদের জীবনীভিত্তিক কতগুলো পালা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন- বড়পির হযরত আব্দুল কাদির জিলানি (র.) ও হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি (র.)-এর জীবনী নিয়ে বিচারগানের স্বতন্ত্র পালা রয়েছে। এই দুইজন যেমন উচ্চপর্যায়ের সুফিসাধক ছিলেন, তেমনি হযরত শাহ জালাল (র.) ও হযরত শাহ পরান (র.)ও উচ্চপর্যায়ের সুফিসাধক ছিলেন। সুতরাং বিচারগানের আসরে তাদের স্বত্রন্ত্র পালা হতেই পারে। প্রথমত, এই দুইজনই আধ্যাত্মিক মহাপুরুষ, এতে এদেশের মানুষ তাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন; দ্বিতীয়ত, এই দুই সাধুপুরুষের মাজার বা সমাধি বাংলাদেশের সিলেটে অবস্থিত। এজন্য এদেশের মানুষের নিকট এই দুইজনের আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশি। বিচারগানে শাহ জালাল-শাহ পরান পালা করার প্রসঙ্গে একই কথা

বলেছেন বিচারগানের গায়েন পাগল দুলাল। তার মতে, বিচারগানে যদি বড়পির-খাজা বাবা পালা হয় তাহলে বাংলাদেশের জমিনে যারা আছেন, মানে এদেশের দুই অলির নামে পালা হবে না কেন? তিনি এও মনে করেন, যে সমস্ত বিচারগানের গায়েন শাহ জালাল-শাহ পরান পালা করেন না, এটা তাদের মস্ত বড় ব্যর্থতা। এখন কথা হচ্ছে, বিচারগানের একটি স্বতন্ত্র পালা হিসেবে শাহ জালাল-শাহ পরান পালাটির বিষয়গত দিক থেকে কতটা স্বতন্ত্রতা রয়েছে। বিষয়গত পার্থক্যের দিক থেকে শাহ জালাল-শাহ পরান পালাটি বিচারগানের জীবনবৃত্তান্তমূলক পালাসমূহের অন্যান্য পালাগুলোর মতোই অনেকটা। এ পালাটিতে ব্যতিক্রম যেটুকু, সেটুকু হচ্ছে ব্যক্তির ভিন্নতা। পালায় আলোচ্য বিষয়াদির ধরণে তেমন কোনো পার্থক্য নেই বললেই চলে। পালার আলোচিত বিষয়াদি বিশ্লেষণ করে কতগুলো সাধারণ বিষয়কে চিহ্নিত করা যায়। সেগুলো হলো-

ক. হযরত শাহ জালাল (র.) ও হযরত শাহ পরান (র.)-এর মধ্যে সম্পর্ক কী?

খ. হযরত শাহ জালাল (র.) কার নির্দেশে বাংলাদেশে আগমণ করেন?

গ. হযরত শাহ জালাল (র.) ও হযরত শাহ পরান (র.)-এর অলৌকিক ক্ষমতার বর্ণনা।

ঘ. হযরত শাহ জালাল (র.)-এর সাথে জালালি কবুতরের মধ্যকার অলৌকিক ঘটনা।

ঙ. মামা হযরত শাহ জালাল (র.) কর্তৃক নিষেধ সত্ত্বেও ভাগিনা হযরত শাহ পরান (র.) জালালি কবুতর ভক্ষণ ও পরবর্তীতে অলৌকিক ক্ষমতাবলে হযরত শাহ পরান (র.)-এর মাধ্যমে ভক্ষণকৃত কবুতরের পাখনা-পশম থেকে নতুন করে কবুতরের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার।

চ. হযরত শাহ জালাল (র.)-এর মাজারপ্রাঙ্গণে জঙ্গিদের বোমা হামলা ও জঙ্গিদের শাস্তি।

ছ. হযরত শাহ জালাল (র.)-এর মাজারপ্রাঙ্গণে এক চিত্রনায়কের জুতা পরিধান সংক্রান্ত বেয়াদবি ও পরবর্তীতে সে কারণে চিত্রনায়কের পঙ্গুত্ববরণের কাহিনি বর্ণনা।

জ. হযরত শাহ পরান (র.)-এর জন্মের পূর্বে তাঁর পিতা-মাতার অলৌকিক স্বপ্নদর্শন ও পরে বাস্তবায়ন।

ঝ. হযরত শাহ জালাল (র.)-এর কারামতিতে জায়নামাজে বসে সুরমা নদী পাড়ি দেয়ার ঘটনা।

এ রকম বহু ছোট ছোট উপাখ্যানের মাধ্যমে হযরত শাহ জালাল (র.) ও হযরত শাহ পরান (র.)-এর জীবনের নানা বিষয়াদি শাহ জালাল-শাহ পরান পালায় বিচারগানের গায়েনগণ আসরে উপস্থাপন করে থাকেন। পালার বিষয়স্তু ও ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে বিচারগানের অনেক দর্শক-শ্রোতার নিকটই শাহ জালাল-শাহ পরান পালাটি খুবই প্রিয়। এ পালাটি প্রসঙ্গে বিচারগানের একজন নিয়মিত দর্শক-শ্রোতা শাহিন টিটু বলেন,

> আমি জীবনে বিচারগানের বহু পালা দেখেছি ও শুনেছি, তবে শাহ জালাল-শাহ পরান পালাকে আমার খুবই ব্যতিক্রমধর্মী পালা বলেই মনে হয়েছে। এই পালার বিষয় দুইজন বিখ্যাত সুফিসাধক। তাদের কারণে বাংলাদেশের মানুষের মাঝে

> মানবতার বাণী প্রচার হয়েছে। তাছাড়া তাদের অনেক অলৌকিক ক্ষমতাও আছে বলে মানুষ বিশ্বাস করেন। এজন্য বহু মানুষ তাদের মাজার জিয়ারত করেন এবং মনের আশা পূরণে মানত করেন। তাই আমার মনে হয় এমন আধ্যাত্মিক দুই মানুষের কাহিনি বিচারগানের পালায় হওয়ায় তাদের সম্পর্কে মানুষ যেমন জানতে পারবেন, তেমনি তাদের শান্তিপ্রিয় দর্শন মানুষকে আলোকিত করবে বলে মনে করি। (শাহিন, ২০২৩ : সাক্ষাৎকার)

বিচারগানের এই দর্শকের অভিমতই বলে দেয়, লোকনাটক বিচারগানে শাহ জালাল-শাহ পরান পালাটির সংযোজন কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এই পালাটি বিচারগানে নব্যসংযুক্তি ঘটায় কিছু কিছু নতুন নতুন গানও যুক্ত হয়েছে। যদিও বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলসহ সারাদেশেই হযরত শাহ জালাল (র.) ও হযরত শাহ পরান (র.)-কে নিয়ে বহু গান অনেক আগেই রচিত হয়েছে। যে গানগুলোর মধ্যে হযরত শাহ জালাল (র.) ও হযরত শাহ পরান (র.)-এর জীবনের নানা ঘটনা ছন্দে-ছন্দে, সুরে-সুরে গায়েনগণ বর্ণনা করে থাকেন। গানে বর্ণিত কথাগুলোর মধ্যে বেশির ভাগই এই দুই সাধুপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও স্তুতি প্রকাশ করা হয়। এছাড়া তাদের জীবনবৃত্তান্ত ও অলৌকিক ঘটনাও থাকে। বিচারগানের গায়েন পাগল দুলালে ভাষ্য মতে, বাংলাদেশে শাহ জালাল-শাহ পরান পালাটিতে সর্বপ্রথম অভিনয় করেছেন তিনি নিজে (পাগল দুলাল) ও পাগল মনির। এই পালাটি দেখে ধারণা করা যায়, প্রায় ১০-১৫ বছর আগে ভিসিডি ক্যাসেটে ধারণ করা হয়েছে। বর্তমানে ভিসিডি কর্তৃপক্ষ আধুনিক মিডিয়া মাধ্যম ইউটিউবে যুক্ত করেছেন। পালাটিতে গায়েনদ্বয় স্ব স্ব পালার পক্ষে হযরত শাহ জালাল (র.) ও হযরত শাহ পরান (র.)-কে উদ্দেশ্য করে বেশ কিছু গান পরিবেশন করেছেন। পালাটিতে পাগল দুলাল হযরত শাহ পরান (র.)-কে উদ্দেশ্য করে তাঁর রচিত কয়েকটি গান পরিবেশন করেন। তার মধ্যে একটি গানের কথা হচ্ছে-

> আল্লারও পিয়ারা তুমি মায়ের গর্ভে বইয়া,
> জিকিরও করিলো বাবা পরান শাহ আওলিয়া ॥
> গর্ভে আসার আগে একদিন মা-জননী দেখিলো,
> আকাশেরই চন্দ্র-তারা মায়ের কোলে হাসিলো,
> তাই দেখিয়া জুড়াইলো পিতা-মাতার হিয়া ॥ (দুলাল, ২০২০ : পরিবেশনা)[৫৯]

বিচারগানের আসরে পরিবেশিত এই গানটির মতোই শাহ জালাল-শাহ পরান পালায় গানের মাধ্যমে এই দুই সুফিসাধকের জন্মবৃত্তান্ত থেকে শুরু করে তাদের জীবনের নানা ঘটনা বর্ণনা করা হয়। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে তাদের জীবনের নানা রকম অলৌকিক ঘটনাসমূহ। এছাড়া এই পালাটিতে গায়েনগণ একে-অপরকে যে সকল প্রশ্ন করেন তারও বেশির ভাগই তাদের জীবনের নানান অলৌকিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে। পাগল দুলাল ও পাগল মনির এবং কাজল দেওয়ান ও বাউল কালা মিয়া পরিবেশিত শাহ জালাল-শাহ পরান পালায়ও এই বিষয়টি দেখা গেছে। যেহেতু এই চারজন গায়ক পরিবেশিত শাহ জালাল-শাহ পরান পালাটি প্রথম দিকের তাই এই দুইটি পালার

পরিবেশনাকে দৃষ্টান্ত হিসেবে নেয়া যায়। পাগল দুলাল ও পাগল মনিরের পরিবেশিত পালায় একটি প্রশ্ন-উত্তরে দেখা যায়, পাগল মনির শাহ জালাল পক্ষ থেকে পাগল দুলালের নিকট জানতে চান, হযরত শাহ পরান (র.), হযরত শাহ জালাল (র.)-এর কোন কথাটি অমান্য করেছিলো এবং পরবর্তীতে শাহ পরান কিভাবে তা শুধরে দেন। উত্তরে পাগল দুলাল বলেন, হযরত শাহ পরান (র.) জালালি কবুতর ভক্ষণ করে মামা হযরত শাহ জালাল (র.)-এর কথা অমান্য করেন। পরে হযরত শাহ পরান (র.) কবুতরের উচ্ছিষ্টাংশ পাখনা-পশম প্রভৃতি থেকে পুনরায় কবুতর জীবিত করে দেন। এই পালাটিতে গায়েনদ্বয় এ রকম প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে দুই সুফিসাধক হযরত শাহ জালাল (র.) ও হযরত শাহ পরান (র.)-এর জীবনী বর্ণনা করেন। বিচারগানের নতুন পালা হিসেবে শাহ জালাল-শাহ পরান পালাটি নিঃসন্দেহে একটি অনন্য সংযুক্তি। যা বিচারগানের বিষয়-বৈচিত্র্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

চিত্র-২২ : শাহ জালাল-শাহ পরান পালায় পরিবেশনারত অবস্থায় পাগল দুলাল ও পাগল মনির

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিবিধ বিষয়ের পালাসমূহ

নিত্য-নতুন বিভিন্ন বিষয়কে আত্মীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ক্রমান্বয়ে সমৃদ্ধ হচ্ছে লোকনাটক বিচারগান। পরিবেশেনাটিতে তাই নতুন নতুন পালাও সৃষ্টি হয়। বিচারগানের পালাসমূহকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, ইতোমধ্যেই ধর্ম বিশ্লেষণাত্মক পালাসমূহ, আত্মীয় সম্পর্কিত পালাসমূহ, হাস্যরসাত্মক পালাসমূহ ও জীবনবৃত্তান্তমূলক পালাসমূহ সম্পর্কে অভিসন্দর্ভে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে বিবিধ বিষয়ের পালাসমূহ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হবে। মূলত বিচারগানের এসকল পালাকে কোনো সুনির্দিষ্ট বিষয়-বিভাজনে অন্তর্ভূক্ত করা যায়নি, সেই পালাগুলোকে বিবিধ বিষয়ের পালাসমূহের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। সেই পালাগুলো হচ্ছে- মালজোড়া, গ্রাম-শহর, ধনী-গরীব, সংসার-সন্ন্যাস, বেহেস্ত-দোজখ, জিন্দা-মরা, তরিকার ভাই-বোন, হাশরের মাঠ-কারবালার মাঠ, পাগলা-পাগলী, দয়াল-কাঙাল, এজিদি ইসলাম-মুহাম্মদি ইসলাম ও কোরান-বিজ্ঞান পালা। এই পালাগুলো বিচারগানের ত্রিমাত্রিক আসরে সরাসরি দর্শক-সম্মুখে পরিবেশনার চেয়ে অডিও, ভিডিও মাধ্যমেই বেশি পরিবেশতি হয়ে থাকে। এই পালাগুলো বিচারগানের আসনে নতুন হওয়ায় সরাসরি আসরে খুব বেশি জনপ্রিয় হয়নি। এছাড়া বিচারগানের পৃষ্ঠপোষক পির-গোঁসাইরাও এই পালাগুলো মাজার বা মন্দিরে আয়োজন করেছে এমন কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে পালাগুলো অডিও, সিডি, ভিসিডি ও বর্তমানে ইউটিউব মাধ্যমে বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। যাহোক, এ পর্যায়ে বিবিধ বিষয়ের পালাসমূহের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত প্রত্যেকটি পালা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

মালজোড়া পালা

'মালজোড়া' শব্দটি লোকনাটক বিচারগানের সমার্থক শব্দ হিসেবে যেমন ব্যবহৃত হয়, তেমনি 'মালজোড়া' পালা হিসেবেও বেশ পরিচিত। বিচারগান বলতে সাধারণ অর্থে বিচার-বিশ্লেষণ ও তর্ক-বিতর্ককে নির্দেশ করে। ঠিক সে রকম 'মালজোড়া' শব্দ দ্বারাও তর্ক-লড়াই বা বাগযুদ্ধকে বুঝায়। বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে যারা কুস্তি করতেন তাদেরকে 'মাল' বলা হতো। তার মানে কুস্তির লড়াই থেকে 'মাল' শব্দটি 'মালজোড়া' পালায় নেয়া হয়েছে। অন্যদিকে 'জোড়া' বলতে যুগল বা দুই বোঝানো হয়েছে। তার মানে 'মালজোড়া' মানে দুইজনের লড়াই বা দুই গায়েনের লড়াইকেই নির্দেশ করে। সুতরাং এ কথা স্পষ্ট করে বলা যায় যে, নানাবিধ তর্ক-বির্তক, তত্ত্ব-তালিম ও গানের সংমিশ্রণে দুই গায়েন যে গান পরিবেশণ করেন তাই মালজোড়া গান। এখন কথা হচ্ছে, মালজোড়া বা বিচারগান কী তবে একই ধরণের পরিবেশনা? বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও সিলেট অঞ্চলে বিচারগানের মতোই একই অর্থে

মালজোড়া গান পরিবেশিত হওয়ার পাশাপাশি বর্তমানে 'মালজোড়া' বিচারগানের শুধু একটি স্বতন্ত্র পালা হিসেবেও সারা বাংলাদেশে পরিবেশিত হয়। তবে মালজোড়া পালাটি কবে, কোথায় উৎপত্তি হয়েছে, এ নিয়ে বিচারগানের গায়েনদের মতামতে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। অনেকেই মানে করেন সিলেট অঞ্চলে মালজোড়া পালাটি প্রথম শুরু হয়েছে। আবার কোনো কোনো গায়েন মনে করেন বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে মালজোড়া পালার উৎপত্তি। বিশেষ করে নেত্রকোণা জেলার বাউলকবি রশিদ উদ্দিনের নামটি সর্বাগ্রে চলে আসে। কেননা অনেক গবেষক ও বিচারগানের গায়েন মনে করেন মালজোড়া গানের স্রষ্টা বাউলকবি রশিদ উদ্দিন। এ প্রসঙ্গে গবেষক রুবেল সাইদুল আলম বলেন,

> ১৯৩৩ সালের ডিসেম্বর মাসে নেত্রকোনা শহরের গরহাট্টায় প্রথম তত্ত্বভিত্তিক ও তর্কভিত্তিক মালজোড়া গানের যাত্রা শুরু হয়। এর আগে বাউলগান মূলত ওই অঞ্চলে বৈঠকি আসরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বাউলকবি রশিদ উদ্দিনই প্রথম এই তত্ত্বভিত্তিক ও প্রশ্নোত্তরভিত্তিক বাউল গানের সূচনা করেন। এই গানই মালজোড়া গান হিসেবে পরবর্তী সময়ে পরিচিতি পায়। তাই বাউলকবি রশিদ উদ্দিনকে মালজোড়া গানের জনক বা প্রবর্তক বলা হয়। (রুবেল, ২০২২ : পত্রিকা)

অনেক গবেষক অবশ্য মনে করেন ময়মনসিংহ অঞ্চলের বাউলকবি রশিদ উদ্দিনের পাশাপাশি জালাল উদ্দীন খাঁ, চান খাঁ, কবিয়াল বিজয় নারায়ণ আচার্য, বাউল তৈয়ব আলী, মিরাজ আলী, ইদ্রিস মিয়াসহ অনেক বাউল মালজোড়া গানের প্রসারে ভূমিকা রেখেছেন। অন্যদিকে বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে মালজোড়া গানের সুনামধন্য গায়ক হচ্ছেন প্রয়াত বাউলকবি শাহ আব্দুল করিম, কারি আমির উদ্দিন বয়াতি, কবির দেওয়ান, রুহী ঠাকুন, নূর জালাল প্রমুখ। সিলেট অঞ্চলে বিচারগানের মতো মালজোড়া গান পরিবেশিত হলেও স্বতন্ত্র পালা হিসেবে মালজোড়া পালা আসরে উপস্থাপিত হয়ে থাকে। বর্তমানে অবশ্য সারা বাংলাদেশের পালা হিসেবে মালজোড়া পালা ব্যাপক জনপ্রিয়। এমনকি দিনে দিনে এই পালাটির পরিবেশনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মালজোড়া পালা প্রসঙ্গে রাজবাড়ি অঞ্চলের বিচারগানের গায়ক মানিক দেওয়ান বলেন,

> আমি প্রায় সারা বাংলাদেশেই বিচারগান গেয়ে থাকি। সব ধরণের পালা নিয়েই বয়াতিদের সাথে আসরে পাল্লা দেই। বিশেষ করে শরিয়ত-মারফত, জীব-পরম, গুরু-শিষ্য, নবুয়েত-বেলায়েত, বেশি গাইতে হয়। কারণ এই পালাগুলো দেশের মারফতি-তরিকপন্থী মানুষেরা বেশি পছন্দ করেন। তবে বর্তমানে একটা বিষয় লক্ষ্য করেছি অনেক ওরশ মাহফিলে মালজোড়া পালা দিয়ে থাকেন। মানে দিন দিন এই পালার জনপ্রিয়তা বাড়তেছে। এর অন্যতম কারণ হলো মালজোড়া পালাটি গাওয়া অন্য পালার চেয়ে একটু সহজ। কারণ এই পালায় সব রকম আলোচনা করা যায়। কোনো নির্দিষ্ট বিষয় নাই। তাই গায়কের আলোচনা করতে সুবিধা হয়। আরেকটা কথা না বললেই নয়, সেটা হলো আমি যখন ওস্তাদের সাথে পালায় দোহারী করতাম তখন মালজোড়া পালা খুব কম হতো। এখন এই পালা প্রচুর হয়। তবে সিলেট অঞ্চল মানেই যেন মালজোড়া পালা। (মানিক, ২০২৩ : সাক্ষাৎকার)

একটা বিষয় স্পষ্ট সেটি হচ্ছে মালজোড়া পালাটি সামগ্রিক বিষয়বস্তুনির্ভর হওয়ায় গায়েনের জন্য পরিবেশনায় অংশগ্রহণ করা খুব সহজ হয়। এছাড়া সমাজ, ধর্ম ও যাপিত-জীবন সম্পর্কিত সব বিষয় নিয়ে আলোচনা থাকায়

দর্শক-শ্রোতাও খুব সহজেই বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানগর্ভ কথা আস্বাদন করতে পারেন। এতে করে ক্রমশ মালজোড়া পালাটির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মালজোড়া পালাটির পরিবেশনার ব্যাপকতা বৃদ্ধির পেছনে আরেকটি কারণ হচ্ছে বিচারগানের পৃষ্ঠপোষকদের চাহিদা। যেহেতু পির-গোঁসাইরা ভক্তবৃন্দদের ধর্মীয় শিক্ষা দিতে বিচারগানের আয়োজন করে থাকেন, তাই তারা ধর্মের সামগ্রিক আলোচনার প্রয়োজনে মালজোড়া পালাটি বেছে নেন। কেননা বিচারগানের গতানুগতিক পালাগুলো বেছে নিলে সুনির্দিষ্ট দুইটি বিষয়ের আলোচনার মধ্যেই গায়েনগণ সীমাবদ্ধ থাকেন। এজন্য তাদের ইচ্ছে থাকলেও আলোচ্য বিষয়ের বাইরে যেতে পারেন না। দর্শক-শ্রোতাও আলোচনার একঘেয়েমীতে পড়েন। এজন্য বিচারগানের পৃষ্ঠপোষকগণ গায়েনদের মালজোড়া পালা নির্ধারণ করে দেন। এ কথার সত্যতা পাওয়া যায়, বিচারগানের পৃষ্ঠপোষক পির সাহেব আলী চিশতির কথায়। তার ভাষ্য মতে,

> আমি প্রতি বছর আমার গুরুর অনুমতিক্রমে আমার বাড়িতে ওরশ মাহফিল করে থাকি। মানে গুরু-ভক্ত মেলা করি আরকি। বার্ষিক এই মেলাতে অবশ্যই বিচারগান দেই এক-দুই পালা। তার মধ্যে গুরু-শিষ্য পালাই বেশি দেই। তবে কয়েক বছর যাবৎ মালজোড়া পালা দেই। এর একটা কারণও আছে, কারণটা হলো মালজোড়া পালা দিলে গানের আসর বেশ জমে। বয়াতিরা যেমন খুশি প্রশ্ন করতে পারে। পাল্লাটা শক্তপোক্ত হয়। এমনকি এই পালায় গভীরতত্ত্ব আলোচনা করা যায়। সব মিলিয়ে বিচারগানের মালজোড়া বেশ ভালো পালা। (সাহেব, ২০২৩ : সাক্ষাৎকার)

মূল কথা হচ্ছে, মালজোড়া পালায় বিষয়বস্তুর দিক থেকে সমৃদ্ধ একটি পালা। যেহেতু বিষয়বস্তুর কোনো নির্দিষ্টতা নেই, সেহেতু গায়েনগণ সহজেই আসরে যে কোনো বিষয়ের অবতারণা করতে পারেন। ধরা যাক, এক পক্ষের গায়েন বিপক্ষের গায়েনের প্রতি প্রশ্ন করেছেন গুরুর প্রতি ভক্তের কর্তব্য কী কী? এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বিপক্ষের গায়েন চাইলেই এই বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে কথার কূটকৌশলে প্রশ্ন করতে পারেন, কৃষ্ণের হাতের বাঁশিতে কয়টি ছিদ্র রয়েছে এবং প্রতি ছিদ্রের মানে বা তাৎপর্য কী? কিংবা চাইলেই প্রশ্ন করতে পারেন, নবি মুহাম্মদ (স.) যে বোরাকে মেরাজে গিয়েছিলেন, সেই বোরাকের চেহারা কেমন ছিলো? অর্থাৎ প্রাসঙ্গিকতা থাকুক বা না থাকুক তাতে গায়েনের বা পালার কোনো সমস্যা হয় না। মূল বিষয় হচ্ছে এক গায়েন কর্তৃক আরেক গায়েনকে প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করা। এবং সেই প্রশ্ন বিচারগানের সমগ্র পালার যে কোনো একটি আলোচিত হলেই চলবে। তবে অঞ্চলভেদে প্রশ্নের চটুলতা ও গভীরতার তারতম্য ঘটে থাকে। ঢাকা, মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, রাজবাড়ি, টাঙ্গাইল, মুন্সিগঞ্জ, নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ অঞ্চলে মালজোড়া পালার প্রশ্নের গভীরতা বেশি থাকে। অন্যদিকে বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার জেলার বিচারগানের মালজোড়া পালার প্রশ্নগুলো হালকা মানের হয়ে থাকে। এছাড়া এই অঞ্চলে বর্তমানে আসরে মালজোড়া গান বা পালা ছাপিয়ে শুধু নাচ-গান হয়ে থাকে। অর্থাৎ বিচারগানের যে ভাবগাম্ভীর্য লড়াই ও ধর্মীয় তত্ত্বের গভীর আলোচনা তা দিনে দিনে উঠে যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে অনেক গায়েনই উষ্মা প্রকাশ করেছেন। এজন্য অবশ্য তারা কিছু বাউলদেরকে দায়ী করে থাকেন। যারা তাদের দৃষ্টিতে উচ্ছৃঙ্খল ও

অর্থলিপ্সু। তবে সেটা যাই হোক বিচারগানের মালজোড়া পালাটি নিঃসন্দেহে বিষয়বস্তুর দিক থেকে যেমন সমৃদ্ধ, তেমনি পরিবেশনাটিতে সব গায়েনই অংশগ্রহণ করতে পারেন বিধায় ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে।

গ্রাম-শহর পালা

মানবসভ্যতার ইতিহাসে মানুষের বসবাসের জন্য গ্রাম ও শহর আবাসিকস্থল হিসেবে বিবেচিত হয়। এই দুটি স্থানে মানুষের বসবাসের সাথে সাথে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার ভিত্তিতে দুটি স্থানই একই সঙ্গে নন্দিত ও নিন্দিত হয়ে থাকে। দীর্ঘ ইতিহাসের ফলশ্রুতিতে এই দুই স্থানকে ঘিরে ঐতিহ্য, নিয়ম, নীতি, রীতি, প্রথা, সংস্কৃতি, খাদ্যাভাস, পোষাক, সমাজ, ধর্ম ও অর্থ সংক্রান্ত বিষয়াদি ছাড়াও বিবিধ বিষয়ের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য তৈরি হয়েছে। সেই সঙ্গে প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে গ্রাম ও শহর নিয়ে মানুষের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়েছে। গ্রামের মানুষজন গ্রাম সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করেন, আর যারা গ্রামে বসবাস করেন না অর্থাৎ শহরের মানুষ একই রকম ধারণা পোষণ নাও করতে পারেন। একই কথা শহরের বেলায়ও প্রযোজ্য। পৃথিবীর সব মানুষ শহরকে ভালো নাও বাসতে পারেন। পৃথিবীর বহু মানুষ যেমন গ্রাম ছেড়ে শহরে আশ্রয় নেয়, তেমনি বহু মানুষ শহর ছেড়ে গ্রামের টানে কৃত্রিমতা বির্বজিত গ্রামে ফিরে আসেন। গ্রাম ও শহরের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কারণেই সভ্যতার শুরু থেকেই দুই স্থানের বাসিন্দাদের মধ্যে নিজস্ব আবাসস্থল নিয়ে প্রেমের প্রগাঢ়তা দেখা যায়। এমনকি কখনো কখনো নিজস্ব আবাসস্থলের প্রতি অনীহা ও অসন্তুষ্টিও দেখা যায়। বাংলা সাহিত্যসহ সারাবিশ্বের সাহিত্যিকেরা গ্রাম ও শহর নিয়ে অজস্র সাহিত্য রচনা করেছেন। যেখানে গ্রাম ও শহরের নানাবিধ দৃশ্য চিত্রায়িত হয়েছে। বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছে গ্রাম ও শহরের নানবিধ শৈল্পিক উপাদান। বহু কবি-লেখকেরা তাদের সৃষ্টিশীল কলমে গ্রাম ও শহরের ছবি এঁকেছেন। যে ছবিতে গ্রাম ও শহরের মানুষের আশা-আকাঙ্খা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, ভালোবাসা-বিরহ, দুঃখ-কষ্টসহ নানা রকম অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে। তবে মানবিক অনুভূতির বাইরেও গ্রামীণ ও শহুরে পরিবেশের বহু দৃশ্য সাহিত্যে উঠে এসেছে। এসকল সাহিত্যে যে শুধু গ্রাম ও শহরের প্রশংসা চিত্রিত হয়েছে এমনটি নয়। এ সকল সাহিত্যে গ্রাম ও শহরের প্রাচুর্যময় বিষয়াদির পাশাপাশি সমস্যা-সংকট নিয়েও কথা হয়েছে। কখনো কখনো গ্রামের অশিক্ষা-কুসংস্কারের মুক্তি চাওয়া হয়েছে। আবার শহরের আবেগহীন-আন্তরিকতাহীন সমাজের পরিবর্তন চাওয়া হয়েছে। গ্রাম ও শহরের এ রকম চিত্র বাংলা সাহিত্যের বহু খ্যাতিমান সাহিত্যিক তাদের সাহিত্যকর্মে চিত্রায়িত করেছেন। সাহিত্যে নোবেলজয়ী একমাত্র বাংলা সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর বহু সাহিত্যকর্মে গ্রাম ও শহরের প্রসঙ্গ নিয়ে লিখেছেন। গ্রাম নিয়ে তাঁর বিখ্যাত একটি গান রয়েছে, সেটি হচ্ছে-

‘গ্রামছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ   আমার মন ভুলায় রে।

ওরে   কার পানে মন হাত বাড়িয়ে   লুটিয়ে যায় ধুলায় রে ॥' (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৭১ : ৫৪৯)[৬০]

এইগানে কবি গ্রামের প্রতি তাঁর মমত্ববোধকে নিবদ্ধ করেছেন। গানের কথা ও সুরের ব্যঞ্জনায় গ্রাম ও শহরের মানুষ নির্বিশেষে পুলকিত হন, গভীর ভালোবাসায় গ্রামের প্রতি টান অনুভব করেন। এই গানটির মতো বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামও তাঁর গানে গ্রামের ছবি এঁকেছেন। তাঁর একটি গানে লিখেছেন-

এ কি অপরূপ রূপে মা তোমায় হেরিনু পল্লী-জননী।

ফুলে ও ফসলে কাদা মাটি জলে ঝলমল করে লাবনি ॥

রৌদ্রতপ্ত বৈশাখে তুমি চাতকের সাথে চাহ জল,

আম কাঁঠালের মধুর গন্ধে জ্যৈষ্ঠে মাতাও তরুতল।

ঝঞ্ঝার সাথে প্রান্তরে মাঠে কভু খেল ল'য়ে অশনি ॥ (রশিদুন্, ২০১৬ : ৬৮৬)[৬১]

বাংলা সাহিত্যের দুই মহান সাহিত্যিকই গ্রাম নিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন। এ রকম শহর নিয়েও তাদের সাহিত্যকর্ম রয়েছে। এখন কথা হচ্ছে গ্রাম ও শহর নিয়ে মূলধারার বা নাগরিক সাহিত্যিকরা যেমন সৃষ্টিশীল কাজ করেছেন, ঠিক তেমনি লোককবিরাও গ্রাম ও শহরের বিষয়বস্তু নিয়ে নানা রকম সাহিত্য রচনা করে লোকসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। বিশেষ করে লোকসংস্কৃতির সমৃদ্ধ শাখা লোকনাটক বিচারগানের গ্রাম-শহর পালাটি লোককবিদের অনন্য সৃষ্টি। বিচারাগানের গ্রাম-শহর পালাটি বিচারগানের আসরে খুব প্রচলিত না হলেও এই পালাটি গায়েনমহলে পরিচিত। এমনকি পালাটির গভীরতত্ত্বনির্ভর না হওয়ায় খুব সহজেই গায়েনগণ যেমন পরিবেশনায় অংশগ্রহণ করতে পারেন, তেমনি সাধারণ দর্শক-শ্রোতাও সহজেই পালার বিষয়বস্তু বুঝতে পারেন। এতে দর্শক-শ্রোতা পালার সাথে আন্তরিক ও দৃঢ়ভাবে একাত্ম হতে পারেন। তবে বিচারগান যেহেতু ধর্মতত্ত্বনির্ভর সেহেতু বিচারগানের মূল পরিবেশনাস্থল মাজার-মন্দিরের আসরে পরিবেশিত হয় না। বর্তমানে আধুনিক প্রচারমাধ্যমগুলোতে গায়েনগণ এই পালাটি করে থাকেন। এই পালায় অংশগ্রহণকারী গায়েন সোনিয়া সরকার বলেন,

> বিচারগানের একজন গায়িকা হিসেবে সব ধরণের পালাই করে থাকি। আমরা মূলত বায়নাকারীদের আদেশ-নির্দেশ মেনে চলি। বায়নাকর্তৃপক্ষ যে পালা নির্ধারণ করে দেন, আসরে সেই পালা নিয়ে পাল্লা করে থাকি। আসলে আমরা দর্শক-শ্রোতাদের মনের চাহিদা মতো গান গাই। এ জন্য বিচারগানের যে পালাগুলো বেশি চলে সেগুলোই বেশি গাওয়া হয়। গ্রাম-শহর পালাটি একেবারে নতুন পালা, তাই আসরে তেমন গাওয়া হয় না বললেই চলে। আমি সর্বপ্রথম গায়ক জালাল সরকার সাধুর সাথে গ্রাম-শহর পালায় গান গেয়েছি। (সোনিয়া, ২০২৩ : সাক্ষাৎকার)

সোনিয়া সরকারের ভাষ্য মতে, গ্রাম-শহর পালাটি বিচারগানের আসরে তেমন জনপ্রিয় হয়নি। গায়েনগণ কালেভদ্রে পালাটি আসরে পরিবেশন করে থাকেন। কোনো কোনো গায়েন অবশ্য গ্রাম-শহর পালার অস্তিত্বকেই স্বীকার করেন না। তারা মনে করেন এই পালা কোনো দর্শক-সম্মুখে পরিবেশিত হয়নি, কেবল বর্তমানে দুয়েকজন শিল্পী প্রচারের

সুবিধার্থে ইউটিউবে গ্রাম-শহর নামে পালা করে দর্শকদর্শন (ভিউ) বাড়িয়ে থাকেন। তবে গ্রাম-শহর পালা সম্পর্কে বিচারগানের দীর্ঘদিনের পৃষ্ঠপোষক পান্নু কাদরি বলেন,

> বিচারাগানের বহু পালা আছে, আমি নিজেও সব পালার নাম জানি না। আমরা তরিকভক্ত মানুষ, তাই আমাদের সাথে যায় এমন পালাগুলোই ওরশে দেই আরকি। গ্রাম-শহর টাইপের পালা আমরা দেই না। এই সব পালার মধ্যে কোনো ধর্মীয় কথা নাই, ভাসা-ভাসা কথায় আমাদের মন ভরে না। তবে যাদের ভালো লাগে তারা দিতে পারেন। (পান্নু, ২০২৩ : সাক্ষাৎকার)

উপরি উক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এটা স্পষ্ট যে, গ্রাম-শহর পালাটি বিচারগানের আসরে খুব বেশি প্রচলিত নয়, কিংবা একেবারেই নতুন একটি পালা। তবে অন্যান্য পালার মতোই ধীরে ধীরে পালাটি সমৃদ্ধ হবে বলে প্রত্যাশা করা যায়। কারণ বিচারগানের অনেক পালাই এক সময় তেমন জনপ্রিয় ছিলো না কিন্তু বর্তমানে বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। বিচারগানের উৎপত্তির সময়ে হাতেগোনা কয়েকটি পালা হতো কিন্তু বর্তমানে ৬০টির অধিক পালা সারাদেশে পরিবেশিত হয়ে থাকে। আর গ্রাম-শহর পালার বিষয়স্তু নিয়ে তো নাগরিককবি ও লোককবিদের অনেকেই গান রচনা করেছেন। বিশেষ করে বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের প্রয়াত প্রখ্যাত বিচারগান তথা মালজোড়া গানের গায়ক শাহ আবদুল করিমের গ্রাম সম্পর্কিত একটি বিখ্যাত গান রয়েছে। গানটি হচ্ছে-

> আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম
> গ্রামের নওজোয়ান হিন্দু-মুসলমান
> মিলিয়া বাউলাগান ঘাটুগান গাইতাম ॥
> বর্ষা যখন হইত গাজীর গাইন আইত
> রঙ্গে-ঢঙ্গে গাইত আনন্দ পাইতাম
> বাউলাগান ঘাটুগান আনন্দের তুফান
> গাইয়া সারিগান নাও দৌড়াইতাম ॥ (শুভেন্দু, ২০০৯ : ১৬৩)[৬২]

শাহ আবদুল করিমের এই গানটির বিষয়বস্তু গ্রাম-শহর পালা সম্পর্কিত হওয়ায় গ্রামপক্ষের গায়েন আসরে গানটি নির্দ্বিধায় গাইতে পারবেন। যাতে গ্রাম-শহর পালার ক্রমবিকাশের চিহ্ন পাওয়া যায়। এছাড়া ২০২০ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গ্রামীণ উন্নয়নের প্রচার ও প্রসারে বিচারগানের গ্রাম-শহর পালার মাধ্যমে প্রচার চালিয়েছে বলে জানা গেছে। এ রকম একটি সরকারি প্রকল্পের প্রচারণায় বিচারগানের গায়েন জালাল সরকার সাধু ও সোনিয়া সরকার অংশগ্রহণ করেছেন। সমাজের নানাবিধ প্রয়োজনে বিচারগানের নতুন নতুন পালা উদ্ভাবিত হচ্ছে ও বিকশিত হচ্ছে। আবার অনেক পালার দর্শক চাহিদা না থাকায় দিনে দিনে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। গ্রাম-শহর পালাটি খুবই নিকটতম সময়ে সৃষ্টি হয়েছে, সুতরাং আশা করা যায় এই পালার বিষয়বস্তুর নতুনত্বে বিচারগানের

আসরে দীর্ঘদিন টিকে থাকবে। বিচারগানের প্রতিটি পালা-ই বিষয়-বৈচিত্র্যের প্রাচুর্যময়তার ভিত্তিতে আসরে পরিবেশিত হয়, নয়তো কালের স্রোতে হারিয়ে যায়।

ধনী-গরীব পালা

ধনী ও গরীবের মধ্যকার যে সম্পর্ক সেটি মূলত ধন-সম্পদ দ্বারা নিরূপিত হয়ে থাকে। পৃথিবীতে যখন থেকে মানুষ ধন-সম্পদকে মালিকাধীন করেছে, তখন থেকেই ধনী ও গরীবের মধ্যে বৈরিতা শুরু হয়েছে। ধনী বলতে আমরা বুঝি যে ব্যক্তি বা সম্প্রদায় অর্থ-সম্পদের মালিক। অন্যদিকে গরীব বলতে যিনি বা যারা ধন-সম্পদের দৈন্যতায় ভুগেন। লোকনাটক বিচারগান যেহেতু সব সময় বিপরীতমুখী দুটি বিষয় নিয়ে গায়েনদ্বয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়, সেহেতু ধনী-গরীব বিষয় দুটি খুব সহজেই পালায় সংযুক্ত হয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় সমগ্র অঞ্চলেই ধনী-গরীব পালাটি পরিচিত হলেও বিচারগানের ধর্ম বিশ্লেষণাত্মক পালাসমূহের মতো জনপ্রিয় হয়। এছাড়া এই পালাটিতে বিচারগানের সব গায়েন অংশগ্রহণ করেন না। কারণ কোনো কোনো গায়েন এ রকম পালাকে হালকা পালা হিসেবে গন্য করেন। আবার একথাও সত্য অনেক সুনামধন্য বিচারগানের গায়েন ধনী-গরীব পালার পরিবেশনায় অংশগ্রহণ করেছেন এবং বর্তমানেও করে থাকেন। ধনী-গরীব পালায় অংশগ্রহণ করে প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হওয়ার জন্য কতগুলো সাধারণ ও নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে এক গায়েন অন্য গায়েনকে প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করেন। ধনী ও গরীবপক্ষের গায়েন একে-অপরকে যে সকল প্রশ্ন ও অভিযোগ করেন, সেগুলো হচ্ছে-

ধনীপক্ষ কর্তৃক গরীবপক্ষের প্রতি প্রশ্ন ও অভিযোগ :

ক. পৃথিবীতে গরীব কেন গরীব হয়?

খ. গরীব মানুষেরা পৃথিবীর আবর্জনা কারণ তারা অলস এবং ধনীর দানে বেঁচে থাকে।

গ. গরীবকে তার স্বভাবের কারণে সৃষ্টিকর্তা গরীব বানিয়েছেন।

ঘ. পৃথিবীতে বহু গরীব আছেন যারা শত কষ্টে থেকেও দম্ভ-অহংকারে জীবন কাটায়, এজন্য তাদের প্রতি সৃষ্টিকর্তার অভিশাপ বর্ষিত হয়।

ঙ. গরীবরা ঠক-প্রতারক কেননা বহু গরীব আছেন যারা কিনা সুস্থ-সবল হওয়া সত্ত্বেও চুরি-বাটপারী এমনকি পঙ্গু সেজে ভিক্ষা করেন।

চ. গরীবরা ধনীর অন্নে বেঁচে থাকে আবার ধনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন।

ছ. এ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অভিশাপ হচ্ছে গরীবরা কারণ এরা পৃথিবী থেকে শুধু গ্রহণ করেন কিন্তু কিছু দেয় না।

জ. গরীবরা ধর্ম-কর্ম কিছু করে না, তারা কেবল সন্তান জন্ম দেয়, এজন্যই তাদের কপালে এতো দুঃখ দেখা যায়।

ঝ. গরীবরা ধনীদের দয়া ছাড়া কখনোই টিকে থাকতে পারবে না। তবুও গরীবরা ধনীদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে না।

ঞ. গরীবদের স্বভাব খারাপ এবং অকৃতজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও সৃষ্টিকর্তা এদের খাইয়ে-পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখেন।

গরীবপক্ষ কর্তৃক ধনীপক্ষের প্রতি প্রশ্ন ও অভিযোগ :

ক. সৃষ্টিকর্তা যদি দয়ালু ও সাম্যবাদী হন তাহলে কোন কারণে ধনীকে ধনী করে পৃথিবীতে পাঠালেন। আর সৃষ্টিকর্তাই যদি ধনীকে ধনী বানান তাহলে ধনীর কী কৃতিত্ব আছে।

খ. কোন কর্মের ফলে ধনীরা পৃথিবীতে ধনী হয়েছেন।

গ. পৃথিবীতে প্রায় সকল ধনীই চোর ও নিষ্ঠুর। এরা অন্যের ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েই ধনী হয়েছেন এবং হচ্ছেন।

ঘ. ধনীর ঘরে যে ধন-সম্পদ তার মূল অংশীদার পৃথিবীর সকল গরীব।

ঙ. ধনীরা দাম্ভিক হন তাই অনেক ধনীরই অধপতন ঘটে।

চ. ধনীদের হাতের মুঠোয় ধন-সম্পদ আছে বটে কিন্তু তারা মোটেও সুখী নয়।

ছ. ধনীদের নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারের কারণে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত শুধু হাহাকার।

জ. ধনীরা পৃথিবীতে সুখে থাকলেও পরকালে এদের প্রায় সবাই শাস্তির সম্মুখীন হবেন।

ঝ. পৃথিবীতে তখনই শান্তি আসবে যখন কোনো ধনী থাকবে না।

ঞ. ধনীদের কারণেই পৃথিবীতে মানুষ গরীব হয়।

উপরি উক্ত প্রশ্ন ও অভিযোগের তীরে ধনী ও গরীবপক্ষের গায়েনগণ আসরে একজন আরেকজনকে আঘাত-পাল্টা আঘাত করে থাকেন। মূল বিষয় হচ্ছে মানুষের যাপিত-জীবনের প্রতিটি বিষয় যেহেতু ধন-সম্পদকে ঘিরে সংগঠিত হয়, তাই ধনী-গরীবের দ্বন্দ্বও চিরন্তন ও অমিমাংসিত। এই চিত্রই চিত্রায়িত হয় বিচারগানের এই ব্যতিক্রমধর্মী পালায়। যেহেতু ধনী-গরীব সম্পর্কিত বিষয়াদি বিশদ ও বিস্তারিত সেহেতু খুব সহজেই গায়েনগণ একে-অপরকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন। আর এই জীবনঘেষা পালাটিও সাধারণ মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। যে কথাটি সারাজীবন গরীব মানুষের মনে ঘুরপাক খায় কিন্তু বলতে পারেন না, সেই কথাটিই তার পছন্দের পালার পক্ষের গায়েন আসরে বলেন। আর এজন্য দর্শক-শ্রোতা সাবলীল ও আন্তরিকভাবে পালার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান। বিচারগানের নিয়মিত দর্শক শাহিন টিটু এ প্রসঙ্গে বলেন,

> আমি বিচারগানের অনেক পালাই দেখেছি। তবে ধনী-গরীব পালা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। যদিও এই পালাটি আমি সরাসরি দেখি নাই। মানে ইউটিউবে দেখেছি। অনেক আগের একটি পালা। এক কথায় অসাধারণ যেভাবে গায়করা ধনী-গরীব নিয়ে লড়াই করেন, তাতে অনেক কিছু শেখার আছে। সত্যি বলতে কী ধনী-গরীব পালার গায়কদের কথা আমার নিজের মনের কথাই মনে হয়। (শাহিন, ২০২৩ : সাক্ষাৎকার)

অর্থাৎ ধনী-গরীব পালার জীবনমুখী বিষয়বস্তুর কারণেই দর্শক-শ্রোতার নিকট জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এছাড়া অন্যান্য পালা বিশেষ করে ধর্ম বিশ্লেষণাত্মক পালাসমূহ সকল ধর্মের মানুষের নিকট সমান প্রিয় নাও হতে পারে। কারণ পালা যদি ইসলামধর্ম সম্পর্কিত হয় সে পালা সব সময় হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না এটাই স্বাভাবিক। আবার হিন্দুধর্ম সম্পর্কিত পালাও সব সময় ইসলামধর্মের সম্প্রদায়ের মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। কারণ প্রত্যেক মানুষই তাদের নিজস্ব বিশ্বাস ও জীবনঘেষা বিষয় পছন্দ করেন। আর এজন্য ধনী-গরীব পালাটি সর্বধর্মের মানুষের নিকট সমান জনপ্রিয়। কেননা ধন-সম্পদে ধর্ম চিনে না, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ধর্ম বুঝে না। পৃথিবীতে মানুষে মানুষে যদি বিভেদ করার মতো কোনো বিষয় থাকে, সেটা হচ্ছে ধনী ও গরীব। এই দুইটি ভাগই কাল থেকে কালান্তরে আবর্তিত হচ্ছে। আর এই বিভাজনকে নির্দেশ করেই বহু বিচারগানের গায়ক গান লিখেছেন, যেখানে বেদনার বাঁশি করুণ সুরে বেজে উঠেছে। বিচারগানের কিংবদন্তি গায়ক খালেক দেওয়ানের একটি গানে গরীব-দুঃখী মানুষের বেদনা এঁকেছেন-

বিধি যার কপালে যা লেখেছেরে
দঃখ কানলে যায় না
সম দুঃখী থাকলে পরে বুঝে সে বেদনা ॥
সুখী যায় রে দুঃখীর বাড়ি
দুঃখী করে ফরাস বিছানা
দুঃখী গেলে সুখীর বাড়ি
সুখী মুখ দিয়া জিগায় না ॥ (হাসানুল, ২০০০ : ২২)[৬৩]

এই গানটিতে অত্যন্ত নিপুনভাবে গরীবের দুঃখ-দুর্দশা প্রকাশ হয়েছে। গরীবপক্ষের গায়েন তার পালার পক্ষে গানটি গাইতে পারেন। এছাড়া গানটিতে বিধাতার সৃষ্টির বৈচিত্র্যের বিষয়েও বলা হয়েছে, বিধাতার সৃষ্টি রহস্য যেন মানুষের বোঝার অসাধ্য সে কথাই বলেছেন গীতিকার খালেক দেওয়ান। গানের কথার সারমর্ম হচ্ছে, সুখ-দুঃখ বা ধনী ও গরীবের দুটি পক্ষের বিভাজন শ্বাশতকাল যাবৎ চলছে। বিচারগানের এই পালা কেন্দ্রিক আবেগতাড়িত গান ও কথা যেমন গায়েনগণ পরিবেশন করেন, ঠিক তেমনি বিপক্ষের পালার তীর্যক কথা বলতেও দ্বিধা করেন না। এ রকম একটি চমৎকার উদাহরণ পাওয়া যায় অডিও-ফিতা যুগে ঢাকার নবাবগঞ্জের পরশ আলী দেওয়ান ও মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া থানার ছোট আবুল সরকার (মহারাজ)-এর একটি ধনী-গরীব পালায়, যেখানে ধনীপক্ষের গায়েন পরশ আলী দেওয়ান বলেন,

> আজকে আমি অভিনয় পেয়েছি ধনী, তুমি গরীব। চিরদিন, অনন্তকাল তোমার ধনীলোকের পায়ের দাসত্ব কইর‍্যা চলতে হবে। ক্যান, আমি চেষ্টা করবো আমার পালাটা ফুটাই তোলার জন্য। এইটা অহংকার না, এইটা আদি হইতে আসছে। (পরশ, ২০২০ : পরিবেশনা)

অর্থাৎ ধনী-গরীব পালায় গায়েনগণ অভিনয়ের খাতিরে একে-অপরকে কড়া কথা বলতে দ্বিধা করেন না। যেহেতু বিচারগানের পরিবেশনায় কুশীলবদের অন্যতম প্রধানতম উদ্দেশ্য হচ্ছে বিপক্ষের গায়েনকে গানে-ছন্দে-কথায় পরাজিত করা। ধনী-গরীব পালায়ও এর ব্যতিক্রম হয় না। সব মিলিয়ে সমাজের চির বাস্তব বিষয়কে কেন্দ্র করে পালাটির পরিবেশনা যেমন দর্শক-শ্রোতার মনে চিন্তা ও বিনোদন যোগায়, ঠিক তেমনি বিচারগানের বিষয়েরও বৈচিত্র্যময়তা দান করেছে।

সংসার-সন্ন্যাস পালা

বহু বিষয়ের সম্মিলিত লোকপরিবেশনা বিচারগান সমৃদ্ধ একটি লোকনাট্যাঙ্গিক, এটি যে কোনো লোকগবেষক নির্দ্বিধায় মেনে নিবেন। কারণ লোকসংস্কৃতির প্রায় সমগ্র বিষয়াদি বিচারগানের আসরে আলোচনা করা সম্ভব। তা বিচারগানের পালাগুলো দেখলেই বোঝা যায়, কত রকমের, কত আঙ্গিকের, কত লোকউপাদানে ভরপুর এই পরিবেশনা। বিচারগানের আসরে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় নিয়ে গায়েনগণ প্রতিযোগিতা করেন মূলত দর্শকদের একঘেয়েমী কাটানোর জন্য। আর এজন্য প্রতিনিয়ত বিচারগানের গায়েনগণ নতুন নতুন পালার উদ্ভাবন করতে সচেষ্ট থাকেন। এ রকমই ভিন্ন রকমের একটি উদ্ভাবন হচ্ছে সংসার-সন্ন্যাস পালা। শিরোনামের মাধ্যমেই বোঝা যাচ্ছে, বিচারগানের অন্যান্য পালার চেয়ে এটি ব্যতিক্রমধর্মী একটি পালা। পালাটি বর্তমানে বিচারগানের ত্রিমাত্রিক আসরে খুব বেশি প্রচলিত না হলেও অডিও-ফিতা ক্যাসেট যুগে বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে সংসার-সন্ন্যাস পালার ক্যাসেট বাজতো। এমনকি বর্তমানেও অনেক দর্শক-শ্রোতার নিকট এই পালাটির আবেদন রয়েছে। বিচারগানের অন্যান্য পালার মতোই সংসার-সন্ন্যাস পালাটি গায়েনগণ দুটি পক্ষ নিয়ে অভিনয় করেন। এক গায়েন সংসারের ভূমিকায় অভিনয় করলে স্বাভাবিকভাবেই আরেক গায়েন সন্ন্যাসের ভূমিকায় অভিনয় করেন। পালাটিতে সংসার বলতে যেটা বুঝানো হয়েছে, সেটি হচ্ছে- মানবসমাজে বসবাসের জন্য যত রকম সম্পর্ক ও প্রতিষ্ঠান রয়েছে তার সবই সংসারের অন্তর্ভূক্ত। সংসারে ব্যক্তির জীবন-যাপনের জন্য পরিবার, পরিবারের সকল সদস্য বাবা, মা, ভাই, বোন, পুত্র, কন্যা, দাদা, দাদি, নানা, নানি, নাতি, নাতিন, স্বামী, স্ত্রীসহ সব ধরণের জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্কের প্রতি কর্তব্য পালন করতে হয়। তাছাড়া সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় দায়-দায়িত্ব তো আছেই। মূল কথা হচ্ছে, একজন মানুষের যাপিত-জীবনের প্রতিটি উপাদানই সংসারের উপাদান। আর কোনো ব্যক্তি যখন সংসারে অবস্থান করে

তখন তাকে সংসারী বলা হয়। সে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালান করুক বা না করুক সে সংসারের সদস্য। অর্থাৎ কোনো মানুষ সংসারে থাকলেই সংসারের সকল উপাদানিক জালে আবদ্ধ। আর কেউ যদি সংসারের এই বাঁধন থেকে মুক্ত থাকেন তাকে সন্ন্যাস বা সন্নাসী বলা যায়। আরো বিস্তারিতভাবে বলা যায়, কোনো মানুষ যখন সংসারের সমস্ত কিছুর মায়া ত্যাগ করে লোকালয়ের বাইরে একান্তই নিজের মতো করে জীবন-যাপন করে তখন তাকে সন্ন্যাস জীবন বলে। যেখানে ব্যক্তির কোনো চাওয়া-পাওয়া, ভোগ-বিলাস মানবিক সম্পর্কের টানাপোড়েন নেই, নেই কোনো জাগতিক লোভ, ব্যক্তি শুধু নিজেকে বা স্রষ্টাকে খুঁজে বেড়ায় সেই জীবনকে সন্ন্যাস বলা যায়। বিচারগানের আসরেও গায়েনগণ সন্ন্যাস বলতে এই বিষয়গুলোকেই নির্দেশ করে থাকেন। এমনকি বিচারগানের অন্যতম দর্শনই হচ্ছে মানুষ জাগতিক মোহ-মায়া ত্যাগ করে আত্মসন্ধানের মাধ্যমে স্রষ্টা প্রাপ্তির সাধনা করা। এখানে কেউ গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হওয়ার শিক্ষা নেয়, আবার কেউ গৃহে থেকেই সন্ন্যাসী মানসিকতাকে ধারণ করে নিরন্তর সাধনা করে থাকেন। বিচারগানের আসরে সংসার-সন্ন্যাস পালায় মূলত এই দ্বিপাক্ষিক বিষয় নিয়েই প্রতিযোগিতা করা হয়। সংসার-সন্ন্যাস পালায় গায়েনগণ যখন অভিনয় করেন তখন তারা নিজ নিজ পালার পক্ষে ধর্মীয়, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, পৌরাণিকসহ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন করেন। যিনি সংসারপক্ষে গান করেন তিনি সংসারের পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে সংসারে বসবাসের গুরুত্ব, সংসারে বসবাস না করলে মানুষের জীবনের সমস্যাসমূহ, সংসার থেকে মানুষের জন্ম সুতরাং সংসারেই মানুষের থাকা উচিত, সংসারে না থাকলে সংসার থেকে গৃহীত সুবিধাদি ফেরত দেয়া উচিত প্রভৃতি বিষয় উপস্থাপন করেন। সেই সঙ্গে সংসারপক্ষের গায়েন সন্ন্যাসপক্ষের গায়েনকে তার পালা নিয়ে 'খোঁচা' দিতে দ্বিধা বোধ করেন না। সন্ন্যাস মানে হচ্ছে পরের খেয়ে আগাছার জীবন-যাপন করা, নোংরা-ময়লা পরিবেশে মানবেতর জীবন অতিবাহিত করা, উপরে উপরে বাড়ি-ঘর ত্যাগ করলেও ভেতরে ভেতরে অনেক সন্ন্যাসীই ভণ্ড-কপট-লোভী এ রকম বহু যুক্তি দিয়ে 'খোঁচা' দিয়ে থাকেন।

অন্যদিকে যে গায়েন সন্ন্যাসের পক্ষে অভিনয় করেন তিনিও কম বলেন না, যে সমস্ত যুক্তি দেন, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে- যারা সংসারী তারা জাগতিক লোভে পড়ে যা অর্জন করেন তা আসলে শেষ পর্যন্ত দুঃখ-কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায় অর্থাৎ সংসারে সুখ নেই, প্রকৃত সুখ সন্ন্যাস জীবন। পৃথিবীতে প্রকৃত মানুষ হতে গেলে তথা পরম ঈশ্বর পেতে চাইলে সন্ন্যাসের পথ উত্তম পথ। পৃথিবীতে সন্ন্যাসীরাই মহামানব প্রভৃতি। নিজ নিজ পালার পক্ষে যক্তি দিতে গিয়ে গায়েনগণ নানাবিধ উপমা, উদাহরণের অবতারণা করেন। তার মধ্যে বৌদ্ধধর্মের গৌতম বুদ্ধের গৃহত্যাগ ও সন্ন্যাসজীবন, নবি মুহাম্মদ (স.)-এর গৃহত্যাগ ও হেরাগুহায় পনের বছরের অধিক সময় ধ্যান, শ্রী কৃষ্ণের বাঁশরী হাতে রাখালিয়া জীবন ও বৃন্দাবনের লীলা, শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারীর সন্ন্যাস জীবন, ভবা পাগলার সন্ন্যাসজীবন, ফকির লালন সাঁইয়ের বাউলজীবন, সীতার বনবাসের জীবনসহ প্রমুখ বাউল-সুফিদের বৈরাগ্যজীবনের দৃষ্টান্ত ও উদাহরণ

অন্যতম। বিচারগানের গায়েন পরশ আলী দেওয়ান ও ছোট আবুল সরকারের সংসার-সন্ন্যাস পালার এক পরিবেশনায় সন্ন্যাসের পক্ষে ছোট আবুল সরকার দুইটি উদারহণের উপস্থাপন করেন। তার একটি হচ্ছে হযরত ওয়ায়েস করনি (র.) সারাজীবন বিয়ে-শাদি করেননি, সংসারের কোনো কিছুতে জড়াননি, শুধু মায়ের খেদমত করেছেন এবং সৃষ্টিকর্তাকে পাওয়ার সাধনা করেছেন। ছোট আবুল সরকারের আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে 'আসহাবে সুফ্‌ফা', যারা নবি মুহাম্মদ (স.)-এর সাহাবা ছিলেন, তাদের কাজ ছিলো মসজিদে নববিতে বসে শুধু আল্লাহর ইবাদত করা। অর্থাৎ এই দুইটি উদাহরণের মাধ্যমে ছোট আবুল সরকার তার পালার পক্ষে জোড়ালো যুক্তি উপস্থাপন করেন এবং বিপক্ষের বিষয়কে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন। মানুষের যাপিত-জীবনকে বিশ্লেষণ করলে দুটি বিষয়ই পাওয়া যায়, তার একটি হচ্ছে সংসারের নানা রকম সুবিধা-অসুবিধা আরেকটি হচ্ছে মানুষের মনের মধ্যে গৃহত্যাগের বাসনা। মানুষ সুপ্রাচীনকাল থেকেই অজানাসুখের আশায় গৃহত্যাগী হয়েছেন। আর এই দুইটি বিষয় নিয়ে বহু গান বাংলার লোককবিরা রচনা করেছেন। বাউল দর্শনই হচ্ছে জাগতিক মোহকে বর্জনের মধ্য দিয়ে পরম প্রভুকে খুঁজে বেড়ানো। বিচারগানেও সেই দর্শনের চর্চা হয়, তাই সংসার-সন্ন্যাস নিয়ে বহু জনপ্রিয় গান রয়েছে। বিচারগানের আসরে ছোট আবুল সরকার রচিত-পরিবেশিত একটি অসাধারণ গান হচ্ছে-

> আমি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীরে, সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী,
> বন্ধুর আশায় পথে নেমেছি ॥
> আমি বন্ধুর লাগি হলাম যোগী,
> ভোগের নেশা ভুলেছি ॥
> করি বন্ধুয়ার তালাশ, তাইতো হয়েছি সন্ন্যাস,
> ঘর-বাড়ি ছাড়িয়া এখন হলাম তাই বনবাস,
> আমি পেয়েছি তার নামের সুবাস, যেমন পেলো মৌমাছি ॥ (ছোট আবুল, ২০২০ : পরিবেশনা)[৬৪]

গায়ক আবুল সরকার সন্ন্যাসের পক্ষালম্বন করে এই গানটির মাধ্যমে সন্ন্যাসের বন্দনা করেছেন। এবং গানের মূলভাব হচ্ছে গৃহত্যাগের মাধ্যমে পরম স্রষ্টাকে পাওয়ার তৃষ্ণায় বনবাসের জীবনকেই উত্তম মনে করা হয়েছে। এছাড়া গানে মানুষের জৈবিক তাড়নাকে দোষারোপ করা হয়েছে। কারণ অনেক সুফি-বাউলই মনে করেন যৌনতার যাচ্ছেতাই ব্যবহারই ঈশ্বরপ্রাপ্তির প্রধান অন্তরায়। সেই সাথে সংসারের মায়ায় জড়িয়ে থাকলে সাধন-ভজনে বিঘ্ন ঘটে। এ রকম চমকপ্রদ গান ও কথা সংসার-সন্ন্যাস পালায় পরিবেশিত হয়ে থাকে। এজন্য পালাটি অনেক দর্শক-শ্রোতার নিকট জনপ্রিয়তা পেয়েছে। বিচারগানের নিয়মিত দর্শক ও বিচারগানের বৈঠকী আসরের গায়ক শহীদ মিয়া বলেন,

> এই যে আমি গান-বাজনা করি, বুকের মধ্যে একটা উদাস-উদাস ভাব অনুভব করি। তার কারণ কিন্তু এই সন্ন্যাস। সারাজীবন সংসারে থেকে পালাই পালাই করছি কিন্তু পালাইতে পারি নাই। গান গেয়ে, গান শুনে বুকের আগুনটাকে চাপা দিয়ে রাখি।

> যখন সংসার-সন্ন্যাস পালার মতো পালা হয়, তখন মনে হয় আসরে আমার কথাই বলা হয়। তবে এই পালাটা খুব বেশি হয় না। বেশির ভাগ জায়গায়ই গুরু-শিষ্য কাম-প্রেম, শরিয়ত-মারফত, নারী-পুরুষ ধরণের পালা হয়। যাইহোক সংসার-সন্ন্যাস নিয়ে বেশি বেশি পালা হওয়া দরকার বলে মনে করি। (শহীদ, ২০২৩ : সাক্ষাৎকার)

শহীদ মিয়ার মতো বহু দর্শক-শ্রোতা সংসার-সন্ন্যাস পালাটি পছন্দ করেন পালার জীবনমুখী বিষয়বস্তুর কারণে এটা নিঃসন্দেহে দাবি করা যায়। তবে একথাও সত্য বিচারগানের আসরে কোন পালা পরিবেশিত হবে তা নির্ধারণ করে দেন বায়নাকারী পির-গোঁসাই তথা গানের পৃষ্ঠপোষকগণ। এ জন্য দেখা যায় সংসার-সন্ন্যাস পালাটি বেশি পরিবেশিত হয় না। কারণ বিচারগানের প্রধান পরিবেশনার উপলক্ষ্য ওরশ শরিফ, এবং এর পরিচালনা করেন পির ও ভক্তবৃন্দ। তাই দেখা যায়, পির ও ভক্তদের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়ন ও গুরু-শিষ্যের একে-অপরের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য বোঝাতে গুরু-শিষ্য সম্পর্কিত গুরু-শিষ্য পালা বেশি হয়। এছাড়া ধর্মের নিগূঢ়তত্ত্বনির্ভর পালাসমূহ যেমন-জীব-পরম, কাম-প্রেম, রাধা-কৃষ্ণ, নবুয়েত-বোলায়েত পালা বেশি পরিবেশিত হয়ে থাকে। তবে একথাও সত্য যতদিন মানবসভ্যতা থাকবে, ততদিন মানুষের সাংসারিক দুঃখ-কষ্ট থাকবে, তাই বিচারগানের পালা হিসেবে সংসার-সন্ন্যাস থাকলেও অন্য কোনোভাবে ঠিকই সংসার-সন্ন্যাস বিষয় নিয়ে গান থাকবে। তখন হয়তো কোনো বাউল বা লোকগায়ক আসরে গাবেন, সংসার-সন্ন্যাস পালা বিষয়ক বিচারগানের গায়েন মাতালকবি রাজ্জাক দেওয়ানের নিচের গানটির মতো কোনো গান।

> এ ভব সংসারে কাঁদালি আমারে মায়া ডোরে বাঁধিয়া
> দিন যায় যত ভাবি আমি ততো মন আগুনে জ্বলিয়া ॥
> শিশুকাল বাল্যকাল গেল তারপরে যৌবন আসিল
> দেহে গেলো কামের জ্বালা বাড়িয়া
> যৌবন জ্বালায় জ্বইলা মরি, ঘরে আনলাম সুন্দর নারী
> পাকাইলাম চুল দাঁড়ি ঐ সঙ দেখিয়া ॥ (তপন, ২০২২ : ৪০৯)[৬৫]

বেহেস্ত-দোজখ পালা

লোকনাটক বিচারগানের প্রবীণ ও নবীন গায়েনদের সাথে আলোচনা করে জানা গেছে, বেহেস্ত-দোজখ বা স্বর্গ-নরক পালাটি ২০০০-২০০৫ সালে মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে এই পালাটির পরিবেশনা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের বিচারগানের অনেক গায়েনই পরিবেশনাটিতে অংশগ্রহণ করে থাকেন। বিখ্যাত গায়েনদের মধ্যে বড় আবুল সরকার, শাহ আলম সরকার, লতিফ সরকার, কাজল দেওয়ান, লিপি সরকার প্রমুখ বেহেস্ত-দোজখ পালাটিতে অভিনয় করে সুনাম অর্জন করেছেন। বেহেস্ত-দোজখ পালাটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে বিচারগানে এই শব্দ দুটি কী

অর্থে ব্যবহৃত হয়, সেটি জানা প্রয়োজন। বাংলা একাডেমি প্রণীত ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে শব্দ দুটির অর্থ যথাক্রমে- ‘বেহেস্ত অর্থ মৃত্যুর পর পূণ্যবানদের বাসস্থান; স্বর্গ; সর্ববিধ সুখের স্থান। আর দোজখ অর্থ নরক; অতি নিকৃষ্ট ক্লেশদায়ক স্থান; ইসলামী বিশ্বাস অনুযায়ী পরকালে যেখানে পাপীদের শাস্তি দেয়া হবে। (এনামুল, ২০১০ : ৯০৩ ও ৬২৭) অভিধান থেকে এটিও জানা যায় শব্দ দুটি ফারসি। এই শব্দ দুটি ধর্মীয় কারণে বাংলা ভাষায় আত্মীকৃত হয়েছে, এটা নির্দ্বিধায় বলা যায়। বেহেস্ত ও দোজখ শব্দ দুটি যে অর্থে বাঙালি মুসলিম-সমাজে ব্যবহৃত হয় তার মূল শব্দ হচ্ছে জান্নাত ও জাহান্নাম। অন্যদিকে বাংলা ভাষায় সর্বাধিক ব্যবহৃত শব্দ স্বর্গ ও নরক শব্দ দুটি বাংলা। যেভাবেই শব্দ দুটির উৎপত্তি ও প্রয়োগ হোক না কেন, বেহেস্ত-দোজখ, জান্নাত-জাহান্নাম ও স্বর্গ-নরক এই ত্রয়ী শব্দ যুগোল মূলত ধর্মীয় বিশ্বাসের জায়গা থেকে গণমানুষের নিকট পরিচিত। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী মৃত্যুর পর পাপ-পূণ্যের বিচার শেষে পাপীদের স্থান হবে চির শাস্তির স্থান দোজখ/জাহান্নাম/নরকে এবং পূণ্যবানদের স্থান হবে চির শান্তির স্থান বেহেস্ত/জান্নাত/স্বর্গে। এখানে আরেকটি কথা না বললেই নয় ধর্ম মতানুসারে এই স্বর্গ-নরকের বর্ণনার পার্থক্য রয়েছে। সে আলোচনা যদিও এখানে মূখ্য নয়। বিচারগানের আসরে এই বেহেস্ত-দোজখ বা স্বর্গ-নরক বিষয় দুটি কিভাবে আলোচিত বা পরিবেশিত হয় সেটাই মূখ বিষয়। এ কথাটি অবশ্য দৃঢভাবে সত্য বিচারগান যেহেতু ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত তাই বেহেস্ত-দোজখ বিষয়টি প্রায় প্রতিটি পালার সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত। আর এই বিষয় দুটি যখন স্বতন্ত্র পালা আকারে আসরে পরিবেশিত হয়, তখন তো আরো জোড়ালো আলোচনা করা গায়েনদের জন্য আবশ্যিক হয়ে যায়। বেহেস্ত-দোজখ পালাটিতে বিচারগানের সর্বপ্রথম বড় আবুল সরকার ও শাহ আলম সরকার অভিনয় করেন। এমনকি বড় আবুল সরকার ও শাহ আলম সরকারই বেহেস্ত-দোজখ পালাটি উদ্ভাবন করেছেন। এই পালার উদ্ভাবন প্রসঙ্গে এক পরিবেশনায় শাহ আলম সরকার বলেন,

> আমি শাহ আলম সরকার এবং আমার প্রতিপক্ষের শিল্পী আমার ওস্তাদ শ্রদ্ধেয় জনাব আবুল সরকার, আমরা উপস্থিত হয়েছি বেহেস্ত ও দোজখের পালা নিয়ে। এই বেহেস্ত ও দোজখের পালা, এটা আমরা দুজনই এই দেশে সর্বপ্রথম করি। আমাদের ওস্তাদ-ছাত্রের (বড় আবুল সরকার-শাহ আলম সরকার) একটা গবেষণার ফসল। (শাহ আলম, ২০১৮ : পরিবেশনা)

অর্থাৎ বড় আবুল সরকার ও শাহ আলম সরকারের মাধ্যমে বেহেস্ত-দোজখ পালার যাত্রা শুরু হয়েছে। বর্তমানে এই পালাটি গায়েনদের পরিবেশনায় সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হচ্ছে। পালাটিকে যেহেতু অন্য সকল পালার সাথে সম্পৃক্ত করা যায়, সেহেতু সহজেই পালাটি জনপ্রিয়তাও পেয়েছে। লোকনাটক বিচারগান প্রায় সম্পূর্ণ রূপে ধর্মতত্ত্বনির্ভর লোকপরিবেশনা, তাই এর পরিবেশনায় বেহেস্ত-দোজখ বা স্বর্গ-নরক খুব গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। ধর্মের মূখ্য বিষয় বেহেস্ত-দোজখ বা স্বর্গ-নরক এবং এই দুটি বিষয়ের মধ্যেই নিহিত আছে ভোগ-বিলাসের লোভ ও দুঃখ-শোকের ভয়। কেননা প্রতিটি ধর্মের মৌলিক বিশ্বাস হচ্ছে পূণ্য করলে মৃত্যুর পর সুখের জীবন পাবে, আর পাপ

করলে মৃত্যুর পর দুঃখের জীবন পাবে। নানাভাবে এই সুখ ও দুঃখের বর্ণনা দেয়া হয় বেহেস্ত ও দোজখকে কেন্দ্র করে। বেহেস্তে কী কী আছে? দোজখে কী কী আছে? আর কিভাবে সে সকল ভোগ করানো হবে তার কাল্পনিক সব ব্যাখ্যাও ধর্মে রয়েছে। বিচারগানের আসরে ধর্মকে অবলম্বন করেই বেহেস্ত-দোজখ সম্পর্কিত নানান আলোচনা হলেও বাংলাদেশের লৌকিক বিশ্বাসগুলোও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আলোচিত হয়। আর এই বেহেস্ত-দোজখ বা স্বর্গ-নরক কেন্দ্রিক আলোচনাগুলো বেশির ভাগই ইসলামধর্ম ও হিন্দুধর্ম থেকে হয়ে থাকে। এর প্রধান কারণ হচ্ছে বিচারগানের কুশীলব ও দর্শক-শ্রোতার বেশির ভাগই মুসলিম ও হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন। তবে গায়েনদের আলোচনার সুবিধার্থে অন্যান্য ধর্মের বিশ্বাস অনুযায়ী স্বর্গ-নরকের আলোচনাও করেন। বেহেস্ত-দোজখ পালায় অভিনয় করতে গিয়ে বিচারগানের গায়েনগণ একে-অপরকে কতগুলো খুব পরিচিত ও সাধারণ প্রশ্ন করে থাকেন।

বেহেস্তপক্ষের গায়েন দোজখপক্ষের গায়েনের প্রতি যে সকল প্রশ্ন করেন :

ক. দোজখ কোথায়? ইসলামধর্ম ও হিন্দুধর্ম মতে দোজখ কয়টি ও কী কী?

খ. দোজখে কোন ধরণের মানুষ সর্বপ্রথম প্রবেশ করবে?

গ. দোজখে মানুষকে কিভাবে শাস্তি দেয়া হবে?

ঘ. কোন পাপের শাস্তি সবচেয়ে বেশি হবে?

ঙ. স্রষ্টা যদি মানুষ বানালেন তাহলে দোজখ বানালেন কেন?

চ. দোজখের শাস্তির কী কোনো দিন শেষ হবে না?

ছ. দোজখে পুরুষ ও নারীদের মধ্যে কাদের সংখ্যা বেশি হবে?

জ. দোজখে নারীদের সংখ্যা বেশি হবে কেন?

ঝ. অবৈধ যৌনাচারের শাস্তি দোজখে কী হবে?

ঞ. হিন্দু-মুসলমানরা কী একই সাথে দোজখে থাকবে নাকি আলাদা আলাদা থাকবে?

ট. দুনিয়ায় কী বোঝার উপায় আছে কোন মানুষ দোজখে যাবে?

দোজখপক্ষের গায়েন বেহেস্তপক্ষের গায়েনের প্রতি যে সকল প্রশ্ন করেন :

ক. ইসলামধর্ম ও হিন্দুধর্ম মতে বেহেস্ত বা স্বর্গের সংখ্যা কয়টি?

খ. সকল ধর্মের মানুষই কী বেহেস্তে যেতে পারবেন?

গ. বেহেস্ত কত বড়, ওখানে কী কী পাওয়া যাবে?

ঘ. বেহেস্তে ৭২টি হুর পেলে নারীরা পাবে না কেন?

ঙ. দুনিয়ায় মদ হারাম কিন্তু বেহেস্তে খাওয়া যাবে কেন?

চ. কোন শ্রেণির মানুষ সর্বপ্রথম বেহেস্তে যাবেন?

ছ. কোন ১০ জন ব্যক্তি পৃথিবী থেকে বেহেস্তের সুসংবাদ পেয়ে গেছেন?

জ. নবি মুহাম্মদ (স.) মেরাজে গিয়ে বেহেস্তে কার জুতার শব্দ শুনেছিলেন?

ঝ. বেহেস্তে যারা যাবেন তারা কতটুকু জায়গার মালিক হবেন?

ঞ. কোন ধর্মের বেহেস্ত বা স্বর্গ সবচেয়ে ভালো? নাকি সব একই রকম?

ট. মৃত্যুর কতদিন পর মানুষ বেহেস্তে প্রবেশ করবে?

ঠ. বেহেস্তিদের খাবার-দাবার ও পোশাক কেমন হবে?

ড. নবি মুহাম্মদ (স.) বেহেস্তে কোন দুই নারীকে আবার বিয়ে করবেন? কেন করবেন?

ঢ. বেহেস্তে বা স্বর্গে কী রাধা-কৃষ্ণের সাক্ষাৎ হবে?

ণ. বেহেস্তে যদি কাজ-কাম না থাকে তাহলে কী মানুষ একঘেয়েমীতে ভুগবেন?

ত. বেহেস্তে গিয়ে কী আল্লাহর সাথে দেখা হবে?

থ. বেহেস্তে যুবকদের সরদার কে হবেন? আর নারীদের সরদার কে হবেন?

দ. বেহেস্তে প্রবেশের পর বেহেস্তিদের সর্বপ্রথম কোন খাবার খাওয়ানো হবে?

ধ. যারা বেহেস্ত বিশ্বাস করে না কিন্তু দুনিয়ায় পূণ্য কাজ করে তারা কী বেহেস্তে যাবে?

উপরের প্রশ্নগুলো ছাড়াও বহু স্পর্শকাতর প্রশ্ন করে এক গায়েন আরেক গায়েনকে পরাজিত করার চেষ্টা করে থাকেন। তাছাড়া গায়েনগণ বহু প্রশ্ন করেন যুক্তির কূটকৌশলে যাতে প্রতিপক্ষ শিল্পী প্রশ্নের জবাব দিতে না পারেন। এ রকমই একটি প্রশ্ন করেছেন বিচারগানের গায়েন লতিফ সরকার, তিনি বেহেস্তপক্ষ থেকে দোজখপক্ষের গায়েন লিপি সরকারকে প্রশ্ন করেন-

> আমি জানতে চাই লিপি সরকার, দোজখের আগুন যদি সুঁইয়ের মাথায় এনে ছেড়ে দেয়া হয় সমগ্র পৃথিবীটা পুড়ে পুড়ে ছাই ছাই হয়ে যাবে। আর দোজখের আগুনের মধ্যে একটা মানুষ যদি ফেলে তাহলে মানুষ তো মোমের মতো গলেই শ্যাষ হয়ে যাবে। মানুষ যদি গলে গলে মোমের মতো শ্যাষ হয়ে যায়, ঐ মানুষটাকে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বছর সেই দোজখের মধ্যে আজাব দিলে সেই মানুষের অস্তিত্বটা কী থাকে? (লতিফ, ২০১৭ : পরিবেশনা)

লতিফ সরকার মূলত এই পরিবেশনায় বিস্তারিতভাবে জানতে চেয়েছেন মানুষকে একবার পোড়ালেই তো তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলবে তাহলে অনন্তকাল কিভাবে তাকে শাস্তি দেয়া সম্ভব? এ রকম চমকপ্রদ প্রশ্ন বিচারগানের আসরে লোককবিরা প্রায়ই করে থাকেন। কখনো কখনো দেখা যায় তাদের প্রশ্ন এমনও হয়, যে কোনো শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করে ফেলে। বিচারগানে শুধু গায়েনের গদ্য-কাব্য কথার যুক্তিতে নয় গানে গানেও আসরে অনন্য প্রশ্নের অবতারণা করা হয়। এতে করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষজনও মোহিত হয়ে গায়েনদের

পালা উপভোগ করেন। বেহেস্ত-দোজখের আরেকটি পরিবেশনায় কাজল দেওয়ান গানের মাধ্যমে প্রচলিত বেহেস্ত-দোজখের চিন্তাকে প্রশ্ন করেছেন। গানটি হচ্ছে-

চাই না জান্নাত, চাই না শান্তি,
যদি আমি থাকি একা,
আমি দোজখে যাইতে রাজি,
যদি পাই মওলাজির দেখা ॥
আনন্দ আর ভোগ-বিলাসে,
সদা রয় যারা মন-উল্লাসে,
তারা ঐ জান্নাতকে তো ভালোবাসে,
ভয় পায় দোজখের অগ্নিশিখা ॥ (কাজল, ২০১৭ : পরিবেশনা)[৬৬]

বিচারগানের সমৃদ্ধ দর্শন এখানেই, বিচারগানে এ রকম বহু পালাভিত্তিক গান রয়েছে যার মাধ্যমে প্রচলিত ধর্মচিন্তার ভিতকেও নাড়িয়ে দিতে সক্ষম। কাজল দেওয়ানের দোজখপক্ষের এই গানটির দর্শনশক্তিও তেমনি। অর্থাৎ বিচারগানের বেহেস্ত-দোজখ বা স্বর্গ-নরক পালাটিও অনন্যতার চিহ্ন বহন করে।

জিন্দা-মরা পালা

বিচারাগানের ব্যতিক্রমধর্মী ও স্বল্প প্রচলিত একটি পালা হচ্ছে জিন্দা-মরা পালা। পালাটি বাংলাদেশের বিচারগানের আসরে ততটা পরিবেশিত না হলেও বিষয়বস্তুর দিক থেকে এটি নিঃসন্দেহে অনন্য একটি পালা। কারণ এই পালাটির পরিবেশনা মানুষকে তার জীবন সম্পর্কে যেমন সচেতন করে তুলে, তেমনি মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কেও সচেতন করে দেয়। পালায় উল্লিখিত দুটি শব্দ জিন্দা ও মরা। এখানে জিন্দা বলতে মানুষের যাপিত-জীবনের সমগ্র সময়কে বোঝানো হয়েছে, আর মরা বলতে মানুষের জীবনের অবসান বা মৃত্যুবরণকে নির্দেশ করে। পালায় গায়েনগণ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মানুষের জীবিত সময়ের যেমন ব্যাখ্যা করেন, তেমনি মৃত্যু নামক ট্র্যাজেডি এবং তার পরবর্তী রহস্যময় সময়কে দর্শন ও ধর্মের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করেন। মূল কথা হচ্ছে মানুষের অস্তিত্ব ও অস্তিত্বহীন মুহূর্তগুলোকে গায়েনগণ আলোচনা করে থাকেন। আর এই জিন্দা ও মরা বিষয়টি আলোচনা করার সময় গায়েনগণ ধর্মতত্ত্ব, ধর্মের আদেশ-উপদেশ, যাপিত-জীবনের দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা, পৌরাণিক কাহিনিসহ নানাবিধ বিষয়ের অবতারণা করেন। সেই সাথে বিচারগানে প্রচলিত জিন্দা ও মরা সম্পর্কিত গানগুলো আসরে গায়েনগণ পরিবেশন করে থাকেন। মানুষ যেহেতু জীবিত জীবনের দুঃখ-কষ্টে কাতর আর মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে ভেবেও বিষন্নতা অনুভব করে, তাই আসরে গায়েনরা জিন্দা-মরার বিষয় নিয়ে গান গাইলে দর্শক-শ্রোতারা আবেগতাড়িত হয়ে কান্নায়

ভেঙে পড়েন। কেউ কেউ কেঁদে-কেটে ভূমিতে গড়াগড়ি যায়, একে-অপরের সাথে দশা ধরে অজ্ঞান হয়েও যায়। জিন্দা-মরা পালাসহ বহু পালায় গাওয়ার উপযোগী এ রকম বহু গান বিচারগানে রয়েছে। তার মধ্যে জনপ্রিয়তার শীর্ষে রয়েছে মুন্সিগঞ্জ অঞ্চলের বিচারগানের গায়ক ও কিংবদন্তি গীতিকার ও সুরকার আব্দুস সাত্তার মহন্তের রচিত 'আমি তো মরে যাব' একটি গান। গানটি হচ্ছে-

আমি তো মরে যাবো-২
চলে যাবো রেখে যাবো সবই
আছিস নি কেউ সঙ্গের সাথী
সঙ্গে নি কেউ যাবি
আমি মরে যাবো ॥
মরার সঙ্গে সঙ্গে পড়ে যাবে কান্নাকাটার ভিড়
কেউ বা মোরে মাটি দিতে হইবে অস্থির-২
আমায় দিবে মাটি
আমায় দিবে মাটি ভুল-ত্রুটি চেয়ে নিবে ক্ষমা
বাড়ি এসে খোঁজ করিবে কোন ব্যাংকে কী জমা ॥ (আব্দুস সাত্তার, ২০১৬ : পরিবেশনা)[৬৭]

বিচারগানের গায়েন আব্দুস সাত্তার মোহন্তের এই গানটিতে অত্যন্ত সুনিপুণভাবে মৃত্যু নামক ট্যাজেডির চিত্র চিত্রায়িত হয়েছে। মানুষের মৃত্যুর পরে তার টাকা-পয়সা, বাড়ি-গাড়ি-নারী, আত্মীয়-পরিজন যে কোনো কাজে আসবে না, গানে সেই বার্তা দিয়েছেন। মানুষের আপন বলতে যে সে নিজে ছাড়া আর কেউ নেই, কবি সেই কথাটিও বলেছেন। এমনকি বিচারগানের পরিবেশনার মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের যে মূল বিষয় মানুষের পরকালের মুক্তির পাথেয় অর্জন, সেই বিষয়টিও আব্দুস সাত্তার মোহন্তের গানটিতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি গানের কথায় বলেছেন, 'সবার হাতে ধরি পায়ে পড়ি বেঁধে নাও সামান/মহন্ত কয় পারের ঘাটে ভয়ংকর নিদান', অর্থাৎ পালায় গানে গানে তিনি মানুষকে পূণ্য কাজের মাধ্যমে পরপাড়ের কড়ি জমানোর কথা বলেছেন, যাতে মানুষ পরপারে সৃষ্টিকর্তার বিচারের দিন মুক্তি পায়। গদ্য, কাব্য ও গানে গানে জিন্দা-মরা পালায় গায়েনগণ যে সমস্ত আলোচনা করেন, তার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিচে তুলে ধরা হলো-

ক. মানুষের মৃত্যু যেহেতু শ্বাশত নিয়মের চূড়ান্ত পরিণতি, তাই মানুষের উচিত জীবিত থাকতে সৎকর্ম করা।

খ. মানুষ পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে যেমন কর্ম করবে, মৃত্যুর পর কর্মফলও তেমন পাবে।

গ. জীবিত অবস্থায় মানুষ যতই আমার-আমার করুক না কেন তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সবই পর হয়ে যায়।

ঘ. মানুষ যাই অর্জন করুক না কেন তার ফলাফল শূন্য। শুধু মৃত্যুর পর সাথে যাবে পাপ-পূণ্য।

ঙ. যত বড় ক্ষমতাবানই হোক না কেন তাকে মৃত্যুবরণ করতেই হবে এবং তাকে বিধাতার সামনে বিচারের কাঠগরায় দাঁড়াতে হবে।

চ. দুনিয়ার জীবন অতি তুচ্ছ, মৃত্যুর পরের জীবনই প্রকৃত জীবন। যে জীবনের কোনো শেষ নেই অনন্ত-অসীম। তাই মানুষের উচিত অসীম জীবনকে সুখের করার চেষ্টা করা, সেই চেষ্টাটি হচ্ছে পূণ্য কাজ।

ছ. পৃথিবীতে যত মানুষ অমর হয়েছে, প্রত্যেকেই সৎকর্মশীল ও সাধক ছিলেন। তাই মানুষের উচিত জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে কাজে লাগানো।

জ. জীবিত থাকতে বেশি বেশি সৃষ্টিকর্তার নাম জপতে হবে যাতে মৃত্যুর পর সৃষ্টিকর্তার কৃপা পাওয়া যায়।

ঝ. ধরাকে শরা জ্ঞান না করে, সব সময় মৃত্যুকে স্মরণে রাখা উচিত।

ঞ. মানুষে মানুষে হিংসা-নিন্দা, সংঘাত-যুদ্ধ না করে প্রেমময়ভাবে জীবন অতিবাহিত করাই জীবিত মানুষের প্রধান কর্ম হওয়া উচিত।

এই বিষয়গুলো গায়েনগণ নানাভাবে আসরে আলোচনা করে দর্শক-শ্রোতাদের সৎকর্মের উপদেশ দিয়ে থাকেন। সেই সঙ্গে বারবার স্মরণ করিয়ে দেন পৃথিবীতে কোনো প্রাণিই চিরকাল বেঁচে থাকবে না, সব মানুষ প্রকৃতির খেলাঘরে তুচ্ছ কচুরীপানার মতো কেবল সময় নামের মহাসাগরে ভেসে চলেছে। মানুষের আসল গন্তব্য কেউ জানে না। তাই মানুষের উচিত স্ব স্ব ধর্মের নির্দেশনা অনুযায়ী ইবাদত-বন্দেগী করা, এমনটাই বলেন আসরে গায়েনগণ। জিন্দা-মরা পালায় ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে যেমন গায়েনগণ আলোচনা করেন, তেমনি অনেক চমকপ্রদ প্রশ্নও ছুড়ে দেন প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের প্রতি। যেভাবে ধর্মে মৃত্যু পরবর্তী জীবন ও বিচার সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে, সে সম্পর্কে কোনো কোনো গায়েন অপর পক্ষকে প্রশ্ন করে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন। তার মধ্যে কতগুলো সাধারণ প্রশ্ন রয়েছে, যেমন-

ক. মানুষের দেহের পাঁচটি উপাদান আগুন, পানি, বাতাস, মাটি ও আত্মা, যদি মৃত্যুর যে যার উপদানের সাথে মিশে যায় তাহলে মানুষকে শাস্তি দিবে কিভাবে? আর যদি বলা হয় আত্মাকে দিবে, তাহলে আত্মা কী, যা দেখা যায় না, ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, তার আবার সুখ-শাস্তি কী?

খ. ইসলামধর্মে বলা হয় মৃত্যুর পর যখন লাশকে কবরস্থ করে মানুষ চল্লিশ কদম হেঁটে চলে আসে তখন মূর্দাকে জিন্দা করে এবং প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে শান্তি বা শাস্তি দেয়া হয়। কিন্তু যে মানুষের কবর হয় না, মানে সলিল সমাধি হয় বা আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হয়, তার কবরের হিসাব-নিকাশ কিভাবে হবে কিংবা কবরের আজাব কিভাবে হবে।

গ. হিন্দুধর্মে বর্ণিত আছে জন্মান্তরবাদ। যদি মানুষ মরে গিয়ে বারাবার ফিরে আসে তাহলে মানুষের স্বর্গ-নরকে বসবাস কিভাবে সম্ভব। আর সম্ভবই যদি হবে তাহলে মানুষের স্বর্গ-নরকের কোনো স্মৃতি নেই কেন?

ঘ. হাদিসে বর্ণিত আছে বলে শোনা যায়, নবি মুহাম্মদ (স.) মেরাজে গিয়ে বেহেস্তে বিল্লাল (রা.)-এর জুতার শব্দ শুনেছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে বিল্লাল (রা.) তখনও মারা যাননি, তিনি দুনিয়াতে অথচ বেহেস্তে তার জুতার শব্দ গেলো কিভাবে?

ঙ. মানুষ তো বিধাতাকে বলেন নি যে, আমাদের সৃষ্টি কর। তিনি নিজ ইচ্ছায় মানুষকে তৈরি করে মানুষ নিয়ে জন্ম-মৃত্যু খেলার কী কোনো মানে আছে?

চ. সকল মানুষই বিধাতার সৃষ্টি যদি হয়,তবে মানুষের আয়ুকাল ভিন্ন ভিন্ন কেন? একজন ৫ বছর বাঁচে, আরেকজন ৫০ বছর, আবার আরেকজন ১০০ বছর। সৃষ্টিকর্তা কিছু মানুষের প্রতি কম আয়ু দিয়ে অবিচার করেছেন কী?

ছ. মানুষ যদি বিধাতার সৃষ্টি হয়, আর সকল ক্ষমতার মালিক একমাত্র তিনিই হন। তবে পৃথিবীতে দেখা যায় একজন অট্টালিকায়, একজন গাছতলায়, কেউ সম্মানিত হন, কেউ আবার অসম্মানিত হন। সৃষ্টির প্রতি স্রষ্টার দানের এই অসামঞ্জস্য কেন?

জ. ভালো-মন্দ বানিয়েছেন বিধাতা, তাঁর ইশারায় যদি গাছের পাতাও না নড়ে, তবে মানুষের মন্দ কাজের অপরাধ হবে কেন? কেনইবা মৃত্যুর পর শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে?

এ রকম বহু চমকপ্রদ প্রশ্ন বিচারগানের গায়েনগণ জিন্দা-মরা পালায় করে থাকেন। এ কথাও সত্য যে এই সকল প্রশ্নের উত্তর ও বিপক্ষের গায়েন কায়দা-কৌশলে দিয়ে থাকেন। জিন্দা-মরা পালার একটি পরিবেশনায় অভিনয়কালে শাহ আলম সরকার তার বিপক্ষের গায়েন বড় আবুল সরকারের প্রতি একটি কৌশলী ও চ্যালেঞ্জিং প্রশ্ন করেন, তিনি বলেন,

> আমার একটা প্রশ্ন আইয়্যা পড়ছে, আমার প্রশ্নটা হইল একটা কথা আছে, 'আল-আওলিয়া লা-ইয়ামুতু' অলি-আল্লার কোনো মরণ নাই। আমি জানতে চাই, যদি অলি-আল্লার মরণ না হয় তাইলে অ্যাগো মাটি দেয় ক্যা? এই আমার ছোট্ট কইরা জিজ্ঞাসা। (শাহ আলম, ২০১৭ : পরিবেশনা)

উপরের এই প্রশ্নটি নিঃসন্দেহে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের মৌলিক বিশ্বাসকেও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করে। তবে শাহ আলম সরকার ও বড় আবুল সরকারের জিন্দা-মরা পালায় বড় আবুল সরকার প্রশ্নটির চমৎকার উত্তরও দিয়েছেন, তার যুক্তি ও বিশ্লেষণকে আশ্রয় করে। লোকনাটক বিচারগানের জিন্দা-মরা পালাটি নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ ও গুরুগম্ভীর একটি পালা যেখানে ধর্মের নিগূঢ়তত্ত্বের বিচার-বিশ্লেষণ হয়। তবে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এখনও এতটা পরিচিতি লাভ করেনি বা জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। জিন্দা-মরা পালা সম্পর্কে বিচারগানের প্রবীণ দর্শক মো. আরফান দয়ালকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন,

> বিচারগানে তো বহু পালা আছে, বেশির ভাগ শোনা হয়েছে কিন্তু জিন্দা-মরা পালা শুনি নাই। সম্ভবত পালাটি নতুন সৃষ্টি হয়েছে। তবে যেটা বুঝলাম জিন্দা-মরা পালায় যে বিষয় আলোচনা করে সেগুলো অন্যান্য পালায় হয়। জিন্দা-মরা নিয়ে

> জীবনে বহু গান শুনছি, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে আব্দুস সাত্তার মোহন্তের লেখা এবং পরশ আলীর দেওয়ানের কণ্ঠে গাওয়া 'আমি তো মরে যাব' গানটা। (আরফান, ২০২৩ : সাক্ষাৎকার)

মো. আরফান দয়ালের মতো আরো বেশ কয়েকজন দর্শক-শ্রোতার মতামত একই। তবে কেউ কেউ ইউটিউবের কল্যাণে জিন্দা-মরা পালাটি উপভোগ করতে পেরেছেন বলে জানিয়েছেন। জিন্দা-মরা পালার জীবন ও মৃত্যুর দ্বিপাক্ষিক চিন্তার বাইরেও বিচারগান ব্যতিক্রমধর্মী জিন্দামরা নিয়ে গান রয়েছে। যেমন জিন্দামরা মানে পৃথিবীতে বেঁচে থাকা অবস্থায় মৃতের মতো নিশ্চুপ, নিরব, মোহমুক্ত, লোভবির্বজিত, জাগতিক সকল চাওয়া-পাওয়ার উর্ধ্বে গিয়ে সহজ-মানুষের জীবন-যাপন করাকে বুঝায়। যে মানুষের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকবে গুরুর কৃপায় পরমগুরু ঈশ্বরকে প্রাপ্তি। এই দর্শননির্ভর মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া থানার ছোট আবুল সরকার (মহারাজ)-এর একটি অসাধারণ গান রয়েছে। গানটি হচ্ছে-

> (ওরে) মরবি যারা জিন্দামরা বৈরাবরে আয়,
> আমার হাসিব বাবার প্রেম-আগুনে ঐ মরা পুড়ায় ॥
> মরার আগে মরে যারা, তাদের বলে জিন্দা মরা,
> মরায় ধরে মরার গলা, বুকে বুক মিলায় ॥ (ছোট আবুল, ২০২১ : পরিবেশনা)[৬৮]

এই গানটি জিন্দা-মরা পালাসহ বিচারগানের সকল পালায় গাওয়ার উপযোগী একটি গান। কেননা গানটি আসরে গুরুপ্রেম জাগ্রত করার জন্য গায়েনরা গেয়ে থাকেন। তাছাড়া গানটির মূল শিক্ষাই হচ্ছে বেঁচে থাকতে মৃতের মতো নির্ঝঞ্ঝাট জীবন-যাপনের মধ্য দিয়ে পরপারের মুক্তির পাথেয় অর্জন করা।

তরিকার ভাই-তরিকার বোন পালা

বিচারগানের প্রতিটি আসরে উচ্চারিত শব্দ হচ্ছে তরিক, তরিকা, তরিকত, তরিকার ভাই ও তরিকার বোন। বিচারগানের সাথে সম্পর্কযুক্ত মানুষ এই শব্দগুলো একটি সাধারণ অর্থে ব্যবহার করেন। তাদের ভাষ্য মতে, তরিক, তরিকা বা তরিকত মানে পথ। যে পথে চললে বা সাধনা করলে গুরুর মাধ্যমে বিধাতাকে পাওয়া যায়। বাউল ও সুফিবাদে তরিকতে দীক্ষা নেয়া অতি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হিসেবে বিবেচিত হয়। কোনো ভক্ত যখন গুরুর নিকট আত্মসর্মপণ করে কোনো তরিকাগ্রহণ করেন তখন তাকে বলা হয় মুরিদ। মানে ঐ ভক্ত তরিকপন্থী বা তরিকতপন্থী হলেন। আর একই গুরুর নিকট শিষ্যত্বগ্রহণকারী নারী-পুরুষকে তরিকার ভাই ও তরিকার বোন বলা হয়। সুফি মতানুসারে সাধনা বা ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য প্রধান চারটি পর্যায় বা সাধনার স্তর রয়েছে, সেগুলো হচ্ছে- শরিয়ত, তরিকত, হাকিকত ও মারফত। তার মানে তরিকত হচ্ছে ইবাদতের দ্বিতীয় স্তর, যে স্তরে গিয়ে একটি গুরুকূলে আশ্রয়গ্রহণ করে গুরুর চালিত পথে চলতে হয়। পৃথিবীতে বহু তরিকা রয়েছে তার মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ হচ্ছে চিশতিয়া,

কাদরিয়া, নকশবন্দিয়া, ওয়াইসিয়া, সোহরাওয়ার্দিয়া প্রভৃতি। একটি কথা না বললেই নয় বিচারগানের কুশীলব, দর্শক-শ্রোতা, পৃষ্ঠপোষক প্রায় সবাই তরিকতের তত্ত্বে বিশ্বাসী। কিন্তু বাংলাদেশে বহু ওহাবী-সালাফি আলেম রয়েছে যারা সুফিবাদকে স্বীকার করেন না, এমনকি ভ্রান্ত বলতেও দ্বিধা করেন না। আবার তরিকতপন্থী বা সুফিবাদী আলেমরাও ওহাবী-সালাফি আলেমদের পথভ্রষ্ট-উগ্র বলে বিদ্রুপ ও ধিক্কার জানায়। ধর্মীয় এই বিভাজন প্রসঙ্গে সজল রোশন বলেন,

> শুধু শিয়া-সুন্নি তাই শেষ নয়, শিয়াদের মধ্যে টুয়েলভার্স, ইসমাঈলী, অনেকগুলো ভাগ আছে। সুন্নিদের মধ্যে প্রধান চারটি মাজহাব ছাড়াও লা মাজহাবী, সালাফি, ওহাবী, আহলে হাদিস- এদের বিশ্বাস ও ধর্মচর্চায় পার্থক্য আছে, হানাফিদের মধ্যেও দেওবন্দি, বেরলভী, আহলে সুন্নাত, মানতেকি, বিভিন্ন ভাগ আছে। তাবলীগ জামাতেও সাদ ও জুবায়রেপন্থী দুই গ্রুপ আছে। এছাড়া আহমদিয়া, ইয়াজিদি, মেভলেভি, কাদেরিয়া, চিশতিয়া, মুজাদ্দেদিয়া, নকশবন্দী, মাইজভাণ্ডারী, তৈফুরিয়াসহ অসংখ্য সুফি, তরিকত, রাজনৈতিক বিশ্বাস, ভিন্নমত বা বিভাজন আছে ইসলামে। এ সব বিভাজনের মূল ভিত্তি হাদিস, তাফসির এবং ফিকহী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং গ্রুপগুলোর ভিন্নমতের জায়গায় এরা এত কট্টর যে, তাদের সাথে একমত না হলে তারা মুসলমানই মনে করে না। (সজল, ২০২১ : ২৫৬)

উপরি উক্ত ভাষ্য মতে, মুসলমানদের মধ্যে বহু বিভাজন রয়েছে। এবং প্রতি মতবাদের মানুষই প্রায় বাংলাদেশে আছে। বিশেষ করে এদেশে সুফিদের মাধ্যমে ইসলামধর্ম প্রচার হওয়ায় তরিকতপন্থী বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী রয়েছে। তাদের মধ্যে চিশতিয়া তরিকার লোকজন গান-বাজনাকে ইবাদত হিসেবে মনে করেন। এছাড়া সুফিবাদী অন্যান্য তরিকার লোকজনও গানকে গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করেন। সুতরাং একথা স্পষ্টভাবেই দাবি করা যায় বিচারগানের সাথে একাত্ম জনগোষ্ঠী আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো গুরুর নিকট দীক্ষা নিক বা না নিক তরিকতের বিশ্বাসের প্রতি তারা শ্রদ্ধা রাখেন। আর তারা নিজেদের মতবাদকে টিকিয়ে রাখার জন্য আদর্শিক-আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ থাকেন। এই তরিকতপন্থীদের আদর্শিক-আত্মীয়তাকেই তরিকার ভাই-তরিকার বোন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তরিকার ভাই-তরিকার বোন প্রসঙ্গে চিশতিয়া তরিকার পির ও বিচারগানের পৃষ্ঠপোষক হিমেল শাহ চিশতি বলেন,

> আমরা যারা তরিকতে বিশ্বাস করি, তাদের মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে আত্মার সম্পর্ক। রক্তের সম্পর্ক তবু ছিন্ন হয় কিন্তু তরিকতের সম্পর্ক ছিন্ন করা যায় না। এ সম্পর্ক জন্ম-জন্মান্তরব্যাপী প্রবাহমান থাকে। প্রত্যেক খাঁটি সুফি তরিকতপন্থী পিরের দরবারের শিষ্যরা একে-অপরের তরিকার ভাই-তরিকার বোন হিসেবে পরিচিত। (হিমেল, ২০২৩ : সাক্ষাৎকার)

এই ভাষ্য অনুযায়ী স্পষ্ট বোঝা যায়, তরিকার ভাই-তরিকার বোনের সম্পর্কের গুরুত্ব অপরিসীম। আর এ কারণেই বিচারগানের আসরে এই বিষয়টি নিয়ে পালার উদ্ভব হয়েছে। পিরের ওরশ শরিফে শিষ্যদের মধ্যে তরিকতের সম্পর্ককে দৃঢ় করার জন্য পালাটি শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। তবে বিচারগানের অন্যান্য পালায় যেমন বিপরীতমুখী বিষয় নিয়ে প্রতিযোগিতা হয়, ঠিক সেভাবে তরিকার ভাই-তরিকার বোন পালাটি আসরে পরিবেশিত

হয় না। কারণ পালাটির বিষয়বস্তু এক ও অভিন্ন। শুধুমাত্র তরিকার ভাই-তরিকার বোনের মধ্যে নারী ও পুরুষের সামান্য পার্থক্য রয়েছে। পালায় দুই পক্ষের গায়েনই তরিকার গুরুত্ব, গুরুর গুরুত্ব, তরিকার ভাই ও তরিকার বোনদের মধ্যকার সম্পর্কের গভীরতা ও গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। এ সময় একে-অপরকে প্রাসঙ্গিক কথার মারপ্যাঁচে সামান্য 'খোঁচা' দেন। যেহেতু বাংলাদেশে ওহাবী মতবাদীদের দ্বারা পরিচালিত ওয়াজ মাহফিলগুলোতে গান-বাজনা, পির-মুরিদ ও তরিকতের বিরুদ্ধে বক্তারা নেতিবাচক বক্তব্য রাখেন, তাই বিচারগানের তরিকার ভাই-তরিকার বোন পালাসহ সকল পালাতেই ওহাবী-মোল্লাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কথাবার্তা বলেন গায়েনগণ। ওহাবী-মোল্লারা যেহেতু তরিকতের দীক্ষা নেয়াকে নাজায়েজ বলেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে বিচারগানের গায়েনগণ কোরান-হাদিস ও অলিদের জীবনীর মাধ্যমে তরিকতগ্রহণকে জায়েজ প্রমাণ করতে যুক্তি উপস্থাপন করেন। এ রকম ক্ষুরধার যুক্তিতে বিখ্যাত ছিলেন বিচারগানের প্রয়াত গায়েন আব্দুর রশিদ সরকার। এছাড়া বর্তমানে ফকির আবুল সরকার, ছোট আবুল সরকার, শরিয়ত সরকার, লতিফ সরকার, আলেয়া বেগমসহ প্রমুখ গায়েন আসরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে থাকেন। তরিকার ভাই-তরিকার বোনদের সম্পর্কের বন্ধন কতটা দৃঢ় হতে পারে এ সংক্রান্ত একটি ঘটনা অনেক গায়েন আসরে বলে থাকেন। ঘটনাটির সারাংশ হচ্ছে- বিচারগানের প্রয়াত গায়ক আব্দুর রশিদ সরকারের এক সন্তানকে তারই এক প্রতিবেশি পানিতে ডুবিয়ে হত্যা করেন। এটা জানতে পেরে আব্দুর রশিদ সরকার ঐ প্রতিবেশি গংদের নামে মামলা করেন। মামলা করলে বিবাদীরা ঘরছাড়া হয়ে যান। এবং এটা সুনিশ্চত হয়ে যায় যে, অপরাধীদের আদালত সর্বোচ্চ শাস্তিতে দণ্ডিত করবেন। এমতাবস্থায় অপরাধীরা আব্দুর রশিদ সরকারের পির তুলা চাঁনের নিকট শিষ্যত্বগ্রহণ করেন। এক পর্যায়ে অপরাধীরা পিরের নিকট সব ঘটনা খুলে বলে অপরাধ স্বীকার করে নেন এবং অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তখন পির তুলা চাঁন আব্দুর রশিদ সরকারকে ডেকে নিয়ে অপরাধীদের ক্ষমা করে দিতে বলেন। কারন অপরাধীরা এখন আব্দুর রশিদ সরকারের তরিকার ভাই। আব্দুর রশিদ সরকার গুরুবাক্য শিরোধার্য করে অপরাধীদের ক্ষমা করে দেন এবং তাদেরকে তরিকার ভাই হিসেবে বুকে জড়িয়ে নেন। এই ঘটনাটি আসরে যখন গায়েনগণ বর্ণনা করেন, তখন দেখা যায় তারা তরিকার ভাইয়ের গুরুত্ব বলতে গিয়ে কান্নাকাটি করেন। গায়েনের সাথে উপস্থিত তরিকতপন্থী মানুষজনও আবেগতাড়িত হয়ে কান্না করেন। এ রকম মুহূর্তে গায়েনগণ তরিকত সম্পর্কিত করুণ সুরের নানান গান আসরে পরিবেশন করে থাকেন। তার মধ্যে জনপ্রিয় একটি গানের 'স্থায়ী' হচ্ছে- 'তরিকার ভাই গলার মালারে/ভাইয়ে জানে ভাইয়ের জ্বালারে'। পালাটিতে আবেগ-আশ্রয়ী গানের সাথে সাথে গায়েনগণ কোরান, হাদিস, গীতা, বাইবেল, মরমিকবিদের নানান গান-ঘটনাকে আশ্রয় করে একে-অপরকে প্রশ্ন করে থাকেন। লতিফ সরকার ও প্রয়াত মায়া রাণী পরিবেশিত তরিকার ভাই-তরিকার বোনের একটি পালায় মায়া রাণী, লতিফ সরকারকে একটি চমৎকার প্রশ্ন করেন। প্রশ্নটি হচ্ছে-

> আমার ভাইয়ের কাছে আমি একটু বলবো, সে বলবে একজন তরিকার ভাইয়ের সাথে আরেকজন তরিকার বোনের কী প্রেম? সূক্ষ্ম, শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, মধুর প্রেম। পঞ্চটা প্রেম, পঞ্চজনের মধ্যে ভাগ করা। তোমার সাথে আর তোমার তরিকার বোনের সাথে, আমার সাথে কইলেতো আবার ভেজাল লাগাই দিতে পারে, এ জন্য আমি বলবো, একজন তরিকার ভাইয়ের সাথে একজন তরিকার বোনের কোন প্রেম? এই পাঁচটা প্রেম বাদে ঐ প্রেমটা। আপনি সুন্দর মতো বলবেন। (মায়া, ২০২২ : পরিবেশনা)

এই প্রশ্নের উত্তরে লতিফ সরকার জানায় তরিকার ভাই ও তরিকার বোনের মধ্যে যে প্রেম সেটি হচ্ছে আত্মার প্রেম। এ রকম অনন্য-অসাধারণ প্রশ্ন-উত্তরের শৈল্পিক গাঁথুনীতে তরিকার ভাই-তরিকার বোন পালাটি পরিবেশিত হয়। এ কথাটিও সত্য যে পালাটি বিচারগানের আসরে নতুন সংযোজন হওয়ায় এখনও বিচারগানের সকল গায়েনের পালাটিতে অভিনয় করা হয়নি। যেহেতু পুরো বিচারগানের অন্যতম বিষয় হচ্ছে তরিকতের শিক্ষাদান, সেহেতু এটা বলা যায় প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে প্রত্যেক বিচারগানের গায়েনই তরিকতের বিষয় নিয়ে গানে-কথায় আসরে অলোচনা করেন। এই বিষয়টির সত্যতা মিলে বিচারগানের এ সময়ের তরুণ জনপ্রিয় বিচারগানের গায়ক মানিক দেওয়ানের সাক্ষাৎকারে, তিনি বলেছেন,

> আমি অনেক দিন যাবৎ বিচারগানের আসরে গায়কের ভূমিকা পালন করলেও তরিকার ভাই-তরিকার বোন পালায় গান গাওয়া হয়ে ওঠেনি। সরাসরি এই পালাটি না গাইলেও তরিকার গানতো বহু করি। আমাদের ধ্যান-জ্ঞানই তরিকা। তরিকা ছাড়া বিচারগান অচল। (মানিক, ২০২৩ : পরিবেশনা)

মূল কথা হচ্ছে, তরিকার ভাই-তরিকার বোন পালাটি স্বতন্ত্র পালা হিসেবে বিচারগানে পরে যুক্ত হলেও পরোক্ষভাবে এই পালার বিষয়বস্তু আগে থেকেই বিচারগানের আসরে চর্চিত হয়।

হাশরের মাঠ-কারবালার মাঠ

লোকনাটক বিচারগানের আসরে নবসংযোজিত পালাগুলোর মধ্যে হাশরের মাঠ-কারবালার মাঠ একটি গুরুত্বপূর্ণ পালা। এই পালাটি হাশরের ময়দান-কারবালার ময়দান নামেও পরিচিত। বিচারগানের ব্যতিক্রমধর্মী এই পালাটিতে প্রতিযোগিতার জন্য যে বিষয় দুটি নির্ধারিত, তার একটি হচ্ছে হাশরের মাঠ যেটি ইসলামধর্মের মৌলিক বিশ্বাসের অন্তর্ভূক্ত, আরেকটি বিষয় হচ্ছে কারবালার মাঠ যেটি ইসলামের ইতিহাসে ক্ষমতা কেন্দ্রিক মর্মান্তিক যুদ্ধের ঘটনা। প্রথমেই পালার বিষয় হাশরের মাঠ কী সে সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। বা এ সম্পর্কে প্রাতিষ্ঠানিক ইসলামী মতামত কী? 'হাশর' শব্দটি আরবি ভাষা থেকে এসে ধর্মীয় কারণে বাংলা ভাষায় জায়গা করে নিয়েছে। বাংলা একাডেমি প্রণীত ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে হাশরের অর্থ করা হয়েছে, 'পুনরুত্থান; কিয়ামত, শেষ বিচারের দিন; আল্লাহর

বিচারের দিন'। (এনামুল, ২০১০ : ১২০৭) অর্থাৎ হাশর শব্দের সাথে ইসলামধর্ম মতে, মানুষের জাগতিক জীবনের পরিসমাপ্তি বা মৃত্যুর পর মানুষের পাপ-পূণ্যের বিচারের দিন। হাশর সম্পর্কে মুহাম্মদ উছমান গনী বলেন,

> হাশর ও নশর তথা পুনরুত্থান ও মহামিলন বা মহাসম্মিলন অনুষ্ঠিত হবে। এদিনই শেষ বিচারের দিন এবং আখিরাত বা পরকালের অনন্ত জীবনের সূচনা এদিন থেকেই হবে, যে জীবনের আর কোনো শেষ বা সমাপ্তি নেই, নেই কোনো সীমা বা পরিসীমা। (উছমান, ২০২০ : পত্রিকা)

সহজ কথায় বললে হাশর হচ্ছে মৃত্যুর পর বিধাতা কর্তৃক শেষ বিচারের মাঠ। যেদিন সমগ্র মানবজাতির পাপ-পূণ্যের বিচারের জন্য মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এবং বিধাতা সকল মানুষের হিসেব-নিকেশ শেষে শান্তি বা শাস্তির ফয়সালা দিবেন। এই হাশরের চিন্তাটি পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি ধর্মের মধ্যেই রয়েছে। বিচারগানের আসরে হাশরের মাঠের পালায় অভিনয় করতে যেয়ে গায়েনগণ হিন্দুধর্মসহ অন্যান্য ধর্মমতের শেষ বিচারের দিনের আলোচনাও করে থাকেন। এখন কথা হচ্ছে, তাহলে হাশরের মাঠ-কারবালার মাঠ পালার কারবালার মাঠ বিষয়টি কী? ইসলামের ইতিহাস অনুসারে ৬৮০ খ্রিস্টাব্দের ১০ অক্টোবর বা ৬১ হিজরির ১০ মুহাররম তারিখে বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ইরাকের কারবালা নামক স্থানে একটি ভয়াবহ যুদ্ধের ঘটনা ঘটে। যে যুদ্ধ ইসলামধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর দৌহিত্র হযরত হোসেন (রা.) ও খলিফা ইয়াজিদের মধ্যে সংগঠিত হয়। এই যুদ্ধের ট্র্যাজিক ঘটনা বিশ্বমানবতাকে আজও বেদনাসিক্ত করে। ইতিহাসবিদদের বর্ণনায় কারবালার এই ভয়ংকর যুদ্ধের ভয়াবহতা বিভিন্নভাবে চিত্রিত হয়েছে। এই যুদ্ধে ইয়াজিদ কারবালার ফোরাত নদীর পানি কুক্ষিগত করে মরুপ্রান্তরে হযরত হোসেন (রা.) ও তাঁর অনুসারীদের পানি পিপাসায় কষ্ট দিয়ে একে একে হত্যা করেন। কারবালার প্রান্তরে শহিদের মধ্যে প্রধানতম ব্যক্তি হচ্ছেন হযরত হোসেন (রা.)। হযরত হোসেন (রা.)- কে হত্যার নিষ্ঠুরতা প্রসঙ্গে আ.জ.ম ওবায়দুল্লাহ বলেন,

> মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত ইমাম হোসাইন একাই লড়াই চালিয়ে যান। শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত নির্মম ও নির্দয়ভাবে ইমাম হোসাইনকে শহিদ করা হয়। সীমার নামক এক পাপিষ্ঠ তার মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। শাহাদতের পর ইমাম হোসাইন (রা.)-এর ছিন্ন মস্তক বর্শার ফলকে বিদ্ধ করে এবং তার পরিবারের জীবিত সদস্যদের দামেস্কে ইয়াজিদের কাছে প্রেরণ করা হয়। ইমামের খণ্ডিত মস্তক দেখে ইয়াজিদ ভীত ও শঙ্কিত হয়ে পরে। (ওবায়দুল্লাহ্, ২০২১ : পত্রিকা)

কারবালার প্রান্তরের এই যুদ্ধের নির্মমতার শোক এতোই বেদনাবিধুর যে, মধ্যপ্রাচ্য ছাড়িয়ে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মানুষের মুখে মুখে এই বেদনাগাঁথা বর্ণিত হয়। এই বেদনাসিক্ত যুদ্ধের ঘটনাকে উপজীব্য করে বাংলা সাহিত্যের খ্যাতিমান লেখক মীর মশাররফ হোসেন মহাকাব্যিক উপন্যাস লিখেছেন, যার নাম 'বিষাদ সিন্ধু'। এই 'বিষাদ সিন্ধু' বাংলায় এতোটাই জনপ্রিয় হয়েছিলো যে, এক সময় মুসলিম পরিবারগুলোতে কোরান শরিফের পাশাপাশি 'বিষাদ সিন্ধু' উপন্যাসও রাখা হতো। এই কারবালার যুদ্ধের ঘটনা ও 'বিষাদ সিন্ধু'র কাব্যিক উপস্থাপনাকে

অবলম্বন করে বাংলাদেশে বহু আঙ্গিকের লোকনাটকের উদ্ভব হয়েছে। সে সকল আঙ্গিকের বহু লোকপরিবেশনা এখনও বাংলাদেশের বিভিন্ন লোকআসরে পরিবেশিত হয়। এই পরিবেশনাগুলোর মধ্যে কারবালার জারি, জারিগান, ইমামযাত্রা ও মহররমের তাজিয়া মিছিল অন্যতম। কারবালা যুদ্ধের ঘটনা নিয়ে বাংলাদেশে পরিবেশিত লোকনাট্য প্রসঙ্গে লোকনাট্যগবেষেক সাইমন জাকারিয়া বলেন,

> কারবালার ঐতিহাসিক যুদ্ধের মর্মান্তিক আখ্যান কোথাও 'ইমামযাত্রা', কোথাও 'জারিগান' এবং মহররমের শোভাযাত্রার আহাজারিমূলক নৃত্য-গীত ও শোক প্রকাশক ভাব-ব্যঞ্জক অভিনয়ের আঙ্গিকে পরিবেশিত হয়ে থাকে। (সাইমন, ২০০৮ : ৩৫৫)

কারবালা যুদ্ধের ঘটনাকে উপজীব্য করে সম্প্রতি বাংলাদেশে লোকনাটক বিচারগানের আসরে হাশরের মাঠ-কারবালার মাঠ পালা সংযুক্ত হয়েছে। বিচারাগানের অন্যান্য পালাসমূহে পালার বিষয়ের বিপরীতমুখী অবস্থানের কারণে প্রতিযোগী গায়েনদ্বয় একে-অপরকে পালা নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করলে বা 'খোঁটা' দিলেও কারবালার মাঠ বিষয়টি বিয়োগাত্মক ও স্পর্শকাতর হওয়ায় গায়েনগণ বিপক্ষের বিষয়কে হেয় করে কথা বলেন না। তবে গায়েনদের মধ্যে একে-অপরকে ঠকানোর যে রীতি সেটি অনুপস্থিত থাকে না। এক্ষেত্রে গায়েনগণ ব্যক্তিগত বিষয়াদি কিংবা জ্ঞানের দূর্বলতাকে লক্ষ্য করে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করার চেষ্টা করেন। পালার একপক্ষ হাশরের মাঠের মানুষের অসহায়ত্ব, বিচারের কাঠগড়ায় কী হিসেব দিবে তার বর্ণনা করেন, আরেক পক্ষ কারবালা প্রান্তরে ঘটে যাওয়া করুণ ইতিহাস বর্ণনা করেন। দুই বর্ণনার মধ্যেই রয়েছে অশ্রুসিক্ত হওয়ার উপাদান। গায়েনগণ বেদনাসিক্ত হয়ে আবেগভরা কণ্ঠে আসরে পালার বিষয়কে ফুটিয়ে তুলেন। আসরে গায়েনগণ একদিকে যেমন করুণ কাহিনির বর্ণনা করেন কাব্য-কথায়, তেমনি অন্যদিকে গানে গানেও কাহিনি বর্ণনা করে থাকেন। এই বর্ণনায় আসরে গায়েন-কুশীলবসহ দর্শক-শ্রোতাও কান্নায় ভেঙে পড়েন। এ সময় আসরে 'দশা ধরা' পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। হাশরের মাঠ ও কারবালার মাঠ পালায় এই দুটি বিষয় সম্পর্কে গায়েনগণ যে সকল করুণ বর্ণনা দেন, তাহলো-

ক. মানুষের মৃত্যু বড়ই নিদারুণ কষ্টের, মৃত্যুর পর যদি হাশরের মাঠে হিসেব দিতে না পারে তবে মানুষের কপালে নরক ছাড়া গতি নেই।

খ. হাশরের মাঠে আল্লাহ আল ক্বাহার নাম ধারণ করবেন মানে মহাপ্রতাপশালী বা কঠোর। সেদিন মানুষের পূণ্য না থাকলে পরিণতি ভয়াবহ হবে।

গ. হাশরের মাঠে মানুষের মাথার এক বিঘত উপরে সূর্য থাকবে, পাপী মানুষেরা সূর্যের তাপে নাজেহাল হয়ে পড়বে।

ঘ. হাশরের মাঠে মানুষ একে-অপরকে চিনবে না, সকলেই 'আল্লাহ আমাকে বাঁচাও, বাঁচাও' বলে চিৎকার করবে।

ঙ. কারবালার মাঠের হত্যাকাণ্ড কোনো ভাষায় প্রকাশের মতো ঘটনা না, কেননা এই যুদ্ধে কোলের শিশুও তৃষ্ণার্ত হয়ে মারা গেছেন।

চ. কারবালার মাঠে হযরত হোসেন (রা.)-এর পক্ষের সৈনিক খুব অল্প তার তুলনায় ইয়াজিদের বিশাল বাহিনী। এ এক অসম যুদ্ধ, তারওপর ইয়াজিদ ছিলো পাষণ্ড।

ছ. হযরত হোসেন (রা.)-এর বুকটা তীরের আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিলো, তাঁর রক্তে কারবালার মাঠ নদী হয়ে গিয়েছিলো।

জ. কারবালার মাঠে হযরত হোসেন (রা.)-কে সিমার হত্যার পর তাঁর মাথা বর্শার ফলায় গেঁথে ইয়াজিদের দরবারে নিয়ে যায়।

হাশরের মাঠ-কারবালার মাঠ পালায় গায়েনগণ আসরে এ রকম লোমহর্ষক বর্ণনা করে থাকেন। লতিফ সরকার ও হাফিজ সরকার পরিবেশিত এই পালাটির কারবালার মাঠের পক্ষের গায়েন লতিফ সরকার মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদ সিন্ধু'-কে আশ্রয় করে করুণস্বরে বলেন,

> যখন 'বিষাদ সিন্ধু' পড়েছিলাম, চোখে জল এসে গেছিলো। কী যে নির্মম কাহিনি, কী যে কষ্টের কাহিনি। এক দেশ থেকে আরেকটা দেশের মধ্যে যদি যায়, আর যদি তাকে ঘেরাও করে, সেখানে তাদের কী হতে পারে! তবে একমাত্র আল্লাহ ছিলো তাদের সাথে। (লতিফ, ২০২১ : পরিবেশনা)

এই বর্ণনাকালে লতিফ সরকার আসরে অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়েন এবং দর্শক মঞ্চে উঠে তাকে জড়িয়ে ধরে শান্তনা দেন। বিচারগানের আসরে যেহেতু কুশীলব ও দর্শক-শ্রোতার অবস্থান পাশাপাশি থাকে, তাই বিভিন্ন মুহূর্তে তারা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় একাকার হয়ে যায়। আর এই মুহূর্তগুলোতে আসর ছাপিয়ে দর্শক-শ্রোতার মধ্যে করুণ রসের ঢেউ যেন আছড়ে পড়ে। আর এই করুণ রসের পরিস্থিতি তৈরিতে বিচারগানের কিংবদন্তি গায়কদের গানও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ রকম কিছু গান রচনা করেছেন বিচারগানের প্রয়াত গায়েন খালেক দেওয়ান। তাঁর একটি গানে কালবালার করুণচিত্র চিত্রিত হয়েছে। গানটি হচ্ছে-

> মরুভূমি কারবালা প্রান্তরে
> ইমাম বংশ কান্দে জারে জারে
> ফোরাত নদীর পানি বন্ধ করিয়াছে কুফরে ॥
> হায়রে দারুণ পানি রাখলি দুঃখের কাহিনী
> চক্ষের পানি এই চান উঠলে ঝরে (মনরে)
> আশায় গেল এই পানির আসগরের বুকেতে তীর
> মারিয়া ছিল কুফরে ॥ (হাসানুল, ১৯৯৯ : ৩৩৮)[৬৯]

এই গানটিতে কবি কারবালার ঘটনা হৃদয়স্পর্শী কায়দায় বর্ণনা করেছেন। যেখানে ইয়াজিদ কর্তৃক ফোরাত নদীর পানি সরবরাহ বন্ধকরণ, বিয়েরই পরেই হযরত কাসেম (রা.)-এর শাহাদতবরণ, শিশু হযরত আসগর (রা.)-এর নির্মম মৃত্যু প্রভৃতি উপমা-অলংকার দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। হাশরের মাঠ-কারবালার মাঠ পালায় কারবালার ঘটনার পাশাপাশি হাশর সম্পর্কিত বহু কালজয়ী লোকগান আসরে পরিবেশিত হয়। বিশেষ করে বিচারগানের সুপ্রাচীন পালা হাশর-কেয়ামত পালার হাশর বিষয় নিয়ে বহু গান কবিয়ালগণ রচনা করেছেন। যেহেতু দুটি পালার একটি বিষয় একই, সেহেতু গায়েনগণ হাশর-কেয়ামত পালার হাশরপক্ষের সমস্ত গান ও তত্ত্ব-তথ্য হাশরের মাঠ-কারবালার মাঠ পালায় হাশরের পক্ষে উপস্থাপন করে থাকেন। দেশের বহু গায়েনের রচিত হাশর সম্পর্কিত জনপ্রিয় গান রয়েছে, তার মধ্যে ঢাকার খালেক দেওয়ান, মালেক দেওয়ান, মাতালকবি রাজ্জাক দেওয়ান, মুন্সিগঞ্জের বড় আবুল সরকার, শাহ আলম সরকার, মানিকগঞ্জের আব্দুর রশিদ সরকার, নূর মেহেদী আব্দুর রহমান, ছোট আবুল সরকার (মহারাজ), নেত্রকোণার সালাম সরকার, ফরিদপুরের আব্দুল হালিম বয়াতি, আয়নাল মিয়া বয়াতি প্রমুখের গান হাশর-কেয়ামত তথা হাশরের মাঠ-কারবালার মাঠ পালায় হাশরের পক্ষে গায়েনগণ গেয়ে থাকেন। এই কালজয়ী রচয়িতাদের মধ্যে মাতালকবি রাজ্জাক দেওয়ানের নিচের গানটি হাশরের পক্ষের অভিনয়কারী গায়েন আসরে গেয়ে থাকেন।

রোজ হাশরের কথা যেন মনে থাকে তোর
একা একা চলতে হবে সঙ্গের সাথী কেও না রবে
আগুনের ফুলকি উঠবে মাথারই উপর ॥
১. ছুটির ঘন্টায় দিলে বারি লাগে যেমন দৌড়াদৌড়ি
তেমনি সকল সমান করি মাঠেরই উপর
ছয় লাখ বছর একটানা হবে বান্দা ফানা ফানা
তারপরে দিবে টানা কাঠগড়ার উপর ॥ (তপন, ২০২২ : ১০২)[৭০]

মাতালকবি রাজ্জাক দেওয়ান গানটিতে হাশরের মাঠে মানুষের কঠিন সময়ের কথা স্মরণ করানোর পাশাপাশি মানুষের দুনিয়াবী কাজের ব্যাপারে সর্তক করেছেন। তাঁর এই গানের কাব্যিক বর্ণনা ও মনোহর সুরে দর্শক-শ্রোতা আসরে বিমোহিত হয়ে পড়েন। তবে একটি কথা উল্লেখ না করলেই নয়, বিচারগানের হাশরের মাঠ-কারবালার মাঠ পালায় যে সকল বর্ণনা গায়েনগণ দিয়ে থাকেন তার বহু কথার সাথে বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের বিস্তর পার্থক্য পাওয়া যায়। এর অন্যতম কারণ গায়েনদের বেশির ভাগেরই প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা কম এবং তাঁরা গুরু-শিষ্য পরম্পরায় শুনে শুনে সমস্ত তত্ত্ব-ঘটনা আয়ত্ত করে থাকেন। যার কারণে অনেক গায়েনের পক্ষেই বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের সাথে যাচাই করা সম্ভব হয় না। এটি দোষেরও নয়, কেননা গায়েনরা কোনো ইতিহাস রচনা করেন না, তারা কেবল ইতিহাস-তত্ত্ব আশ্রয়

করে লোকসাহিত্য রচনা করেন। তাছাড়া ফোকলোরের ধর্মই হচ্ছে লোকমানুষের মুখে মুখে পরিবর্তনের ধারায় নতুন কোনো কিছুর সৃষ্টি করা।

পাগলা-পাগলী পালা

সাধারণ ও প্রচলিত অর্থে পাগল মানে উন্মাদ বা বিকৃত মস্তিষ্ক মানুষেকে বুঝায়। পাগলের পুরুষবাচক শব্দ হিসেবে পাগলাও ব্যবহৃত হয় এবং পাগলা বা পাগলার স্ত্রীবাচক শব্দ হিসেবে পাগলী বা পাগলনী ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু বিচারগানের আসরে পাগল শব্দটি ভিন্ন দ্যোতনায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিচারগানের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ শব্দটিকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেন যা অতি সম্মানের পর্যায়ভূক্ত। এ জন্য দেখা যায় বিচারগানের বহু গায়ক-গায়িকার নামের পূর্বে বা পরে উপাধি হিসেবে পাগল, পাগলা বা পাগলী শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। পাগল, পাগলা বা পাগলী উপাধি গ্রহণকারী বিচারগানের কয়েকজন শিল্পী হচ্ছেন- প্রয়াত পাগলা রশিদ (আব্দুর রশিদ সরকার), প্রয়াত পাগল বাচ্চু, পাগল মনির, পাগল সোহরাব, পাগল দুলাল, পাগল রুহুল আমিন, পাগল রফিক সরকার, জহির পাগলা, পাগল আলাউদ্দিন, নীলা পাগলী, পাগলী রুমা রহমান, লিমা পাগলী, আছমা পাগলী, শিল্পী পাগলী প্রমুখ। বিচারগানের কুশীলব ছাড়াও এই পরিবেশনার পরিবেশনাস্থল হিসেবে অগ্রগন্য বিভিন্ন মাজারে শায়িত ব্যক্তিদের নামের সাথেও রয়েছে পাগল, পাগলা ও পাগলী উপাধি। যেমন- হযরত ফৈজদ্দিন শাহ (লেংটা পাগল), হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ। এছাড়া মাজারে-মাজারে পাগল উপাধিধারণকারী বহু মানুষ ঘুরে-ফিরেন। এমনকি পাগলা উপাধিধারণকারী মরমিসাধক কেউ কেউ বাংলা অঞ্চলের সংগীত অঙ্গণে খ্যাতি লাভ করেছেন। তাদের একজন হচ্ছেন বাংলাদেশের মানিকগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণকারী ভবা পাগলা, যার সমাধি বর্তমানে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। যার গান বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছে এবং এপার বাংলা-ওপার বাংলার মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত হয়। তার মানে হচ্ছে বিচারগানের এই পাগলা-পাগলী পালা নিছক কোনো পালা নয়, এর রয়েছে গভীরতত্ত্ব সংশ্লিষ্টতা ও বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে বিচারাগানের পালা হিসেবে পাগলা-পাগলীর কী মানে? এমন প্রশ্নের জবাবে বিচারগানের নিয়মিত দর্শক ও সুফি-বাউল দর্শনে বিশ্বাসী মো. আমজেল বিশ্বাস বলেন,

> জগতে তো আমরা আসলে সবাই পাগল, কেউ টাকার পাগল, কেউ ধন-সম্পদের পাগল, কেউ নারীর পাগল, কেউ নামের পাগল, আর অল্প কিছু লোক আল্লাহর পাগল। সব পাগল হওয়া কঠিন, শুধু আল্লাহর পাগল হওয়া কঠিন। বিচারগানে এই সমস্ত ব্যাপার নিয়েও পালা হয় আর কি, পাগলা-পাগলী পালা হিসেবে খারাপ না। (আমজেল, ২০২৩ : সাক্ষাৎকার)

অর্থাৎ বিচারাগানের পাগলা-পাগলী পালাটিতে বহুমাত্রিক বিচার-বিশ্লেষণের বিষয় রয়েছে। আসরে গায়েনগণ কখনো মানুষের জাগতিক ভোগ-বিলাসে উন্মাদনা নিয়ে কথা বলেন, কখনো নারী-পুরুষের একে-অপরের প্রতি হৃদয়ের টান

থেকে যে পাগলামো হয় তা নিয়ে কথা বলেন, কখনো গুরু-শিষ্যের প্রেমের পাগলামো আবার কখনো স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে প্রেমের পাগলামো নিয়ে আলোচনা করেন। পাগলা-পাগলী পালাটি যদি আসরে চটুল পর্যায়ে পরিবেশিত হয়, তখন প্রেম-কামের বিষয় নিয়ে আলোচিত হয়ে থাকে। আর যদি আসরে উচ্চমার্গীয় পর্যায়ের পরিবেশ থাকে গায়েনগণ স্রষ্টা-সৃষ্টির প্রেম, আল্লাহ-নবির প্রেম, রাধা-কৃষ্ণের প্রেম, গুরু-শিষ্যের প্রেম, পিতা-মাতা ও সন্তানের প্রেমের যে পাগলামো রয়েছে, সেই বিষয়গুলো আলোচনা করে থাকেন। পাগলা-পাগলী পালার আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে পাগল সম্পর্কে এক পরিবেশনায় মালেক সরকার বলেন,

> আমি অশ্লীল কোনো কথা বলি নাই। আমি বলছি পাগল আর পাগলী এই দুয়ের একটা মত, এই দুইজন, আমি যেমন পুরুষ হইয়্যা পাগল হইছি, আর তুমি মেয়ে হইয়্যা পাগলনী হইছো। পদ কিন্তু দুজনের একই, একই বিষয়। তখন কেউ পাগল ধনের জন্য, কেউ পাগল বাড়ির জন্য, কেউ পাগল মেয়ে-নারীর জন্য, কেউ পাগল আল্লার জন্য। (মালেক, ২০২০ : পরিবেশনা)

গায়েন মালেক সরকারের ভাষ্য মতেও বোঝা গেলো বিচারগানের আসরে পাগলা ও পাগলী বিষয়টি বহু রকম অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আসরে এই বিষয়কেই আশ্রয় করে গায়েনগণ একে-অপরকে প্রশ্ন করেন। তবে এই প্রশ্নগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন করা হয় স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে নিগূঢ়তম প্রেমের পাগলামোর বিষয়কে আশ্রয় করে। এ রকমই একটি প্রশ্ন করেন পাগলা-পাগলী পালার একটি আসরে গায়েন নীলা পাগলী, আসরে তার বিপক্ষের গায়েন মালেক সরকারের প্রতি-

> আমার সর্বপ্রথম এই পাগলার কাছে প্রশ্ন থাকবে, আপনি খালি জবাব দিবেন এই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম পাগল কে ছিলো? কার জন্য এবং তার নাম কী? আপনার যদি জানা থাকে, সুন্দর মতো প্রশ্নের জবাবটা আসরে দিবেন। (নীলা, ২০২০ : পরিবেশনা)

এই প্রশ্নের উত্তরে মালেক সরকার বলেন, সর্বপ্রথম পাগল ছিলেন স্বয়ং আল্লাহ, তিনি সৃষ্টির জন্য পাগল হয়েছিলেন। তাঁর সৃষ্ট-মানব মুহাম্মদ (স.)-এর জন্য পাগল হয়েছিলেন। আল্লাহ মুহাম্মদ (স.)-এর জন্য পাগল আর মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর জন্য পাগল এবং তাঁর অনুসারী বা ভক্তদের জন্য পাগল। এই রকম গুরুগম্ভীর প্রশ্নের পাশাপাশি বহু কামনা-বাসনার প্রতি পাগলামোর বিষয়বস্তু নিয়ে প্রশ্ন-উত্তরের সাথে সাথে গানও পরিবেশন করেন গায়েনগণ। কোনো কোনো গান আবার বেশ চটুলও হয়ে থাকে। এ রূপ একটি গানের কয়েকটি পঙক্তি হচ্ছে-

> আমি পাগল তোমার লাগিয়া,
> পাগলী তোমারে করুম বিয়া,
> কাছে আইসা, পাশে বইসা ধর জড়াইয়া ॥
> তুমি আমার মাথার মণি,
> তপ্ত বড়, শীতল পানি গো,
> আমি সরবো না ভুল করবো না,

মাইনষ্যারে ডরাইয়া ॥ (মালেক, ২০২০ : পরিবেশনা)

পালায় স্থুল ও অশ্লীল কথাবার্তা মিশ্রিত গানের কারণে অনেক প্রবীন ও গুরুবাদী গায়েন, দর্শক-শ্রোতা পাগলা-পাগলী ধরণের পালাগুলো পছন্দ করেন না। এমনকি কোনো কোনো গায়ক ও দর্শক-শ্রোতা এই পালাকে বিচারগানের পালা হিসেবে স্বীকার করতেও দ্বিধাবোধ করেন। কেউ কেউ মনে করেন এই সমস্ত পালায় যারা অভিনয় করেন, তারা টাকা-পয়সার লোভে পালাগুলো আসরে বা সিডিতে করে থাকেন। তবে বর্তমানে প্রচারমাধ্যম ইউটিউবের কল্যাণে দেখা যায়, পালাগুলোর দর্শকদর্শন (ভিউ) অনেক। তার মানে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠী এই পালাগুলো পছন্দও করেন। বেশ কয়েকজন বিচারগানের দর্শক-শ্রোতার সাথে কথা বলে জানা গেছে, তারা মনে করেন সব ধরণের পালারই প্রয়োজন রয়েছে, কেননা বহুমাত্রিক পালা থাকলে মানুষের একঘেয়েমী কেটে যায়। অনেক পুরোনো বা প্রাচীন দর্শক আছে বিচারগান দেখতে দেখতে যেন তাদের সব মুখস্থ হয়ে গেছে। তাই তারা নতুনত্ব খুঁজেন। পাগলা-পাগলী কেন্দ্রিক বহু গুরুগম্ভীরতত্ত্বনির্ভর গানও বিচারাগানের কিংবদন্তি রচয়িতারা রচনা করে গেছেন। যে গানগুলো পাগলা-পাগলী পালা ছাড়াও বিচারগানের প্রায় সব আসরে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে গায়েনগণ গাইতে পারেন। এ রকম গান রয়েছে মাতালকবি রাজ্জাক দেওয়ানের যেখানে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ‘পাগল’ বিষয়টি তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। বিশেষ করে ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ মানুষ ও দেবতাদের আলোচনা করেছেন। তার একজন নবি মুহাম্মদ (স.) আরেকজন দেবতা শিব বা ভোলানাথ। এই দুজনকেই মাতালকবি রাজ্জাক দেওয়ান তাঁর একটি গানে পাগল বলে সম্মোধন করেছেন। গানটির দুটি ‘অন্তরা’ হচ্ছে-

২. মস্ত পাগল মোস্তফা নবি উম্মত বলে করে দাবি
দেখাইল পাগলা ছবি বিশ্বে ভুবনজোড়া
নয়ন জলে ঢেউ খেলে তার সারাজীবন ভরা
মাইর খাইয়া ক্ষমা চাইয়া আবার ডাকে আয়রে তোরা ॥
৩. আরেক পাগল পাগলা ভোলা সারাজীবন শ্মশান খোলা
বিষ পান করে গোলা গোলা জানে পাগল যারা
মাঝে মাঝে ভোম ভোলা কয় ভোলা দেয় না ধরা
কখন হাসে কখন কাঁদে কান্না-হাসি জনম ভরা ॥ (তপন, ২০২২ : ৪১১)

এই গানে যেমন ধর্মীয় পূজনীয় ব্যক্তি বা দেবতাকে বন্দনা করা হয়েছে, তেমনি বিচারগানের আরো বহু বিখ্যাত গান রয়েছে যেগুলোতে নানাভাবে পাগলতত্ত্বকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তার গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয় হচ্ছে- ক. মাজারে শায়িত অলি-সাধু শ্রেণিভূক্ত পাগলের বন্দনা ও খ. বিভিন্ন তরিকার পিরের ও তার ভক্তদের প্রেমময় পাগলামোর বন্দনা। এই বিষয় দুটির প্রথমটি মানে মাজার কেন্দ্রিক পাগলের বন্দনায় আব্দুর রশিদ সরকার (পাগলা রশিদ)-এর একটি

জনপ্রিয় গান রয়েছে। যে গানটিতে আব্দুর রশিদ সরকার অলি-শ্রেণির পাগলদের বন্দনা করেছেন। এবং সেই গানটিতে বাংলাদেশে সুফিবাদে বিশ্বাসী বহু পির-অলি-দরবেশের বর্ণনাসহ তাদের বন্দনা করেছে। গানের মাধ্যমে তিনি এই পাগলদের অত্যন্ত মর্যাদা দানের পাশাপাশি ওহাবী ধারার মোল্লাদের সমালোচনা করেছেন। আব্দুর রশিদ সরকার তাঁর গানে বলেছেন পাগলেরা মারা গেলে তাদের মাজার হয় এবং মানুষের মাঝেই আল্লাহ থাকে। তিনি গানে লিখেছেন-

> পাগল মরলে বাত্তি জ্বলে
> মুন্সি মরলে জ্বলে না
> এই মানুষে আল্লা থাকে
> মোল্লারা তা জানে না ॥
> মুন্সি মরলে বেহেস্তে যাবে
> পাগল মরলে অমর হবে
> তরিকার বাত্তি জ্বালাবে
> যে বাত্তির জ্যোত কমে না ॥ ঐ (রশিদ, ২০২০ : ১১৮-১২০)[৭১]

আব্দুর রশিদ সরকারে গানের বই ‘রশিদগীতি : মানুষে আল্লাহ থাকে’-তে উপরের গানটির মতো আরেকটি গান বাংলাদেশ ও ভারতে বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছে। গানটি হচ্ছে ‘বাবা তোমার দরবারে সব পাগলের খেলা’ যদিও গানটি কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে প্রচারিত হয়েছে। মূল গানটির ‘স্থায়ী’ হচ্ছে- ‘ফকির মওলা দরবারে সব পাগলের খেলা।/বাবায় হরেক রকম পাগল দিয়া মিলাইছে মেলা ॥’ (রশিদ, ২০২০ : ৩৮) গানটির ‘স্থায়ী’র কিছু অংশ শুধু পরিবর্তিত হয়েছে, গানের বাকি অংশ প্রায় একই রকম আছে। যদিও লোকসংগীতের বিষয়ে সুনিশ্চিত করে বলা মুশকিল। কারণ মুখে মুখে কে, কখন কিভাবে গেয়েছে তার সন্ধান পাওয়া কঠিন। প্রকৃতপক্ষে লোকসংস্কৃতি হচ্ছে অনেকটা কূলকিনারাহীন মহাসমুদ্র। বিচারগান তার একটি শক্তিশালী শাখা। এই পরিবেশনা সম্পর্কে অজস্র রকমের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থাকবে এটাই স্বাভাবিক। তাই পাগলা-পাগলী পালা সম্পর্কে সমালোচক গায়ক ও দর্শক-শ্রোতা যাই বলুক না কেন, বিষয়বস্তুর নতুনত্ব ও বৈচিত্র্যময়তার কারণে পালাটির মাধ্যমে নিঃসন্দেহে বিচারগান সমৃদ্ধ হয়েছে।

দয়াল-কাঙাল পালা

লোকনাটক বিচারাগানের ৬০টির অধিক বিষয়ভিত্তিক পালার মধ্যে দয়াল-কাঙাল পালাটি অনন্য একটি পালা। এই পালাটি বিষয়বস্তুর দিক থেকে অন্য সকল পালা থেকে আলাদা হয়েও সকল পালার নির্যাস হিসেবেই যেন আসরে পরিবেশিত হয়। পালাটি বিচারগানের জীব-পরম ও গুরু-শিষ্য পালার অনেক নিকটবর্তী একটি পালা। পালার

আলোচ্য বিষয়বস্তু স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যকার সম্পর্কের বহুমুখী বিশ্লেষণ। পালার শিরোনামের দুটি পক্ষ হচ্ছে দয়াল ও কাঙাল। দয়াল এখানে পরম-প্রভু সৃষ্টিকর্তাকে বুঝানো হয়েছে, আর কাঙাল বলতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় সৃষ্টিকে বুঝানো হয়েছে। তবে এখানে বিশেষভাবে 'দয়াল' মানে দয়াময়-দাতা এবং 'কাঙাল' মানে নিঃস্ব-দুঃখী বা যিনি কোনো কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা করেন। বিচারগানের দয়াল-কাঙাল পালায় মূলত মহাদাতা ঈশ্বর ও গ্রহীতা হিসেবে নিঃস্বজনের আখ্যান আলোচনা করা হয়। তবে পরিবেশনায় 'দয়াল' হিসেবে গুরু আর 'কাঙাল' হিসেবে শিষ্যও হিসেবে বিবেচিত হন। এছাড়া বিচারগানের দর্শন অনুযায়ী গুরু স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি হিসেবেই বিবেচিত হয়ে থাকেন। এই কারণে দয়াল-কাঙাল পালাটিতে গুরু-শিষ্যের জায়গা থেকেও গায়েনগণ আলোচনা করেন। এই দয়াল ও কাঙাল শব্দ দুটি বাংলাদেশের লোকগানের ভাণ্ডারে বহু ব্যঞ্জনায় বহু উপমায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দয়াল ও কাঙাল শব্দদ্বয় নিয়ে অজস্র গানও লোককবিগণ রচনা করেছেন। এই গানগুলোর বিপুল জনপ্রিয়তাও রয়েছে। বিশেষ করে বিচারগানের প্রতিটি পালাতেই দয়াল ও কাঙাল সম্পর্কিত গান গায়েনগণ পরিবেশন করেন। এছাড়া বিচারগানের মুর্শিদী ও বিচ্ছেদগানের মধ্যে দয়াল-কাঙাল প্রসঙ্গ নিয়ে অগণিত গান রয়েছে। যে গানগুলো আসরের শেষের দিকে বা মঙ্গলগীত পর্বে গায়করা গেয়ে থাকেন। এতে করে দর্শক-শ্রোতা করুণরসে আবিষ্ট হয়ে যান। যেহেতু গানের বিষয়বস্তু হিসেবেই দয়াল-কাঙাল প্রচলিত ও জনপ্রিয়, সেহেতু দয়াল-কাঙাল বিচারগানের স্বতন্ত্র পালা হিসেবে জনপ্রিয় হবে এটাই স্বাভাবিক। বিচারগানের স্বতন্ত্র পালা হিসেবে দয়াল-কাঙাল পালাটি কবে উৎপত্তি হয়েছে, সেটি জানা না গেলেও এটি বলা যায় যে, পালাটির উৎপত্তি খুব বেশি দিন হয়নি। বেশ কয়েকজন গায়েনের ভাষ্য মতে ও কিছু পালার ভিসিডি প্রকাশের সাল দেখে ধারণা করা যায় ২০০৫-২০১০ সালের মাঝামাঝি সময়ে পালাটির উৎপত্তি হয়েছে। পালাটির বিষয়বস্তু অনন্য হওয়ায় বিচারাগানের সব গায়েনই পালাটি ধীরে ধীরে আসরে পরিবেশন করতে শুরু করেছেন। পালাটিতে ইতোমধ্যেই অভিনয় করে বেশ কয়েকজন গায়েন সুনাম অর্জন করেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- আলেয়া বেগম, জলিল সরকার, মালেক সরকার, আল-আমিন সরকার, আলমগীর সরকার, আরিফ সরকার, দোলন সরকার, আব্বাস সরকার, পাগল সেন্টু সরকার, জালাল সরকার সাধু প্রমুখ। এই গায়কদের পরিবেশিত দয়াল-কাঙাল পালার বিভিন্ন পরিবেশনা পর্যবেক্ষণ করে পালাটিতে গায়েনদের প্রশ্ন-উত্তরের কতগুলো নির্দিষ্ট বিষয় চিহ্নিত করা গেছে। সেগুলো হচ্ছে-

ক. দয়াল কী সমগ্র সৃষ্টির প্রতি সমান দয়াশীল?

খ. দয়াল যদি দয়াবানই হবেন তাহলে মানুষের এতো দুঃখ-কষ্ট কেন?

গ. কাঙাল ছাড়া দয়ালের কোনো মূল্য আছে কী?

ঘ. দয়াল কোনো অভাবের কারণে জীব সৃষ্টি করেছেন? নাকি দয়াল নিজেও কাঙাল?

ঙ. দয়ালকে না ডাকলে কাঙালকে দয়া করেন না কেন?

চ. যে কাঙাল, দয়ালকে এতো ডাকাডাকি করছে, সেই কাঙালেরই সর্বনাশ কেন করেন দয়াল?

ছ. কাঙাল ছাড়া দয়ালের কী কোনো মূল্য আছে?

জ. বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কাঙাল ছাড়া কেউ আছেন কী?

ঝ. শ্রী কৃষ্ণ রাধার কাছে কিসের কাঙাল ছিলেন?

ঞ. নবি মুহাম্মদ (স.)-কে দয়াল বিধাতা কী কারণে এতো দুঃখ-কষ্ট দিয়েছেন?

ট. একজন গুরু নিজেও ভক্তের কাছে কিসের কাঙাল?

ঠ. প্রেমের জগতে দয়াল বড় নাকি কাঙাল বড়?

ড. দয়াল রূপী গুরু ও কাঙাল রূপী শিষ্যের মধ্যে কিসের সম্পর্ক?

ঢ. এই জগতে সবচেয়ে বড় কাঙাল কে?

ণ. দয়াল-গুরু ও কাঙাল-শিষ্যের মধ্যে কে কার উদ্ধারকর্তা?

এই রকম দ্বিপাক্ষিক প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে বিচারগানের ব্যতিক্রমধর্মী দয়াল-কাঙাল পালাটি আসরে পরিবেশিত হয়ে থাকে। আল-আমিন সরকার ও মালেক সরকারের পরিবেশিত দয়াল-কাঙাল পালায় উপরি উক্ত প্রশ্ন-উত্তরের প্রামাণ্য পাওয়া যায়। আল-আমিন সরকার কাঙালপক্ষ থেকে দয়ালপক্ষের মালেক সরকারকে প্রশ্ন করেন, কোন কারণে দয়াল জগতে একজনকে সুখে রাখেন, আরেকজনকে দুঃখে রাখেন? এই প্রশ্নের উত্তরে মালেক সরকার জানান, জগতে মানুষকে দুঃখ-কষ্ট দেয়ার মূল কারণ হচ্ছে দয়ালের নাম স্মরণ করানো। দয়াল যদি সব দিয়েই দেন, তবে মানুষ তো দয়ালকে আর ডাকবে না। তাছাড়া জগতে সবই দয়ালের লীলা মাত্র। দয়ালের নিকট ধনী-গরীব, সুখ-দুঃখ সবই সমান। তিনি সব কিছুতেই পরম আনন্দের উপাদান রেখেছেন। দয়াল-কাঙাল পালার পরিবেশনায় বিচারগানের বহু চমৎকার গান পরিবেশিত হয়ে থাকে। দয়াল-কাঙালের মধ্যে যে গুরুবাদী দর্শন রয়েছে, সেই দর্শনকে উপজীব্য করে বহু গান বাংলার লোককবিগণ গান রচনা করেছেন। এমনকি বিচারগানের সাথে সম্পর্কিত কবিগানেরও দয়াল-কাঙাল সংক্রান্ত বহু গান রয়েছে। কবিগানের বিখ্যাত কবিয়াল বিজয় সরকারের 'জানিতে চাই দয়াল তোমার আসল নামটা কী' কিংবা 'দয়াল চির কাঙাল করে দাও আমায়'-সহ বহু কবিয়ালের দয়াল-কাঙাল সম্পর্কিত গান রয়েছে। বর্তমানে কবিগানের এই সমস্ত গান বিচারগানের আসরে পরিবেশিত হয়ে থাকে। বিশেষ করে দয়াল-কাঙাল পালাটিতে আবশ্যিকভাবেই গানগুলো পরিবেশিত হয়ে থাকে। বিচারাগানের কিংবদন্তি গায়ক ও রচয়িতাদের প্রায় সকলে দয়াল-কাঙাল প্রসঙ্গ নিয়ে গান রচনা করেছেন। যেমন- খালেক দেওয়ানের 'দয়াল বলে দেরে ধ্বনি/আয় চলে আয় বেলা বয়ে যায় আড়ালে লুকায় দিনমনি॥'; 'দয়াল তুমি দয়া কর দীন হীনে/দয়া কর তুমি

কৃপা কর এই অধীনো॥'; মাতালকবি রাজ্জাক দেওয়ানের 'দয়াল চান্দে তরী বাইয়া যায়/ তোরা কে কে যাবি আয়রে আয়॥'; আব্দুর রশিদ সরকারের 'দয়াল চান্দের প্রেমবাজারে আমায় চল লইয়া/আমার পুড়া দেহ শীতল করবো গো/মুর্শিদ চাঁদ তোমাকে দেখিয়া॥' এ রকম বহু বিচারগানের লোককবিদের গান রয়েছে। বিশেষ করে বিচারগানের আদি গায়কদের মধ্যে অন্যতম একজন আলফু দেওয়ান, তাঁর রচিত দয়াল সম্পর্কিত চমৎকার একটি গান হচ্ছে-

ওহে দয়াল, আমা হতে, দয়াময় নাম যাবে হে জানা
দয়া যারে পার তারে কর আমি কী চাই না ॥
১। ওহে দয়াল বংশীধারি আমায় করেছ কড়ার ভিখারী
তবু যেন তর ঐ রূপ হেরি মায়ায় ভুলি না
গৃহ ছাড়া করলে মোরে, এই ছিল তোমার অন্তরে
আমায় নিরাশ কইরা গাছতলাতে নিতে পারবা না ॥ (শাকির, ২০১৫ : ৬৪)[৭২]

উপরের গানটিতে দয়াল-কাঙাল পালায় কাঙালপক্ষ হতে আরাধনা-প্রার্থনা করে দয়ালের নিকট নিজের দুঃখের কথা বলা হয়েছে এবং দুঃখ থেকে পরিত্রাণের জন্যও আকুতি জানানো হয়েছে। সেই সাথে দয়ালের মহিমায় গুণকীর্তনও করা হয়েছে। মূল কথা হচ্ছে দয়ালের প্রতি কাঙালের আজন্মের চাওয়া-পাওয়ার যে বিষয়টি সেটিই গানে প্রকাশ হয়েছে। পালাটিতে এই রকম অসংখ্য গানের কারণেই দর্শক-শ্রোতার নিকট দয়াল-কাঙাল পালাটি ক্রমেই জনপ্রিয় হচ্ছে। তাছাড়া দয়াল-কাঙাল পালাটির জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ হচ্ছে তরিকতপন্থী বা গুরুবাদী মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস। এই শ্রেণির জনগোষ্ঠী মনে করেন দয়ালের কৃপাতেই জগতে সব হয়, তাই কাঙাল রূপে তার নাম জপতে হবে। এই দর্শনই যেহেতু দয়াল-কাঙাল পালার আলোচনার মূখ্য বিষয়, সেহেতু পালাটি দিনে দিনে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হচ্ছে। সর্বোপরি দয়াল-কাঙাল পালা সম্পর্কে বলা যায়, পালাটির ব্যতিক্রমী বিষয়বস্তুর জন্য যেমন জনপ্রিয়, তেমনি নতুন বিষয়ের পালার সংযোজনে লোকনাটক বিচারগানও বৈচিত্র্যময় পরিবেশনায় পরিণত হয়েছে।

এজিদি ইসলাম-মুহাম্মদি ইসলাম পালা ও কোরান-বিজ্ঞান পালা

লোকনাটক বিচারগানের এজিদি ইসলাম-মুহাম্মদি ইসলাম পালা ও কোরান-বিজ্ঞান পালা নামে দুটি পালা সম্পর্কে খুবই সামান্য তথ্য-প্রামাণ্য পাওয়া গেছে। এই পালা দুটি এখন পর্যন্ত দুটি আসরে পরিবেশিত হয়েছে বলে জানা গেছে। বিচারগানের প্রয়াত গায়েন অসীম দাস বাউল এক পরিবেশানায় জানিয়েছেন, কিংবদন্তি গায়েন আব্দুর রশিদ সরকার কোনো এক আসরে এজিদি ইসলাম-মুহাম্মদি ইসলাম পালা নামে একটি পালার প্রর্বতন করেন, যে পালায় অসীম দাস বাউল নিজে এবং অন্য একজন গায়েন অভিনয় করেছিলেন। এছাড়া এ পালাটি আর কখনো আসরে পরিবেশিত হয়েছে, এমন কোনো তথ্য-প্রামাণ্য পাওয়া যায়নি। আর ২০২১ সালে বিচারগানের এক আসরে কোরান-

বিজ্ঞান পালা নামে একটি পালা যুক্ত হয়েছে বলে জানা গেছে। পালাটিতে সর্বপ্রথম মুন্সিগঞ্জের বড় আবুল সরকার ও লতিফ সরকার অভিনয় করেছেন। এছাড়া পালাটিতে আর কোনো গায়েন অভিনয় কেউ করেছেন বলে জানা যায়নি। তবে আশা করা যায়, বিচারগানের আসরে যুক্ত এই পালা দুটিও অন্যান্য পালার মতোই বিকশিত হবে এবং বিচারগানের আসরে নিয়মিত পরিবেশিত হবে।

চিত্র-২৩: বিচারগানের গায়েন (বাম থেকে) লতিফ সরকার ও বড় আবুল সরকার।

চতুর্থ অধ্যায়

বিচারগানের আঙ্গিক-বৈচিত্র্য

নাটককে দৃশ্যকাব্য হিসেবেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। এর কারণ নাটক কতগুলো দৃশ্যমান উপাদানের সহযোগে কুশীলবদের অভিনয়ের মাধ্যমে মঞ্চে দৃশ্যায়িত হয়। এই দৃশ্যায়ন প্রক্রিয়াটি নাটকের চূড়ান্ত রূপ। প্রত্যেকটি নাটক দর্শকসম্মুখে দৃশ্যায়িত হওয়ার জন্য কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের প্রয়োজন হয়ে থাকে। তার মধ্যে অভিনয়, পরিবেশনা-কাঠামো, দর্শক-শ্রোতা, আসর, আসন, আলো, শব্দ ও দ্রব্য-সামগ্রী উল্লেখযোগ্য। এছাড়া অভিনেতার পোশাক-সাজসজ্জাও রয়েছে। কারণ নাটক দর্শক সম্মুখে দৃশ্যায়িত করার জন্য নাটকের গল্প ও চরিত্র অনুযায়ী পোশাক খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আর নাটকের দৃশ্যগত প্রত্যেকটি উপাদানই আঙ্গিক হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। যেহেতু নাটক দৃশ্যমান হওয়ার জন্য কতগুলো বিষয় অন্তর্ভূক্ত হয়, যার সবই প্রায় বস্তুগত বা অভিনেতা-অভিনেত্রীর শরীরের সাথে সম্পর্কিত সেহেতু নাটকের বস্তুগত দৃশ্যমানতার জন্য যা কিছুর প্রয়োজন হয় তাকে সামগ্রিকভাবে আঙ্গিক বা গঠন-শৈলী বলা যায়। নাটকের রীতিভেদে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকের অবতারণা হয়ে থাকে। এ বিষয়টি লোকনাটক বিচারগানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সমৃদ্ধ আঙ্গিকের জন্যই লোকনাটক বিচারগান স্বতন্ত্র লোকপরিবেশনা হিসেবে বাংলাদেশে বর্তমানে বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছে। যাহোক, লোকনাটক বিচারগান দর্শক-শ্রোতাদের সম্মুখে উপস্থাপনের জন্য আসরে যা কিছু দৃশ্যমান হয়, তার প্রত্যেকটি বিষয়ই পরিবেশনাটির বৈচিত্র্যময় আঙ্গিক উপাদান। কিংবা বিচারগান পরিবেশনার জন্য আসরে যে সব উপাদানের সম্মিলন হয় তাকে একত্রে এই পরিবেশনাটির আঙ্গিক বলা যায়। পরিবেশনাটির আঙ্গিক-বৈচিত্র্য বলতে কতগুলো আবশ্যিক উপদান রয়েছে, যা এই পরিবেশনাটিকে বাংলাদেশের লোকনাটকে স্বতন্ত্র নাট্যাঙ্গিক হিসেবে পরিচিতি দান করেছে। বিচারগানের বৈচিত্র্যময় আঙ্গিক উপাদানগুলো হচ্ছে- বিচারগানের পরিবেশনা-কাঠামো; বিচারগানের চরিত্র পরিচিতি; বিচারগানের বিচারক বা বিজ্ঞশ্রোতা; বিচারগানের কুশীলবদের অভিনয় প্রস্তুতি; বিচারগানের অভিনয় পদ্ধতি; বিচারগানের পৃষ্টপোষক ও কুশীলবের বায়না; বিচারগানের কুশীলবদের পোশাক ও সাজসজ্জা; বিচারগানের আসর-আসন ব্যবস্থাপনা ও সাজঘর; বিচারগানে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র; বিচারগানে আলো, শব্দ ও দ্রব্য-সামগ্রীর ব্যবহার এবং বিচারগানের প্রচারণা প্রভৃতি। সর্বোপরি বিচারগানের এই আঙ্গিক উপাদানগুলোই বিচারগানকে পরিবেশনার দিক থেকে বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে। বিচারগানের আঙ্গিক-বৈচিত্র্য বোঝার জন্য পরিবেশনাটির আঙ্গিক উপাদান নিয়ে এ পর্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিচারগানের পরিবেশনা-কাঠামো

বাংলাদেশের লোকনাটক প্রধানত প্রথা ও ঐতিহ্যের ধারায় ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে বিশেষ কাঠামোতে পরিবেশিত হয়ে থাকে। এই পরিবেশনা-কাঠামো একেবারেই আবদ্ধ নয়। কেননা লোকনাটক কালের স্রোতধারায় সদা পরিবর্তনশীল। লোকনাটেকের পরিবেশনায় দেখা যায়, কুশীলবদের অভিনয়ের সুবিধার্থে পরিবেশনা-কাঠামোর উপস্থাপনে ভিন্নতা। লোকনাটক বিচারগানও এই পরিবেশনা-কাঠামোর বাইরে নয়। তবে বিচারগান লোকনাটকের স্বতন্ত্র আঙ্গিকে পরিচিত হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে এর স্বতন্ত্র পরিবেশনা-কাঠামো। অন্যান্য লোকনাট্যাঙ্গিকগুলোর পরিবেশনা-কাঠামোর মধ্যে একটি আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে। বিচারগানের সাথে এই পরিবেশনা-কাঠামোগত সম্পর্ক যেমন আছে, তেমনই বিস্তর পার্থক্যও রয়েছে। তার প্রধান কারণ হচ্ছে এই আঙ্গিকটি একটি প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশনা। যার কারণে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশনাগুলোর সাথেই বিচারগানের পরিবেশনা-কাঠামোর সাদৃশ্য বেশি। বিশেষত কবিগান, জারিগান ও ধুয়াগানের সাথে বিচারগানের পরিবেশনা-কাঠামোর মিল রয়েছে। বাংলাদেশে অঞ্চলভেদে যে সব আঙ্গিক ও পরিবেশনা রীতির লোকনাটক রয়েছে, তার প্রতিটি আঙ্গিকের পরিবেশনা-কাঠামো প্রায় একই রকম। লোকনাট্যের পরিবেশনা-কাঠামোকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

ক. বন্দনা পর্ব

খ. মূল আখ্যান পর্ব

গ. মঙ্গলগীত পর্ব

তবে এই তিনটি পর্বের মধ্যেই নানা রকম উপাখ্যান বা বৈচিত্র্যময় বিষয় যুক্ত থাকে। লোকনাট্যের পরিবেশনা-কাঠামো নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে মোহাম্মদ সাইদুর বলেন,

> প্রথমেই মূল সরকার বা সূত্রধর আসরে উপস্থিত হয়ে করজোড়ে বা বিনীতভাবে প্রস্তাবনার আকারে সেদিনের অভিনীত পালা সম্পর্কে শ্রোতাদেরকে অবহিত করতেন। সূত্রধরের প্রস্তাবনার পর পরই শুরু হতো বাদ্যযন্ত্রীদের ঐকতান। এরপর সূত্রধর বা নর্তক-নর্তকীর বন্দনা, বন্দনার পর শুরু হতো মূল পালা। মূল পালা বা কাহিনীর অভিনয়েও নানা ফর্মের প্রচলন ছিলো, যেমন- অভিনয়, নাচ, গান, গীত, বাদ্য ও হাস্য কৌতুক। এসব মিলিয়ে মূল কাহিনীর অভিনয় শেষ হতো। (সাইদুর, ২০১৭ : ১৪৪)

এখানে গবেষকের বিশ্লেষণে লোকনাট্যের পরিবেশনা-কাঠামোতে মূলত তিনটি অংশই পাওয়া যায়। তিনি বন্দনার পূর্বে সূত্রধরের প্রস্তাবনা, বন্দনার পরে মূল পালা বা কাহিনির কথা উল্লেখ করেছেন। আর মূল পালা বা মূল আখ্যানের মধ্যে অন্যান্য উপাদান, যেমন- অভিনয়, নাচ, গান, বাদ্য ও হাস্য-কৌতুকের সম্মিলন ঘটেছে। পালার শেষে প্রায়

সব লোকনাট্য পরিবেশনায় মঙ্গলগীত বা সমাপনী গীত থাকে সে বিষয়ে আলোকপাত করেননি। উপরিউক্ত পরিবেশনা-কাঠামো বিবেচনায় রেখে লোকনাটক বিচারগানকে পরিবেশনা-কাঠামোর দিক থেকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা-

ক. যন্ত্রসংগীত

খ. প্রস্তাবনা

গ. বন্দনা

ঘ. মূল আখ্যান

ঙ. মঙ্গলগীত বা বিচ্ছেদ গান

এই পাঁচ ভাগের সমন্বয়ে পরিবেশিত হয়ে লোকনাটক বিচারগান উপস্থিত সুধীজনের সামনে প্রশ্ন-জিজ্ঞাসার মাধ্যমে বিষয় থেকে বিষয়ান্তর অবতারণা করে। নিচে প্রতিটি ভাগ বিশ্লেষণ করা হলো।

ক. যন্ত্রসংগীত

বাংলাদেশের সব অঞ্চলের পরিবেশনাতেই বিচারগানের শুরুতে গায়েনগণ তাদের যন্ত্রীদল সহযোগে যন্ত্রবাদন করে থাকেন। এই যন্ত্রসংগীত শুধু পরিবেশনার শুরুতেই করেন না বরং দুই দলের শিল্পীগণ প্রতি আসরের (প্রত্যেক গায়েনের খণ্ড খণ্ড পরিবেশনার অংশকে এক আসর গান গাওয়া বা এক ‘স্টেজ’ গান গাওয়া বলে) শুরুতেই এই যন্ত্রসংগীত করেন। অর্থাৎ একজন শিল্পী ও তার দল যতবার আসরে দাঁড়িয়ে গান করেন ততবারই প্রথমে যন্ত্রসংগীত বা যন্ত্রবাদন করেন। এই যন্ত্রসংগীত বা যন্ত্রবাদন প্রসঙ্গে বিচারগানের বেশ কয়েকজন গায়েনের[৭৩] সঙ্গে আলোচনা করে জানা যায়, যন্ত্রবাদনের দ্বারা মূলত আসরে দর্শক-শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়। তাছাড়া দীর্ঘসময় ব্যাপী পরিবেশনা হওয়ার কারণে আসরের দর্শক-শ্রোতাদের ওঠা-বসার বিরতি হিসেবেও যন্ত্রবাদন করা হয়। যাতে মূল পরিবেশনার সময় দর্শক-শ্রোতাদের ওঠা-বসা বা কথাবার্তার কারণে পরিবেশনায় বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়। প্রকৃতপক্ষে যন্ত্রবাদন বিচারগানের মূল পরিবেশনা না হয়েও পরিবেশনা উপস্থাপনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এই যন্ত্রবাদনের ক্ষেত্রে প্রধানত দেশাত্মবোধক গানের সুর বাজানো হয়। কখনও কখনও জনপ্রিয় লোকগান বা চলচ্চিত্রের সুর অথবা জাতীয় সংগীতও বাজানো হয়ে থাকে।

খ. প্রস্তাবনা

বিচারগানের পরিবেশনা-কাঠামোতে প্রস্তাবনা অংশে বিচারগানের মূল গায়েন নিজেই বন্দনার শুরুর আগে গদ্য বা কাব্যে আসরে অবস্থানরত বিজ্ঞজন, অতিথি ও দর্শকদের উদ্দেশ্যে ভক্তি নিবেদন ও প্রাথমিক কুশল বিনিময় করেন। বিচারগানের প্রারম্ভে এ রকম প্রস্তাবনা বাংলাদেশের সব অঞ্চলের পরিবেশনাতেই লক্ষ্য করা যায়। এখানে ঢাকা অঞ্চলের বিচারগানের শিল্পী ছোট আবুল সরকার ও ময়মনসিংহ অঞ্চলের বিচারগানের শিল্পী সুনীল কর্মকারের মধ্যকার একটি পরিবেশনায় আবুল সরকারের প্রস্তাবনাকে উদাহরণ হিসেবে আনা যেতে পারে। যেখানে গায়েন বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি ভক্তি রেখে বন্দনা করেন। ছোট আবুল সরকারের প্রস্তাবনাটি একটু দীর্ঘ হলেও এখানে উপস্থাপন করা হলো:

> পরম করুণাময়ের কাছে করুণা ভিক্ষা চেয়ে, সৃষ্টিতে প্রেমাস্পদ যার খাতিরে যার মহব্বতে আল্লাহ-তায়ালা তামাম জাহানকে সৃষ্টি করেছেন, আপনাকে আমাকে। সে হুজুর হযরত আহাম্মদে মোস্তফা, মোহাম্মদে মোস্তফা, হযরত মোহাম্মদ (স.), খাতুনে জান্নাত মা ফাতেমা, মওলা আলী মুশকিল কুশা, মওলা ইমাম হাসান, মওলা ইমাম হোসেন, আহলে বাইয়েত পাক-পাঞ্জাতনের প্রতি শতকোটি ভক্তি-চুম্বন রেখে, আমার মুর্শিদে মোকাম্মেল গাউসুল আজম বৈরিয়াবর পাক দরবার শরিফের আওলাদে রসুল হযরত হাসিবুল হাসান আল চিশ্‌তি নিজামি (র.), বাবাজান কেবলার রওজায় শতকোটি ভক্তি-চুম্বন রেখে, সকল আওলাদে রসুলদের প্রতি ভক্তি-চুম্বন রেখে, আমার গানের গুরু, গানের ওস্তাদ প্রয়াত আলহাজ্ব রশীদ সরকার আল চিশ্‌তি-নিজামি ওরফে রশীদ সাঁইজি (র.) বাবাজানের রওজা মোবারকে শতকোটি ভক্তি-চুম্বন রেখে, আমার আম্মা হুজুরের কদমে ভক্তি-চুম্বন রেখে, ফকির মওলা দরবার শরিফের বর্তমান গদিনশিন পির কেবলা আমার তরিকার ভাই সৈয়দ গোলাম শফিউল বাশার আল চিশ্‌তি নিজামির কদমে ভক্তি-চুম্বন রেখে, দরবারের ভবিষ্যৎ কর্ণধার শিবলী চাঁন তার প্রতি মহব্বত-ভালোবাসা আশীর্বাদ রেখে, এ দরবারের যত ভক্তবৃন্দ, যত আশেকান, জাকেরান, সকলের প্রতি সালাম শ্রদ্ধা-ভালোবাসা রেখে…এবং দরবারের যত ভাই-বোন শিল্পীবৃন্দ আছেন, তাদের প্রতিও সালাম-ভালোবাসা রেখে, মহব্বত রেখে, দরবারকে যারা ভালোবেসে এসেছেন, গান শোনার জন্য আশেক হয়ে এসেছেন, দরবারের ভক্ত, আমার বাবাজান কেবলার ভক্ত এবং শফিউল বাশার আল চিশ্‌তি নিজামির ভক্ত এবং যত পির-মাশায়েখের দরবার থেকে এসেছেন সকল সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের কদমে আমি অধমের ভক্তি রেখে আমি আমার কর্তব্য কাজ আরম্ভ করতে যাচ্ছি। আমার প্রতিপক্ষ শিল্পী দেশে ও দেশের বাহিরেও যার অনেক সুনাম-খ্যাতি বাবু সুনীল কর্মকারের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে, উভয় দলের তালসংগীতে যারা, তাদের প্রতি আমার সালাম-ভালোবাসা রেখে, ইতিহাসের রাখাল রাজা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর সমাধিতে আমার হাজারও শ্রদ্ধা-ভক্তি রেখে, বাংলার জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম (র.) তাঁর দরবারে ভক্তি-চুম্বন রেখে, আত্মার বিজ্ঞানী কুষ্টিয়ার লালন সাঁইজি ফকির এবং নেত্রকোনা ময়মনসিংহের কবি জালাল উদ্দিন খাঁ, সাধক রজ্জব আলী দেওয়ান, সাধক হালিম চিশ্‌তি, সাধক খালেক দেওয়ান, মালেক দেওয়ান, দলিল উদ্দিন বয়াতি, আলফো দেওয়ান, মাতালকবি রাজ্জাক দেওয়ান, এমনি করে আমাদের জন্য যারা লিখেছে, গেয়েছে, গবেষণা করেছে, আমি সকল বাবাদের রওজায় ভক্তি-চুম্বন রেখে, আমি আমার কর্তব্য কাজ আরম্ভ করতে যাচ্ছি, আস্‌সালামু আলাইকুম, ওয়া রহমাতুল্লাহ, ওয়া বরকাতুহু। (ছোট আবুল, ২০২০ : পরিবেশনা)

বিচারগানের পরিবেশনা-কাঠামোতে প্রস্তাবনা একটি অবিচ্ছেদ্য ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যেখানে মূলত গায়েনগণ গদ্যে বা কাব্যে বিচারগানের সাধক, মহাজন, গুরু, পির, গোঁসাই, বৈষ্ণব, আদি বাউল-কবি-শিল্পী, জাতীয় মহাপুরুষ, আসরে উপস্থিত বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ, সাধারণ শ্রোতা-দর্শক, বিপক্ষের শিল্পী ও যন্ত্রীদলের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদন করে থাকেন। এই প্রস্তাবনার মাধ্যমে উপস্থাপকের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরিধি বোঝা যায়। তিনি যে একক বা স্বয়ম্ভু নন, তাঁর যে বিনয় ও কৃতজ্ঞতা রয়েছে এ সবই প্রস্তাবনায় উঠে আসে। এই অংশটি পরম্পরার প্রতি আনুগত্য প্রকাশক বলে খুবই আকর্ষণীয়।

চিত্র-২৪ : বিচারগানের গায়েন (বাম থেকে) ছোট আবুল সরকার ও সুনীল কর্মকার।

গ. বন্দনা

বন্দনার মধ্য দিয়েই বিচারগানের মূল পরিবেশনা শুরু হয়। বন্দনার মধ্যে সৃষ্টিকর্তা, ধর্মপ্রবর্তক, সাধু-মুনি-ঋষি, পির-গোঁসাই, মাজার-মন্দির, সমাজপতি, প্রতিপক্ষ শিল্পীবৃন্দের প্রতি ভক্তি নিবেদন করে নিজের পরিচয় প্রদান করে থাকেন। বিচারগানের বন্দনা পর্বটি বাংলাদেশের লোকনাট্যের অন্যান্য আঙ্গিকগুলোর বন্দনার বৈশিষ্ট্যের সাথে অনেকাংশেই মিল রয়েছে। তবে বিচারগানের বন্দনার সাথে বেশি মিল পাওয়া যায় কবিগানের। কবিগানের বন্দনার পদ্ধতি সম্পর্কে সাইমন জাকারিয়া লিখেছেন-

> সাধারণত একটি বা দু'টি ডাক বা বন্দনা দিয়ে কবিগানের আসর শুরু করা হয়। এক্ষেত্রে দৈন্যপর্বের গান গেয়ে বন্দনাগীত পরিবেশন করেন। প্রথম ডাক বা বন্দনাগীতের মধ্যে থাকে 'এসো দীনবন্ধু হরি' জাতীয় গান এবং দ্বিতীয় ডাক বা বন্দনায় থাকে 'বিশ্বের সকল গান সবই তার দান' জাতীয় গানের পরিবেশনা। উল্লেখ্য, কবিয়ালদের সহযোগীরাই সাধারণত ডাক বা বন্দনাগীত গেয়ে থাকেন। ডাকের শেষ পর্যায়ে কবিয়ালদ্বয় আসরে এসে বসেন। (সাইমন, ২০০৮ : ৪৬৪)

বিচারগানের ক্ষেত্রেও তাই। তবে পরিবেশনা ও আঙ্গিকগত জায়গা থেকে বিচারগানের নিকটতম পরিবেশনা কবিগানের বন্দনারীতির সাথে মিল থাকলেও কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়। কবিগানে সহযোগী শিল্পীরাই মূলত বন্দনা

গেয়ে থাকেন। কিন্তু বিচারগানে বন্দনা মূল গায়েনগণই গেয়ে থাকেন এবং সহযোগী শিল্পীরা শুধু দোহার ধরেন। এই রীতি বা ধারাটি দেশের সব অঞ্চলেই প্রায় একই রকম। গায়েনগণ নিজ অঞ্চলের শিল্পীদের রচিত বন্দনাই বেশি পরিবেশন করেন। এছাড়া গায়েনের নিজের রচিত অথবা গায়েনের গানের গুরুর রচিত গান আসরে বেশি করেন। এক্ষেত্রে দেখা যায়, ঢাকা অঞ্চলের বিচারগানের গায়করা এই অঞ্চলের আদিগায়ক, যেমন- রজ্জব আলী দেওয়ান, খালেক দেওয়ান, মালেক দেওয়ান, আলফো দেওয়ান কিংবা মাতাল রাজ্জাক দেওয়ান ও আ. রশিদ সরকারের রচিত বন্দনাই বেশি পরিবেশন করেন। অন্যদিকে সিলেট অঞ্চলের গায়কগণ ঐ অঞ্চলের বিখ্যাত ও প্রয়াত বাউল শাহ্ আবদুল করিম, ক্বারি আমির উদ্দিন বয়াতি প্রমুখের বন্দনাগীত বেশি করেন। ময়মনসিংহ অঞ্চলের বিচারগানের গায়করা জালাল উদ্দীন খাঁ, উকিল মুন্সি রচিত বন্দনা অধিক পরিবেশন করেন। নেত্রকোণার সালাম সরকার তাঁর নিজের রচিত বন্দনা বেশি গেয়ে থাকেন। সোহাগ সরকার, হবিল সরকার তাদের গুরু সালাম সরকারের রচিত বন্দনা বেশি পরিবেশন করেন। অন্যদিকে ফরিদপুর অঞ্চলের বিচারগানের গায়কগণ সে অঞ্চলের আদিগায়ক বিখ্যাত আ. হালিম বয়াতি ও সদ্যপ্রয়াত আয়নাল বয়াতির রচিত বন্দনা আসরে বেশি গেয়ে থাকেন।

তবে বিচারগানের শিল্পীগণ নিজের কিংবা অন্যের রচিত যে বন্দনাগীত পরিবেশন করেন না কেন, বন্দনার মর্মবাণী প্রায় একই রকম হয়। যেখানে প্রকাশ পায় ভক্তি-প্রেম, শ্রদ্ধা নিবেদন, ক্ষমা প্রার্থনা, ধর্মীয় সম্প্রীতির বাণী প্রচার, মানবতাবাদ এবং শিল্পীর আত্মপরিচয়। বাংলাদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকটি বহুল জনপ্রিয় বন্দনা রয়েছে। তার মধ্যে কিছু বন্দনাগীত গায়েনগণ বেশি গেয়ে থাকেন। ঢাকা অঞ্চলের বিখ্যাত বিচারগানের গায়ক প্রয়াত মাতালকবি রাজ্জাক দেওয়ান রচিত জনপ্রিয় কয়েকটি বন্দনাগান রয়েছে। তাঁর বিপুল জনপ্রিয় একটি বন্দনাগান হচ্ছে-

> তুমি নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ ॥
> তুমি আল্লা, তুমি হরি, তুমি গোলকের গোঁসাই
> তুমি কালা, তুমি কালী, তুমি কলঙ্কিনী রাই
> তুমি রামের দৌহিতা, বনবাসী সীতা
> ভাগবত কোরান, গীতা তোমায় যাচে অনুক্ষণ ॥
> আদি হইতে অনন্তকাল তোমার ছবি আঁকিয়া
> কূল পাইলো না হাদিস-ফেকা, ভাগবত কোরান দিয়া
> অনাদিরও আদি তুমি বিধির বিধি
> তোমাকে সাধি আমি বিপদ ভূঞ্জন ॥ (কাজল, ২০১৯ : পরিবেশনা)[৭৪]

বিচারগানের আসরে পরিবেশিত এই বিখ্যাত বন্দনাগানটি গায়েন, দর্শক-শ্রোতার নিকট বিপুল জনপ্রিয়। অভিসন্দর্ভে সংযুক্ত এই বন্দনাটির প্রথম চারটি ‘অন্তরা’ মাতালকবি রাজ্জাক দেওয়ানের রচিত আর বন্দনার বাকি অংশ আসরে

বন্দনা পরিবেশনাকারী গায়েন কাজল দেওয়ানের তাৎক্ষণিক রচনা ও পরিবেশনা। কাজল দেওয়ানের রচিত ও পরিবেশিত বর্ধিত অংশটুকুর মতো বিচারগানের সব গায়েন বন্দনা-পরিবেশনাকালে বন্দনাগানের সাথে তাৎক্ষলিকভাবে অন্তমিলের গাঁথুনীতে আসরে বর্ণনা করে থাকেন। কাজল দেওয়ান পরিবেশিত এই বন্দনাগানটিতে যেমন বিখ্যাত ও প্রয়াত সুফি-বাউলদের নাম উল্লেখ করে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে, তেমনি বিচারগানের প্রত্যেকটি আসরেই গায়েনগণ বিভিন্ন তাপস-সাধকদের নামের ওপর শ্রদ্ধা নিবেদন করে থাকেন। এছাড়া মাতালকবি রাজ্জাক দেওয়ান রচিত এই বন্দনাগানটিতে যেভাবে আন্তঃধর্মীয় বিশ্বাসকে আশ্রয় করে সম্প্রীতির বাণী বর্ণিত হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। এমনকি এই গানের মাধ্যমেই বিচারগানের গায়েনদের দর্শনের চিত্র ফুটে উঠেছে। এই বন্দনাগানটি বিচারগানের গায়ক ও লোককবিদের বন্দনার উদারহরণ, একই রকম বিষয় পাওয়া যায় ময়মনসিংহ অঞ্চলের বিচারগানের গায়ক সুনীল কর্মকার পরিবেশিত একটি বন্দনাগানে, যে গানটির রচয়িতা বাউলকবি মনমোহন। এই গানটিতেও সৃষ্টিকর্তার বন্দনার পাশাপাশি বিভিন্ন সাধুব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে। এছাড়া গানে গায়েনের গুরু-শিষ্য পরম্বরাও বর্ণিত হয়েছে। যা প্রত্যেক বিচারগানের প্রত্যেক গায়েনই বন্দনাগানের মধ্যে বর্ণনা করে থাকেন। সুনীল কর্মকার পরিবেশিত বন্দনাগানের প্রথম তিনটি ‘অন্তরা’ বাউলকবি মনমোহন রচিত, বাকিটুকু আসরে তাৎক্ষণিকভাবে গায়েন নিজে রচনা করে পরিবেশন করেছেন। সুনীল কর্মকারের পরিবেশনা থেকে সংগৃহীত বন্দনাগানটি হচ্ছে-

হৃদে থাকো, হৃদে জাগো, হৃদে মাখো প্রেম তোমারি,
আমার হৃদয় ছেড়ে আর কোথাও যেয়ো না হে দয়াল হরি ॥
হৃদয়ের দেবতা তুমি, অনুগত সেবক আমি,
শিখাইয়া দাও সেবাব্রত, শ্রীপদে মিনতি করি ॥
বসে আছি হাল ছাড়িয়ে, অকূলে তরী ভাসিয়ে,
মনের মতন সাধন দিয়ে মনমহনের মন লও কাড়ি ॥ (সুনীল, ২০২০ : পরিবেশনা)[৭৫]

উপরের বন্দনাগানটির মতো রাজবাড়ি তথা বৃহত্তর ফরিদপুর অঞ্চলের বিচারগানের গায়েন ফকির আবুল সরকার পরিবেশিত ও ফজলুল করিম রচিত একটি বন্দনাগানেও সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের পাশাপশি ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের বর্ণনা রয়েছে। ফকির আবুল সরকার পরিবেশিত এই গানটিতেও গায়েনের তাৎক্ষণিক রচনার দৃষ্টান্ত রয়েছে। কেননা বন্দনাগানটির প্রথম চারটি ‘অন্তরা’ হচ্ছে ফজলুল করিম রচিত, গানের বাকি অংশটুকু ফকির আবুল সরকার আসরে তাৎক্ষণিকভাবে অন্তমিলের ছন্দে-ছন্দে পরিবেশন করেন। বন্দনাগানটি হচ্ছে-

সামান্য তারিফ হবে না সারাজীবন গাইলে গান,

চিন্তা করো হিন্দু-মুসলমান,

অফুরন্ত আল্লার দান ॥

এই যে মানব লাগে আজব, ছিলো শুক্রকিট,

মায়ের পেটে ভ্রূণ আকারে না ছিলো বুক-পিঠ,

আবার রাখিয়া মায়ের উদরে সর্ব-অঙ্গ তৈয়ার করে,

দুগ্ধ স্তনের ভেতরে, জন্ম নিয়াই করি পান ॥ (ফকির আবুল, ২০২০ : পরিবেশনা)[৭৬]

এই গানটির মতোই আরেকটি অসাধারণ বন্দনাগান বিচারগানের আসরে বিখ্যাত ও প্রয়াত পরশ আলী দেওয়ান জীবদ্দশায় প্রায়ই পরিবেশন করতেন। এই গানটিতে ধর্মনিরপেক্ষ বাণী বর্ণনার পাশাপাশি সৃষ্টিকর্তাকে ভক্তি নিবেদন ও আধ্যাত্মিক মহামানবদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের বিয়য়টিও রয়েছে। বিশেষ করে গানটির দুটি পঙক্তিতে পলা হয়েছে, 'কোথায় মা বীণাপাণি আমি কি তোমার ভজন জানি/তালসংগীতে আছো তুমি দাও দরশন'। গানটিতে হিন্দুধর্মের বিদ্যা ও শিল্পকলার দেবী হিসেবে পূজিত সরস্বতী দেবীর যেমন আরাধনা করা হয়েছে, তেমনি ইসলামধর্মের আল্লাহ, নবি ও সাহাবিদের প্রতিও সম্মান জানানো হয়েছে। অর্থাৎ বিচারগানের বন্দনাগানে যে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির চর্চা হয়, তা এই বন্দনাগানটিতে প্রমাণিত হয়। গানটি হচ্ছে-

সত্য সনাতন নিত্য নিরাঞ্জন, পতিত পাবন নিরাঞ্জন ॥

না জানি সাধন, না জানি ভজন,

দাও দর্শন আমি অতি অভাজন ॥

ছিলে আশ্রয় শূন্য স্বআচারে, ছিলে গুপ্তধনাগারে,

জাতি নূরে নূর নবিরে করেছো সৃজন,

আসমান-জমিনাদি, পাহাড় আর নদী,

তরু-লতা ফুল-ফলাদি সব তোমার সৃজন ॥ (পরশ, ১৯৮৫-৯০ : পরিবেশনা)[৭৭]

এই গানটির পরিবেশনাকারী গায়েন পরশ আলী দেওয়ানের বাড়ি ঢাকা জেলার দোহার উপজেলায়। দেশের কয়েকটি অঞ্চলের বিচারগানের গায়েনদের বন্দনাগান পরিবেশনার দৃষ্টান্তের মাধ্যমে এটি প্রমাণিত হয় যে, বিচারগানের বন্দনাগানের ধরণ সমগ্র বাংলাদেশে একই রকম। তবে বন্দনাগান ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে বলা যায়, বিচারগানের গায়েনগণের বন্দনাগীতে মূলত দুটি বিষয় প্রাধান্য পায়। তার একটি গায়কের ভক্তি নিবেদন, আরেকটি হচ্ছে গায়কের আত্মপরিচয় প্রদান। ভক্তি নিবেদনের ক্ষেত্রে সৃষ্টিকর্তা, পাকপাঞ্জাতন, সরস্বতী দেবী, অলি-আওলিয়া, পির-ফকির-গোঁসাই, ওস্তাদ, মা, বাবা, আসরে উপস্থিত বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ, প্রতিপক্ষের শিল্পীসহ দর্শক-শ্রোতাদের সম্মান জানানো হয়। এক্ষেত্রে গায়েনগণ সম্মাননীয়দের নাম ধরে বিভিন্ন রকম সৌজন্যমূলক শব্দে শ্রদ্ধা-ভক্তি নিবেদন করে থাকেন। এছাড়া বন্দনার মধ্যেই গায়ক তাঁর জন্মবৃত্তান্ত ও ঠিকানাসহ পরিচয় প্রদান করেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই

বিচারগানের গায়েনগণ বন্দনাকালে করজোড়ে ভক্তি নিবেদন করেন। প্রায়ই দেখা যায় গায়েনগণ বন্দনার শেষে আসরের ভূমিতে কপাল ঠেকিয়ে সবার উদ্দেশে ভক্তি নিবেদন করেন। এমনকি কখনও কখনও বিচারগানের আয়োজক পির বা খাদেমের পায়ে নতশিরে ভক্তি করেন, যাঁকে বিচারগানের সংশ্লিষ্ট লোকজন ‘তাজিমি সিজদাহ’ বলেন। অর্থাৎ ভক্তি প্রদান ও গায়েনের পরিচয় পর্বের মাধ্যমেই বিচারগানের মূল পর্বের পরিবেশনা শুরু হয়। বন্দনার আরও একটি অংশ হচ্ছে বন্দনাগীতের পর প্রধানত সব গায়কই মহান ব্যক্তিরদের নিয়ে লেখা কোনো স্তুতিমূলক গান করেন, যেখানে চিশ্‌তিয়া তরিকার প্রবর্তক খাজা মৈনুদ্দিন চিশ্‌তি ওরফে খাজা বাবার স্তুতি ও আরাধনা থাকে। এছাড়া বড়পিরকে (আব্দুল কাদির জিলানি) সম্মান জানিয়ে গানও গাওয়া হয়। তবে কখনও কখনও গায়েনগণ খাজা বাবা বা বড়পিরের শানে গান না গেয়ে নবি, গুরু বা বাবা-মার সম্মানেও গান গেয়ে থাকেন। বন্দনার এই দ্বিতীয় অংশের উদ্দেশ্য হচ্ছে শুধুই ভক্তি-প্রার্থনা। যেখানে বাহুল্য থাকে না। বিচারগানের বন্দনাকে নিম্নোক্ত ছকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

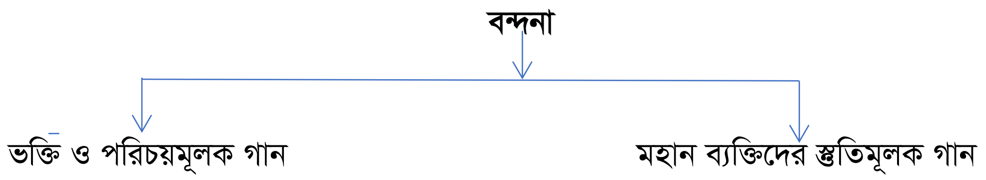

বিচারগানের বন্দনা পর্বে গীত হয় এ রকম বেশকিছু জনপ্রিয় খাজা বাবার গান রয়েছে। বাংলাদেশে বিচারগানের আসরে পরিবেশিত একটি বিপুল জনপ্রিয় একটি গান হচ্ছে ‘খাজা মরে নাই, মরে নাইরে’। এই গানটির গীতিকার ও সুরকার মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলার বিচারগানের প্রখ্যাত গায়েন ছোট আবুল সরকার (মহারাজ)। এই গানটি বিচারগানের প্রায় সকল গায়েনই আসরে পরিবেশন করে থাকেন। গানটিতে মূলত হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি (র.)-এর একটি অলৌকিক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। ঘটনাটি হচ্ছে খাজা বাবা কর্তৃক এক গরীব লোককে অর্থ সহায়তার গল্প। এক গরীব লোক তার মেয়ের বিয়ের জন্য অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় খাজা বাবার মাজারে যায়, এবং টাকা চেয়ে প্রার্থনা করেন। গরীব লোকের দীর্ঘ অপেক্ষার পর প্রয়াত খাজা বাবা অলৌকিকভাবে এসে গরীব লোককে টাকা দিয়ে যায়। বিচারগানের আসরে খাজা বাবার গানে এ রকম বহু ঘটনা বর্ণিত হয়ে থাকে। এই খাজা বাবার গানগুলোর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গানগুলোর সুর খুবই সহজ ও চমৎকার। ছোট আবুল সরকার রচিত ও পরিবেশিত খাজা বাবার গানটি হচ্ছে-

আমার খাজা বাবার আশেক যারা, তারা খাজার ধ্যানে থাকে,
খাজার ধ্যানে থাকলে ভক্ত নূরানী রূপ দেখে।

(ওরে) জিন্দা অলি খাজা বাবা ধ্যান করিলে পাই,

খাজা মরে নাই, মরে নাইরে ॥

আল্লাহর অলির নাইরে মরণ নিজেই আল্লায় কয়,

আল্লার জাতে মিশে গিয়ে অমর হয়ে রয়,

ওরে রূহানী বেশেতে ঘুরে সর্ব জাগাই ॥ (ছোট আবুল, ২০১৮ : পরিবেশনা)[৭৮]

বিচারগানের বন্দনা পর্বে পরিবেশিত খাজা বাবার গানের আরেকটি বিশেষ দিক হচ্ছে, হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি (র.) কর্তৃক গানের প্রতি প্রগাঢ় প্রেম, সেই বিষয়টি খাজা বাবার গানে বর্ণিত হয়ে থাকে। শুধু তাই নয় খাজা বাবার গানের মাধ্যমে বিচারগানের গায়েনগণ দেশের ওহাবী মতবাদী মোল্লাদের মোকাবেলা করেন। কারণ এই মোল্লা শ্রেণি সাধারণত গান-বাজনাকে হারাম বলে প্রচার করে থাকেন। আর মোল্লা শ্রেণির গান বিরোধীতার প্রতিবাদে বিচারগানের গায়েনগণ গান-বাজনা যে ইসলামধর্মে হালাল তার প্রমাণ হিসেবে খাজা বাবার সংগীত-প্রেমকে গানে গানে আসরে বর্ণনা করে থাকেন। এ রকম বিখ্যাত গানের রচয়িতা মুন্সিগঞ্জ গায়েন শাহ আলম সরকার। এই গানটি বাংলাদেশে বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এমনকি বিচারগানের এই গানটি পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্রকার গৌতম ঘোষ পরিচালিত লালন সাঁইয়ের জীবনী নির্ভর সিনেমা ‘মনের মানুষ’-এ চিত্রায়িত হয়েছে। যাহোক, শাহ আলম সরকারের বিখ্যাত সেই খাজা বাবার গানটি হচ্ছে-

আকাশটা কাঁপছিলো ক্যান,

জমিনটা নাচছিলো ক্যান,

বড়পর ঘামছিলো ক্যান, সেই দিন সেই দিন,

গান গেয়েছিলো খাজা যেই দিন যেই দিন ॥

আল্লা-নবির গান, পীর-আওলিয়ার শান,

যে বলে হারাম সেতো জ্ঞানহীন (কমিন),

না বুঝে ভেদ-বাতেন হারাম বলো ক্যান,

এই গান শুনেছেন নবি ইয়াছিন ইয়াছিন ॥ (শাহ আলম, ২০১৭ : পরিবেশনা)[৭৯]

এ রকম চমকপ্রদ সব খাজা বাবার গান বিচারগানের বন্দনা পর্বে পরিবেশতি হয়ে থাকে। তবে বিচারগানের পরিবেশনা-কাঠামোর বন্দনা পর্বে অনেক সময় দেখা যায়, খাজা বাবার গানের বিকল্প হিসেবে বড়পিরের গান বা বিচারগানের কুশীলবদের বিশ্বাস অনুযায়ী কাদেরিয়া তরিকার প্রবর্তক হযরত আব্দুল কাদের জিলানি (র.)-এর স্তুতিমূলক ও জীবনীনির্ভর গানও গাওয়া হয়। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ না করলেই নয় বিচারগানের পরিবেশনার সাথে ধর্মীয় বিশ্বাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সে বিশ্বাস মূলত প্রথাগত মোল্লাতন্ত্রের বাইরে এসে বাংলাদেশের প্রাচীন বিশ্বাস, বাউল দর্শন ও সুফি দর্শনের সংমিশ্রণে তৈরি হয়েছে এবং যার মূল উদ্দেশ্য মানবতাবাদ। তবে এখানে

প্রাতিষ্ঠানিকধর্মের অনেক বিধি-নিষেধই মানা হয় না। এমনকি কখনও কখনও প্রথাগত ধর্মের আচারকেও চ্যালেঞ্জ জানায় এবং এই বিশ্বাসের কারণেই বিচারগানের পরিবেশনা-কাঠামোতে কালক্রমে বিষয়ভিত্তিক গান সংযোজন ও পরিবেশন করা হয়। বিচারগানের শিল্পীদের অসাধারণ অভিনয়-পারদর্শিতার মাধ্যমে মানবতাবাদের আদর্শ উপস্থাপিত হয়ে থাকে। যাহোক, বিচারাগানের বন্দনা পর্বে খাজা বাবার গানের পাশাপাশি আসরে প্রায়ই বড়পিরের গানও গায়েনগণ পরিবেশন করে থাকেন। যে গানগুলোতে বড়পিরের জীবনের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের সাথে সাথে তাঁর অনেক অলৌকিক ঘটনা বর্ণিত হয়ে থাকে। বড়পিরের অলৌকিক ঘটনানির্ভর এ রকম একটি গান হচ্ছে-

> হায় বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানির জিলানি,
> তোমারই নামের গুণে আগুন হয়ে যায় পানি ॥
> জন্ম তোমার জিলানেতে তরিকাতে কাদরিয়া,
> আবু সালেহ জঙ্গি মুসা তোমারই হলেন পিতা,
> উম্মুল খায়ের ফাতেমা হয় তোমারই জননী ॥ (আলাউদ্দিন, ২০১৬ : পরিবেশনা)[৮০]

এই গানটির মতো হযরত আব্দুল কাদের জিলানি (র.)-এর স্তুতিমূলক ও জীবনীনির্ভর বহু গান বিচারগানের বন্দনা পর্বে গায়েনগণ আসরে গেয়ে থাকেন। যে গানগুলো দর্শক-শ্রোতার নিকট বড়পিরের গান নামেই পরিচিত।

ঘ. মূল আখ্যান পর্ব

বিচারগানের পরিবেশনা-কাঠামোর তৃতীয় পর্বের অংশকে 'মূল আখ্যান পর্ব' হিসেবে অভিহিত করা যায়। বিচারগানের এই 'মূল আখ্যান পর্ব' মূলত খণ্ড খণ্ড বা বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক আখ্যানের সমন্বয়ের একটি সামগ্রিক রূপ বা একে বহু উপাখ্যানের সম্মিলনও বলা যেতে পারে। এই পর্বটির মাধ্যমেই প্রকৃতপক্ষে বিচারগানকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত করা যায়। কারণ বাংলাদেশের অন্যান্য লোকনাট্য পরিবেশনায় প্রায় একই রকম যন্ত্রবাদন, বন্দনা ও মঙ্গলগীত একটি প্রচলিত সাধারণ বিষয়। কিন্তু বিচারগানের মূল আখ্যান পর্বটি অন্যান্য লোকনাট্য আঙ্গিক থেকে প্রায় সম্পূর্ণ রূপেই আলাদা। যদিও কবিগানের সঙ্গে এর অনেকাংশেই মিল রয়েছে। কিন্তু দুটি লোকনাট্যের পরিবেশনা কৌশল দেখলেই বোঝা যায় কোনটি কবিগান আর কোনটি বিচারগানের পরিবেশনা। কারণ কবিগানের প্রধান বৈশিষ্ট্য এর প্রতি মুহূর্তের চমকপ্রদ কাব্যিক পরিবেশনা তবে বিচারগানে কাব্য-ছন্দ থাকলেও সেখানে গদ্যের প্রাধান্যই বেশি।

বিচারগানের এই মূল আখ্যান পর্বে বিভিন্ন বিষয় বিন্যাসের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়। যদিও এই বিন্যাস নিয়মতান্ত্রিক নয়, তবে এই বিষয়ভিত্তিক উপাদানগুলো ঘুরেফিরে গায়েন ও দোহারের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়। তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি উপাদান হচ্ছে-

১. দুজন গায়েন দুটি পারস্পারিক বিরোধী বিষয় নিয়ে পাল্লা করেন।

২. গায়েনগণ একে অপরকে পালাকেন্দ্রিক প্রশ্নবাণে আক্রমণ করেন এবং উত্তর দেন।

৩. সব ধর্মগ্রন্থ ও বাউল-সুফি-বৈষ্ণব-পির-গোঁসাই-ফকিরদের তত্ত্ব-তালিমের অবতারণা ও আদর্শ প্রচার করেন।

৪. কাব্যে কিংবা গদ্যে ধর্মীয় ও লৌকিক গল্প উপমা হিসেবে উপস্থাপন করেন।

৫. এক গায়েন কোনো যুক্তি দিলে আরেক গায়েন পাল্টা যুক্তি উপস্থাপন করেন।

৬. দর্শকদের আনন্দিত করতে গায়েনগণ প্রায়ই নানা রকম কৌতুক, খোশ-গল্প, হাস্যরসাত্মক অঙ্গভঙ্গি করে থাকেন।

৭. গায়েনগণ একে-অপরের সাথে পাল্লা দিয়ে এক বা একাধিক বিষয়ভিত্তিক গান করেন।

৮. কাব্য-গদ্য-কথায় যেমন প্রশ্ন করা হয়, তেমনি গায়েনগণ প্রশ্নবোধক গান গেয়েও প্রশ্ন করেন। পক্ষান্তরে প্রশ্নের উত্তরমূলক গান গেয়ে প্রশ্নের মোকাবিলা করা হয়।

৯. অনেক সময় দেখা যায়, গায়েনগণ বাউলগানের বিভিন্ন মহান সাধকদের বাণীনির্ভর গান গেয়ে পাল্লা দেন। একজন লালন ফকিরের গান গাইলে দেখা যায় অন্যজনও লালন ফকিরের আরেকটি বিপরীতমুখী গান করেন। এ রকম আ. হালিম বয়াতি, জালাল উদ্দীন খাঁ, দেওয়ান আব্দুর রশিদ চিশতি, আব্দুর রশিদ সরকার, মাতালকবি রাজ্জাক দেওয়ান, খালেক দেওয়ান, মালেক দেওয়ান, রজ্জব আলী দেওয়ান, পরশ আলী দেওয়ান, দ্বিজদাস, রাধাবল্লভ, শাহ্ আব্দুল করিম, ননী ঠাকুর, বড় আবুল সরকার, ছোট আবুল সরকার, ফকির আবুল সরকার, শাহ আলম সরকার, আব্দুস সাত্তার মোহন্ত, ক্বারি আমির উদ্দিন, সালাম সরকার, আলেয়া বেগম প্রমুখ বাউল বা বিচারগানের কিংবদন্তিতুল্য গায়কদের বাণী ও সুরের গান পরিবেশন করেন।

১০. কখনও দেখা যায়, বাদ্যযন্ত্র বাজানোর পাল্লা করেন দুই দলের কুশীলব-শিল্পীবৃন্দ। তার মধ্যে বেহালা, সারিন্দা, দোতারা, ঢোল, বাঁশি, জুড়ি, মন্দিরার 'পাল্লাপাল্লি' করেন। এ সময় শিল্পীগণ মঞ্চে বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে লম্বা চুলে মাথা দুলিয়ে নেচে বাদ্য বাজান। সাথে মূল গায়েনের দরদি কণ্ঠের গানও গীত হয় সমান তালে।

১১. অনেক সময় দেখা যায়, গায়েনগণ আকর্ষণীয় ও জনপ্রিয় গানগুলো গেয়ে দর্শকদের মোহিত করে টাকা সংগ্রহ করেন বা 'প্যালা' তুলেন। এ সময় গায়েনগণ টাকা পেয়ে দর্শকদের ভক্তিমূলক কথাবার্তা বলে ধন্যবাদ জানান। শুধু তাই নয়, এক গায়েন টাকা উপহার বেশি পেলে আরেক গায়েনকে চাতুরীর ছলে 'খোঁটা' দেন। আবার এর পাল্টা 'খোঁটা'ও অন্য গায়েন দিয়ে থাকেন।

১২. মূল আখ্যান পর্বে গায়েনগণ নানাভাবে যুক্তি-পাল্টা যুক্তি দিয়ে একে অপরকে পরাজিত করতে চান।

এসব উপাদানের উপর ভিত্তি করেই মূল আখ্যান পর্ব গড়ে ওঠে এবং আকর্ষণীয় হয়।

ঙ. মঙ্গলগীত বা বিচ্ছেদগান পর্ব

বাংলাদেশের লোকনাট্যের পরিবেশনা-কাঠামোর মধ্যে মঙ্গলগীত পর্বটি অবিচ্ছেদ্যভাবে প্রায় সব লোকনাট্য আঙ্গিকের মধ্যেই রয়েছে। লোকনাট্যের এই পর্বে মূলত মানুষ, জীব-জগৎ তথা আসরে উপস্থিত সকল দর্শক-শ্রোতাদের মঙ্গল কামনা করা হয়ে থাকে, যেখানে সৃষ্টিকর্তার প্রশংসামূলক আরাধনার মাধ্যমে জাগতিক অভাবপূরণ ও পারলৌকিক মুক্তির জন্য প্রার্থনা করা হয়। তবে সেই সঙ্গে গুরু-মহামানবদের 'উসিলা' বা কৃপাও প্রত্যাশা করা হয়। বিশেষ করে বিচারগানে সৃষ্টিকর্তা ও সাধু-গুরুদের দয়া ভিক্ষা করা হয় মঙ্গলগীত পর্বে। এ পর্বে প্রধানত ভক্তি, স্তুতি ও প্রার্থনামূলক গান গাওয়া হয়। তবে বিচারগানের মঙ্গলগীত পর্বে বেশি ভাগ ক্ষেত্রেই বিচ্ছেদগান গাওয়া হয়ে থাকে। এই বিচ্ছেদগানকে মূলত এক ধরনের ভক্তিমূলক গানই বলা যায়। বিচারগানে যে সব বিচ্ছেদগান পরিবেশিত হয়, সেগুলোর সামগ্রিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, গানে ঈশ্বরপ্রাপ্তিহীনতার শোক, গুরু হারানোর ব্যথা, মা-বাবা হারানোর শোক ও প্রেমিক-প্রেমিকা হারানোর শোক, সর্বোপরি প্রিয়জন হারানোর শোকের বিষয়বস্তুই বেশি থাকে। বিচারগানের কুশীলবদের ভাষ্য মতে, গানের উপরিব্যাখ্যায় মানবিক প্রেমিক-প্রেমিকা হারানোর বিরহের কথা মনে হলেও আসলে গানের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হচ্ছে গুরু-শিষ্য ও স্রষ্টা-সৃষ্টির মধ্যকার অপ্রাপ্তির বিরহ। এখানে রূপক অর্থে প্রেমিক-প্রেমিকার উপমা নিয়ে আসা হয় গানের পঙক্তিতে। আর এই গানের বাণীতে বিধাতা ও গুরুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনাসহ নানা রকম মাঙ্গলিক বিষয়াদির জন্য প্রার্থনা করা হয়। সেখানে কখনও কখনও ভক্তের সর্বস্ব ত্যাগের মধ্য দিয়ে হলেও গুরু বা বিধাতার সান্নিধ্য প্রত্যাশা করা হয়। বিচারগানের এই পর্বের পরিবেশনায় দেখা যায়, গায়েনগণ গান গাইতে গাইতে কান্নায় ভেঙে পড়েন, তার সাথে দর্শক-শ্রোতাগণও করুণ রসে আপ্লুত হয়ে যান।এ সময় কুশীলববৃন্দ ও দর্শক কাঁদতে কাঁদতে একে অপরকে জড়িয়ে ধরেন। যাকে বিচারগানের পরিবেশনার পরিভাষায় বলা হয় 'দশা ধরা'। নিচে বিচ্ছেদগান পর্বে 'দশা ধরা'র কিছু মুহূর্তের ছবি যুক্ত করা হলো।

চিত্র-২৫ : বিচারগানের মঙ্গলগীত বা বিচ্ছেদগানের পর্বের 'দশা ধরা'র বিভিন্ন মুহূর্ত।

বিচারগানের পরিবেশনায় বিচ্ছেদগানের পর্বটি প্রকৃতপক্ষে পরিবেশনাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যায়। এ সময় কুশীলব ও দর্শক-শ্রোতাগণ করুণ রসের আবহে ভাবের জগতে একাকার হয়ে যান। এমনকি বাউল-সুফি-গুরুবাদের বিশ্বাসের জায়গা থেকে একে-অপরের চরণে ভক্তি করেন। যাকে গুরুবাদীরা বলে থাকেন 'তাজিমি সিজদাহ' বা সম্মানসূচক ভক্তি। অর্থাৎ গুরু বা স্রষ্টার কাছে নিজের সমস্ত কিছু অর্পণ করে নিজের পারলৌকিক মুক্তি অর্জন করার চূড়ান্ত প্রয়াস। এমনকি এই পর্বেই বিচারগানের গায়েন ও কুশীলবগণ 'প্যালা' বা অর্থ উপহার বেশি পেয়ে থাকেন। এ সময় দেখা যায়, গায়েনগণ নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করে জনপ্রিয় বিচ্ছেদগানগুলো পরিবেশন করেন। এছাড়া গায়েনগণের মধ্যে প্রচেষ্টা থাকে কে বেশি দর্শককে কাঁদাতে পারেন তার বিচ্ছেদগানের সুর ও বাণী দিয়ে। দেখা যায়, যে গায়েন বেশি দর্শককে করুণ রসে আবিষ্ট করতে পারেন, সেই বেশি 'প্যালা' পেয়ে থাকেন। বিচারগানের বিচ্ছেদগানগুলোও বাংলাদেশের জনপ্রিয় সব গানের ভান্ডার বলা চলে। কারণ সব জনপ্রিয় গানই বিচারগানে পরিবেশিত হয়। আবার একথাও সত্য বর্তমানে বাংলাদেশে প্রচলিত-জনপ্রিয় সব বিচ্ছেদগানের স্রষ্টাও বিচারগানের কিংবদন্তি গায়েনগণ। বিশেষ করে আব্দুল হালিম বয়াতি, রজ্জব আলী দেওয়ান, আব্দুর রশিদ সরকার, মাতালকবি রাজ্জাক দেওয়ান, পরশ আলী দেওয়ান, বাউলকবি নূর মেহেদী আব্দুর রহমান, কিয়ামদ্দিন বয়াতি, বড় আবুল সরকার, ছোট আবুল সরকার, সালাম সরকার, আলেয়া বেগম, মায়া রাণী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য বিচ্ছেদগানের স্রষ্টা। এই বাউলকবি তথা বিচারগানের গায়েনদের রচিত কিছু বিচ্ছেদগান রয়েছে যেগুলো পরিবেশিত হলে মুহূর্তের মধ্যেই আসরে দর্শক-শ্রোতা বেদনাসিক্ত হয়ে পড়েন। বিশেষ করে অভিসন্দর্ভ রচনাকালে বিভিন্ন বিচারগানের আসর পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, মানিকগঞ্জের হরিরামপুরের অকাল প্রয়াত বিচারগানের বিখ্যাত গায়েন কিয়ামদ্দিন বয়াতি রচিত কয়েকটি জনপ্রিয় বিচ্ছেদগান যখন আসরে পরিবেশিত হয়, তখন দর্শক-শ্রোতা করুণরসের স্পর্শে অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়েন। কোনো আসরে এমনও দেখা দেখা গেছে, গায়েন, দর্শক-শ্রোতা কাঁদতে কাঁদেতে আসরে অজ্ঞান হয়ে গেছেন। কিয়ামদ্দিন বয়াতির এমন একটি বিপুল জনপ্রিয় বিচ্ছেদগান হচ্ছে-

এই কী ছিলো কর্মের লিখন, ভালোবাসিয়া তোমাকে,
(প্রাণবন্ধুরে) বিষাক্ত তীর মারলিরে আমার বুকে ॥
কী যে জ্বালা হৃদয় মাঝে সহিতে না পারি,
চিতার মতো জ্বলে উঠে যখন মনে করি,
(ওরে) কাঞ্চা বাঁশে ঘুন ধরিলে বাঁশের কী বা থাকে ॥ (গবেষক, ২০২৩ : সংগ্রহ)[৮১]

এই বিচ্ছেদগানটিতে যেভাবে বাউলকবি কিয়ামদ্দিন বয়াতি মানুষের বিরহ-ব্যথাকে চিত্রায়িত করেছে, তাতে প্রিয়জন হারানো মানুষ গানের কথা ও সুরে প্রভাবিত হয়ে অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়েন। কিয়ামদ্দিন বয়াতির এই বিচ্ছেদগান এতোটাই জনপ্রিয় যে তাঁর জন্মভূমি অঞ্চলের মানুষের মুখে মুখে ফেরে এই গানটি। এমনকি এই অঞ্চলে মাঠ পর্যায়ে

পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, প্রায় প্রতিটি বিচারগানের আসরেই কিয়ামদ্দিন বয়াতির বিচ্ছেদগান পরিবেশিত হয়ে থাকে। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে বিচারগানের মঙ্গলগীত বা বিচ্ছেদগান পর্বে আসর জমানোর জন্য গায়েনগণ সব সময় জনপ্রিয় ও করুণরসের গান পরিবেশন করে থাকেন। তবে বিচারগানের আসরে পরিবেশিত জনপ্রিয় বিপুল পরিমাণ বিচ্ছেদগান বাংলাদেশে প্রচলিত রয়েছে। তার মধ্যে মাদারীপুর জেলার বিচারগানের বিখ্যাত নারী গায়েন আলেয়া বেগমের বেশ কিছু বিচ্ছেদগান রয়েছে। আলেয়া বেগমের বিপুল জনপ্রিয় একটি বিচ্ছেদগান হচ্ছে-

মালা কার লাগিয়া গাঁথিরে, মালা কার লাগিয়া গাঁথি,

অজানা এক নদীর স্রোতে আমি হারায়াছি সাথীরে ॥

সবুজ ঘাসে বসতাম আমরা,

ও সখিরে শাড়ির আঁচল পাতি,

ফুলের উপর ভ্রমরা এসে যেমন করে মাতামাতিরে ॥ (আলেয়া, ২০২১ : পরিবেশনা)[৮২]

এই বিচ্ছেদগানটিও যখন বিচারগানের আসরে গায়েনগণ পরিবেশন করেন, তখন গায়ের, দর্শক-শ্রোতা আসরে কাঁদতে কাঁদতে ‘দশা ধরা’ পর্যায়ে চলে যায়। মূল বিষয় হচ্ছে বিচারগানের মঙ্গলগীত বা বিচ্ছেদগান পর্বে বিচ্ছেদগানের শিল্পশক্তি যত সমৃদ্ধ হবে আসর তত বেশি প্রাণবন্ত হবে। এই মঙ্গলগীত বা বিচ্ছেদগান পর্বটি বিচারগানের পরিবেশনা-কাঠামোর খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি পর্যায় হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। সর্বোপরি, লোকনাটকের অন্যান্য আঙ্গিকের মতোই বিচারগানেরও প্রথাগত ও ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় বিশেষ কাঠামো রয়েছে। তবে বিচারগানের গায়েনগণ অনেক সময় প্রদত্ত-পরিস্থিতির কারণে প্রথাগত কাঠামো মানেন না বা মানতে পারেন না। তখন তারা বন্দনা পর্বের সংক্ষেপণ কিংবা খাজা বাবা ও বড়পিরের গান বাদ দিয়ে মূল আখ্যান পর্বে চলে যান। অর্থাৎ বিচারগানের পরিবেশনা-কাঠামো কোনো শৃঙ্খলের মধ্যে বদ্ধ থাকে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিচারগানের চরিত্র পরিচিতি

লোকনাটক বিচারগানে গানের প্রাধান্যতা দেখা যায়, সেই সাথে চরিত্রদের মধ্যে তাৎক্ষণিক পারস্পরিক সংলাপের খুব বেশি মুহূর্ত নেই। এ জন্য পরিবেশনাটিতে চরিত্র সংখ্যা খুবই কম। বিচারগানের প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশনার কাঠামোর কারণে যে দুটি দলে বিভক্ত হয়ে পরিবেশনা উপস্থাপন করেন, দুটি দলের চরিত্রও একই রূপ হয়ে থাকে। বিচারগানের প্রতিটি দলে ৫-১০জন অভিনেতা থাকেন, তারা প্রত্যেকে এক বা একাধিক চরিত্রের ভূমিকায় অভিনয় করেন। চরিত্রগুলোকে মূলত চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। চরিত্রগুলো হচ্ছে-

ক. মূল গায়েন

খ. ডায়না

গ. দোহার ও

ঘ. বাদক

ক. মূল গায়েন

বিচারগানের পরিবেশনায় দুই দলের দুজন মূল গায়েন থাকেন। তারাই পরিবেশনার মূখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই মূল গায়েনকে নানা নামে ডাকা হয় বা নানা নামে পরিচিত। তার মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় ও প্রচলিত হচ্ছে, গায়ক, গায়েন, বয়াতি, ফকির-ফইকরানী, পালাকার, সরকার, দেওয়ান, বাউল প্রভৃতি। তবে বিচারগানের মূল গায়েনের নামের শেষে ‘সরকার’ ও ‘দেওয়ান’ পদবী লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও অনেক গায়েনের নামের সাথে বাহারি পদবীও পাওয়া যায়। তার মধ্যে পাগল, পাগলা, পাগলী, মাতাল, ফকির, বৈদেশী, কানা, অন্ধ, বাউলমাতা, মহারাজ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ রকম পদবীতে পরিচিত বেশ কয়েকজন খ্যাতিমান বিচারগানের গায়ক ছিলেন এবং আছেন। যেমন- বিচারগানের দুজন প্রখ্যাত গায়ক ছিলেন আব্দুর রশিদ সরকার ও মাতালকবি রাজ্জাক দেওয়ান। আব্দুর রশিদ সরকার তাঁর জীবদ্দশায় ‘পাগলা’ রশিদ নামে সর্বাধিক পরিচিত ছিলেন এবং রাজ্জাক দেওয়ান ‘মাতাল’ রাজ্জাক বা ‘মাতালকবি’ রাজ্জাক দেওয়ান নামে পরিচিতি লাভ করেন।

চিত্র-২৬ : বিচারগানের গায়েন (বাম থেকে) বড় আবুল সরকার, ফকির আবুল সরকার ও ছোট আবুল সরকার ।

এছাড়া বর্তমানে বেশ কয়েকজন গায়ক কিছু পদবীতে দর্শকদের নিকট পরিচিত। তার মধ্যে মানিকগঞ্জের আবুল সরকার, 'ছোট' আবুল ও 'মহারাজ' আবুল সরকার নামে পরিচিত। মুন্সীগঞ্জের আবুল সরকার, 'বড়' আবুল নামে পরিচিত। এবং ফরিদপুরের আবুল সরকার, 'ফকির' আবুল নামে দর্শকদের নিকট পরিচিতি লাভ করেছেন। এর কারণ হিসেবে জানা যায়, তিনজনের নাম একই হওয়ায় নামে পার্থক্য করতে 'ছোট' (যিনি বয়সে ছোট), 'বড়' (যিনি বয়সে বড়) এবং ফকির শব্দ যুক্ত করেছেন। আর ছোট আবুল সরকারের গুরু আ. রশিদ সরকার তাকে 'মহারাজ' উপাধী দিয়েছেন। এছাড়া গায়েন বাচ্চু- 'পাগল' বাচ্চু, মনির-'পাগল' মনির, বারেক- বারেক 'বৈদেশী' এবং শামসু দেওয়ান অন্ধ হওয়ায় 'কানা' শামসু নামে বিচারগানের দর্শক-শ্রোতাদের নিকট পরিচিত। যাহোক, বিচারগানের যিনি মূল গায়েন তিনি যে নামেই বা যে পদবীতেই পরিচিত হন না কেন, পরিবেশনায় চরিত্রগত ভূমিকা একই। মূল গায়েনই বিচারগানের মূখ্য চরিত্র। তিনি বিচারগানের মূল গায়ক, মূল অভিনেতা, মূল কথক এবং বাদকও বটে। তিনিই তার দল-সহযোগে অপর দলের মূল গায়েন ও দলের সাথে অভিনয়ের মাধ্যমে পাল্লা দিয়ে পরিবেশনা উপস্থাপনা করে থাকেন।

চিত্র-২৭ : বিচারগানের গায়েন (বাম থেকে) কাজল দেওয়ান, শরিয়ত সরকার ও করিম দেওয়ান।

খ. ডায়না

বিচারগানের প্রতিটি দলেই দ্বিতীয় মূখ্য চরিত্র হচ্ছে 'ডায়না'। এই ডায়না অবশ্য 'ঠ্যাটা' নামেও পরিচিত। বিচারগানের ডায়না আবার মূল দোহার হিসেবেও ভূমিকা রাখেন। ডায়না যেমন মূল গায়েনের বর্ণনা ও সংলাপের সাথে বিভিন্ন কাথামালা জুড়ে দেন, তিনিই আবার সর্বক্ষণ গানের সুরে ধর্ণা দিয়ে থাকেন। এবং প্রায় প্রতিটি দলেই এই ডায়নাই হারমোনিয়াম বাদক হিসেবে থাকেন। এমনকি বিচারগানের গুরু-শিষ্য পরম্পরার যে অনুশীলন সেটিও ডায়নার ভূমিকায় অভিনয় অনুশীলন করতে করতেই এক সময় তিনিই মূল গায়েন হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করেন। অর্থাৎ মূল গায়েন হওয়ার পূর্বের সর্বশেষ ধাপ হচ্ছে ডায়না বা প্রধান দোহার হওয়া।

গ. দোহার

বিচারগানে দোহার হিসেবে যারা থাকেন, তারা মূলত দুটো ভূমিকায় অভিনয় করেন। একটি তারা গায়েনের গানের সাথে ধুয়া ধরেন, অন্যটি হচ্ছে প্রত্যেক দোহারেই কোনো না কোনো বাদ্যযন্ত্র বাজান। প্রতিটি দলেই একের অধিক দোহার থাকেন। সাধারণত দোহারের সংখ্যা হয় ২-৩ জন। তবে কখনও কখনও সংখ্যাটি এর চেয়ে বেশিও হয়। এছাড়া দোহারগণ সাধারণত হারমোনিয়াম, জুড়ি, কাঠ করতাল ও খমোক বাজিয়ে থাকেন। এমনকি দোহারের মধ্যে কেউ কেউ ডায়না বা ঠ্যাটার ভূমিকায়ও অভিনয় করেন।

চিত্র-২৮ : বিচারগানের ডায়না ও দোহার চরিত্রে পরিবেশনার কয়েকটি মুহূর্ত।

ঘ. বাদক

বিচারগানে শুধু বাদক হিসেবে অংশগ্রহণকারী নেই বললেই চলে। কেননা প্রত্যেক বাদকই কোনো না কোনো সময় ডায়না বা ঠ্যাটার ভূমিকায় অভিনয় করেন। তবে কোনো কোনো বাদক থাকেন তারা একেবারেই যৎসামান্য সময় ডায়নার ভূমিকা পালন করেন। যারা ডায়না বা ঠ্যাটার ভূমিকায় কম থাকেন, তারা হচ্ছেন ঢুলী, বংশীবাদক কর্নেড বাদক। এছাড়া এই তিন বাদক দোহারের ভূমিকায়ও থাকেন না। আর হারমোনিয়াম জুড়ি ও কাঠ করতাল বাদকগণ দোহার ও ডায়নার চরিত্রে অভিনয় করেন।

তবে উপরিউক্ত চরিত্রগুলোর বাইরে মূল গায়েন অসংখ্য চরিত্রে অভিনয় করেন। তার মধ্যে বিচারগানে যতগুলো পালা আছে তার প্রতিটি পালায় একটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন। যেমন- গুরু, শিষ্য, জীব, পরম, কৃষ্ণ, রাধা, আদম, শয়তান, মা, বাবা প্রভৃতি। এছাড়া মূল গায়েন যখন গান করেন ও বিভিন্ন ঘটনা, তত্ত্ব, উদাহরণ টেনে কথা বলেন তখন তিনি গল্প বা ঘটনার চরিত্রে নিজেকে রূপায়িত করেন। সেখানে মূল গায়েন কখনও রাজা, রাণী, গ্রাম্য মাতবর, কৌতুক শিল্পী, চোর, চাকর, বিয়াই, বিয়াইন, শালা, শালী, চেয়ারম্যান, মেম্বার প্রভৃতি চরিত্রে নিজেকে রূপান্তরিত করে অভিনয় করে থাকেন।

চিত্র-২৯ : বিচারগানের বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাদক।

বিচারগানে কুশীলবদের চরিত্র হিসেবে ভূমিকা পালন সংক্রান্ত আলোচনার পাশাপাশি একটি বিষয় আলাচনা না করলেই নয়, সেটি হচ্ছে কুশীলবদের জীবন ও জীবিকা। বিচারগান পরিবেশনার সরূপ বুঝতে গেলে এই পরিবেশনার সাথে যুক্ত মানুষের জীবনের চালিকা শক্তি জীবিকা বা পেশা সম্পর্কে জানা দরকার। বিচারগানের কুশীলবগণের প্রায়

সকলেই গান ছাড়াও অন্যান্য জীবিকার ওপর নির্ভরশীল। যদিও গায়েনগণের মূল পেশা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই গান। এবং এটা বাংলাদেশের সব অঞ্চলের বিচারগানের কুশীলবদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তবে বিচারগান সব কুশীলবের জন্য গান প্রধান ও একমাত্র পেশা না হওয়ার পেছনে মূল কারণটি হচ্ছে সারা বছর বিচারগান পরিবেশিত হয় না। পরিবেশনাটির উপস্থাপন বিশেষত শীত মৌসুমে বেশি হয়। তাই কুশীলবদের বায়না বেশি হলেও সারা বছরের জীবিকার জন্য শুধু বিচারগান পরিবেশনা যথেষ্ট হয়। তবে সারাদেশে অল্প কয়েকজন আছেন যারা গান গেয়ে খ্যাতি অর্জন করেছেন তাদের বিষয়টি আলাদা। বিচারগান সুপরিচিত ও জনপ্রিয় গায়েনগণের জন্য শুধু একমাত্র পেশাই নয়, এই পেশায় থেকে বিলাসবহুল জীবন-যাপন করে থাকেন। তার মধ্যে মুন্সীগঞ্জের শাহ আলম সরকার ও লতিফ সরকার, ঢাকার আরিফ দেওয়ান, কাজল দেওয়ান, দেওয়ান বাবলী সরকার, মানিকগঞ্জের ছোট আবুল সরকার (মহারাজ), মমতাজ বেগম ও নেত্রকোনার সালাম সরকার উল্লেখযোগ্য।

তবে বিচারগানের বেশির ভাগ কুশীলবই অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ সেটি বলা যায় না। বরং অনেক কুশীলবই দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করেন। নিম্নে বিচারগানের কুশীলবদের ভূমিকা, বয়স, পেশা প্রভৃতি উল্লেখপূর্বক একটি ছকের মাধ্যমে বিচারগানের কুশীলবদের সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা পাওয়া যাবে।

গায়েন পক্ষ : ১				গায়েন পক্ষ : ২			
পদবী/ভূমিকা	নাম	বয়স	পেশা	পদবী/ভূমিকা	নাম	বয়স	পেশা
মূল গায়েন	আজিজ সরকার	৫৩	গান	মূল গায়েন	ফকির আবুল সরকার	৪৭	গান
হারমোনিয়াম	রওশন আলী	৩৫	গান	হারমোনিয়াম	আলমাস হোসেন	৩৫	গান
ঢোল	হারুন-উর-রশীদ	২৫	কৃষি	ঢোল	শহিদুল ইসলাম	৩৫	ঢুলি
আরবাঁশি	আমিনুর রহমান	২৮	কৃষি	আরবাঁশি মন্দিরা	ইসহাক হোসেন	৩৮	ব্যবসা
মন্দিরা	ফরহাদ হোসেন	২৬	রাজ মিস্ত্রি	মন্দিরা	আশিক সরকার	১৯	গান
মন্দিরা	রেজাউল করিম	২৫	কৃষি	বেহালা	জিন্নাহ সরকার	৩৫	কৃষি

উপরের ছকটি ২৬/১২/২০০৯ খ্রি. তারিখে মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর উপজেলাধীন নিমতা গ্রামের পীর সাহেব আজিমউদ্দিন আল চিশতির বাড়িতে অনুষ্ঠিত বিচারগান পরিবেশনায় অংশগ্রহণকারী কুশীলবদের ওপর করা হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিচারগানের কুশীলবের অভিনয় প্রস্তুতি

বিচারগান পরিবেশনাটি বাংলাদেশের লোকনাট্যের ঐতিহ্যগত ধারায় ক্রমবিকশিত ও গুরু-শিষ্য পরম্পরায় বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে। তাই এই পরিবেশনার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক অনুশীলন ও নিয়মতান্ত্রিক প্রস্তুতি নেই, যেখানে কুশীলবগণ পরিবেশনাটি আয়ত্ত করবে বা নিয়মতান্ত্রিকভাবে অভিনয় প্রস্তুতি পদ্ধতি শিখবে। পরিবেশনাটি শেখার বা অভিনয় আয়ত্ত করার প্রধানতম উপায়টি হচ্ছে গুরুর নিকট হতে দীর্ঘদিন সাধনা ও অনুশীলনের মাধ্যমে আত্মীকরণ করা। বিচারগানের প্রত্যেক কুশীলবই গুরুগৃহে এবং গুরুর সাথে আসরে আসরে পরিবেশনায় যুক্ত থেকে পরিবেশনার জন্য নিজেকে যথাযথ পর্যায়ে প্রস্তুত করেন। কুশীলবদের এই প্রস্তুতি পর্যায়ে যারা দোহার-বাদক পর্যায়ে থাকেন, তারা মূলত পরিবেশনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু মূল গায়েন হিসেবে তৈরি হন, সেই সকল বা শিষ্যগণ যারা গুরুর পরামর্শ মোতাবেক বিভিন্ন বই-পুস্তক অধ্যয়ন করেন। বিশেষত বিচারগানের মূল গায়েন যারা হন তারা প্রত্যেকেই সব ধর্মবিষয়ক জ্ঞান আহরণ করেন। কেননা বিচারগান আন্তঃধর্মীয় ও অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধ সম্পন্ন পরিবেশনা। এ জন্য প্রত্যেক গায়েনকেই আন্তঃধর্মীয় গ্রন্থসমূহের পাশাপাশি নানারকম আধ্যাত্মিক বই পড়তে হয়। এ সম্পর্কে সাইমন জাকারিয়া বলেন,

> বিচারগানের শিল্পীগণ হিন্দু-মুসলামান ধর্মের তুলনামূলক আলোচনার জন্য হিন্দু ও মুসলমান শাস্ত্রীয় ও ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ করে থাকেন। আসলে, তারা বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জনের জন্য বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন এবং অর্জিত জ্ঞান গানের মাধ্যমে প্রচার ও প্রসারের চেষ্টা করেন। এই জন্য একজন বিচারগানের শিল্পী হিন্দুর বাড়িতে গেলে দেবতার মতো মানে, আবার একই শিল্পী মুসলমানের বাড়িতে গেলে পীরের মতো মানে। (সাইমন, ২০০৮ : ৪৭১)

বিচারগানের গায়েনগণ অসাম্প্রদায়িক চেতনা প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে নিজের প্রজ্ঞা ও যুক্তিকে ধারালো করতে ইসলামধর্মের পবিত্র কোরান শরিফের বাংলা অনুবাদ ও বিভিন্ন তাফসিরুল কোরান, সহি সিত্তাহ ৬টি হাদিসের বাংলা অনুবাদ, এছাড়া নবিদের জীবনীগ্রন্থ, অলি-আওলিয়াদের জীবনীগ্রন্থ, জালাল উদ্দিন রুমির মসনবি, বিভিন্ন তরিকার বিশেষত চিশ্‌তিয়া, কাদরিয়া, মুজাদ্দেদিয়া ও নক্স-বন্দিয়া তরিকার কিতাবসমূহ, তাসকেরাতুল আওলিয়া ও তাসকেরাতুল আম্বিয়া, ওমর খৈয়ামের কবিতা, ইমাম গাজ্জালীর এলিয়া উলুমুদ্দিনসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন পিরের দরবারী বই-পুস্তক পাঠ করে থাকেন। অন্যদিকে, হিন্দুধর্মের ধর্মগ্রন্থ পবিত্র গীতা, বেদ, উপনিষদ, মহাভারত, রামায়ন, রাধা-কৃষ্ণের জীবনীগ্রন্থ, বিভিন্ন পূজা বিষয়ক মন্ত্র পাঠ করেন। এছাড়া খ্রিস্টধর্মের ধর্মগ্রন্থ পবিত্র বাইবেল, বৌদ্ধ ধর্মের ধর্মগ্রন্থ পবিত্র ত্রিপিটক পাঠ করার পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন অঞ্চল কেন্দ্রিক ধর্ম সংক্রান্ত প্রকাশিত বইও পড়ে থাকেন। এমনকি কিছু কিছু প্রণয় উপাখ্যানও পাঠ করেন, তার মধ্যে লাইলী-মজনু অন্যতম।

বিচারগানের গায়েনদের এই পঠন-পাঠন বিষয়ে প্রয়াত কিংবদন্তি গায়ক আ. রশিদ সরকারে নাম অগ্রগন্য। কথিত আছে, হাদিস, কোরান, ফেকাশাস্ত্রসহ আন্তঃধর্মীয় পুস্তকের জ্ঞানে সমৃদ্ধ ছিলেন তিনি। বিভিন্ন শিল্পীদের সাথে গান গাওয়ার সময় তিনি অত্যন্ত গর্ভভরে প্রতিপক্ষকে 'ঠ্যাশ' মেরে কথা বলতে দ্বিধা করতেন না। এমনকি তিনি চ্যালেঞ্জ করে বলতেন, বিচারগানের জগতে বাংলাদেশে তার চেয়ে কোনো তত্ত্ব-তালিম জানলেওয়ালা শিল্পী নেই।

এছাড়া আ. রশিদ সরকারের পূর্ববর্তী গায়কদের মধ্যে আ. হালিম বয়াতি ও রজ্জব আলী দেওয়ানের ধর্মীয় জ্ঞানের পাণ্ডিত্ব সম্পর্কে উঁচু ধারণার গল্প এখনও মানুষের মুখে মুখে ফেরে। বর্তমানে বাংলাদেশে তত্ত্ব ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে সুখ্যাতি অর্জন করেছে, ফরিদপুরের ফকির আবুল সরকার, মানিকগঞ্জের ছোট আবুল সরকার, মাদারীপুরের আলেয়া বেগম আলো, মুন্সীগঞ্জের বড় আবুল সরকার ও শাহ আলম সরকার, ময়মনসিংহের সুনীল কর্মকার ও নেত্রকোণার সালাম সরকার অন্যতম।

বিচারগানের গায়েনদের নানা বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান অর্জনের মূলেই রয়েছে বিপক্ষের গায়েনকে তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক প্রশ্নবাণে পরাজিত করা। যে যত প্রতিপক্ষ গায়েনকে গভীর ও গুঢ় প্রশ্ন করে ঠেকাতে পারেন, সে তত বাহবা পান বিচারগানের দর্শকদের নিকট। এই তত্ত্ব-তালিমের বাইরেও কিছু বিষয়ে প্রস্তুতি ও অনুশীলন করতে হয় গায়েনদের। তার মধ্যে বিষয়ভিত্তিক গান সংগ্রহ ও আত্মস্থ করা এবং জনপ্রিয় বিচ্ছেদগানের চর্চা করতে হয়। কারণ আসরে যে গায়ক গানের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী গান গাইতে পারেন, গানে গানে প্রশ্ন রাখতে পারেন ও উত্তর দিতে পারেন সেই আসরে পুরস্কৃত হন। এ বিষয়গুলো ছাড়া বিচারগানের গায়েনগণ কথাবার্তা ও গানে নিজেকে উপস্থাপনের জন্য কিছু অনুশীলন করে থাকেন। তারমধ্যে গানের সুরের অনুশীলন, কথাবর্তা বলার অনুশীলন ও বাদ্যযন্ত্র বাজানোর অনুশীলন করে থাকেন। শিষ্য পর্যায়ে যারা থাকেন তাদেরকে দিয়ে মাঝে মাঝে গুরু গায়েন এক-দুই আসর গান করান কিংবা পরিবেশনার শেষ পর্যায়ে বিচ্ছেদগান গাওয়ান। আর মূল গায়েন আসরে ওঠার আগে আয়োজকের বাড়িতে বসে কুশীলবদের জন্য নির্ধারিত ঘরে বসে কিছু কিছু গানের অনুশীলন করে থাকেন। কিংবা নতুন গান রচনা করে সুরারোপ করার চেষ্টা করেন। এছাড়া গায়কদের প্রত্যেকেরই একটি করে তত্ত্ব বা প্রশ্ন-উত্তরের ডায়েরি বা খাতা থাকে সেগুলো পড়েন। অনেক সময় আসরে কী প্রশ্ন করবেন তাও ডায়েরি বা খাতা দেখে বা নিজস্ব জ্ঞানে মনে মনে পূর্ব নির্ধারিত করে নেন। এছাড়া বাদ্যযন্ত্রের সর-শব্দ ঠিক আছে কিনা দেখেন এবং আসরে ওঠার আগে আসরে সালাম-প্রণাম-ভক্তি করে ওঠেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিচারগানের অভিনয় পদ্ধতি ও পর্যবেক্ষণ

বাংলাদেশে প্রচলিত ও ঐতিহ্যগত কোনো লোকনাট্যেরই সুনির্দিষ্ট ও নিয়মতান্ত্রিক কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক অভিনয় পদ্ধতি (Acting Method) নেই। কিন্তু প্রতিটি পরিবেশনার অভিনয় পদ্ধতি ও প্রয়োগের চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে, উক্ত পরিবেশনার ঐতিহ্যগত ধারা ও গুরু-শিষ্য পরম্পরা। যার মাধ্যমে কুশীলবগণ পরিবেশনাটি রপ্ত করার পাশাপাশি অলিখিত অভিনয় পদ্ধতিও আয়ত্ত করে থাকেন। যে অভিনয় পদ্ধতির সুনির্দিষ্ট কাঠামো না থাকলেও কতগুলো উপাদান সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের বিচারগান পরিবেশনায় অভিনয় পদ্ধতির ক্ষেত্রে এ বিষয়গুলো প্রযোজ্য।

যদিও বিচারগানের কুশীলবগণের মধ্যে বেশির ভাগই মনে করেন, পরিবেশনাকালে তারা অভিনয় করেন না। তাদের বিশ্বাস পরিবেশনাটিতে তারা যা করেন সবই বাস্তব এবং তাতে নাটকীয় বা অভিনয়ের কিছু নেই। তবে কেউ কেউ স্বীকার করেন পরিবেশনাকালে তারা অভিনয় করেন। কুশীলবগণ যা-ই মনে করুক না কেন, নাট্যতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে নির্দ্বিধায় বিচারগানকে অভিনয়নির্ভর লোকনাট্য পরিবেশনা বলা যায়। যে পরিবেশনাটির উপস্থাপনায় রয়েছে কুশীলবদের অভিনয় পদ্ধতি। বিচারগানের পরিবেশনা পর্যবেক্ষণ ও কুশীলবদের একান্ত সাক্ষাৎকার গ্রহণের ভিত্তিতে এবং নাট্যতত্ত্বের সুপ্রসিদ্ধ দুটি গ্রন্থ 'ভরত নাট্যশাস্ত্র' ও 'স্তানিস্লাভ্স্কির অভিনয় পদ্ধতি'র তাত্ত্বিক সহযোগিতা নিয়ে বিচারগানের অভিনয় পদ্ধতির কতগুলো উপাদান চিহ্নিত করা যায়। যার মাধ্যমে বিচারগানের অভিনয় পদ্ধতিকে বিশ্লষণ করা যেতে পারে। উপাদানগুলো হচ্ছে–

১. ভক্তি ও বিশ্বাস
২. সুর ও তাল
৩. যুক্তি ও বাগ্মিতা
৪. পারলৌকিক মুক্তি
৫. মনোযোগ ও যোগাযোগ
৬. রস
৭. স্মৃতি

১.ভক্তি ও বিশ্বাস

'ভক্তি ও বিশ্বাস'-কে বিচারগানের অভিনয় পদ্ধতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। 'ভক্তি' ও 'বিশ্বাস' শব্দ দুটি আলাদা হলেও দুটো বিষয়ই একে-অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। 'ভক্তি' বলতে এখানে বিচারগানের কুশীলবদের গুরুর প্রতি আনুগত্য ও গুরুর নির্দেশনা অনুযায়ী নিজেকে প্রস্তুত করা এবং পরিবেশনা উপস্থাপনাকালে পূর্ণ মনোযোগ ও ভালোভাবে পরিবেশনায় অংশগ্রহণ করাকে বলা যেতে পারে। 'ভক্তি' বিষয়টি মূলত দীর্ঘদিন গুরুর সাথে পরিবেশনায় একনিষ্ঠভাবে কাজ করতে করতে কুশীলবের হৃদয়ে আত্মস্থ হয়। এমনকি এই ভক্তির সাথে ধর্মীয় ও লৌকিক বিশ্বাসের প্রভাব রয়েছে। যার মাধ্যমে কুশীলব ভক্তিতে মনোনিবেশ করতে পারেন।

অন্যদিকে, বিচারগানে কুশীলবদের অভিনয় পদ্ধতিতে 'বিশ্বাস'-এর ক্ষেত্রে দুটি প্রেক্ষাপট কাজ করে। প্রথমত, 'ধর্মীয় বিশ্বাস' যার মাধ্যমে কুশীলবগণ পরিবেশনায় অংশগ্রহণ করেন। ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে কুশীলবগণ পরিবেশনায় একনিষ্ঠভাবে যুক্ত থেকে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেন। দ্বিতীয়ত, বিচারগানের কুশীলবগণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিশ্বাস করেন তারা অভিনয় করেন না। তারা বিশ্বাস করেন পরিবেশনায় অংশগ্রহণকালের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তাদের বাস্তব জীবনের অংশ। যার ফলে পরিবেশনায় নাটকীয় বা অভিনয়ভাব থাকে না। পরিবেশনাকালে কুশীলবদের মনে হয় জীবন্ত-প্রাণবন্ত। যদিও বিচারগানের বিভিন্ন পালায় গায়েনগণ বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেন কিন্তু সেটিকে তারা অভিনয় বলতে নারাজ। ধরা যাক, বিচারগানের 'জীব-পরম' পালায় একজন গায়েন জীবের ভূমিকায় অন্যজন পরমের ভূমিকায় পালা পরিবেশন করছেন। সেখানে আবশ্যিকভাবেই জীব অথবা অথবা পরম চরিত্রে অভিনয় করতে হবে। অর্থাৎ বিচারগানের কুশীলবগণ বিশ্বাস না করলেও এটা সত্য যে তারা অভিনয় করেন। কিন্তু তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও পরিবেশনায় অংশগ্রহণের বিশ্বাসের জায়গা থেকে তারা একে অভিনয় বলতে অস্বীকার করেন। আর তাদের এই বিশ্বাসের কারণেই তাদের অভিনয় পরিবেশনাকালে অভিনয়টা বাস্তবের মত দৃশ্যমান হয়। প্রকৃতপক্ষে, বিচারগানের কুশীলবদের এই 'ভক্তি ও বিশ্বাস' উপাদান অভিনয়ের ক্ষেত্রে দারুণভাবে প্রায়োগিক হয়ে ধরা দেয় পরিবেশনাটির উপস্থাপনের সময়।

২. সুর ও তাল

অভিনয়ের ক্ষেত্রে সুর ও তাল অথবা লয় ও ছন্দ খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সেটা হোক নাগরিক নাট্যাঙ্গিক কিংবা লোকনাট্যাঙ্গিক। 'স্তানিস্লাভস্কির অভিনয় পদ্ধতি' গ্রন্থে যেমন বিষয়টিকে 'লয় ও ছন্দ' হিসেবে আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থে 'লয় ও ছন্দ'-এর আলোচনায় বলা হয়েছে–

> শারীরিক এ্যাকশনের সময় সত্যতা ও দৃঢ়তাকে ফুটিয়ে তোলার গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত হলো 'লয়-ছন্দ'। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে দ্রুতগতি এবং ছন্দ (বিভিন্ন ধরনের গভীরতাবিশিষ্ট অভিজ্ঞতাগুলো) আমাদের ভেতরে ও বাইরে রয়েছে। প্রতিটি ঘটনার প্রতিটি গতির উপযোগী 'লয়-ছন্দ'-এর তালে তালে মিলিয়েই ঘটে থাকে। আমরা কাজ করতে যাই এবং ফিরে আসি বিভিন্ন ধরনের 'লয়-ছন্দ'-এর মধ্য দিয়ে। মূলত আমাদের চারপাশে নানা ধরনের 'লয়-ছন্দ' রয়েছে। যখন আমরা গান শুনি কিংবা দমকলের সাইরেন শুনি সেখানেও 'লয়-ছন্দ' বিদ্যমান। একটা সুন্দর শস্যক্ষেত এবং রাস্তার একটা দুর্ঘটনাকে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের 'লয়-ছন্দ'-এর দ্বারাই সব সময় আমরা দেখে থাকি। বাস্তব জীবনের 'লয়-ছন্দ' অনুযায়ী মঞ্চে প্রতিটি এ্যাকশনকে তুলে ধরতে হবে। (মুস্তাফিজুর, ১৯৯৯ : ৪৭)

অর্থাৎ প্রতিটি বাস্তবিক এ্যাকশনেরই রয়েছে আলাদা আলাদা 'লয়-ছন্দ' যা মঞ্চে অভিনয়ের সময়েও বাস্তবিকভাবে তুলে ধরাটা কুশীলবের গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়া। মঞ্চে অভিনয়কালে এ্যাকশন অনুযায়ী যদি 'লয়-ছন্দ' যথার্থ না হয় তবে অভিনয়ের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ঘাটতিতে অভিনয় হবে প্রাণহীন। তাই অভিনয়ে 'লয়-ছন্দ'-এর ভূমিকা অপরিসীম। কিন্তু বিচারগান যেহেতু গীতপ্রধান লোকনাট্য তাই অভিনয়ের প্রতি পদে পদে রয়েছে সুর ও তাল, আর এই সুর ও তালের মধ্যে নিহিত থাকে 'লয়-ছন্দ'। সুতরাং বিচারগানের অভিনয় পদ্ধতিতে 'সুর-তাল' উপাদানকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায়। বিচারগানের কুশীলবগণ এই সুর ও তালের মাধ্যমে প্রতিটি মুহূর্তের এ্যাকশনে ক্রিয়াশীল থাকেন। এবং এই সুর-তাল কেবল গানের ক্ষেত্রে নয়, কুশীলবগণ যখন কাব্যে বা গদ্যে কথা বলেন তখনও প্রায়ই দেখা যায়, তারা সুরে ও তালে কথা বলছেন। তাছাড়া প্রতিটি আখ্যান বা ঘটনা বর্ণনাতে মূল গায়েন সুর ও তাল মেনে চলেন। অর্থাৎ বিচারগানে সুর ও তাল কিংবা লয় ও ছন্দ সবগুলো উপাদানই কুশীলবের অভিনয় পদ্ধতিতে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত রয়েছে।

৩. যুক্তি ও বাগ্মিতা

বিচারগানের অভিনয় পদ্ধতিতে 'যুক্তি ও বাগ্মিতা' খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যিক উপাদান। অন্যান্য নাট্যাঙ্গিক ও অভিনয় থেকে বিচারগানের অভিনয় বা পরিবেশনাকে আলাদা করা যায় এই পরিবেশনার 'যুক্তি ও বাগ্মিতা'র উপস্থিতির মধ্য দিয়ে। আর পরিবেশনাতে 'যুক্তি ও বাগ্মিতা'র প্রাচুর্যতার কারণেই বিচারগানকে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশনা হিসেবে অভিহিত করা হয়। বিচারগানের অভিনয়ের প্রতিটি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যেই 'যুক্তি ও বাগ্মিতা'য় পরিপূর্ণ। প্রসেনিয়াম-নাগরিক নাট্যাঙ্গিকে নাটকের সংলাপের বিপরীতে যে সংলাপ থাকে তা কথার স্বাভাবিক প্রত্যুত্তর মাত্র। কিন্তু বিচারগানে সংলাপের বিপরীতে বিপরীতমুখী যুক্তির মাধ্যমে প্রত্যুত্তর হয়। যাকে সহজ ভাষায় বলা যায়, জবাব-পাল্টা জবাব। এমনকি এই অভিনয় একটি সঠিক তথ্য ও তত্ত্বগত বিষয়কেও যুক্তি দিয়ে মিথ্যা-অকেজো করার চেষ্টা করেন দুপক্ষের গায়েনগণ। যার মূল উদ্দেশ্য নিজের মতামতকে সত্য বলে টিকিয়ে রাখা।

সঠিক সময়ে সঠিক পাল্টা জবাব দিতে পারা বিচারগানের গায়কের জন্য খুবই ফলপ্রসূ পালায় নিজেকে জিতিয়ে নেওয়ার জন্য। এ জন্য অবশ্য গায়েনকে প্রচুর তথ্য ও তত্ত্বগত জ্ঞানের অধিকারী হতে হয়। সেই সাথে জানতে হয়, নানান উপমা, উদাহরণ, মেছাল, প্রবাদ-প্রবচন, গ্রামীণ গল্প, ধর্মীয় ও লৌকিক কাহিনি, ঐতিহাসিক ঘটনা প্রভৃতি। যে গায়েন যত বেশি এই সব বিষয়ে পারদর্শী হবেন সে তত বেশি পরিবেশনার প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকেন। আর যুক্তি-পাল্টা যুক্তি দেওয়ার জন্য গায়েনকে অবশ্যই স্বতস্ফূর্ত বাগ্মী মানুষ হওয়া জরুরী। যে গায়েন যত বেশি বাগ্মী বা জড়তহীনভাবে বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারেন, বিচারগানের অভিনয়ে সে গায়েন তত বেশি অভিনয়ে প্রাণবন্ত। এমনকি সেই গায়েন দর্শক-শ্রোতার নিকট জনপ্রিয়তা লাভও করে থাকেন। বিচারগানের অভিনয়ে 'যুক্তি ও বাগ্মিতা'য় বাংলাদেশে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন , কিংবদন্তি দুই গায়ক, তার একজন হচ্ছেন মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইরের আ. রশিদ সরকার, অন্যজন হচ্ছেন ঢাকা জেলার দোহারের পরশ আলী দেওয়ান। এই দুই শিল্পীর জীবদ্দশায় বহু আসরে 'যুক্তি ও বাগ্মিতা'র পাল্টাপাল্টি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যেতো, কখনও কখনও সেটাকে মনে হতো ঝগড়া বা মারামারি। যদিও সবটাই ছিলো তাদের অভিনয়। এখনও এই দুই গায়কের অনেক অডিও ক্যাসেট পাওয়া যায়, যেখানে বিচারগানে তাদের কালজয়ী 'যুক্তি ও বাগ্মিতা'র দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। যা বিচারগানের অভিনয় পদ্ধতির 'যুক্তি ও বাগ্মিতা'র উপাদানগত প্রায়োগিক প্রমাণ মেলে। এবং বিচারগানের কুশীলবদের অভিনয়ের 'যুক্তি ও বাগ্মিতা'র অনুশীলন হয় মূলত আসর থেকে আসরে পরিবেশনা উপস্থাপনের সময়।

৪. পারলৌকিক মুক্তি

বিচারগানের পরিবেশনায় অভিনয়ের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে কুশীলব ও দর্শক-শ্রোতার পারলৌকিক মুক্তির জন্য পুন্য অর্জন। বিশেষ করে কুশীলবগণ মনে করেন, বিচারগান ধর্মীয় সংগীত যেটির চর্চা করলে পুন্য অর্জিত হয় এবং এই পাথেয় দিয়ে তারা পারলৌকিক মুক্তিকে সহজ করতে পারবেন। বিচারগানের পরিবেশনা বা অভিনয় কাঠামোর প্রস্তাবনা, বন্দনা, মূল আখ্যান ও মঙ্গলগীত বা বিচ্ছেদগানের প্রতিটি পর্যায়েই ঈশ্বর বন্দনা, মানব বন্দনা, ধর্মীয় সম্প্রীতির বাণী, গুরুবাদ, সাধন-ভজন, ইবাদত-বন্দেগি, পূজা-অর্চনা প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। যার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈশ্বর স্তুতি ও ধর্মীয় বাণী প্রচার করে পূন্য লাভ। যাতে কুশীলব ও দর্শক-শ্রোতাগণ পরপারের কড়ি জমাতে পারেন। এমনকি বিচারগানের প্রায় সব পালাতেই পারলৌকিকমুক্তি চেয়ে গান গাওয়া হয়। এই পারলৌকিক মুক্তির জন্য কুশীলবগণ পরিবেশনাতে একনিষ্ঠভাবে মনোযোগ দিয়ে থাকেন এবং অভিনয় সম্পাদনে কোনো ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে আন্তরিকতার ঘাটতি দেখা যায় না। অর্থাৎ বিচারগানের অভিনয়ে 'পারলৌকিক মুক্তি' পরোক্ষভাবে অভিনয় পদ্ধতির উপাদান হিসেবে কাজ করে।

৫. মনোযোগ ও যোগাযোগ

নাগরিক নাটকের পরিবেশনার অভিনয় পদ্ধতিতে 'মনোযোগ ও যোগাযোগ' আবশ্যিক উপাদান। যে উপাদান ছাড়া অভিনয় বিষয়টি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আর বিচারগানের অভিনয়ে 'মনোযোগ ও যোগাযোগ' বিষয়টি এক মুহূর্তের জন্যও বিরামযোগ্য নয়। বিচারগানে যদিও অভিনেতা থেকে অভিনেতার মধ্যে সরাসরি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নেই বললেই চলে। প্রায় সব ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয় পরোক্ষভাবে। কারণ একদলের মূল গায়েন আসরে গান বা পরিবেশনা উপস্থাপন করার পর আবার অন্যদলের গায়েন আরেক আসর গান বা পরিবেশনা উপস্থাপন করেন। যার জন্য অভিনয়ে কুশীলবদের মধ্যে তাৎক্ষণিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তেমন নেই। কিন্তু একপক্ষের গায়েনের পরিবেশনা অন্যপক্ষের গায়েনের গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনতে হয় এবং দুইদলের গায়েনের মধ্যে পরোক্ষ যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে হয়। কারণ বিচারগানে একপক্ষ অন্যপক্ষকে যেমন প্রশ্ন করেন, তেমনি গানও কথার যুক্তিতে 'ঠ্যাশ' মারেন। তাই কোনো বিষয় অগোচরে গেলেই প্রতিপক্ষ গায়কের নিকট পরাজিত হবে। তাই বিচারগানের মূল গায়েনদ্বয় একে-অপরের সাথে সব সময় মনোযোগ ও যোগাযোগে সংযুক্ত থাকেন। এছাড়া গায়েনদ্বয় তাদের দোহার ও বাদকদের সাথে সর্বক্ষণ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকালে মনোযোগ ও যোগাযোগ রাখতেই হয়। এই মনোযোগ ও যোগাযোগ একেবারেই প্রত্যক্ষ ও সার্বক্ষণিক। আর প্রত্যেক কুশীলব তার নিজের ক্রিয়ার প্রতি মনোযোগ রাখা এবং নিজ চরিত্রের সাথে মানসিক যোগাযোগ রাখার বিষয়টিও বিচারগানের কুশীলবগণ অন্যান্য নাট্যাঙ্গিকের মতই করে থাকেন নিশ্চয়ই।

৬. রস

ইউরোপিয়ান নাট্যাঙ্গিক বা ঘটনা প্রবাহ মূলত সামনে এগিয়ে যায় দ্বান্দ্বিকতা নিয়ে পক্ষান্তরে ভারতীয় তথা বাংলাদেশের লোকনাট্যাঙ্গিকের ঘটনা প্রবাহ সামনে এগোয় প্রধানত 'রস' আশ্রয় করে। ভরত নাট্যশাস্ত্রে ৮ প্রকার রস সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত সংজ্ঞক এই আটটি নাট্যরস বলে কথিত।' (সুরেশচন্দ্র, ১৯৯৭ : ১৩৩) আর এই 'নাট্যরস' উপভোগের বাসনায় কুশীলব ও দর্শক-শ্রোতাগণ পরিবেশনার সাথে যুক্ত থাকেন। বিচারগানের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম নয়। নাট্যপরিবেশনায় কুশীলবদের নাট্যরস আস্বাদনের বিষয়টি মুখ্য নয়, দর্শকদের নাট্যরস আস্বাদনের মত। কিন্তু বিচারগানে কুশীলব ও দর্শকের রস আস্বাদন বিষয়টি সমতুল্য হিসেবে বিবেচ্য। কেননা বিচারগান পরিবেশনাটির প্রতিটি মুহূর্ত নাট্যরস আশ্রয় করে সামনে এগোয়। এই পরিবেশনায় যদিও সামগ্রিক ঘটনার দ্বান্দ্বিকতা নেই কিন্তু দ্বি-দলীয় দ্বান্দ্বিকতা রয়েছে গায়েনদের মধ্যে। তবে সেই দ্বান্দ্বিকতাকেও ছাপিয়ে বিভিন্ন প্রেক্ষাপট ও গানের সুরে নাট্যরসই প্রধান বিষয় হয়ে যায়। এবং এই নাট্যরসে ডুবে থেকেই কুশীলবগণ অভিনয় করেন আর দর্শক পরিবেশনা উপভোগ করেন। কুশীলব নিজে হাসেন-

কাঁদেন এবং দর্শককে হাসান-কাঁদান। অর্থাৎ কুশীলব যখন ‘হাস্য রস’ উপভোগ করেন, দর্শকও ‘হাস্য রস’ উপভোগ করতে পারেন। আবার কুশীলব যখন ‘করুণ রস’ উপভোগ করেন, দর্শকও ‘করুণ রস’ উপভোগ করেন। প্রকৃতপক্ষে বিচারগানের অভিনয় পদ্ধতিতে ‘রস’ একটি অবিচ্ছেদ্য উপাদান।

৭. স্মৃতি

ইউরোপিয়ান থিয়েটারে কিংবা নাগরিক নাট্যাঙ্গনের অভিনয়ের ক্ষেত্রে শুধু সংলাপ আত্মস্থ করাটাই মূখ্য বিষয়। অর্থাৎ অভিনয়ে স্মৃতির ভূমিকা বলতে গেলে এটুকুই। যদিও এখানে মানুষের সামগ্রিক স্মৃতির কথা বলা হচ্ছে না। প্রকৃতপক্ষে নাট্যপরিবেশনার অংশের স্মৃতি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কথা এখানে বলা হচ্ছে। বিচারগানে গায়েন ও দোহারদের স্মৃতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা বিচারগানের পরিবেশনায় বিভিন্ন পালা রয়েছে, এর জন্য অসংখ্য গান, তথ্য-তত্ত্বসহ নানা বিষয় আত্মস্থ করতে হয়। এছাড়াও পরিবেশনাকালে একজন গায়েন কী কী প্রশ্ন করলেন, কোন কোন প্রসঙ্গে ঠ্যাশ মারলেন, কিংবা কোন যুক্তি দিয়ে যুক্তি খণ্ডন করলেন সব বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মনে রাখতে হয়। তা না হলে গায়েনের পক্ষে পরিবেশনায় জবাব ও যুক্তি খণ্ডন সম্ভব নয়। আরেকটি বিষয় হচ্ছে বিষয়ভিত্তিক গান মুখস্থ থাকা খুবই জরুরি নয়তো প্রতিপক্ষ শিল্পীর গানের পাল্টা হিসেবে যথার্থ গান পরিবেশন করতে সক্ষম হবেন না। তাই যে গায়কের স্মৃতি যত ভালো সে গায়ক তত বেশি পরিবেশনায় ভূমিকা রাখতে পারেন। অর্থাৎ বিচারগানের পরিবেশনায় অভিনয় পদ্ধতির উপাদান হিসেবে স্মৃতিও আবশ্যিক বিষয়।

সর্বোপরি উপরিউক্ত উপাদানগুলো বিচারগানের অভিনয় পদ্ধতির আবশ্যিক উপাদান হিসেবে বিবেচ্য বলে মনে করি। বিচারগানের অভিনয় পর্যবেক্ষণ করলে এই উপাদানগুলোকে কোনোভাবেই এড়িয়ে যাওয়া যায় না। কারণ এর প্রতিটি বিষয়ই বিচারগানের পরিবেশনায় ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত রয়েছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিচারগানের পৃষ্ঠপোষক ও কুশীলবদের বায়না

বাংলাদেশের প্রায় সমগ্র অঞ্চলেই যেহেতু বিচারগান পরিবেশিত হয়, তাই এই পরিবেশনাটির পৃষ্ঠপোষকও সারাদেশেই কম-বেশি রয়েছে। যেহেতু এই লোকনাট্য আঙ্গিকটি ধর্মীয়-আধ্যাত্মিকতা চর্চা ও অসাম্প্রায়দায়িক চেতনা নির্ভর, অন্যদিকে বিচারগানে সামাজিক নানান বিষয়ভিত্তিক পালাও হয়ে থাকে। তাই এ পরিবেশনার সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। একই পরিবেশনা মুসলিম পিরের বাড়িতে যেমন হচ্ছে, তেমনি হিন্দু গোঁসাইয়ের বাড়িতেও পরিবেশিত হচ্ছে। আবার দেখা যাচ্ছে, প্রাতিষ্ঠানিক ইসলামের বাইরে এসে সুফি-ইসলামের বিশ্বাসের জায়গা থেকে সকল ধর্মের মানুষের বিশ্বাসের কেন্দ্র হিসেবে মাজারে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের পৃষ্টপোষকতা পাচ্ছে বিচারগান। যদিও সঠিক সংখ্যা পাওয়া যায় না, তথাপি বিচারগানের গায়ক ও মাজারপন্থীদের ভাষ্য মতে, বাংলাদেশে লক্ষাধিক মাজার বা দরগা রয়েছে। আর এই প্রতিটি মাজারেই রয়েছে মানতকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক আয়, যে আয়ের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বপ্রাপ্ত খাদেম ও ভক্তগণ সবাই বিচারগানের ভক্ত-শ্রোতা। এবং প্রায় প্রতিটি মাজারে বিচারগানের চর্চা ও পরিবেশনা হয়। অর্থাৎ বিচারগানের প্রধান পৃষ্টপোষক হচ্ছেন মাজার কেন্দ্রিক বিশ্বাসী লোকজন, পির-গোঁসাই ও বারোয়ারি গানপ্রেমী মানুষ। একই চিত্র সারা বাংলাদেশেই প্রায় একই রকমভাবে বিদ্যমান। এছাড়া বিভিন্ন জাতীয় ইস্যুতে বিচারগানের পরিবেশনার আয়োজন হয়ে থাকে। যেমন- নির্বাচন, ইদ, পূজা প্রভৃতি। দেখা যায়, নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক নেতারা বিচারগানের আয়োজনে অর্থ দিয়ে অতিথি হয়ে নিজের নাম প্রচার করেন। কিংবা ইদ ও পূজায় ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ নিজের নাম প্রচারের স্বার্থে অথবা নির্মল বিনোদনের জন্য বিচারগানের আয়োজন করেন। অর্থাৎ মাজার কমিটি, পির-গোঁসাই, রাজনৈতিক নেতা ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণই বিচারগানের প্রধান পৃষ্টপোষক। এমনকি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর চাঁদা সংগ্রহের মাধ্যমেও বিচারগানের আয়োজন হয়। আর এই সকল পৃষ্টপোষকদের অকৃপণ হাতের মাধ্যমেই বিচারগানের দলের বায়নার ব্যবস্থা হয়। বিচারগানের বায়না মূলত হয় মূল গায়েনের দল ভিত্তিক। সাধারণত মূল গায়েনের বায়না বরাদ্দ হয়, তিনি আবার তার দলের অন্যান্য সদস্য বা কুশীলবদের টাকা দিয়ে থাকেন। প্রতিটি দলের মানবিচারও হয় মূল গায়েনের জনপ্রিয়তা ও খ্যাতির ওপর নির্ভর করে। বিচারগানের বায়না সম্পর্কে সাইমন জাকারিয়া বলেন,

> বিচারগানের শিল্পীরা সম্পূর্ণরূপে পেশাগতভাবে এই গান পরিবেশন করে থাকেন। একজন বিচারগানের শিল্পী তাঁর বাদ্যযন্ত্রী ও দোহার-সহকারীসহ এক রাতের পাল্লার জন্য ৩০০০ থেকে ১৫০০০ টাকা পর্যন্ত বায়না নিয়ে থাকেন। (সাইমন, ২০০৮ : ৪৬৯)

গবেষকের তথ্যমতে, ৩০০০-১৫০০০ টাকা বায়নার কথা পাওয়া যায়, যেটি প্রকাশিত ২০০৮ সালে। কিন্তু বিভিন্ন বিচারগানের গায়েনদের ভাষ্যমতে, (২০২১ সাল হতে) ২৫-৩০ বছর আগেই বিচারগানের প্রখ্যাত গায়ক দলিল উদ্দিন বয়াতি ৩০-৬০ হাজার টাকা বায়না পেতেন। তবে বর্তমানে (২০২২) বিচারগানের মূল গায়েনসহ একটি দল ৫ হাজার থেকে শুরু করে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বায়না নিয়ে থাকেন এক পালা গান গাওয়ার জন্য। অবশ্য এই বায়নার তারতম্য ঘটে সময়ের ওপর। শীতকাল বিচারগানের মৌসুম হওয়ায় শিল্পীদের চাহিদা বেশি তখন বায়নাও বেশি, আবার মন্দা মৌসুমে শিল্পীদের বায়না কমে যায়। দেশের বিচারগানের প্রয়াত প্রখ্যাত গায়কদের মধ্যে বায়না বেশি ছিলো তৎকালীন সময়ে আ. হালিম বয়াতি, রজ্জব আলী দেওয়ান, খালেক দেওয়ান, মালেক দেওয়ান, মাতালকবি রাজ্জাক দেওয়ান, আ. রশিদ সরকার, পরশ আলী দেওয়ান, আয়নাল মিয়া বয়াতি ও অসীম দাশ বাউলসহ প্রমুখ শিল্পী-কুশীলবদের।

বর্তমানে (২০২২) দেশের বেশি বায়না প্রাপ্ত গায়েন ও তার দলের মধ্যে শীর্ষে রয়েছেন, ময়মনসিংহ অঞ্চলের সুনীল কর্মকার ও সালাম সরকার; ফরিদপুরের ফকির আবুল সরকার; মাদারীপুরের আলেয়া বেগম আলো; মানিকগঞ্জের মমতাজ বেগম ও ছোট আবুল সরকার (মহারাজ); ঢাকার কাজল দেওয়ান ও আরিফ দেওয়ান; মুন্সীগঞ্জের শাহ আলম সরকার ও লতিফ সরকার।

এছাড়াও বর্তমানে (২০২২) বিচারগানের নারী গায়েনদেরও বেশ জনপ্রিয়তা রয়েছে, এদের মধ্যে মমতাজ বেগম, আলেয়া বেগম আলো, মুক্তা সরকার, দেওয়ান বাবলী সরকার, লিপি সরকার, শেফালী সরকার, নীলা পাগলী, বিলকিস বানু ও রুমা সরকারসহ প্রমুখের বায়না বেশি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিচারগানের কুশীলবদের পোশাক ও সাজসজ্জা

বিশ্বনাট্যাঙ্গিকের দিকে তাকিয়ে দেখলে লোকনাট্যাঙ্গিককে খুব সহজেই আলাদা করা যায় পরিবেশনার কুশীলবদের পোশাক ও সাজসজ্জার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চিহ্নের জন্য। বিশ্বের নাগরিক থিয়েটারের পোশাক ও সাজসজ্জার ক্ষেত্রে যেমন নিয়মতান্ত্রিক ও কার্যকারণ রয়েছে। ঠিক তেমনি বিশ্বের নানা অঞ্চলের লোকনাটক বা দেশজ নাটকেরও রয়েছে সুনির্দিষ্ট পোশাক-সাজসজ্জার নিয়মতান্ত্রিকতা ও ঐতিহ্যবাহী ধারা। এমনকি নাগনিক বা লোকনাটক সে যে আঙ্গিকেরই হোক না কেন নাটকের পোশাক ও সাজসজ্জার মাধ্যমে নাট্যে অন্তর্নিহিত দর্শন ও তাৎপর্য সহজেই অনুধাবন করা যায়। নাগরিক থিয়েটারে যেমন আঙ্গিক ও রীতিভেদে পোশাক ও সাজসজ্জার পার্থক্য তৈরি হয়। তেমনি লোকনাট্যের ক্ষেত্রেও ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিক ও রীতিভেদে পোশাক ও সাজসজ্জার বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। তবে লোকনাটকের কুশীলবদের পোশাক ও সাজসজ্জায় নাট্যের অন্তর্নিহিত দর্শন ও তাৎপর্য ফুটে ওঠে। বাংলাদেশের লোকনাট্য আঙ্গিকগুলোর পোশাক ও সাজসজ্জার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়। এমনকি এ দেশের বৈচিত্র্যময় লোকনাট্যাঙ্গিকগুলোতেও রয়েছে পোশাক ও সাজসজ্জার বৈচিত্র্যময়তা। এবং প্রতিটি লোকনাট্য আঙ্গিকের পরিবেশনা-পদ্ধতি কৌশলভেদে পরিবেশনাটির নিজস্ব পোশাক ও সাজসজ্জা রয়েছে। যা দেখে দর্শক সহজেই বুঝতে পারেন কোন আঙ্গিকের পরিবেশনা এটি। যেমন, রঙচঙে প্যান্ট-শার্ট, জুতা, বেল্ট, ইউরোপিয়ান ধাঁচের পোশাক-পরিচ্ছদ ও গাঢ় মেক-আপের আয়োজন দেখলেই বোঝা যায় এটি কোনো যাত্রাপালার আসর। কিংবা সাদা গেঞ্জি, লুঙ্গি, মাথায় মাথাল, মুখে সাদা দাঁড়ি, হাফ প্যান্টের কোনো চরিত্র দেখলে দর্শকের বুঝতে অসুবিধা হয় না, এটি রাজশাহী অঞ্চলের গম্ভীরাগান। এ রকম বহু পরিবেশনারই রয়েছে নিজস্ব পোশাক ও সাজসজ্জা। তেমনি প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশনা বিচারগানেরও রয়েছে খুব সহজেই চেনার মত পোশাক ও সাজসজ্জার চিহ্ন-রূপ। যদিও সহজেই বিচারগানের কুশীলবদের তেমন কোনো বিশেষায়িত পোশাক ও সাজসজ্জা নেই। তারপরও যতটুকুই আছে তাতেই বুঝতে অসুবিধা হয় না, পরিবেশনাটি বিচারগান। বিচারগানের পোশাক ও সাজসজ্জার ক্ষেত্রে দুটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যথা-

এক. কুশীলব নারী নাকি পুরুষ, দুই. কুশীলব মূল গায়েন নাকি দোহার । বিচারগানের কুশীলব নারী-পুরুষভেদে প্রধান পার্থক্য কেবল পুরুষালি ও মেয়েলি পোশাক। বিচারগানে লোকনাট্যের অন্যান্য আঙ্গিকের মত ছুকরির উপস্থিতি নেই এবং এক্ষেত্রে পুরুষকে মেয়ে সাজতে হয় না এবং পুরুষকে মেয়েলি পোশাকও পরতে হয় না। এমনকি বিচারগানের নারী-পুরুষ কুশীলবগণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাদের দৈনন্দিন জীবনের পোশাকই পরে থাকেন।

তবে পরিবেশনাটির মূল গায়েনদ্বয় বিশেষ ধরনের পোশাক পরে থাকেন। এক্ষেত্রে দেখা যায়, বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী বাউলরা যেমন পোশাক পরেন বিচারগানের গায়েনগণও সে রকম পোশাক পরেন।

পুরুষ গায়েনগণ প্রধানত সাদা বা গেরুয়া আলখাল্লা, সাদা ঢিলেঢালা পাঞ্জাবী, সাদা লুঙ্গি বা পাজামা ও গলায় উত্তরীয় পরেন। এমনকি কোনো কোনা গায়েন প্যান্ট-শার্টও পরে গান করেন। বিচারগানের গায়েনদের পোশাক পরিধানের বিষয়ে এই পরিবেশনার জনপ্রিয় গায়ক আরিফ দেওয়ান বলেন,

> আমরা যারা বিচারগান বা পালাগান করি, তারা সব সময় পাজামা-পাঞ্জাবী-লুঙ্গি পরেই গান করি। কারণ এই পোশাকের সাথে একটি ভাব-গাম্ভীর্য ও ঐতিহ্যবাহী ধারা বহমান আছে। আমরা যে পোশাক পরি তা মূলত সাধু-অলিদের পোশাক। তবে একালের অনেক শিল্পীই প্যান্ট-শার্ট পরে গান গায়, আমি মনে করি তারা এক ধরনের প্রতারণা করছে। কারণ বিচারগান কেবল পেশা না এটা একটা সাধনার বিষয়। আমরা মহাজনদের ঐতিহ্যকে ধারণ করি। (আরিফ, ২০২১ : সাক্ষাৎকার)

অর্থাৎ বিচারগানের কুশীলবগণ প্রধানত গুরু-শিষ্য পরম্পরা ও ঐহিত্যেও ধারায় পোশাকগুলো পরে থাকেন। তবে পোশাকের রঙের ক্ষেত্রে চমকপ্রদ তথ্য দিয়েছেন গায়ক কাজল দেওয়ান, তাঁর ভাষ্য মতে,

> বিচারগানের গায়েন বা বাউলদের মধ্যে বিশ্বাসের জায়গা থেকে দুইটি ধারা রয়েছে। একটি সুফি বাউল, আরেকটি বৈষ্ণব বাউল। সুফি বাউলরা সাদা পোশাক পরতে পছন্দ করেন আর বৈষ্ণব বাউলরা গেরুয়া রঙের পোশাক পরে থাকেন। (কাজল, ২০১৪ : সাক্ষাৎকার)

প্রকৃতপক্ষে বিচারগানের পরিবেশনার সাথে লৌকিক বিশ্বাস ও আচারগত কারণে পোশাক পরিধানে কিছুটা পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। তবে সাদা বা গেরুয়া রঙের যে পোশাকই পরুক না কেন বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পাঞ্জাবী, পাজামা ও লুঙ্গিই বেশি দেখা যায় গায়েনদের পরিধানে। কেউ কেউ অবশ্য বিশেষায়িত বা নিজের মত করে পোশাক তৈরি করেও পরেন। যেমন মানিকগঞ্জের বিচারগানের কিংবদন্তি গায়ক আ. রশিদ সরকার বিশেষ ধরনের আলখাল্লা পরতেন। এমনকি তার শিষ্যদের মধ্যেও কেউ কেউ আছেন তাকে অনুসরণ করেন। তারই এক শিষ্য ছোট আবুল সরকার আবার নিজস্ব তৈরি বিশেষ রকমের পোশাক পরেন। তিনি সাদা লুঙ্গি সাথে সাদা একটা বৃহৎ চাদর সারা শরীরে জড়িয়ে রাখেন। সেক্ষেত্রে কখনও গায়ে সেন্টো গেঞ্জি বা কখনও খালি গায়ে শুধু চাদর জড়িয়ে থাকেন। তবে বিচারগানের সব অঞ্চলের গায়েনদের বিশেষ একটি পোশাক রয়েছে সেটি হচ্ছে এক রঙবিশিষ্ট উত্তীয়। যা পুরুষ গায়েনদের সবাই পরে থাকেন। বাংলাদেশের প্রায় অঞ্চলের গায়েনগণ বাউল-সুফি-বৈষ্ণব ঘরাণার পোশাক পরলেও কেউ কেউ হালনাগাদ সময়ে শার্ট-প্যান্ট পরে পরিবেশনায় অংশগ্রহণ করেন। বিশেষ করে ময়মনসিংহ অঞ্চলের গায়েন সালাম সরকার, হবিল সরকার, সোহাগ সরকারকে একদমই দৈনন্দিন জীবনের পোশাকে গান গাইতে দেখা যায়। এছাড়া বর্তমানে কেউ কেউ জিন্সের প্যান্টের সাথে লম্বা পাঞ্জাবী পরেও পরিবেশনায় অংশগ্রহণ করেন। যেমন

ঢাকার কেরানীগঞ্জের গায়ক কানন দেওয়ান প্রায়ই জিন্সের প্যান্ট ও পাঞ্জাবী পরে গান গেয়ে থাকেন। তবে বিষয়টিকে বয়োজ্যেষ্ঠ গায়করা ভালো দৃষ্টিতে দেখেন না। এমনকি এ রকম পোশাকের তীব্র নিন্দাও করে থাকেন।

বিচারগানের পুরুষ গায়েনদের পোশাকে কিছুটা বৈচিত্র্য থাকলেও নারী গায়েনদের পোশাকে তেমন কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। নারী গায়েনগণ সাধারণত শাড়ি পড়েই গান করেন। এছাড়া বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, কেউ কেউ পুরুষ গায়েনদের মত সাদা বা গেরুয়া রঙের এক রঙবিশিষ্ট শাড়ি-ব্লাউজ পরিধান করেন। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দেওয়ান বাবলী সরকার, মুক্তা সরকার প্রায়ই সাদা রঙের শাড়ি-ব্লাউজ পরিধান করে পরিবেশনায় অংশগ্রহণ করেন। তবে বিচারগানের কিছু বিশেষ পালা রয়েছে , যেমন রাধা-কৃষ্ণ, বাইদা-বাইদানী পালাসহ কয়েকটি পালায় গায়েনগণ অভিনয় কালে উক্ত চরিত্রের মত করে পোশাক ও সাজসজ্জা গ্রহণ করেন। দেখা যায়, নারী গায়েন যখন রাধা পক্ষে গান করছেন, তখন তিনি দেবী রাধার মত করে (মন্দিরে অধিষ্ঠিত রাধার মূর্তি দেখতে যেমন) মাথায় মুকুট ও নানা রকম তিলকসহ বিভিন্ন রকম গয়না পরেন। তেমনি যিনি কৃষ্ণ চরিত্রে অভিনয় করেন তিনিও ভগবান কৃষ্ণের (মন্দিরে অধিষ্ঠিত কৃষ্ণের মূর্তি দেখতে যেমন) সাজে নিজেকে সাজান। এমনিভাবে বাইদা-বাইদানী বা অন্যান্য পালার চরিত্রানুযায়ী গায়েনগণ নিজেকে সজ্জিত করার চেষ্টা করেন।

অন্যদিকে, বিচারগানের অন্যান্য কুশীলব বিশেষ করে দোহারদের পোশাকে তেমন পার্থক্যযোগ্য পোশাক নেই বললেই চলে। দোহারগণ দৈনন্দিন জীবনের পোশাক পরেই গানে অংশগ্রহণ করেন। তবে বর্তমানে গানের ভিডিওধারণের উদ্দেশ্যে বিচারগানের আয়োজন হলে দেখা যায়, বিচারগানের উভয়দলে এক রঙের এই রকম পোশাক-পরিধান করে দোহারগণ পরিবেশনায় অংশগ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে অবশ্য বিচারগানের দলগুলো নিজেদের ব্যবস্থাপনায় পোশাক তেরি করেন না। পোশাকের ব্যবস্থা বাণিজ্যিক কোম্পানরি ব্যবস্থাপনায় পরিবেশনার জন্য পোশাক তৈরি ও সরবরাহ করা হয়। এমনকি এটাও দেখা যায়, একই পোশাক অথচ, একই কোম্পানির ব্যবস্থাপনায় ভিন্ন ভিন্ন পালার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দলের একই পোশাক সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

সর্বোপরি পোশাকের ক্ষেত্রে বিচারগানের কুশীলবগণ কোনো ধরা বাঁধা নিয়ম অনুসরণ করেন না। পোশাকের ব্যাপারটা সম্পূর্ণই ঐচ্ছিক, অনির্ধারিত ও তাৎক্ষণিক ব্যবস্থাপনার ওপর নির্ভরশীল।

অন্যদিকে বিচারগানের কুশীলবগণের সাজসজ্জা বা মেক-আপের ক্ষেত্রেও কোনো ধরা-বাঁধা নিয়ম নেই। এমনকি দেশের অন্যান্য লোকনাট্য আঙ্গিকের মত ঐতিহ্যগতভাবে কোনো সাজসজ্জা বা মেক-আপ করেন না। কয়েকটি পালা অবশ্য ব্যতিক্রম রয়েছে যেখানে চরিত্র অনুযায়ী মেক-আপ নিয়ে থাকেন কুশীলবগণ। তবে দেশের যাত্রাগুলোতে যেমন দেখা যায়, গাঢ় মেক-আপের চাকচিক্যময়তার প্রাবল্য রয়েছে কিংবা দেশের সঙযাত্রা বা

সঙখেলায় অদ্ভুত ও হাস্যারসাত্বক মেক-আপের বাহুল্য রয়েছে, কিন্তু বিচারগানের তেমন কোনো মেক-আপের বাহুল্যতা নেই বললেই চলে।

চিত্র-৩০ : বিচারগানের রাধা-কৃষ্ণ পালার পোশাক ও সাজসজ্জার ছবি।

বিশেষ করে পুরুষ কুশীলবগণ মেক-আপ পরেন না বললেই চলে। তবে কেউ কেউ দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য প্রসাধনী ব্যবহার করেন, সেক্ষেত্রে স্নো, পাউডার, আর সুগন্ধি। এগুলোও কালেভদ্রে ব্যবহার করেন। বিচারগানের গায়েন আজিজ সরকার বলেন, "আমরা আসলে কেউই মেক-আপ করি না, একটু-আধটু স্নো নেই, আর মঞ্চে উঠার আগে হয়তো একটু আতর, সেন্ট মাখি। চুলটা আউলা-ঝাউলা থাকলে মাথায় একটু চিরুনী করি।" (আজিজ, ২০০৯ : সাক্ষাৎকার) অর্থাৎ বিচারগানের কুশীলবগণ মেক-আপের বিষয়ে আগ্রহ দেখান না এ পরিবেশনার ঐতিহ্যগত ধারা থেকেই। তবে বিচারগানের তরুণ গায়িকাদের মধ্যে মেক-আপের ব্যাপারে আগ্রহ দেখা যায়। বিশেষ করে মহিলা মূল গায়েনগণ গাঢ় মেক-আপে মঞ্চে ওঠেন। কিন্তু এই মেক-আপও দৈনন্দিন জীবনের মানুষের পার্টি বা বিয়ে বাড়ির অতিথিদের সাজের মত অনেকটা। অর্থাৎ নাট্যপ্রদর্শনীর জন্য বিশেষায়িত সাজসজ্জা বা মেক-আপ করেন। বর্তমানে মমতাজ বেগম, দেওয়ান বাবলী সরকার, লিপি সরকার, শেফালী সরকার, পারুল সরকার, মুক্তা সরকার, নূর কাজল প্রমুখ বিচারগানের নারী গায়েনদের গাঢ় মেক-আপে আসরে দেখা যায়। এমনকি এই গাঢ় রঙের মেক-আপ বর্তমানে দেশের প্রায় সব নারী গায়েনদের মধ্যেই কম-বেশি প্রভাবিত করছে। এছাড়া নারী গায়েনগণ তাদের মেয়েলি সব রকম অলংকারই পরিধান করেন। বিশেষ করে নাকফুল, কানের দুল, পায়ের নুপূর, গলার হার,

হাতের চুড়ি-বালা পরিধান করেন। এবং হিন্দু বিবাহিত নারী গায়েনগণ হাতে শাখাও পরে থাকেন। তবে বিচারগানের মূল গায়েনদের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই প্রায় কোনো না কোনো আংটি পরেনই। খুব কম শিল্পীই আছেন যারা আংটি পরেন না। কেউ কেউ শখের বশে পরলেও অধিকাংশ গায়েনই আধ্যাত্মিক-ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে আংটি পরে থাকেন। কোনো কোনো শিল্পীর হাতে ১টি থেকে শুরু করে ৮টি পর্যন্ত আংটি পরেন। মানিকগঞ্জের ছোট আবুল সরকারের হাতে সব সময় কতগুলো আংটি পরিহিত অবস্থায় দেখা যায়। মৈয়মনসিংহের সুনীল কর্মকার, সালাম সরকার; মুন্সীগঞ্জের শাহ আলম সরকার, লতিফ সরকার; ফরিদপুরের ফকির আবুল সরকার, অসীম দাশ বাউল, ঢাকার আরিফ দেওয়ান, কাজল দেওয়ান; মানিকগঞ্জের জালাল সরকার, সাত্তার সরকারসহ প্রমুখ গায়েনের হাতেই বিচারগানের পরিবেশনাকালে আংটি পরিধান করেন। একটি বিষয় লক্ষণীয় বিচারগানের গায়েনগণ শুধু পরিবেশনাকালে নয়, তারা সব সময় অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আংটি পরিধান করে থাকেন। এই আংটি পরার রীতিটি অবশ্য বাংলাদেশের সব অঞ্চলের গায়েনদের মাঝেই দেখা যায়। বয়স্ক শিল্পীদের হাতে আংটি পরিমানে বেশি আর তরুণ শিল্পীদের হাতে একটু কম দেখা যায়।

চিত্র-৩১: বিচারগানের গায়েন (বাম থেকে) খোরশেদ আলম বয়াতি, ছোট রজ্জব আলী দেওয়ান, ফকির আবুল সরকার ও জালাল সরকার (সাধু) রুদ্রাক্ষর মালা ও পুঁতির মালা পরে আসরে অংশগ্রহণের মুহূর্ত।

বিচারগানের কুশিলবদের সাজসজ্জার ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, মাথায় লম্বা চুলের বাহার। অন্যান্য লোকনাট্যাঙ্গিকের কুশীলবদের মত তারা আলগা চুল পরেন না। বিচারগানের মূল গায়েন, দোহার, ঢুলী, বাঁশিওয়ালা প্রায় সবার মাথায় লম্বা চুল দেখা যায়। বিশেষত, তিনটি চরিত্রের মাথায় লম্বা চুল থাকেই, সেটি হচ্ছে মূল গায়েন,

ঢুলী ও বংশীবাদক। তবে ব্যতিক্রম কেউ কেউ আছেন যারা চুল লম্বা রাখেন না। অন্যদিকে নারী কুশীলবদের তো সামাজিক ও প্রথাগতভাবেই লম্বা চুল থাকে। আর পুরুষ কুশীলবগণ ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক ও ঐতিহ্যগতভাবে লম্বা চুল রাখেন। বিচারগান পরিবেশনার সময় দেখা যায়, বিভিন্ন সময় কুশীলবগণ মাথার চুল দুলিয়ে গান করেন, ঢোল বা বাঁশি বাজান। শুধুই তাই নয় দুই দলের মধ্যে কখনও কখনও গানের সাথে চুল দোলানো প্রতিযোগিতাও লেগে যায়। তবে বিচারগানের কুশীলবদের এই লম্বা চুল রাখার বিরুদ্ধে নানা সময়ে দেশের শরিয়াপন্থী মোল্লারা ফতুয়া ও হুমকি-ধমকি দিয়ে থাকেন। এমনকি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিচারগানের কুশীলবগণ লম্বা চুল রাখার জন্য আক্রমণের শিকার হয়েছেন এমন রেকর্ডও রয়েছে। এ জন্য অবশ্য বিচারগানের মূল গায়েনগণ অনেক সময় লম্বা চুলের ধর্মীয় বৈধতার জন্য এর পক্ষে বিভিন্ন হাদিসের দালিলিক প্রমাণ পেশ করেন। বিশেষ করে বিচারগানের প্রয়াত গায়ক আ. রশিদ সরকার ও বর্তমান গায়ক ছোট আবুল সরকার লম্বা চুলের পক্ষে সরব বক্তব্য দিয়েছেন বিভিন্ন বিচারগানের আসরে। বিচারগানের সাজসজ্জার ক্ষেত্রে হিন্দু গায়েনদের মধ্যে রুদ্রাক্ষর মালা পরার প্রচলন বেশি হলেও মুসলিম গায়েনদের মধ্যেও অনেকেই রুদ্রাক্ষর মালা পরেন। ছোট আবুল সরকারকে রুদ্রাক্ষর মালা পরে আসরে গান করতে দেখা যায়। এছাড়া ফরিদপুরের ফকির আবুল সরকার ও অসীম দাশ বাউল, ঝিনাইদহের খোরশেদ আলম বয়াতি, মানিকগঞ্জের জালাল সরকার (সাধু), ঢাকার ছোট রজ্জব আলী দেওয়ান এবং ঝিনাইদহের খোরশেদ আলম বয়াতি প্রায়ই রুদ্রাক্ষর মালা পরে গান করেন। এমনকি এই গায়েনগণ রুদ্রাক্ষর মালার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের কাঠ ও প্লাস্টিকের পুঁতির মালা পরেও গান করে থাকেন।

সর্বোপরি বলা যায়, বিচারগানের কুশীলবদের পোশাক ও সাজসজ্জা পরিধানে বৈচিত্র্য থাকলেও সারাদেশের কুশীলবদের পোশাক ও সাজসজ্জার মধ্যে এক ধরনের ঐক্য রয়েছে। যার মাধ্যমে পরিবেশনা দেখলেই বোঝা যায়, এটি বিচারগানের আসর।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিচারগানের আসর-আসন ব্যবস্থাপনা ও সাজঘর

নাগরিক থিয়েটার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বদ্ধকাঠামো বা মঞ্চের মধ্যে হলেও লোকনাটক অনেক বেশি উন্মুক্ত ও মুক্তকাঠামোর মধ্যে পরিবেশিত হয়। বাংলাদেশের লোকনাটকের যতগুলো আঙ্গিক রয়েছে প্রায় সবকটিই কোনো সুনির্দিষ্ট মঞ্চ বা আসর কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। যে কোনো আয়তনের মধ্যে যে কোনো আঙ্গিকের লোকনাট্য পরিবেশনা খাপ খাইয়ে নিতে পারে। এবং খুব সহজেই পরিবেশনাটি ঐ আয়তনের মধ্যে উপস্থাপিত হতে পারে। বাংলাদেশের লোকনাট্যের মঞ্চ বা আসরকে প্রধানত ৪ ভাগে ভাগ করা যায়:

ক. বর্গাকার আসর

খ. আয়তকার আসর

গ. ত্রিভুজকার আসর ও

ঘ. উন্মুক্তকার আসর

লোকনাট্যের একেকটি আঙ্গিক একেকটি আকার ও আয়তনের আসরের জন্যই সাধারণত উপযুক্ত বা প্রদর্শনযোগ্য। কিন্তু বিচারগান পরিবেশনাটি সব ধরনের বা সব রকমের আসরেই প্রদর্শন উপযোগী এবং সহজেই কুশীলবগণ খাপ খাইয়ে নিতে পারেন। বিচারগানের আসর সম্পর্কে সাইমন জাকারিয়া বলেন,

> বিচারগানের আসরের মাঝখানে সাধারণত চারটি চৌকি দিয়ে মঞ্চ বানানো হয়। তার ওপর থাকে শামিয়ানা। মঞ্চের চারপাশে থাকে দর্শক-শ্রোতার বসবার ব্যবস্থা। সহকারী-দোহারদের মাঝখানে রেখে গায়ক বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি সহকারে এই গান পরিবেশন করে থাকেন। (সাইমন, ২০০৮ : ৪৬৯)

উপরের উদ্ধৃতির মাধ্যমে বিচারগানের বর্গাকার বা আয়তকার আসরের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এবং চারপাশে দর্শক-শ্রোতার আসন থাকে। নিম্নে বিচারগানের বর্গাকার আসরের একটি প্রামাণ্যমূলক রেখাচিত্র দেয়া হলো।

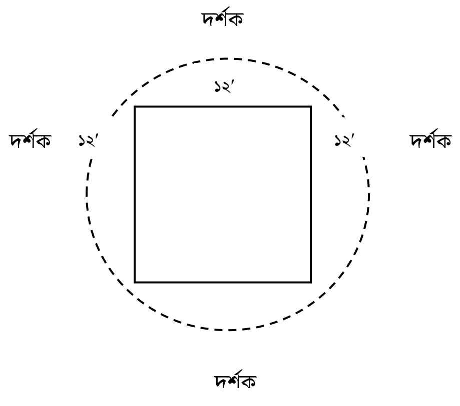

(রেখাচিত্রটি ২৬/১২/২০০৯ খ্রি. তারিখে মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর উপজেলাধীন নিমতা গ্রামের পির সাহেব আজিমউদ্দিন আল চিশ্‌তির বাড়ি থেকে সংগৃহীত।)

অন্যদিকে, বিচারগানের আসর ত্রিভুজ আকৃতি ও উন্মুক্ত আকৃতিরও হয়। এমনকি অনেকটা প্রসেনিয়াম মঞ্চের মত আসরও বিচারগানের পরিবেশনায় দেখা যায়। বিচারগানের পরিবেশনা যেহেতু সবচেয়ে বেশি হয়, দেশের নানা অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত মাজার বা দরগা ও মন্দিরের প্রাঙ্গনে কিংবা আয়োজকের বাড়ির সম্মুখে। এক্ষেত্রে মাজার বা দরগা ও মন্দির অথবা আয়োজকের বাড়িকে যে কোনো এক পাশে রেখে অন্যপাশে মঞ্চ বা আসর বসানো হয়। এই আসর বসানোর জায়গার সংকুলানের ওপর নির্ভর করে মঞ্চ বা আসর কেমন হবে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আসর যদিও বর্গাকার ও আয়তকার করা হয়, তবে ত্রিভুজ আকৃতি ও প্রসেনিয়ামও আদলে হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের অনেক জায়গাতেই বিচারগানের স্থায়ী মঞ্চ রয়েছে। গত প্রায় ২৫-৩০ বছর যাবৎ মানিকগঞ্জের হরিরামপুর উপজেলার যাত্রাপুর গ্রামে তাজুল ইসলামের বাড়িতে একটি স্থায়ী বর্গাকার আসর রয়েছে। এটিকে আবার বিচারগানের পরিবেশনাকালে কারুকার্যময় ও রঙ-পালিশ করা হয়।

তাছাড়া দেশের বিভিন্ন মাজার ও মন্দির প্রাঙ্গনে ও পির-গোঁসাইদের ব্যবস্থাপনায় সুনির্দিষ্ট কিছু জায়গাও বরাদ্দ রাখা হয় বাৎসরিক বিচারগানের পরিবেশনার জন্য। এ রকম কিছু আসর ব্যবস্থাপনার জন্য ভূমি রয়েছে, মানিকগঞ্জের হরিরামপুর উপজেলাধীন ঝিটকা গ্রামের দেওয়ান আব্দুর রশিদ চিশ্‌তি ও জিন্দা শাহ্‌ের মাজার প্রাঙ্গন, একই জেলারই সিংগাইর উপজেলার আজিমপুর গ্রামের আ. রশিদ সরকারের মাজার প্রাঙ্গন এবং ঢাকার কেরানীগঞ্জের মাতালকবি রাজ্জাক দেওয়ানের মাজার প্রাঙ্গনসহ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তবে বিচারগানের মঞ্চ বা আসর বেশির ভাগই হয় অস্থায়ী যা মাজারের ওরশ ও মন্দির কেন্দ্রিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সময় স্থাপন করা হয়। এছাড়া শখের বশে মানত পূরণার্থে কিংবা বারয়ারি মানুষের আয়োজনে যে সব বিচারগানের পরিবেশনা হয় তার বেশির ভাগই অর্থনৈতিক যোগানের ওপর নির্ভর করে আসরের ব্যবস্থাপনা হয়। অর্থের যোগান কম হলে চৌকি বা বেঞ্চির সম্মিলনে মঞ্চ বা আসর নির্মিত হয়। আর অর্থের যোগান পর্যাপ্ত হলে আধুনিক ডেকোরেটরের সহযোগিতায় ব্যয়বহুল মঞ্চ নির্মিত হয়।

এ ক্ষেত্রে ডেকোরেটরের পাটাতনের মাধ্যমে আসর প্রস্তুত হয়। নিচে থাকে কাঠের পাটাতন, আর পাটাতনের ওপরে বাঁশ-কাঠের কাঠামোতে শামিয়ানা টাঙানো হয়। বর্তমানে অবশ্য বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলে আধুনিক ডেকোরেটর কোম্পানির ব্যবস্থাপনায় আসর নির্মিত হয়। তবে বিচারগানের একাধিক শিল্পী-কুশীলব ও বয়োজ্যেষ্ঠ শ্রোতাগণের ভাষ্য মতে, এক সময় বিচারগানের পরিবেশনায় আসর ব্যবস্থাপনা হতো মূলত আয়োজক-গেরস্থের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায়। যেখানে সামাজিক তাবু বা শামিয়ানা, ঘের-কাপড় প্রভৃতি নিয়ে বসত বাড়ির বড় আঙিনায় বাঁশ দিয়ে

আসর বা মঞ্চ বানানো হতো। এবং এ সকল মঞ্চ বেশির ভাগই ভূমি সমতলে থাকতো। যেখানে দর্শকের আসন ও আসরের মাঝে খুব একটা পার্থক্য থাকতো না। অর্থাৎ কুশীলবের আসর ও দর্শকের আসন একাকার হয়ে যেতো। এই আসরগুলোকে উন্মুক্তকার আসর বলতে পারি। বিচারগানের আসর ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও চমকপ্রদ দিকটি হচ্ছে আসর যে রকমেরই হোক না কেন পরিবেশনার কোনো না কোনো সময় কুশীলব ও দর্শক-শ্রোতাগণ শিল্পরসের সম্মোহনীতে আসরের সীমারেখাকে মুছে দিয়ে 'দশা ধরা'র মাধ্যমে একাকার হয়ে যায়। সেটা কখনও বিচ্ছেদগানের করুণ রসে দশা পর্যায়ে কিংবা কখনও কৌতুক হাস্য রসের খুশির ঢেউয়ে কুশীলব ও দর্শক-শ্রোতার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে সংঘটিত হয়।

চিত্র-৩২ : বিচারগানের দর্শক-শ্রোতার বসার আসন হিসেবে খড়ের ব্যবহারের ছবি।

অন্যদিকে, বিচারগানের 'আসন' ব্যবস্থাপনাটিও সম্পন্ন হয় আসর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমেই। বাংলাদেশের অন্যান্য আঙ্গিকের লোকনাট্যের পরিবেশনায় যেমন দর্শকের আসনের জন্য বিস্তৃর্ণ মাঠ, হাট-বাজার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গন, বসত বাড়ির উঠানে পাটি, মাদুর, ছন, নাড়া, খড়, চেয়ার ও বেঞ্চ ব্যবহৃত হয়। ঠিক তেমনি বিচারগানের আসনের ভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হয়, মাজার বা মন্দির প্রাঙ্গন, পির-গোঁসাইয়ের দরবারের উঠান, হাট-বাজারের খোলা চত্বর, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাঠ, সরকারি খাস জমি প্রভৃতি। আর আসন হিসেবে চেয়ার, বেঞ্চ, পাটি, ছালা, খড়, নাড়া ও প্লাস্টিকের চটের ব্যবহার সর্বাধিক হয়ে থাকে। তবে বিচারগানের আসন ব্যবস্থাপনায় বসার জন্য সামাজিক শ্রেণিকরণ থাকে। সাধারণত চেয়ার-বেঞ্চে বসেন সমাজের বিত্তবান, জনপ্রতিনিধি ও শিক্ষিত লোকজন পক্ষান্তরে ভূমি-সমতলে বিছানো আসনে বসেন সাধারণ আমজনতা। অবশ্য এটি বিচারগানের কোনো

প্রথা নয়, এটি অলিখিত সামাজিক মর্যাদার কারণে হয়ে থাকে। কিন্তু এটিও শতভাগ সত্য বিচারগান পরিবেশনাটি সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ভেদাভেদহীন এক পরিবেশনা। যাতে সব শ্রেণির মানুষ পাশাপাশি বসে আসরের পরিবেশনা উপভোগ করেন।

এছাড়া বিচারগানের কুশীলবদের জন্য সাধারণত কোনো সাজঘর থাকে না। কেননা কুশীলবদের মেক-আপ ও পোশাকের বাহুল্য নেই বললেই চলে। যতটুকু আছে তা মূলত কুশীলবগণ নিজের বাড়ি থেকেই করেন। পরিবেশনা স্থানে এসে সাধারণত কোনো নির্দিষ্ট ঘরে বিশ্রাম নেন। কিংবা বাদ্যযন্ত্রগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে থাকেন। কিছু কিছু পালার জন্য যদিও মেক-আপ নেওয়ার প্রয়োজন হয় তা ঐ বিশ্রাম ঘরেই গ্রহণ করেন। এমনকি আসর থেকে কুশীলবদের প্রবেশ-প্রস্থানের বিষয়টিও নেই। কুশীলবগণ সবাই একসঙ্গে আসরে আসন গ্রহণ করেন এবং পরিবেশনা উপস্থাপন করেন। পরিবেশনার প্রয়োজনে কিংবা চরিত্র চিত্রায়নের জন্য অথবা দৃশ্য পরিবর্তনের প্রয়োজনে প্রবেশ-প্রস্থান করতে হবে এমন কোনো বিষয় নেই। তাই সাজঘরও বিচারগানের প্রদর্শনীতে অনুপস্থিত ও অপ্রয়োজনীয় হিসেবেই থেকে যায়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিচারগানে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র

বাংলাদেশে প্রচলিত সকল আঙ্গিক বা ধারার লোকনাট্য ও লোকসংগীতে ব্যবহৃত প্রায় সব ধরনের বাদ্যযন্ত্রই বিচারগানে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। তবে যাত্রায় ব্যবহৃত ইউরেপিয়ান ধাঁচের বাদ্যযন্ত্র খুব বেশি দেখা না গেলেও কোনো কোনো বিচারগানের দলে দুই-একটি অস্তিত্ব পাওয়া যায় বটে। বিচারগানের আসরে কয়েকটি বাদ্যযন্ত্র প্রায় আবশ্যিকভাবেই দেখা যায়। সেগুলো হচ্ছে, হারমোনিয়াম, সারিন্দা, বেহালা, দোতারা, বাঁশি, বাংলা ঢোল ও জুড়ি। এছাড়া কাঠকরতাল, সেক্সোফোন, প্যাড, একতারা, ঢুগী, খমক, খোল্ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রও ব্যবহৃত হয়। বিচারগানে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার প্রসঙ্গে সাইমন জাকারিয়া বলেন,

> এই গানে মূল গায়কের হাতে থাকে দোতারা বা বেহালা। দোহারগণ হারমোনিয়াম, ডুগি-তবল বা খোল্ ব্যবহার করেন। করতালও এখানে ব্যবহার হয়। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে দোতারা, বেহালা, হারমোনিয়াম, ডুগিতবলা, খোল্, জুড়ি ইত্যাদি থাকে। (সাইমন, ২০০৮ : ৪৭০)

বিচারগানের আসরে গায়েনগণ যদিও বর্তমানে বেশির ভাগই বেহালা বাজিয়ে গান করেন। কিন্তু আদি বিচারগানের গায়েনগণ প্রায় সবাই সারিন্দা বাজিয়ে গান করতেন। বিচারগানের প্রয়াত কিংবদন্তি গায়ক আ. হালিম বয়াতি, আয়নাল মিয়া বয়াতি, রজ্জব আলী দেওয়ান, পরশ আলী দেওয়ান প্রমুখ শিল্পীগণের সারিন্দা বাজানোর সুখ্যাতি এখনও মানুষের মুখে মুখে ফেরে। বর্তমান সময়ে গায়কদের মধ্যে করিম দেওয়ান, মানিক দেওয়ান ও লাল মিয়া বয়াতি সারিন্দা বাজিয়ে গান করেন।

অন্যদিকে, দোতারা বাজিয়ে যে সকল গায়কের গান করার জন্য খ্যাতি রয়েছে তাদের মধ্যে ঝিনাইদহের খোরশেদ আলম বয়াতি (সদ্যপ্রয়াত) ও চাপাইনবাবগঞ্জের প্রফেসর এম.এ ফারুক উল্লেখযোগ্য। এছাড়া দেখা যায়, দেশের প্রায় সব শিল্পীই বেহালা বাজিয়ে বিচারগান পরিবেশন করেন। বিচারগান যেহেতু সব সময় আধুনিক বিষয়াদির সাথে খাপ-খাইয়ে নেয় সেক্ষেত্রে ইদানিং দেখা যায় কেউ কেউ ইউকেলেলে বাজিয়ে গান পরিবেশন করছেন। বিচারগানের মূল গায়েনদের মধ্যে নরসিংদী জেলার সুমন দেওয়ানকে দেখা যায় মাঝে মাঝে আসরে ইউকেলেলে বাজিয়ে গান করেন। যদিও সুমন দেওয়ান নিজেও বেশির ভাগ সময় আসরে বেহালা বাজিয়ে গান পরিবেশন করেন।

তবে বিচারগানের সব নারী গায়েনই বেহালা বাজিয়ে গান পরিবেশন করেন। বিচারগানের আসরে আবার এটাও দেখা যায়, একই গায়েন একাধিক বাদ্যযন্ত্রও বাজান। কেউ হয়তো সব সময় বেহালা বাজান কিন্তু তিনিই আবার মাঝে মাঝে একতারা বা দোতারাও বাজিয়ে থাকেন।

কুশীলবদের ক্ষেত্রে অবশ্য ভিন্ন কথা প্রায় প্রত্যেক কুশিলবই একটি করে বাদ্যযন্ত্র বাজান। ঢোলবাদক ও বংশীবাদক শুধু যন্ত্রী হিসেবেই পরিবেশনায় থাকেন। মাঝে মাঝে হয়তো একটু-আধটু কৌতুক বা ঠ্যাটামি করে থাকেন। কিন্তু যে কুশীলবগণ হারমোনিয়াম ও জুড়ি বা করতাল বাজান তারাই সাধারণত দোহার ও প্রধান ডায়নার ভূমিকা পালন করেন। তবে বিচারগানের মূল গায়েন থেকে শুরু করে প্রায় প্রত্যেক কুশীলবই কোনো না কোনো বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে পরিবেশনায় অংশগ্রহণ করে থাকেন।

নবম পরিচ্ছেদ

বিচারগানে আলো, শব্দ ও দ্রব্য-সামগ্রীর ব্যবহার

বাংলাদেশের অন্যান্য লোকনাট্যাঙ্গিকগুলোর মতই বিচারগানেও আলো, শব্দ ও দ্রব্য-সামগ্রীর ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা মূলত স্থানীয় যোগানের ভিত্তিতেই সম্পন্ন হয়। এই প্রতিটি উপাদানই আবার লৌকিক সহজলভ্যতার ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। এবং এই উপাদানগত সহজলভ্যতা আবার কালক্রমে বিবর্তিত হয়। এক সময়ে যে উপাদান ও উপায়ে আলো, শব্দ ও দ্রব্য-সামগ্রীর ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা হতো বর্তমানে কিঞ্চিত পরিবর্তিত বা সম্পূর্ণ নতুন ভাবে হয়ে থাকে। হয়তো ভবিষ্যতেও ভিন্ন কোনো উপায়ে সম্পন্ন হবে। বিচারগানের গোড়ার দিককার পরিবেশনার সময় আলোর ব্যবস্থাপনা হতো মূলত হ্যারিকেন, কুপি-বাতি ও হ্যাজাক বাতির মাধ্যমে। বিচারগানের প্রবীণ দর্শক-ভক্ত মো. দিরাজদ্দিন বলেন,

> আমরা ছোটবেলায় বিচারগান শুনতাম হ্যারিকেনের আলোতেই বেশি, হ্যাজাক বাত্তিও থাকতো তবে সেটা খুবই কম। কিন্তু তখনকার দিনের ঐ টিমটিম আলো-আন্ধারেই গানের একটা ভাব আছিল। কিন্তু এখন বাত্তি ঝকমকা কিন্তু বয়াতিগো গান ভাল্ লাগে না। (দিরাজদ্দিন, ২০২০ : সাক্ষাৎকার)

কালের পরিবর্তনের সাথে সাথে বিচারগানের আলোর ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি ও প্রয়োগেও ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে বিচারগানে সেই পুরোনো দিনের হ্যারিকেন-বাতি আর খুঁজে পাওয়া যায় না। তার বদলে জায়গা করে নিয়েছে আধুনিক বৈদ্যুতিক নানান রকমের বাতি। এখন বিচারগানের আসরে সাধারণত টিউবলাইট ও হ্যালোজেনের ফ্লাট বাতি দেয়া হয়। সেই সাথে দর্শকদের মাঝে মাঝেও কম পাওয়ারের টিউবলাইট ব্যবহার করা হয়। যেহেতু বিচারগানের কুশীলব ও দর্শকদের মাঝে সর্বক্ষণ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিষয় থাকে, তাই আসর ও দর্শক আসন পুরোপুরি আলোকিত থাকাটা জরুরী। এবং প্রতিটি বিচারগানের পরিবেশনা স্থলেই দেখা যায় আসর ও দর্শকের বসার স্থান আলোকিত। এমনকি বিচারগানের পরিবেশনাস্থলের আশে-পাশে বিশেষ করে মূল পরিবেশনাস্থলে প্রবেশের সম্মুখে তোড়ন তৈরি করা হয়। এ সকল তোড়নে থাকে চাকচিক্যময় রঙবেরঙের মরিচ-বাতি ও নানান নকশার আলোর চমকপ্রদ দৃশ্যায়ন। এছাড়াও আয়োজক কর্তৃপক্ষের আর্থিক অবস্থা ভালো হলে কিংবা আয়োজন বৃহৎ আকারের হলে মূল পরিবেশনা স্থান থেকে আশে-পাশের কয়েক কি.মি. রাস্তাও মরিচ-বাতি দিয়ে সাজানো হয়। বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই এ রকম মরিচ-বাতি দিয়ে সাজানোর প্রচলন দেখা যায়। বিশেষত ঢাকা বিভাগে আলোর চাকচিক্যময় প্রদর্শনী বেশি দেখা যায়। মানিকগঞ্জের হরিরামপুরে তাজুল ইসলামের বাড়ির পরিবেশনা, ঝিটকার জিন্দাশাহের মাজার, আল্লা বাজানের মাজার ও দেওয়ান আ. রশিদ চিশ্তির মাজারের বিচারগানের পরিবেশনায় বিস্তৃত

এলাকাজুড়ে বৈদ্যুতিক মরিচ-বাতি দিয়ে সাজানোর প্রচলন দেখা যায়। এছাড়া ঢাকার কেরানীগঞ্জ, ময়মনসিংহের বিভিন্ন এলাকায়ও মরিচ-বাতি দিয়ে সজ্জিত করা হয়।

চিত্র-৩৩ : বিচারগানের আসর ও আশেপাশের এলাকায় আলোকসজ্জা ব্যবহারের ছবি।

বিচারগানের পরিবেশনায় শব্দের ব্যবহারও সময় ও আধুনিকতার সাথে তাল মিলিয়ে হালনাগাদকরণ হয়। পূর্বের দিনে বিচারগানের পরিবেশনায় মূল গায়েনসহ দোহার-কুশীলবগণ খালি গলায় উঁচু স্বরে গান পরিবেশন করতেন। পরবর্তীতে মাইকের ব্যাপক প্রচলন ঘটে। বর্তমানে অবশ্য লম্বা-মাইকের পাশাপাশি আধুনিক সাউন্ডবক্স ব্যবহৃত হয়। বিচারগানের আসরে মূল গায়েনের জন্য একটি মাইক্রোফোন থাকে, তার কথাবার্তা ও গান পরিবেশনের জন্য, আরেকটি থাকে বাদ্যযন্ত্রের জন্য, যদি গায়েনের বাদ্যযন্ত্র 'ইলেট্রিক যন্ত্র' হয়। বর্তমানে অনেক গায়েনের বেহালা, দোতারা, একতারার সাথে ইলেকট্রিক তার লাগিয়ে গান গাইতে দেখা যায়। ছোট আবুল সরকার (মহারাজ), কাজল দেওয়ান ও লতিফ সরকারসহ অনেক গায়েনই অত্যাধুনিক ইলেকট্রিক বেহালা বাজিয়ে গান করেন। যেগুলোর সাথে ইলেকট্রিক সংযোগ যুক্ত করতে হয়। এছাড়া দোহার ও অন্যান্য বাদকদের জন্য আলাদা আলাদা মাইক্রোফোনের ব্যবস্থা থাকে। আসরের সামগ্রিক পরিবেশনা ধারণের জন্য মঞ্চের উপরের একাধিক 'ক্যাসিং' শব্দযন্ত্রও থাকে। পরিবেশনা দর্শকদের নিকট শ্রবণযোগ্য করে তোলার জন্য দর্শক আসনের মাঝে মাঝে মাইকেই হর্ন লাগানো হয়। তাছাড়া গানের প্রচারের জন্য পরিবেশনাস্থলের চারপাশের এক কিলোমিটারের অধিক জায়গাজুড়ে মাইকের হর্ন বেঁধে দেয়া হয়। এতে করে গ্রামীণ জনপথে কোথাও বিচারগান হলে কয়েক কিলোমিটার দূর হতেও গান শোনা যায়।

চিত্র-৩৪ : বিচারগানের পরিবেশনায় গায়েন কর্তৃক দ্রব্য-সামগ্রী হিসেবে কলম ও ডায়েরি ব্যবহারের মুহূর্ত।

বিচারগানের পরিবেশনার আরেকটি অভিনয় উপাদান হচ্ছে দ্রব্য-সামগ্রী (Props)। বাংলাদেশের অনেক লোকনাট্য আঙ্গিকেই সুনির্দিষ্ট দ্রব্য-সামগ্রী থাকে। যেমন- গম্ভীরাগানে কাঁচি মাথাল; যাত্রায় চাবুক, তরবারী, ছুরি; ঝাপান খেলায় সাপ, কলসী, বাটি প্রভৃতি। কিন্তু বিচারগানে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য দ্রব্য-সামগ্রীর ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় না। তবে মূল গায়েনের বাদ্যযন্ত্রের বিশেষ করে বেহালার স্বর কিংবা সারিন্দার বেনা কখনও কখনও গায়েন লাঠি বা তরবারি হিসেবে ব্যবহার করেন। হয়তো পরিবেশনাকালে কোনো যুদ্ধের বর্ণনা দিচ্ছেন তখন দেখা যায় গায়েন হাতের স্বর বা বেনাকেই তরবারী বানিয়ে অঙ্গভঙ্গি করছেন। এছাড়া বিচারগানের প্রত্যেক গায়েনেরই গলায় লম্বা উত্তরীয় থাকে। এই উত্তরীয়কেও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দ্রব্য-সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। দ্রব্য-সামগ্রীর ব্যবহার সারা বাংলাদেশের সব অঞ্চলে একই রকম, কোনো বৈচিত্র্যময়তা নেই বললেই চলে। তবে গায়েন তার পরিবেশনার প্রয়োজনে ডায়েরি ও কলম ব্যবহার করে বিভিন্ন প্রশ্ন লিখে রাখেন এবং অনেক সময় আগে থেকে ডায়েরিতে লিখে রাখা বিভিন্ন তত্ত্ব পড়ে প্রতিপক্ষ গায়েনের প্রশ্নের জবাবও দেন।

দশম পরিচ্ছেদ

বিচারগানের প্রচারণা

বিচারগানের পরিবেশনার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবতাবাদী বাণীর প্রচার ও প্রসার। যার মাধ্যমে গুরুবাদী শিক্ষা-দীক্ষার গুরুত্ব ও মর্মবাণী প্রচার হয়ে থাকে। আর এ জন্যই বিচারগানের মূল আয়োজক এদেশের সূফি, বৈষ্ণব ও বাউল মতবাদে বিশ্বাসী পির-গোঁসাইগণ। ভক্ত-শ্রোতাদের বিচারগানের মাধ্যমে আকৃষ্ট ও দীক্ষিত করতে এগানের আয়োজন করে থাকেন। তাই বিচারগান পরিবেশনার দিনগুলোতে আয়োজক প্রত্যাশা করেন যেমন করেই হোক সর্বোচ্চ দর্শকের উপস্থিতি হোক। এজন্য বিচারগান অনুষ্ঠানের প্রচারণার জন্যও নানা রকম উপায় অবলম্বন করেন। বাংলাদেশে যেহেতু বেশির ভাগ বিচারগান পরিবেশনা মাজার, মন্দির বা পির-গোঁসাইয়ের ওরশ বা বাৎসরিক অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক হয়। তাই পির-গোঁসাই বা মাজারের ভক্তবৃন্দগণ প্রচারের দায়িত্ব পালন করেন। এক্ষেত্রে বিচারগানের পরিবেশনার কথা ভক্তদের মাধ্যমে মুখে মুখে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। এছাড়া পোস্টার, ব্যানার, হ্যান্ডবিল ও এলাকাভিত্তিক মাইকিং করা হয়ে থাকে। প্রচার পোস্টারগুলোতে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ থাকে, বিচারগান পরিবেশনার উদ্দেশ্য কি? কেন করে, কোন তারিখে ও কোথায় হবে? এবং বিশেষভাবে উল্লেখ থাকে দুজন মূল গায়েনের নাম। যেখানে দুজন গায়েনের নামের সাথে সাথে তাদের জেলার নামও উল্লেখ থাকে। নিচে কয়েকটি বিচারগানের পোস্টার সংযুক্ত করা হলো। যাতে বিষয়গুলোর স্পষ্ট প্রামাণ্য রয়েছে।

চিত্র-৩৫ : বিচারগানের প্রচারণায় ব্যবহৃত কয়েকটি পোস্টারের ছবি।

বিচারগান যে শুধুই লোকপর্যায়ে পরিবেশিত হয় তা নয়, পরিবেশনাটির প্রচার-প্রসারের বিস্তৃতিও বেশ অগ্রগ্রামী। রেডিও, অডিও ক্যাসেট ও টেলিভিশনেও বিচারগান পরিবেশিত হয়। এমনকি বিচারগানের বাণিজ্যিক সফলতার ওপর ভিত্তি করে এক সময় ঢাকার ইসলামপুরে অডিও ক্যাসেটের রমরমা ব্যবসা ছিলো। যে ক্যাসেটগুলো সারাদেশের আনাচে-কানাচে মাইকে বাজতো। গ্রামের বিয়ের অনুষ্ঠান, পূজা, সুন্নাতে খৎনা, ভ্রাম্যমান বিক্রেতা

বিশেষত মালাই ও আঁচার বিক্রেতাদের মাইকে বিচারগানের অডিও ক্যাসেট হরহামেশা বাজতো। যদিও এখন সেই অডিও ক্যাসেটের বাজার ও মাইকে বাজানোর প্রথা অনেকটাই ম্লান। সাইমন জাকারিয়ার গ্রন্থ থেকে জানা যায়,

> ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ২২ মার্চ রেডিওতে লোকসঙ্গীত উৎসব উপলক্ষে সর্বপ্রথম বিচারগানের সম্প্রচার শুরু হয়। রেডিওতে প্রচারিত বিচারগানের প্রথম শিল্পীদ্বয় হচ্ছেন-হালিম বয়াতি ও হাজেরা বিবি। এছাড়া, বিচারগানের প্রথম অডিও-ক্যাসেটের শিল্পী হচ্ছেন-কুষ্টিয়ার মায়ারাণী ও উত্তরখান-ঢাকার পাগল বাচ্চু, ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে এই দুইজন শিল্পীর গাওয়া 'নারী-পুরুষ' পালার অডিও-ক্যাসেট বের হয়, সেটিই বিচারগানের প্রথম প্রকাশিত বাণিজ্যিক অডিও-ক্যাসেট। (সাইমন, ২০০৮ : ৪৭৩-৪৭৪)

তবে বর্তমানে পৃথিবীর প্রযুক্তিগত উন্নতির সাথে সাথে বিচারগানের প্রচারের ধরণেরও পথ পাল্টে গেছে। আধুনিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও প্রচার মিডিয়াতে বিচারগান জায়গা করে নিয়েছে। বর্তমানে অনেক বিচারগানের গায়েনগণ ফেসবুক ও ইউটিউবেও বিচারগান প্রচার করেন। বিচারগানের গায়কদের প্রায় সবারই রয়েছে এক বা একাধিক ইউটিউব চ্যানেল। কেউ কেউ আবার ফেসবুক ও ইউটিউবে লাইভ গান করে থাকেন। ইতোমধ্যে দেশের অনেক বিচারগানের গায়কদের বেশ কিছু ইউটিউব চ্যানেল জনপ্রিয়তা পেয়েছে। তার মধ্যে আবুল সরকার বাউল মিডিয়া, বাউলমাতা আলেয়া বেগম বাউল মিডিয়া, লতিফ সরকার বাউল মিডিয়া এবং মিরাজ দেওয়ান, কাজল দেওয়ান, সালাম সরকার, দেওয়ান বাবলী সরকার, হবিল সরকার, মুক্তা সরকারসহ অনেক গায়কেরই বিচারগান কেন্দ্রিক জনপ্রিয় ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে।

অর্থাৎ বিচারগান পরিবেশনাটি সব সময় যুগের সাথে তাল-মিলিয়ে ও খাপ-খাইয়ে ক্রমেই সমৃদ্ধশালী পরিবেশনায় রূপ নেয় বা নিচ্ছে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

বিচারগানের বিচারক বা বিজ্ঞশ্রোতা

প্রতিটি পরিবেশনার অলিখিত বিচারক হচ্ছেন দর্শক-শ্রোতা, হোক সেটা নাগরিক নাট্যাঙ্গন অথবা লোকনাট্যাঙ্গন। প্রতিটি প্রদর্শনী শেষে দর্শকই পরিবেশনার সফলতা বা ব্যর্থতার সমালোচনা করেন। কিন্তু এ বিষয়টি পরিবেশনার মূল অংশ নয় এবং বাধ্যতামূলকও নয়। তবে বিচারগানের ক্ষেত্রে বিচারক বা বিজ্ঞশ্রোতার বিচার-বিশ্লেষণ পরিবেশনার অবিচ্ছেদ্য অংশ। কেননা প্রতিটি বিচারগানের পরিবেশনার আসরে আসনগ্রহণ করে থাকেন বেশ কয়েকজন বিজ্ঞশ্রোতা। যারা প্রধানত ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কে অগাধ জ্ঞান রাখেন, আধ্যাত্মিক সাধনার উচ্চ শিখরে পৌঁছে গেছেন, খেলাফত প্রাপ্ত পির বা গোঁসাই, এমনকি আত্মদর্শন সম্পর্কে গভীর জ্ঞানে রাখেন তারাই বিচারগানের বিচারকের ভূমিকা পালন করে থাকেন। এক সময় এই বিচারকগণ দুই দলের গানের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে রায় প্রদান করতেন, কোন গায়েন ও তার দল পরিবেশনায় সেরা হয়েছেন। এ বিষয়ে গবেষক সাইমন জাকারিয়া বলেন,

> বিচারগানের মঞ্চের নির্দিষ্ট স্থানে মহৎ বা বিচারকগণ বসতেন। শরিয়ত-মারফত, শাস্ত্র ও তত্ত্বজ্ঞানে জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণ (হিন্দু-মুসলিম) বিচারক হিসাবে আসরে বসতেন। বিচরাকগণ দুই দলের গান শুনতেন। কোন গায়ক প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে না পারলে মহৎগণ সেই গায়ককে পরাজিত ঘোষনা করতেন। যার বাড়িতে আসর বসতো তিনি এই সব বিচারকদের দাওয়াত দিয়ে আনতেন এবং তামাক, চা, নাস্তা, পান দিয়ে আপ্যায়ন করতেন। দশজন বিচারক থাকলে সবাই মিলে একজনকে বিচারকদের পক্ষে রায় ঘোষনা করতে বলতেন। বিচারকদের টাকা পয়সা বা সম্মানী দিতে হতো না। বিচারগানের আসরে উপস্থিত বিচারকগণ গায়কের যুক্তিতর্ক উপস্থাপন, গানের ঢঙ, সুর বৈচিত্র্য, গানের ভাষা, ছন্দের মিল ইত্যাদি বিচার করতেন। মঞ্চে সঙ্গীত পরিবেশনের বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা করতেন। বিচারকদের ধর্মগ্রন্থ, শাস্ত্রীয় গ্রন্থ, আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিষয়ে পারদর্শী হতে হতো। বিখ্যাত মহতের গান, গানের সুর, ছন্দ, ইত্যাদি কোনো গায়ক নিজের নামে চালিয়ে দিচ্ছে কিনা এই বিষয়টিও বিচারকগণ লক্ষ্য করতেন। তাঁরা আসরে রীতিমতো খাতাকলম নিয়ে বসতেন এবং পয়েন্ট টুকতেন। দশটি প্রশ্নের মধ্যে সাতটি এমনকি ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেও ঐ শিল্পীর পক্ষে রায় ঘোষণা করতেন। (সাইমন, ২০০৮ : ৪৭০)

বিচারকদের এ রকম রায়ের কারণে গায়েনের মানের হ্রাস-বৃদ্ধিও ঘটতো। দেখা যেতো কোনো গায়েন একাধিক আসরে ভালো গান করলে লোকমুখে প্রচারিত হয়ে সেই গায়েনের ধীরে ধীরে বায়নাও বৃদ্ধি পেতো। তবে বর্তমানে পূর্বের মতই বিচারগানের আসরে বিজ্ঞশ্রোতা বা ধর্ম ও সংগীতে প্রাজ্ঞজন থাকেন কিন্তু আগের মত বিচার করে ফলাফল ঘোষণা করা হয় না। এই বিচার-বিশ্লেষণ বিষয়টি এখন চলে গেছে মৌখিক সমালোচনার বৃত্তে। দেখা যায়, কোনো গায়েন ভালো গান করলে দর্শক-শ্রোতা বাহবা দিতে দিতে বাড়ি প্রত্যাগমণ করেন। আর গায়েন পরিবশেনায় খারাপ করলেও দর্শক-শ্রোতা সমালোচনা করেন একে অপরের সাথে আলোচনায়। শুধু তাই নয়, বেশির ভাগ

বিচারগানের পরিবেশনায় দেখা যায়, যিনি গায়েন ভালো পরিবেশনা উপস্থাপন করতে পারেন না, তিনি পরবর্তী বছর গানের বায়না পান না। কারণ গানের আয়োজক কমিটির দৃষ্টিতে তিনি হেরে যাওয়া গায়ক। আর তাই বিচারগানের আসরে দুই দলের শিল্পী-গায়েনদের মধ্যে হাড্ডা-হাড্ডি লড়াই হয় পরিবেশনা উপস্থাপনায়। এমনকি কোনো কোনো বিচারগানের আসরে লড়াই চরমে উঠলে বেহালা দিয়ে মারামারির ঘটনা ঘটার ইতিহাসও রয়েছে। বিচারগানের প্রয়াত কিংবদন্তি গায়ক আ. রশিদ সরকার ও পরশ আলী দেওয়ান এবং দলিল উদ্দিন বয়াতি ও ননী ঠাকুরের বিচারগানের পালার তুমুল লড়াইয়ের গল্প এখনও দর্শকদের মুখে মুখে ফেরে। বিচারগানের প্রবীণ দর্শক-শ্রোতা মো. দিরাজ উদ্দিন বলেন, আমরা ছোট বেলায় বিচারগানে তত্ত্ব আর গানের যে পাল্লা দেখছি, বর্তমানে তার সিকি ভাগও হয় না। বিচারগানের দুই বয়াতির পাল্লাপাল্লিটাই আসল মজা। (দিরাজ, ২০২০ : সাক্ষাৎকার) বর্তমানেও বিচারগানের দুই গানের মধ্যে প্রতিযোগিতা ঠিকই হয়, তবে আগের মতো সেই তীব্রতা ও তীক্ষ্ণতা নেই বললেই চলে।

চিত্র-৩৬ : বিচারগানের আসরে পরিবেশনারত শরিয়ত সরকার।

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশের অঞ্চলভেদে বিচারগান : বিষয় ও আঙ্গিকের পারস্পরিক তুলনা

অতীতে যেমন ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্য পরিবেশনা কবিগান সমগ্র বঙ্গদেশে (বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ) পরিবেশিত হতো, ঠিক তেমনই কবিগানের পরিবর্তিত রূপ বিচারগান বর্তমানে সমগ্র বাংলাদেশে বিভিন্ন নামে পরিবেশিত হয়। একই পরিবেশনা একই বিষয় ও আঙ্গিকের ওপর নির্ভর করে শৈল্পিক বৈচিত্র্য নিয়ে সারা বাংলাদেশেই কম-বেশি উপস্থাপিত হয়ে থাকে। একই পরিবেশনায় কেবল জেলা অঞ্চলভেদে নামের তফাৎ এবং বিষয় ও আঙ্গিকের কিছুটা তারতম্য দেখা যায়। যা বিচারগান তাই পালাগান, ভাবগান, বাউলাগান, বাউল-বিচারগান, টানের গান, তত্ত্বগান, দোতারাগান, শব্দগান, বাউলার লড়াই, কবির লড়াই, ধরাটগান, খাড়া কাওয়ালি, ফকিরিগান, বৈঠকীগান, মজলিশীগান, মালজোড়াগানসহ বহু নামে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিচিত-পরিবেশিত। সেই সাথে বিচারগানের পরিবেশনায় অঞ্চলভেদে রয়েছে আঞ্চলিক প্রভাব। মূলত গান, ভাষা, উপমা, লৌকিক গল্প, পোশাক ও সাজসজ্জা এবং স্থানীয় ব্যক্তিদের প্রভাবের কারণে অঞ্চলভেদে বিচারগানের পরিবেশনায় যে পার্থক্য দেখা যায়, তা খুব সহজেই বোঝা যায়। বিশেষ করে বিচারগানের গায়েনদের ব্যবহৃত ভাষা ও তাদের পরিবেশিত গানের মাধ্যমে খুব সহজেই তাদের জেলা অঞ্চল চিহ্নিত করা যায়। গান শুনলেই বিজ্ঞ দর্শক-শ্রোতাগণ বুঝতে পারেন গায়ক ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিলেট, রাজশাহী, কুমিল্লা, রংপুর নাকি চট্টগ্রাম অঞ্চলের। সেই গায়েনদের পরিবেশিত গানের ভেতরেও আঞ্চলিক প্রভাব লক্ষণীয়। ঢাকা বিভাগের বিচারগানের গায়েনগণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই অঞ্চলের সাধক-বাউল-লেখক আ. হালিম বয়াতি, আহমদ শাহ্, দেওয়ান আব্দুর রশিদ চিশ্‌তি, আব্দুর রশিদ সরকার, আব্দুর রহমান বয়াতি, গওহার শাহ্ চিশ্‌তি, মাতালকবি রাজ্জাক দেওয়ান, রজ্জব আলী দেওয়ান, খালেক দেওয়ান, মালেক দেওয়ান, মাখন দেওয়ান, কেয়ামদ্দিন বয়াতি, রাধাবল্লভ সরকার, কালু শাহ ফকির, আলেয়া বেগম আলো ও মমতাজ বেগম রচিত গান বেশি গেয়ে থাকেন। আবার সিলেট বিভাগের গায়েনগণ ঐ অঞ্চলের বাউল-কবিয়াল রাধারমণ দত্ত, দুর্বিন শাহ, শাহ আব্দুল করিম, কারি আমির উদ্দিনসহ অন্যান্যদের গান বিচারগানের আসরে বেশি গেয়ে থাকেন। অন্যদিকে, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের শিল্পীদের দেখা যায়, ঐ অঞ্চলের বাউল-ফকির লালন শাহ, মো. মনসুর আলী আল চিশতি নেজামী, মকসেদ শাহ, খোদা বক্স সাঁই, কবিয়াল বিজয় সরকার, খোরশেদ আলম বয়াতি প্রমুখের গান বেশি করেন। এছাড়া অন্যান্য বিভাগীয় অঞ্চলের গায়কগণও নিজ নিজ অঞ্চলের সাধকদের রচিত গানই বেশি পরিবেশন করেন। তবে সব অঞ্চলের গায়কই সারাদেশের রচয়িতাদের গান করেন। কেবল স্থানীয় রচয়িতার গানের পরিবেশনা একটু বেশি করেন। দেখা যায়, বিচারগানে পরিবেশিত গানের শব্দ-সুরেও আঞ্চলিক প্রভাব ও বৈচিত্র্য রয়েছে। অঞ্চলভেদে বিচারগানের নাম, গান, ভাষা ও সুরের পার্থক্য রয়েছে। পরিবেশনাটির বিষয় ও আঙ্গিকের বৈচিত্র্যময়তা

নিয়ে ইতোমধ্যে অভিসন্দের্ভের তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে পরিবেশনাটির বিষয় ও আঙ্গিক নিয়ে অঞ্চলভেদে পারস্পারিক তুলনামূলক আলোচনা করলে বৈচিত্র্যের বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে। অঞ্চলভেদে বিচারগানের বিষয় ও আঙ্গিকের বৈচিত্র্যয়তা যেমন তৈরি হয়, ঠিক তেমনই বিচারগানের বিষয়ভেদেও আঙ্গিক বৈচিত্র্যময় হয়ে থাকে। প্রথমত, অঞ্চলভেদে বিচারগানের বিষয় ও আঙ্গিকের পারস্পারিক তুলনা করা যাক। বিচারগানের আঙ্গিকের অভিনয়, পোশাক, সাজসজ্জা, মঞ্চ ও আলোকে প্রধান করে তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে। সাধারণত সারাদেশের বিচারগানের গায়েনগণই গুরু-শিষ্য পরম্পরায় অভিনয় আয়ত্ব করেন এবং পরিবেশনা উপস্থাপন করেন। এমনকি এই পরিবেশনার প্রধান প্রেরণা হিসেবে কাজ করে বাউল ও সুফিবাদের মানবতাবাদী বিশ্বাস। যাতে গায়েনগণের উদ্দেশ্য থাকে মানুষের মধ্যে ধর্মীয় বিভেদ ঘুচিয়ে মানবতাবাদের প্রতিষ্ঠা করা। এই উদ্দেশ্যের সাথে মানুষকে শিল্পরসের মাধ্যমে বিনোদিত করা হয়। গায়েনগণ তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী কেউ সাদা পোশাক পড়েন, কেউবা গেরুয়া পোশাক পড়েন, কেউ আবার গুরুর অনুসরণেও পোশাক পড়েন। বিচারগানের পরিবেশনায় দেখা যায়, ঢাকা অঞ্চলের গায়েনগণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সাদা আলখাল্লা জাতীয় পোশাক পড়ে থাকেন এবং প্রত্যেক গায়েনের গলায় থাকে লম্বা ওড়না বা উত্তরীয়। আবার কেউ কেউ বিশেষ ধরণের পোশাকও পড়েন। যেমন মানিকগঞ্জের ছোট আবুল সরকার (মহারাজ) সাদা লুঙ্গি ও সাদা চাদরের মতো এক খণ্ড কাপড় গায়ে জড়িয়ে গান পরিবেশন করেন। আবার তাঁর গানের গুরু আব্দুর রশিদ সরকার ফতুয়ার মতো দেখতে বৃহৎ আকারের ঢিলেঢালা আলখাল্লা পড়তেন। অন্যদিকে ময়মনসিংহ অঞ্চলের গায়ক সালাম সরকার, সোহাগ সরকার ও হবিল সরকারকে দেখা যায় শার্ট-প্যান্ট গায়েও আসরে বিচারগান পরিবেশন করেন। কিন্তু এ অঞ্চলের প্রবীণ ও বিখ্যাত গায়ক সুনীল কর্মকার পাঞ্জাবী, পাজামা বা লুঙ্গি পরে মঞ্চে পরিবেশনায় অংশগ্রহণ করেন। আবার সিলেট অঞ্চলের শিল্পীদের মধ্যে বিশেষ ধরণের পোশাক পরতে দেখা যায়, বিশেষ করে কারি আমির উদ্দিন, মুজিব সরকার, কারি এমরান আলী পাঞ্জাবি-পাজামার সাথে বড় কোটও পড়ে থাকেন। এমনকি কারি আমির উদ্দিন ও কারি এমরান আলীসহ বেশ কয়েকজন আসরে সব সময় কালো চশমা পড়ে গান করেন।

এছাড়া আঙ্গিকের বিচারে অঞ্চলভেদে সাজসজ্জা, মঞ্চ ও আলোর স্পষ্ট পার্থক্য করা যায় না। কেননা সব অঞ্চলেই কুশীলবদের রুচি ও স্থান-কাল-পরিস্থিতিভেদে সব রকমের সাজসজ্জা, মঞ্চ ও আলোর প্রয়োগ দেখা যায়।

দ্বিতীয়ত, আলোচনা করা যাক বিষয়ভেদে বিচারগানের আঙ্গিকগত বৈচিত্র্যময়তা। লোকনাটক বিচারগানে বিষয়ভিত্তিক যে পালাগুলো আছে, সেগুলোর তাত্ত্বিক গভীরতা ও বিনোদনের উদ্দেশ্য সফল করতে আঙ্গিকের স্পষ্ট বৈচিত্র্য রয়েছে। পূর্বেই আলোচনার সুবিধার্থে বিচারগানের পালাগুলোকে প্রধানত পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে- যথা- ক. ধর্ম বিশ্লেষণাত্মক পালাসমূহ খ. আত্মীয় সম্পর্কীত পালাসমূহ গ. হাস্যরসাত্মক পালাসমূহ ঘ.

জীবনবৃত্তান্তমূলক পালাসমূহ ও ঙ. অন্যান্য পালাসমূহ। এই পাঁচটি ভাগের পালাগুলোর পরিবেশনার যথাযোগ্যতা পূরণার্থে আঙ্গিকের বৈচিত্র্য স্পষ্টভাবে প্রয়োগ হয়ে থাকে। ধর্ম বিশ্লেষণাত্মক পালাসমূহে দেখা যায় গায়েন ও কুশীলবদের অভিনয়, পোশাক-সাজসজ্জা খুবই গুরু-গম্ভীর ও সাদাসিধা হয়। তবে মঞ্চ-আলোসহ অন্যান্য বিষয় অন্য পালাগুলোর মতোই হয়ে থাকে। জীবনবৃত্তান্তমূলক পালাসমূহের অভিনয়, পোশাক, সাজসজ্জা, মঞ্চ ও আলো ঠিক ধর্ম বিশ্লেষণাত্মক পালাসমূহের মতোই হয়।

তবে আত্মীয় সম্পর্কীত পালাসমূহ ও হাস্যরসাত্মক পালাসমূহের পরিবেশনার মধ্যে বিচারগানের আঙ্গিকের মূল বৈচিত্র্য পাওয়া যায়। আত্মীয় সম্পর্কীত পালাসমূহ যথা : নারী-পুরুষ, বাবা-মা, বাবা-ছেলে, বাবা-মেয়ে, মা-ছেলে ও মা-মেয়ে পালাতে দেখা যায়, গায়েনগণ দৈনন্দিন জীবন কিংবা বাউলদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পড়েন ও সাজসজ্জা গ্রহণ করেন। আর অভিনয়, মঞ্চ ও আলো বিচারগানের সব পালার গড়পরতা ধরণেরই হয়। হাস্যরসাত্মক পালাসমূহে সবচেয়ে বেশি আঙ্গিকের বৈচিত্র্যময়তা পাওয়া যায়। এই পালাগুলোর প্রত্যেকটি চরিত্র যেমন চমকপ্রদ, তেমনই এ পালাগুলোর অভিনয়, পোশাক, সাজসজ্জাও বৈচিত্র্যপূর্ণ। তবে মঞ্চ-আলোর কোনো বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না। বিষয় বৈচিত্র্যের বিচারে দেখা যায়, দাদা, দাদি, নানা, নানি, নাতি ও নাতিন সংক্রান্ত হাস্যরসাত্মক পালাসমূহ যথা-দাদা-নাতি, দাদা-নাতিন, দাদি-নাতি, দাদি-নাতিন, নানা-নাতি, নানা-নাতিন, নানি-নাতি ও নানি-নাতিন পালার অভিনয় যেমন হয় কমেডি ধাঁচের ও রসাত্মক কথাবার্থায়। তেমনই পোশাক-সাজসজ্জাও চরিত্র অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন হয়। এ পালাগুলোতে সুফি-বাউলদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক-সাজসজ্জা থাকে না। পালায় দেখা যায়, যিনি দাদা, দাদি, নানা ও নানির ভূমিকায় থাকেন, সেই গায়েন বৃদ্ধ বা বৃদ্ধার সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা ও বাস্তবতার ভিত্তিতে পোশাক ও সাজসজ্জা পরিধান করেন। এমনকি চরিত্রের ভূমিকায় অভিনয়কারীর বয়স অল্প হলে সাজসজ্জা বা মেক-আপের মাধ্যমে বয়সে বার্ধক্য তৈরি করা হয়। আবার নাতি ও নাতিনের চরিত্রে যিনি অভিনয় করেন, সেই গায়েনকে দেখা যায়, যুবক-যবতীর মতো পোশাক ও সাজসজ্জা পরিধান করেন। তাদের অভিনয়ে বাৎসল্যভাব থাকে। তবে মঞ্চ-আলো ঐতিহ্যগতভাবে একই ধারার হয়।

এছাড়া হাস্যরসাত্মক পালাসমূহেরর মধ্যে স্বামী-স্ত্রী, শালী-দুলাভাই, দেবর-ভাবী, ননদ-ভাবী, বিয়াই-বিয়াইন, দুই বিয়াইন, বাইদা-বাইদানী, দুই বাইদানী, জামাই-বউ, জামাই-শ্বশুর, জামাই-শ্বাশুড়ি, বউ-শ্বশুর, বউ-শ্বাশুড়ি ও বুড়ি-ছোকরা পালায় চরিত্রের যথাযোগ্যতা অনুসারে গায়েন ও কুশীলববৃন্দ অভিনয়, পোশাক, সাজসজ্জার প্রয়োগ করে থাকেন।

বিষয়ের ভিত্তিতে ধর্ম বিশ্লেষণাত্মক পালাসমূহের মধ্যে রাধা-কৃষ্ণ পালাটির আঙ্গিক বৈচিত্র্য বিশেষভাবে আলোচনার দাবি রাখে। পালাটির আঙ্গিকের প্রয়োগে বিশেষত্ব রয়েছে। অন্য পালাগুলোর থেকে পালাটির আঙ্গিকের বৈচিত্র্য খুব

সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। পালায় দেখা যায়, রাধা-কৃষ্ণের চরিত্রে অভিনয়ের সময় ধর্মীয় বিশ্বাস ও রাধা-কৃষ্ণের চিরাচরিত রূপে গায়েনগণ নিজেকে পোশাক ও সাজসজ্জায় সজ্জিত করেন। সেই সাথে গুরু-গম্ভীর ও রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার শৃঙ্গার রসের লাস্যময়ী ভাব নিয়ে গায়েনগণ অভিনয় করেন। যা বিচারগানের অন্য কোনো পালার সাথে মিলে না। অর্থাৎ বিচারগানের বিষয় ও আঙ্গিক যেমন বৈচিত্র্যময়, তেমনই দেশের অঞ্চলভেদে পরিবেশনাটির আঙ্গিকের বৈচিত্র্য সুস্পষ্ট। এমনকি বিচারগানের বিষয়ের বিচারেও এর আঙ্গিক বৈচিত্র্যময় হয়ে থাকে।

চিত্র-৩৭ : বিচারগানের আসরে পরিবেশনারত আব্দুল হাই দেওয়ান।

উপসংহার

পৃথিবীর যে কোনো ভূখণ্ডের দর্পণ হচ্ছে সেই অঞ্চলের নিজস্ব সংস্কৃতি। স্বতন্ত্র সংস্কৃতির মাধ্যমেই অঞ্চলভিত্তিক জাতিসত্তার স্বরূপ বোঝা যায়। এ কথাটিও সত্য সংস্কৃতি কী তা নিয়ে বিস্তর মতভেদ রয়েছে। সাধারণভাবে বলতে গেলে কোনো সুনির্দিষ্ট অঞ্চলের মানবগোষ্ঠীর জীবন-যাপনের প্রত্যেকটি উপাদানই সংস্কৃতি। যার মধ্যে শিল্প-সাহিত্যের উপদানও রয়েছে। বাঙালি জাতির স্বাধীন-সার্বভৌম ভূখণ্ড হচ্ছে বাংলাদেশ। যদিও এদেশে বাঙালি জাতি ছাড়াও বহু উপজাতি জনগোষ্ঠীর বসবাসও রয়েছে, তথাপি সাধারণ অর্থে বলা যায় বাংলাদেশের সংস্কৃতি মানেই বাঙালি সংস্কৃতি। বাঙালি সংস্কৃতির শেকড় সন্ধানে এই গবেষণা সম্পাদিত হয়েছে। আর বাঙালির শেকড়ের সংস্কৃতি হচ্ছে লোকসংস্কৃতি। বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি হাজার বছর ধরে ক্রমবির্বতনের মাধ্যমে বয়ে চলেছে তা নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সারাবিশ্বে এখন স্বীকৃত। এই অভিসন্দর্ভে বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির একটি উপাদান লোকনাটকের একটি আঙ্গিক বা ধারা বিচারগান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভে প্রথম অধ্যায়ে ‘বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতিতে লোকনাট্য : পরিচয়’ এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে ‘বাংলাদেশের লোকনাট্যে বিচারগান : ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে’ শিরোনাম ধরে লোকসংস্কৃতি কী, এবং বিচারগানের সাথে এর সম্পর্ক কী? এছাড়া বিচারগানের উৎপত্তির সন্ধান করা হয়েছে। এই গবেষাণায় লোকসংস্কৃতি থেকে শুরু করে লোকনাটকের বিচারগানের বিষয় ও আঙ্গিক বৈচিত্র্য নিয়ে ধাপে ধাপে যেভাবে আলোচনা করা হয়েছে এবং গবেষণার ফলাফল হিসেবে যা পাওয়া গেছে, তা সংক্ষিপ্তভাবে ক্রমবর্ণনা করলে সহজেই গবেষণার ফলাফল বুঝতে সহায়ক হবে। প্রথমেই লোকসংস্কৃতির সংজ্ঞা নির্ধারণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিভিন্ন গবেষকের সংজ্ঞাকে বিবেচনায় রেখে লোকসংস্কৃতির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, লোকসংস্কৃতি হচ্ছে কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের লোকসমাজের মধ্যে সুপ্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত সংস্কৃতিই লোকসংস্কৃতি। আর লোকসমাজ হচ্ছে সেই সমাজ যার লোকজনের বেশির ভাগই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাহীন ও অল্পসংখ্যক অল্পশিক্ষিত। এই লোকসমাজেরর দ্বারা সৃষ্ট, চর্চিত ও বিকশিত সংস্কৃতিই হচ্ছে লোকসংস্কৃতি। এই লোকসংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ দুটি উপদান হচ্ছে লোকসাহিত্য ও ফোকলোর। অর্থাৎ লোকসংস্কৃতি, লোকসাহিত্য ও ফোকলোর একই সূত্রে গাঁথা। সমন্বিতভাবে বলতে গেলে এই তিনটি বিষয়ের কতগুলো সাধারণ উপদান রয়েছে যা বাংলাদেশে প্রচলিত ও চর্চিত হয়। উপাদানগুলো হচ্ছে, লোকনাটক, লোকসংগীত, লোকনৃত্য, লোককৃত্য, লোকবাদ্য, লোকক্রীড়া, লোককাহিনি, গীতিকা, লোকছড়া, মন্ত্র, ধাঁধা, প্রবাদ-প্রবচনসহ প্রভৃতি। এই উপদানগুলোর মধ্যে লোকনাটক বাংলাদেশে প্রচলিত-চর্চিত একটি লোকউপাদান। লোকনাটকের মধ্যে আবার রয়েছে নানা আঙ্গিক বা ধারার লোকনাটক। লোকনাটকের আঙ্গিকগুলোকে আট ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে। যার মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক লোকনাটক অন্যতম। আর অভিসন্দর্ভের বিষয় ‘লোকনাটক বিচারগান : বিষয় ও আঙ্গিক

বৈচিত্র্য'-এর বিচারগান পরিবেশনাটি প্রতিযোগিতামূলক লোকনাটকের অন্তর্ভূক্ত হিসেবে প্রমাণ করা হয়েছে। এই লোকনাটক বিচারগান বাংলাদেশের লোকনাটকের ধারায় ক্রমবিকাশের মাধ্যমে কবিগান থেকে উপত্তি হয়ে বিকশিত হয়েছে। বর্তমানে এই লোকনাটক বিচারগান সমগ্র বাংলাদেশেই প্রচলিত-চর্চিত হয়। অভিসন্দর্ভে তত্ত্বীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিচারগানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে, বিচারগান বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির একটি সমৃদ্ধ ধারা। যার সাথে এই অঞ্চলের বহু লোকউপাদানের সংযুক্তি রয়েছে। বিশেষ করে বলতে গেলে লোকনাটক, লোকসংগীত, লোকনৃত্য ও লোকবাদ্যের বহু উপাদানকে আত্তীকরণ করে বিচারগান স্বতন্ত্র পরিবেশনা হিসেবে বাংলাদেশে পরিচিতি লাভ করেছে। তবে কবিগান ও বাউলগানের সাথে বিচারগানের উপাদানিক সাদৃশ রয়েছে। বাংলাদেশে 'বিচারগান' নাম ছাড়াও লোকনাটকের এই পরিবেশনাটি আরও বহু নামে বহু অঞ্চলে পরিচিত। তবে 'বিচারগান' ও 'পালাগান' নামে সর্বাধিক পরিচিতি লাভ করেছে। বিচারগান যে নামেই পরিচিত হোক না কেন, এর পরিবেশনা ধরণ বা পদ্ধতি একই সেটিও প্রমাণিত হয়েছে। কেবল অঞ্চলভেদে গায়েন কুশীলবদের ভাষাগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। গবেষণার মূল বিষয় হচ্ছে বিষয় ও আঙ্গিক বৈচিত্র্য সন্ধান ও বিশ্লেষণ। অভিসন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়ে বিচারগানের বিষয়-বৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিচারগানে মূলত দুটি বিষয় নিয়ে একটি পালা হয়। এই পরিবেশনাটিতে ৬০টির অধিক পালার প্রচলন রয়েছে। বিষয়-বৈচিত্র্যের দিক থেকে পালাগুলোকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে- ক. ধর্ম বিশ্লেষণাত্মক পালাসমূহ খ. আত্মীয় সম্পর্কীত পালাসমূহ গ. হাস্যরসাত্মক পালাসমূহ ঘ. জীবনবৃত্তান্তমূলক পালাসমূহ ও ঙ. বিবিধ বিষয়ের পালাসমূহ। এই পাঁচটি ভাগের মধ্যে ৬০টির অধিক পালা আলোচনা করা হয়েছে- গুরু-শিষ্য, জীব-পরম, কাম-প্রেম, হিন্দু-মুসলমান, রাধা-কৃষ্ণ, সুবোল-মিলন, শরিয়ত-মারফত, হাশর-কেয়ামত, নবুয়েত-বেলায়েত, নূরতত্ত্ব-কারতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব-পারঘাটা, আদম-হাওয়া, আদম-শয়তান, আদি আদম-বনি আদম, আদি আদম-বিশ্বনবি, আদম সৃষ্টি-নুর সৃষ্টি, আদমতত্ত্ব-দেহতত্ত্ব, আদম তত্ত্ব-নবি তত্ত্ব, নবি তত্ত্ব-মেরাজ তত্ত্ব, হায়াতুন্নবি-ওফায়াতুন্নবি, নবি-সাহাবা, নারী-পুরুষ, বাবা-মা, বাবা-ছেলে, মা-ছেলে, ভাই-ভাই, মামী-ভাগিনা, শালা-দুলাভাই, শালী-দুলাভাই, দেবর-ভাবী, ননদ-ভাবী, বিয়াই-বিয়াইন, দুই বিয়াইন, বাইদা-বাইদানী, দুই বাইদানী, দাদা-নাতিন, দাদি-নাতি, দাদি-নাতিন, নানা-নাতিন, জামাই-বউ, জামাই-শাশুড়ি, বউ-শাশুড়ি, বুড়ি-ছোকরা, বুড়া-ছুকরি, নবির জীবনী-কৃষ্ণের জীবনী, বড়পির-খাজা বাবা, খাজা বাবা-নবিজি, লালন সাঁই-সিরাজ সাঁই, লালন সাঁই-রশিদ সাঁই, শাহ জালাল-শাহ পরান, মালজোড়া, গ্রাম-শহর, ধনী-গরীব, সংসার-সন্ন্যাস, বেহেস্ত-দোজখ, জিন্দা-মরা, তরিকার ভাই-বোন, হাশরের মাঠ-কারবালার মাঠ, পাগলা-পাগলী, দয়াল-কাঙাল, এজিদি ইসলাম-মুহাম্মদি ইসলাম ও কোরান-বিজ্ঞান পালা। এই পালাগুলোর বিভিন্ন পরিবেশনাকে প্রামাণ্য হিসেবে ধরে

পালাগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এবং বিস্তারিত আলোচনা করে প্রমাণ করা হয়েছে, পালাগুলোর মধ্যে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক গুরুগম্ভীরতত্ত্ব যেমন আলোচিত হয়, তেমনি বিভিন্ন রকম চটুল বিষয়াদিও হাস্যরসাত্মক ভঙ্গিতে বিচারগানের আসরে গায়েনগণ আলোচনা করে থাকেন। বিচারগানের প্রতিটি পালা বিষয়গত দিক থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেও প্রত্যেকটি পালা-ই আবার অন্য পালাগুলোর সাথে তত্ত্বগত সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। পালাগুলো নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দেখা গেছে, ধর্ম বিশ্লেষণাত্মক পালাগুলোতে যেমন ধর্মীয় বিষয় ছাড়াও আত্মীয় সম্পর্কিত বা অন্য পালাগুলোর বিষয় প্রসঙ্গক্রমে গায়েনগণ আলোচনা করেন, তেমনি আবার হাস্যরসাত্মক পালাসমূহের পালা আলোচনা করতে গিয়েও আসরে ধর্মের গুরুগম্ভীরতত্ত্বনির্ভর আলোচনার অবতারণা হয়। এছাড়া জীবনবৃত্তান্তমূলক পালাগুলোর মধ্যে অনায়াসে আত্মীয় সম্পর্কিত পালাসমূহের বিষয়াদিও আলোচিত হয়। অর্থাৎ বিচারগানের প্রত্যেকটি পালা-ই একে-অপরের সাথে সংযুক্ত। কোনো পালা অন্য পালার তত্ত্বকে পুরোপুরি বর্জন করে আসরে আলোচিত হয় না। যাকে বলা যায়, ভিন্নতার মধ্যেই ঐক্য বা ঐক্যের মধ্যেই ভিন্নতা। পালাভেদে এই বিষয়গত বৈচিত্র্যের পাশাপাশি রয়েছে আঙ্গিকগত বৈচিত্র্য। সেই বিষয়টিও অভিসন্দর্ভে বিভিন্ন তত্ত্ব ও বিচারগানের বিভিন্ন উপাদানকে আশ্রয় করে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রমাণ করা সম্ভব হয়েছে। বিচারগানের আঙ্গিক-বৈচিত্র্য আলোচনা করতে যেয়ে চতুর্থ অধ্যায়ে এগারটি পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে, বিচারগানের পরিবেশনা-কাঠামো; বিচারগানের চরিত্র পরিচিতি; বিচারগানের কুশীলবদের অভিনয় প্রস্তুতি; বিচারগানের অভিনয় পদ্ধতি; বিচারগানের পৃষ্ঠপোষক ও কুশীলবের বায়না; বিচারগানের কুশীলবদের পোশাক ও সাজসজ্জা; বিচারগানের আসর-আসন ব্যবস্থাপনা ও সাজঘর; বিচারগানে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র; বিচারগানে আলো, শব্দ ও দ্রব্য-সামগ্রীর ব্যবহার; বিচারগানের প্রচারণা এবং বিচারগানের বিচারক বা বিজ্ঞশ্রোতা। এই বিষয়গুলোকে বিভিন্ন তত্ত্বের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এখানে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে, বিচারগানের পরিবেশনা-কাঠামো যেমন স্বতন্ত্র তেমনি অভিনয় পদ্ধতি, অভিনয় প্রস্তুতি, পোশাক, সাজসজ্জা, আলো, শব্দ ও দ্রব্য-সামগ্রীসহ আঙ্গিকের প্রত্যেকটি বিষয়ই বাংলাদেশের বহু লোকপরিবেশনার আঙ্গিকের চেয়ে সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময়। এছাড়া বিচারগানের আঙ্গিকগত স্বতন্ত্রতার জন্যই বিচারগানকে স্বতন্ত্র একটি পরিবেশনা হিসেবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। যাহোক, এই অভিসন্দর্ভের সামগ্রিক আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি অসংখ্য শাখা-প্রশাখা নিয়ে স্রোতসিনী নদীর মতো বহমান। এই লোকসংস্কৃতির একটি সমৃদ্ধ শাখা এদেশের ঐতিহ্যবাহী লোকনাট্য। আর লোকনাট্যের শাখা হিসেবে বর্তমানে স্বতন্ত্র এক লোকনাট্যাঙ্গিক বিচারগান। বর্তমানের এই সমৃদ্ধ লোকনাট্য পরিবেশনাটিও পরিবর্তনের ধারায় লোকনাটক ‘কবিগান’ থেকে উৎপত্তি হয়ে বহু রকমের লোক-আঙ্গিক আত্তীকরণের মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশে বিচারগান পরিবেশনাটি ‘বিচারগান’ নাম ছাড়াও বহু নামে পরিচিতি লাভ করেছে। দেশের

একেক অঞ্চলে একেক নাম হলেও পরিবেশনাটির বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক প্রায় একই রকম। বিষয় ও আঙ্গিকভেদে বিচারগানের আঙ্গিক বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে। আবার ধর্ম, পরিবার, সমাজ ও মানুষের যাপিত জীবনের নানান বিষয় পরিবেশনাটির বিষয়বস্তু হিসেবে গৃহীত হয়েছে। এই বিষয়গুলোর মধ্যে বহু রকমের পার্থক্যের কারণে বিষয় হয়ে উঠেছে বৈচিত্র্যময়। বিচারগানের বিষয় ও আঙ্গিক বৈচিত্র্য পরিবেশনাটিকে চমকপ্রদ ও আকর্ষণীয় করেছে। পরিবেশনাটির বিষয় ও আঙ্গিক এক অদৃশ্য উদ্দেশ্যের সুঁতোয় গাঁথা, সেটি হচ্ছে- ধর্মনিরপেক্ষতা ও মানবতাবাদী দর্শন। বিচারগানের প্রতিটি বিষয়ের সাথে ধর্ম ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত। আর এই ধর্মনির্ভর পরিবেশনার আসরে দাঁড়িয়েই গায়েন-কুশীলবগণ ধর্মীয় সম্প্রীতির বাণী প্রচার করেন। এই মানবতাবাদের বাণী প্রচারে বিচারগানে যুক্ত হয়েছে এক চমকপ্রদ প্রয়োগ-কৌশল, সেটি হচ্ছে- প্রতিযোগিতামূলক অভিনয়-কৌশল। যে প্রতিযোগিতায় দ্বিপাক্ষিক যুক্তি-তর্কের আঘাত-প্রত্যাঘাত দর্শককে সহনশীল মানুষ হওয়ার শিক্ষা দেয়। বিচারগানে যেমন বিষয় ও আঙ্গিকের বৈচিত্র্য সামগ্রিকভাবে পরিবেশনাটিকে একটি ঐক্যে গ্রথিত করে। তেমনই ধর্ম, ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের অজস্র বিষয়াদিকে বিচারগানে প্রচারিত মানবতাবাদের দর্শনের আলো আলোকিত করে। সর্বোপরি, লোকনাটক বিচারগানের বিষয় ও আঙ্গিকের বৈচিত্র্য বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যময়তার সাক্ষ্য দেয়। যে বৈচিত্র্যের মাঝে নিহিত রয়েছে মানবিক মূল্যবোধ।

চিত্র-৩৮ : বিচারগানের বাইদা-বাইদানী পালায় পরিবেশনারত খোরশেদ আলম বয়াতি ও পাখি সরকার।

টীকা

১.

যথা হস্তপদ নাইকো আমার, চলাফেরা হয় কী প্রকার?

ছিলাম আমি কার অধিকার, সঙ্গী কে ছিল আমার?

যখন না ছিল মোর দুটি আঁখি, কেমনে সে রাস্তা দেখি।

মাতৃগর্ভে জিয়ে থাকি, কি সন্ধানে নিলাম ঠাই ॥ ঐ

মা জননীর ইঞ্জিন ঘরে, কে উঠায়ে দিল মোরে?

নিরাকারকে আকার করে, জীবদেহ করলেন তৈয়ার,

তাতে করেছে কে কারিগড়ি, কোথায় আছে সেই মিস্ত্রী?

রজ্জবে কয় তালাশ করি, দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াই ॥

২.

দয়াল ডাকিতে ডাকিতে, হয় যদি মরণ,

দুঃখ না রবে ভুবনে।

আমার পাপে ভরা দেহ, ফেলিওনা কেহ।

রেখে দিও গুরুর চরণে ॥

ঐ চরণের ছোঁয়ায়, অমৃত সুধায়,

ঘুচিবে কলঙ্ক জীবনে।

কয় লাতিফ সরকার মুর্শিদ চাঁন হলে আমার।

ধন্য জীবন হবে ভূবনে ॥

৩.

সর্বশাস্ত্রে শুনিতে যে পাই তোমার নাকি পিতামাতা নাই,

তবে তোমার নামকরণ কে করলো সাঁঈ বসে ভাবি তাই,

তুমি নামি কি অনামি হে সাঁঈ আমরা তার বুঝি বা কি ॥

কেহ পিতা কেহ পুত্র কয় আবার বন্ধু বলে কেউ দেয় পরিচয়,

তুমি সকলেরই সকল আবার কারো কেহ নয়,

তোমার যে আসল পরিচয় কে জানে তা কি নাকি ॥

বিজয় বলে মনের কথা কই আমি খাঁটি ভাবের পাগল নই,

আমার গোল বেঁধেছে মনের মাঝে কাজেই পাগল হই,

আমার বুকে যা নাই মুখে তাই কই কাটা কান চুলে ঢাকি ॥

৪.

স্বরূপে করিয়া আশ্রয়

সৃষ্টির মধ্যে কে কথা কয়

বাতুন ঢুরলে জানতে পারবি

কামুক নয় সে প্রেমভোলা ॥ ঐ

প্রেমের মেলা মিলাইছে রসিক

ছেড়ে দিয়া আচার বৈদিক

রশিদ বলে রসের মাফিক

ডুব দিয়া হও আত্মভোলা ॥ ঐ

৫.

খাঁটি প্রেমের কী সাধনা, বল যে মূলমন্ত্র খানা,

না জানলে ভজন হবে না, তত্ত্ব জানে সাধুজন ॥

কোন প্রেমের কী ভাণ্ড কিবা, প্রেমিক আমায় বলে দিবা,

প্রেম কেমনে নিবা দিবা, হাতে কিবা দুই নয়ন ॥

কাম ছাড়া কী প্রেম করা যায়, প্রেমের বিষয় বল আমায়,

আকলিমারে বুঝানো দায়, কারও প্রেমে থাকলে অপূরণ ॥

৬.

অজপা করে নাম করে আশা, নটা পাইল পথের দিশা,

মিটে যায় মরণ পিপাসা দেখতে পাইল রাধেশ্যাম ॥

না হইলে নামের নামের নামী, কেমনে হয় ঊর্ধ্বগামী,

ভোগ-বিলাসে নিম্নগামী তার কাছে নাই রামের সাম ॥

রাধা-কৃষ্ণের যুগোল নামে মালেক হয় যার অন্তর ঘামে,

আমার দ্বীনবন্ধুর নামও প্রেমে নিশ্চয়ই ....॥

৭.

ইসলামের ঝাণ্ডা হাতে এলেন নবি এ ধরায়,

কত কাফের হয় মুসলমান কলেমারও উসিলায়,

হাশর-মিজান পার হয়ে যায় পুলসিরাতের পুল ॥

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ,

এই কলেমা পড়লেরে মন থাকবে না ত্রিতাপ জ্বালা,

বাউল শংকর দাস হয় উতালা পাইতে চরণধূল ॥

৮.

রাধা পক্ষের গায়েন আলেয়া বেগম : আমার যে প্রশ্ন তার পুঙ্খানুপুঙ্খ জবাব শুনলাম। অনেক কিছুই জানলাম। আমি শুধু ভাইকে বলবো, যে রাধা জগৎ সংসারে হিন্দু মতে, যত নারীগণ বলেন সকলেই সেই রাধার ছায়া। আর রাধা হলো মূল কায়া। সেখানে আপনে রাধাকে কোনো নারী থেকে ভিন্ন বা বিচ্ছিন্ন করতে পারেন না। আপনে প্রশ্ন করেছেন যথা সম্ভব আমি তার জবাব করার চেষ্টা করবো। আমি বলেছিলাম স্বামী নিয়ে রাধা বড় সুখেই ছিলো। সেখানে কৃষ্ণ কেন সুখের সংসারে বাধার সৃষ্টি করলো? আপনে বলেছেন, বিয়ের যে মালাটা, সেই মালাটা পরানো হইছিলো কার গলায়? আসলে কী আমি কৃষ্ণের সম্পর্কে এতক্ষণে পুরাপুরি বুঝতে পারলাম, কৃষ্ণের স্বভাব শুধু ছলনা আর ছলচাতুরিতে ভরা। এই যে মালা রাধার হাত থেকে, মালা পড়ার যেই ছলনা, সেখানে কৃষ্ণের একটা বিশাল ছলনা ছিলো। আমি জানি, রাধা আর কৃষ্ণ, বয়সে অনেক ছোট-বড়। রাধার যখন বিয়ে হলো তখন কৃষ্ণ খুবই ছোট। তবে আয়েন ঘোষ ছিলো কৃষ্ণের মামা। সেই হিসেবে রাধার সাথে সম্পর্কে হয় মামী। কৃষ্ণের লাগে মামী। যখন নাকি সাত ঘোরায়, তার মালা যখন পড়ায়ে দিবে আয়েন ঘোষের গলায়, তখন পেছনে পেছনে কৃষ্ণ শুধু কাঁদে আর বলে মালা চাই, মালা চাই, মালা চাই। এক পর্যায়ে আয়েন বলে রাধা, যেহেতু আমার ভাগিনা কাঁনতেছে বুঝে না কিছুই, তাই ঐ মালাটা আমারে না দিয়া কৃষ্ণের গলায়ই পড়াইয়া দেও, আমার ভাগিনার গলায়ই পড়াইয়া দেও। এই ছেলেখেলাটা, এই মালাটা পড়ানোটা আর পাওয়াটাকে যদি মনে করেন, রাধার সাথে আপনার বিয়ে হইছে। এতটুকু জ্ঞান যদি আপনার হয় তাহলে আপনার স্ত্রীকে মামার ঘরে পাঠাইলেন কিভাবে? আপনে যে হিসেব-নিকাশে বুঝাইতে চাইতেছেন আমি যখন মালা গলায় নিছি, তাহলে রাধার স্বামী আমিই হয়ে গেছি। তাহলে এতটুকু জ্ঞান, এতটুকু বিচার আপনে করে থাকেন, তাহলে এতটুকু বুঝার পরে, মালা আপনার গলায় পরানোর পরে আপনার স্ত্রীকে

আপনে আরেক জনের ঘরে পাঠাইলেন এইটা কোন যুক্তিতে? এইটা কোন বিচার? এইটা আপনে রাধার প্রতি খুব অবিচার করছেন জগৎ সংসারে। তাই যত দূর্বল পায় মানুষ ততই সেখানে আঘাত করে। সেই আপনে ঠিক কৃষ্ণ বা গুরু হইয়া, আপনে রাধার প্রতি কি ব্যবহারটা করছেন ! রাধাকে কেউ মা বলে না, কেন বলে না, তার পেছনে অবশ্যই একটা কারণ আছে। ... কেন রাধা মা হইল না, আমি সংক্ষেপে তার মিমাংসা কইরা দিব। রাধা একদিন কৃষ্ণকে বলেছিলো, মহাপ্রভু কৃষ্ণ, সবাইতো সন্তান কোলে নিয়া লালন-পালন করে, কত আনন্দ পায়। আমার এমন একটা লোকের সাথে বিয়ে হইছে, সে হইল নপূংসুক। তাই রাধা বলেছিলো, যা হবার তাই হয়ে গেছে আমারে তুমি একটা সন্তান দেও। তাই কৃষ্ণ তাকে আর্শীবাদ করেছিলো যে, যাও রাধা তোমার সন্তান হবে। যখন সন্তানের বয়স পাঁচ মাস হয়, পাঁচ মাস হইলেতো সন্তানের পাঁচ আত্মা আসে। গর্ভের মধ্যে নড়াচড়া করে। তার (মায়ের) স্বাস্থ্যে অন্য রকম দেখা যায়। মা-বোনেরা কানাঘুষা করে যে, এই মেয়েটার বোধ হয় পেটে বাচ্চা আসছে। তাই রাধিকা বললো, সবাই না জানলেও, অন্তত আয়েন জানে তার তো সন্তান দেওয়ার ক্ষমতা নাই। আমি যদি এই সন্তান পাই, তবে এই সন্তান কার পরিচয়ে বড় হবে। আমি কলঙ্কিত হব, আমার যেই সন্তান তারও কোনো পরিচয় থাকবে না। তাই এই সন্তান আমি রাখবো না। নদীর পাড়ে যাইয়া, সেই সন্তানটা গর্ভপাত ঘটাইলো। সন্তানটা যখন নদীর মাঝে ফেলে দেয়, আবার সন্তানটা মা মা কইয়া কাছে আসে। আবার রাধা সেই সন্তানটাকে সরাইয়া দেয় ঢেউয়ের বারিতে। তখন ঐ সন্তানটা ডুবে আর কয়, আমারে তুমি গর্ভে ধারণ করলা কিন্তু আমারে তোমার বুকে শুইয়া মা ডাকার সুযোগ দিলা না। আমি সন্তান হইয়া যখন তোমারে মা ডাকতে পারলাম না। আমি তোমারে অভিশাপ দিয়া দিলাম, জগৎ সংসারে তোমারে যেন কেউ মা না ডাকে। তাই সেই থেকে রাধা মা ডাক থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল। এটা বাবা জগৎ সংসারে রাধা-কৃষ্ণের জীবন কাহিনি যতই বলি, আমি যদি আমার সন্তানকে আমার মাতৃত্ব থেকে বঞ্চিত করি, আমাকেও কিন্তু সেই কষ্ট ভোগ করতে হবে। শাস্ত্রে বলে, ...যে যেমন কর্ম করিবে তার কর্ম বিশিষ্ট ফল ভোগ করিতেই হইবে।

৯.

যখন ডাকে তখনে, থাকি না অন্যখানে,
আমি কিন্তু রাধারই কানাই।
রাধা আমার মনোবল, রাধা সহায়-সম্বল,
রাধা প্রেমে মত্ত সর্বদাই ॥
শোন বলি শ্রীমতি রাধা, আমি তোমার প্রেমে বাঁধা,
ঘুরি সদাই প্রেমঋণের দাই।

খোরশেদ আলম কেঁদে কয়, যদি দুজন মিলন হয়,

তবে যদি ঋণের মুক্তি পাই ॥

১০.

চিনেছি আমি তোমারে, কৃষ্ণ কী করেছো আমার তরে,

আমায় দিয়ে পড়ায়েছো পরপুরুষকে বরের মালা ॥

এত খেলা খেলিতেছো, তোমার কী মনে ভেবেছো,

মনে করো ভালোই আছো, আমার বুকে দিয়ে জ্বালা ॥

আমায় এনে ঘরের বাইরে, শান্তি কী দিছো অন্তরে,

পাড়ার লোকে নিন্দা করে, আকলিমারে কী সুখ দিলা ॥

১১.

যদি মক্কায় গেলেই খোদা মিলতো নবী মিলতো মদিনায়

দেশে ফিরে কেউ আইতো না হজ করিতে যারা যায়

কেউ যায় টাকার গুমানে কেহ যায় দেশ ভ্রমণে

ধনী যায় ধনের টানে আনিতে সোনাদানা ॥

হজ করিতে মক্কায় গিয়া খরচ করলি যে টাকা

এই টাকা গরীবরে দিলে গরীব আর থাকে কেঠা

তোর দেশের লোক না খাইয়া মরে ঘরের ধন খায় পরে পরে

সত্য কথা বললে পরে দেশে থাকতে পারে না ॥

দ্বীনহীন রাজ্জাকে বলে মানুষে মানুষ রতন

এই মানুষকে ভালোবাসো বেঁচে আছ যতক্ষণ।

মানুষ চিনতে করিস ভুল তবে হারাবি দুই কূল

গাছের মূল কাটিয়া জল ঢালিলে ঐ গাছে ফুল ফোটে না ॥

১২.

অনেক দিন পর পাইছি মারফতের খাঁটি এক ফকির,

দশটা লক্ষণ কইতে পারলে হইবা ভক্তের তীর,

(হায় হায়) ছয় লতিফার আছে জিকির জবাব দাও আমারেরে ॥

গানের মধ্যে প্রশ্ন শুনি মুখটা করছে কালা,

কাঁদলে ছাড়বো না ফকির বাড়াই দিমু জ্বালা,

(হায় হায়) খুললে তোমার কলবের তালা গলায় দিব মালারে ॥

দেহের মধ্যে আছে তোমার বার ইস্টিশন,

ভেদের কথা কইলে হবে সঠিক মহাজন,

(হায় হায়) কয় লতিফে দাও বিবরণ নইলে উপায় নাইওরে ॥

১৩.

সূর্যের তাপে আকাশ-জমি হবেরে ভাই তামা,

আমার নবি বিনে রোজ হাশরেরে,

সুপারিশ আর কেউ করবে না ॥

মা ফাতেমায় কেঁন্দে বলবে ওগো আমার রাব্বানা,

আমার হাসান-হোসেনের বিচার চাই নারে,

বাবার উম্মতকে দাও বেহেস্তখানা ॥

মানুষ আইছো ভবে যাইতে হবে কেউ থাকিতে পারবা না,

অদম আব্বাসেরই কর্ম দোষেরে,

দয়াল নবিজির দিদার আর পেল না ॥

১৪.

(সখি গো) আমায় আদর-সোহাগ-চুমু দিয়া পালকিতে দিও উঠাইয়া,

ঐ পালকি লইও কান্দেতে,

আল্লাহ-রাসুল, বোল-হরিবোল যার যার প্রিয় নামটি সম্বল,

ঐ নামের ধ্বনি শুনাইয়া দে ॥

(সখি গো) ভেবে কয় লতিফ সরকারে জগৎস্বামীর বাসরঘরে,

চিরনিদ্রায় শোয়াইয়া দে,

জগৎস্বামী যদি হয় গো আমার ধন্য জন্ম হবে আমার,

নইলে জনম বিফলে যাবে ॥

১৫.

মানুষে মানুষে বাঁধে প্রেমপাশে

ভক্তি-বিশ্বাসে লও তাঁর নাম

বিশ্বস্রষ্টা যিনি এক রব তিনি,

দিবস রজনী গাও তাঁর গান ॥

নবি তোমার তুলনা জগতে মিলে না

নামের সাথে রাব্বানা লিখিয়াছে নাম

দেওয়ানের প্রাণে চায় প্রিয় নবি মোস্তফায়

সেবিতে তোমার হয়ে গোলাম ॥

১৬.

সপ্ত তালা ভেদ করে সে যে,

দেখো নুরের দেখা পাইছে যাইয়া কাবা কাওসাইনে,

যার নুরেতে আকাশ-পাতাল সৃষ্টি করা ॥

পাইতাম যদি নুর-পেয়ালা,

সাধক হালিম বলে মিটাইতাম মনেরও জ্বালা,

একদিন আক্কাসে করিয়া ছলা পাইলো এক গেররা ॥

১৭.

যে আশায় এই ভবে আসা

হল না তার রতি মাসা

ঘটিল রে কি দুর্দশা

কুসঙ্গে কুরঙ্গে মেতে ॥

যারে ধরে পাবি নিস্তার

তারে সদায় ভাবলি পর

সিরাজ সাঁই কয় লালন তোমার

ছাড় ভবের কুটুম্বিতে ॥

১৮.

এত সুন্দর বসুন্ধরা আল্লাহ করেছে সৃজন,

আদমেরই দেখার ভাগ্য হইত না কখন,

হাওয়া বিবির উছিলায় আদম এলো দুনিয়ায়,

হাওয়াকে বানাইয়া সিঁড়ি আদম দুনিয়ায় নামছে,

হাদিস ও কোরানে তাহা প্রমাণ করেছে ॥

যার জন্যে দুনিয়ায় আসা ওরে আদম জাত,

তার মনে কখনো তুমি দিও না আঘাত,

না থাকিলে হাওয়া থাকতি অন্ধকারে পড়িয়া,

আকলিমা কয় হাওয়া বিবি আদমের উপকার করছে ॥

১৯.

(ওরে) আমি আদি হইতে আইজ পর্যন্ত,

আমার প্রেমের নাইরে অন্ত,

আমারে দেখলে বেটা খোদায়ও ভয় করে,

আমি সকল কিছু করতে পারি,

এই কূল ভাঙ্গি ঐ কূল গড়ি,

আমার লীলা কে বুঝিতে পারে ॥

ও তাই পরশ কয় এমন শক্তি,

(ওরে) আমার কী আর আছে কমতি,

আমি থাকি প্রতি ঘরে ঘরে ॥

২০.

শব্দ আছিল কুন, শুনে তার বিবরণ,

হুয়াল আসমার কারিগরীতে,

আহাদিয়াত জাতনুর, এলেমে হয় জহুর

শহুদ, অজুদ ফায়াকুনেতে কুনেতে।

জাতের এতবার চার পুঁজিপাটা এই তার,

আরেফ পারেন ভাল বলিতে

জাত ও ছেফাত ছিল, নওবতন ঘুরে এল,

এমকানে জহুর হ’ল দেখিতে দেখিতে।

দীন হীন রশিদ বলে, শাহ ছাফার চরণ তলে,

জেনেছি তব কৃপার বলেতে,

সাত পাঁচ বার কারে, সাঁইজী মোর সৃষ্টি করে,

তালিমে পাইনু সে ভেদ, বুঝিতে বুঝিতে।

২১.

রাসুলে মোকাররাম নূরে হয় মুজাস্‌সাম

সাড়ে চার হাজার খাস নাম প্রকাশ পুস্তিকায়।

তাফসিরে কাবিরে লেখা রয় তার ভিতরে

তাইতো পরানও ভরে জানাই আসসালামু আলাইকা ॥ ঐ

তুমি আহাদ হইতে আহাম্মদ পাক জমিনে মোহাম্মদ

সকল ধর্মের হাকিকত তোমার তরিকায়।

বাশারী আর মালাকী আরেক ভাব তার হাকিকী

তিন অবস্থায় আছো তুমি করো না বাকা ॥ ঐ

মীমের পর্দা উঠাইয়া তোমাকে দেখলাম চাইয়া

খুদে খোদা রব-রহমান সব তুমি একা।

রশিদের মোনাজাত লও মুর্শিদ রূপে দেখা দাও

নিজের কাছে টানিয়া লও কুল মাখলুকের রাব্বুকা ॥

২২.

কী কৌশলে ঘর বাঁধিয়ে, তার ভিতরে রয় ছাপিয়ে,

একটি পুরুষ একটি মেয়ে জোড়া বানায় ভবে,

প্রেমের আশ্চর্য খেলা বুঝবে কে আর কবে,

মানুষ দিয়া মানুষ বানাইয়া প্রেমে বদ্ধ রাখছে ভবে ॥

খেলা ভাঙলে শুধু ভাণ্ড থাকবে না আর কৌশল কাণ্ড,
করিবে সব লণ্ডভণ্ড জাতে মিশে যাবে,
জালালে কয় মানবকূলে জন্ম লইয়া ভবে,
যাবার বেলা দুইটি জিনিস সকলেরই সঙ্গে যাবে ॥

২৩.

দাল হরফে দন্ত হইল জালে জনখদা তৈয়ার
রে হরফে রগের টানা দিয়া দিলেন পরোয়ার
জে হরফে হয় জেসানা সিন হরফে হইল সিনা
দ্বিতীয় সিনে ঠিকানা কণ্ঠ হইতে গলা তরি ॥
সোয়াত দোয়াত দুইটি হাত লাগাইল ডাইনে বাঁয়
তোয়া তিল্লি জোয়া ঝিল্লি আদম তনেতে লাগায়
আয়েন গায়েন গোস্ত গর্দান ফে হরফে ফেপ্‌সা বানান
ছোট কাপ কলিজায় বসান বড় কাপে কলব জারি ॥
লামে লা মোকাম হইতে মিমে মহব্বত লাগায়
পেটের ছাউনী বানাইয়া নুন হরফে নাভিতে যায়
ওয়াও হেতে আওয়াজ আসে, লাম আলিফ কোমর আর নফ্‌সে
হামজা দুই পায়েতে বসে ইয়াতে হয় পায়ের এরি ॥
দশ হরফে দশটি শক্তি দিয়া দিলেন নিরঞ্জন
দর্শন শক্তি, শ্রবণ শক্তি, ঘ্রাণ শক্তি আর আস্বাদন
বাক শক্তি, বিবেক শক্তি, রয় ধরন আর চলন শক্তি হয়
দেওয়ান খালেক ভাবিয়া কয় ইচ্ছা শক্তি এস্কের ডুরি ॥

২৪.

না চিনিলে আদম সফি, চিনবি কিসে আল্লা-নবী,
আদম কিবা বস্তু হয়, সন্ধান তার কর,
পঞ্চ রুহু,পঞ্চ নফ্‌স হিসাবেতে ধর,
নফ্‌স বিচে পাবি মামুদ, যদি তার বিচার কো’রতে পার।

চিনিবার তরে নবী, আয়ন করিল খুবী,

মান্-আরেফা নফস্হু বলে, হাদিসে কহিল,

সিনার এলেম সেই সিনায় সিনায় এল,

শাহ ছাফার চরণ সেবে, দীন হীন রশিদ চিন্‌ল তার।

২৫.

দলিলে কয় হায়াতুন্নবি

হায়উন সিফাতে উনি রয় চিরজীবি,

তারে ধ্যান করিলে দেখতে পাবি,

মালকুতের দেশে ॥

কেবল নাম শুনেছ আরবের নবি

তোমার দেহের আরব চিনো নাইরে হে আজব খুফি,

হযরত গওহার বলে গুরু ধরে,

কইরা লও দিশে ॥

২৬.

হযরত আলী, আবু বকর, ওসমান গনি

ঘুম ভাঙ্গিয়া আজ শুনি আযানের ধ্বনি

গায় দোয়েল পাপিয়া আজ গাছের ডালে ডালে

সুর তুলিয়া যার নাম স্মরণে যায় উজানে গঙ্গা ঢেউ খেলে ॥

যার উপরে নাজেল হইল পবিত্র কোরান

গাছ বৃক্ষ তরুলতা মরুদ্যান পাপী উম্মতের আসায়

সারা জীবন নয়ন জলে ঢেউ খেলে যার গায়

মাতাল রাজ্জাক নাচে গায় দুই বাহু তুলে ॥

২৭.

মেয়েদের এই রকম অনেক গুণ আছে, মাত্র একটা গুণ চাই পুরুষের কাছে,

মাঝে মাঝে দিয়া রাখেবেন পাতলা বারি,

(ওগো) তা না হইলে ঠিক থাকবে না রশিদ বলে যুক্তি করি ॥

২৮.

জায়েদ, জয়নবকে ত্যাগ করিলো, সেই বিয়া নবি করিলো,

ছেলের বউরে বাপে নিলো, কেউ তো দোষী না ॥

পুত্রবধূ নিয়া যায় বাপ, কয় লতিফে সুরা আযহাব-চল্লিশ আয়াত,

পাল্লা লাগছে পোলায় আর বাপ, কী হয় জানি না ॥

২৯.

তোমার বুকের দুগ্ধ পান করেছি,

তোমার আদর-সোহাগে বড় হয়েছি,

মা গো তোমার দুধের ঋণ শোধ হবে না কোনোদিন,

বলছে আমার দয়াল রাব্বানা ॥

বিদেশে থাকলে সবাই চায় টাকা,

মা শুধু বলে কোথায় আমার খোকা,

সন্তানের লাগিয়া থাকে মা পথ চাহিয়া,

মায়ের চোখে ঘুম আসে না ॥

দেখিলে মায়ের মুখ, দূরে যায় সব দুঃখ,

মায়ের মতো ভবে আর কেহ না,

মা আছে ঘরে যার ধন্য জীবন ভবে তার,

আলেয়ার এই গান রচনা ॥

৩০.

ভাই আমার ভালো ছিলো, কেন যে আজ এমন হলো,

কোথায় হারিয়ে গেলো হৃদয়ের বন্ধন,

আমি মা-বাবা হারাইয়া, সব ভুলেছি ভাইকে পাইয়া,

সেই ভাই গেছে হারাইয়া, দাঁড়াই কৈ এখন ॥

লতিফ সরকার বলে ভাই, ভাইয়ের মতো বান্ধব নাই,

স্বার্থের লোভে ভাইকে পর করো না কখন,

ভাই তোমার বাহুবল, ভাই তোমার নিদানের সম্বল,

হিংসা-নিন্দা ভুলে সকল চলো সর্বজন ॥

৩১.

এমন কথা বলিও না মামানী, একই দোকানের কিনারে ॥

তোমার মামার পরনের লুঙ্গি, তোমার পরনে কেন দেখিরে ॥

তোমার মামার মুখের হাসি, তোমার মুখে কেন দেখিরে ॥

যা কইয়াছো বেশি কইয়াছো, আর কইও না মামানীরে ॥

তোমার মামার চেহারার মতো, তোমার চেহারা দেখিরে ॥

এতো রাতে জানালা খুলে দেখি, ভাইগনা রইছে দাঁড়াইয়ারে ॥

হাজির হাঁটের তাঁতের শাড়ি, ভাইগনা আনছে কিনিয়ারে ॥

পাবনা শহরের লক্ষ্মীর মিষ্টি, ভাইগনা আমায় খাওয়াইলোরে ॥

৩২.

বাঁশি বাজে গোকূলে, মামী তখন রানতে বসে জানে সকলে,

বাঁশির সুরে বাইরে আসি, পরান মানে না ॥

ভাইগনা করি যে মানা, নিভানো মনের আগুন আর জ্বালাইও না,

নীলা পাগলীর মনের বাঁশি, তুমি ভাইগনা ॥

৩৩.

সাধু-মহৎ বাউল ছিল যত জ্ঞানী গুণী

পালাইয়া গেছে তারা গানে নামছে খুনি

ওরা গায়ের জোরে মুরব্বিরে করে অপমান

কথায় কথায় তুইলা বহে হাদিস আর কোরান ॥

ঢিলাঢালা পাঞ্জাবী গায় মাথায় লম্বা চুল

নিজেরে পরিচয় দেয় সে মস্ত এক বাউল

শেষে বায়না লইয়া গানে গিয়া আন্দাজে গান তুলি

নিজে খায় জুতার বারি তার মা-বাপ শুনে গালি ॥

কেউ ক্যাসেটে দুলাভাই কেউ হয়েছে শালী

কেউ সাজিল সুজন বাইদ্যা কারও মাথায় চুড়ির ডালি

কেহ নানা হইল জড়াইলো নাতিনেরে গিয়া
দিল বাউলের কপালে কালি এই সব ক্যাসেট দিয়া ॥
এই গান না শিখিয়া কিছু মাইয়া গানের সুযোগ নিয়া
বছরে বছরে বহে সাত-আট খান বিয়া
কেউ স্বামী হারা খাইছে ধরা রাখছে উপস্বামী
আবার কেউ স্বামী থুইয়াই করতাছে ভণ্ডামী ॥
মান্যগন্য নাই আর এখন উইল্টা গেছে ধারা
চেয়ারে বইয়া পাও ঝুলাইছে ছোট গায়ক যারা
ওরা চোখ উল্টাইয়া ঠামক দিয়া চলে আড়েঠাড়ে,
পোশাকের বাহার দিয়া কত সাধু মারে ॥
আছে কিছু গানের মাইয়া অল্প বইয়্যা ছেরি
বিয়া শাদির ধার ধারে না জামাই গন্ডা চারি
যত চরিত্রহীন লজ্জাবিহিন দিছে গানের মাথায় বারি
হাইকোর্ট আর মিরপুরে কত রারিবুরি ॥
এখনো সময় আছে আল্লার কাছে ক্ষমা চাইয়া নিও
কার জীবনে কী কইরাছো মনেরে জিগাইও
একদিন ডুববে তরী বুঝাই ভারি পাপে গেছে ছাইয়া
একদিনও ভাবলী না কানবি পার ঘাটাতে বইয়া ॥
দারুণ বিধি বাম হইয়া গজব ঢাইলা দিলো
মাতাল রাজ্জাকেরে কেন খোদায় এই গানে নামাইল
ছিলো জমিদারি বাবুগিরি গেলো ফুরাইয়া
এই মোনাজাত করি খোদা লও আমায় উঠাইয়া ॥
৩৪.
ঐদিন দেখলাম সন্ধ্যাবেলা নিরবে বসিয়া,
কাহার সাথে হস্টিনষ্টি করতেছে দাঁড়াইয়া,
শালা দে ছাড়িয়া দে চুট্টা স্বভাব ছাইড়া দে,

এমনিভাবে আর কত খাস কত ধাক্কা ॥
জাঁকজমক করাইয়া তারে করাইছিলাম বিয়া,
এখন কেন দূরে থাক আমায় কও খুলিয়া,
কালা তোর মনের খবর, বল দেখি তোর,
গভীরভাবে চিন্তা করিস মনিরের কথা ॥
৩৫.
রাস্তা দিয়া যখন চলে, ওদের মত কিছু ছেলে,
ওদের দিকে নজর দিলে, কয় প্রেমিক একজনা,
(ওরে) প্রেমে খাইয়া হাবুডুবু, ইংলিশে কয় আই লাভ ইউ,
বাড়িতে যা বড় বুবু, আমি যাব না ॥
দুলাভাইরে বলিস গিয়া, মুইনারে করতাছি বিয়া,
আমার জন্য কোনো যেন চিন্তা করে না,
(ওরে) আমার কাজে বাঁধা দিলে, মিথ্যা কথা দিব বলে,
মান-সম্মান যাবে চলে, কিছুই রবে না ॥
ব্যথা ভরা নিয়া বুক, দুলাভাই হইছে চুপ,
এই পর্যন্ত ক্ষ্যান্ত থাকুক মালেকের রচনা,
(ওরে) আপন বোন রাখিয়া ঘরে, শালীরে যে আদর করে,
তার কপালে ঘটবে দেখবেন মিথ্যা রটনা ॥
৩৬.
শিশুকালে মা যদি, কারও মারা যান,
দেবরকে লইয়া বুকে ঘুমায় ভাবীজান ॥
দেবর-ভাবী, ভাবী-দেবর, যদি থাকে মনে টান,
কয় লতিফে ঐ সংসার হয় পূর্ণিমারই চাঁন ॥
৩৭.
বুক ফুলাইয়া চলাফেরা, পিছে ঘুরে কত ছোকরা,
ইশারাতে শুইয়া পইড়ো না ॥

একা একা ঘুরোফিরো, যারে তারে চিমটি মারো,

যাই করো নিলাজ হইও না ॥

তোমার বিয়ার বয়স পার হইতাছে, গাছের ফল গাছে পাকতাছে,

অখাদ্যতে মন মজাইও না ॥

রূপের ঠমক আছে অনেক, পাওনা তবু রসিক-আশেক,

বলে মনির হইয়া অস্থীর গরম হইও না ॥

৩৮.

বিয়াইনে কয় যৌবন আইছে তাতেই নাকি মোটা হইছে,

যৌবন আইলে কেন সাজ পারলারে যাইয়া ॥

আমি আরো কইলে কইতে পারি পড়বে তোমার মাথায় বারি,

রজ্জব দেওয়ান প্রকাশ করি যাও ভালো হইয়া ॥

৩৯.

বিয়াইন তোরে বারে বারে করিলাম কত মানা,

আপনা বোইনের সুখের সংসার বিয়াইনলো তুই ভাঙ্গিস না ॥

চোরের তো ধর্ম আছে লো বলি বিয়াইন তোর কাছে,

ধর্ম বলতে তোর কিছু নাই আমার জানা হইয়াছে ॥

৪০.

কত ছেড়ি পিছে ঘুরে খবর রাখস নি,

আমার মতো এমন স্বামী আর পাবি নি ॥

স্বামীর সাথে বড় বড় কথা চলে নি,

খুপায় ধইরা চুপায় মারবো তোমায় বাইদানী ॥

ভাত না খাইলে কপালে তোর আছে লো শনি,

রাস্তায় রাস্তায় মাইগা খাবি বাসি ফ্যান-পানি ॥

পায়ে ধইরা বইছোস বিয়া মনে আছে নি,

জনম ভইরা কাম করিয়া আনবি মালপানি ॥

৪১.

রসবাত খসাই, শিঙ্গা লাগাই, দাঁতের পোকা ফেলাইরে,

কর্ম মোদের নাহি নিন্দা পেটের ধান্ধারে ॥

গ্রামে-গঞ্জে, হাট-বাজারে, শহর কত বন্দরে,

পায়ে হাঁটি নিজে খাটি আমরা দুঃখিনীরে ॥

মেঘে ভিজি রোদ্রে শুকাই মাথায় ভারী বুজারে,

মিনারায় কয় অন্তিমশয্যায় থাকি যেন নৌকায়রে ॥

৪২.

কাজের বেলায় যেমন-তেমন, কথায় কথায় ভুল,

তাই ময়মনসিংহের জালাল কবি মইরা গিয়া করতে চায় কবুল,

জেতা-মরায় পিরিত করা এ কেমন ব্যাপার,

মরার সাথে প্রেম করিলে তোর জীবনটা হয় সার রে ॥

৪৩.

দুধে-আলতায় গায়ের রঙ আমার,

পাগল যে হয় দেখে একটি বার,

আমার বয়স কম, টাঙ্গাইলের চমচম,

পুরান ঢাকার গরম গরম, তেলে ভাজা আলুপুরী ॥

নানা তোমার গায়ে খুব গন্ধ,

এজন্য নানি করে না পছন্দ,

যেমন রাম পাঠা, তোমার পাও ফাঁটা,

কিনো আগে সাবান সোডা, যাও আইকে কর মুড়ামুড়ি ॥

নানা কত সুন্দর আলকাতরার রঙ্গে,

পিরিত করতে চাও আমার সঙ্গে,

তোমার হাঁপানী, কইছে মোর নানি,

কত খাও নাকানি-চুবানি, একটু করলে নানি জোরাজুরি ॥

৪৪.

আমারে তুই বুড়া কইছোস, নিজের কপাল নিজে খাইছোস,

আমার জন্যে বাঁইচা রইছোস টের পাইছোস না ॥

পুরুষ মানুষ বুড়া হয় না, এই কথা সকলের জানা,

এখনো তো বিয়া করতে ভয় করি না ॥

বকরির মত ডাক উঠছে, ঘুরিয়া যাছ যারতার কাছে,

নানার মত আর কে আছে, এমন আপনা ॥

৪৫.

চেহারাটা দেখতে দাদির শিম্পাঞ্জির মতো,

বুইঝা-শুইনা খাইলে কী আর চামড়া ঢিলা হইতো,

পাকা চুলে কলপ দিয়া কাঁচা করতে পারবা না ॥

ডিসকো জুতা, ডিসকো শাড়ি দাদি পরতে চায়,

চুলের মইধ্যে চাইর-পাঁচটা ক্লিব লাগায়,

টাংকি মারতে যায়রে দাদি রজ্জব দেওয়ান জানে না ॥

৪৬.

(ও নাতিন লো) মাথার চুলে শ্যাম্পু দিয়া, বাতাসে চুল উড়াইয়া,

বুকের কাপড় হেলেধুলে যায়,

পাকা কাঁঠালের ঘ্রাণ পাইয়া পাখিরা সব যায় উড়িয়া,

জুয়ান-বুড়া দেখিলে তাকায় ॥

(ও নাতিন লো) নাতিন আমার আলাভোলা ফালদ্যা ধরে মাইষ্যের গলা,

এমন নাতিন বিকাই কোন জাগায়,

কলিকালের ছেরাছেরি পিরিত করে পাড়া ঘুরি,

আমি বলি হুশিয়ারে থাইকো ঐ জাগায় ॥

৪৭.

তবে সবে একটা কথা জানে, সংসার ধ্বংস হয় রমণীর গুণে, আবার এই সংসার ধ্বংস হয় রমণীর কারণে, নাকি? দুনোটাই। কিন্তু আগে জানতে হবে, আগে বুঝতে হবে, রমণীর মনে যাতে কষ্ট না পায়। রমণীর মনে, স্ত্রীর মনে

কষ্ট পাইলে ঐ সংসারে হবে অঘটন এবং অশান্তি বিরাজ করবে। কী ভাই তাই না? (দর্শককে উদ্দেশ্য করে) আর এই ক্যাসেটটি আপনাদের মাঝে উপহার দিচ্ছেন তরঙ্গ ইলেট্রো সেন্টার, নিউ সিনেমা রোড, বি-বাড়িয়া। আমাদের গান, কথাগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে, আমাদের গাওয়া স্বার্থক হবে। আপনারা সকলেই দোয়া করবেন... আপনাদের যাতে ভালো কিছু গান, কথা শুনাইতে পারি, ধন্যবাদ। একটা গান গাইলেন, অনেক সুন্দর গান, বাবারে বাবা ! স্বামীর গান গাইলেন। 'স্বামী তোমার আল্লারও ঠিকানা।' (হাসি) ভাই, স্বামী বলেন, আরও অনেক কিছু বলেন, আমার দুঃখ নাই।...আমি যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লার কর্ম, রাসুলের কর্ম না করবো, ততক্ষণ কী আমি আল্লাহ পাব? কী বাবা পাব? (দর্শককে উদ্দেশ্য করে) অ্যা, আমি পাপ করলে আপনার কী ক্ষমতা আছে, সেইখানে আল্লাহপাকের কাছে রিকোয়েস্ট করে, আমার রাসুলের কাছে রিকোয়েস্ট করে তরাইয়া নেওয়ার জন্য? নাই। যার যার পাপের সাজা, সেই সেই পাবে। যার যার হিসেব, তার তার দিতে হবে। আর হ্যায় কী কয়, দেখছেন ন্যাকি? অ্যা... স্বামীর সাথে আল্লাকে তুলনা করেছেন ! আরে কয় কী? কথা একটু হিসেব কইরা বইলেন। আশা করি সর্বপ্রথম স্টেজ, যেই কথা বলেছেন! আমি তো বলতে চাই না, কিন্তু আমাকে বলাইয়েন না। প্রথমবারেই স্টেজে ওরে বাবারে বাবা, চরণধূলি মাখতাম! ওরে আমার চরণরে চরণ, চরণ আইজক্যা কুবাইয়া কাইট্টা লই যামু। চরণধূলি মাখতাম, কোন চরণধূলি মাখবো। আরে চরণের মতো চরণ অইতে অইব। সেই চরণধূলি মাখবো। দেখা যায়, এই চরণ লইয়া যায়গা পাড়ার ভিতরে। বউ থুইয়া, স্ত্রী থুইয়া আরেক জায়গায় যায়। এই চরণ চরণধূলি ! চরণ আইজক্যা কুবাইয়া কাইট্ট্যালামু।

৪৮.

ভরণপোষণ হইলে একটু কম,
(ওরে) জবাবদিহি করতে হবে জনমে জনম,
চলে যাবে আল্লার রহম ব্যথা দিলে অন্তরে ॥

৪৯.

শশুরবাড়ির সোনার গয়না বেইচা খাইয়া হইলা দেনা,
কাজ করতে ভালো লাগে না, কর বাবুগিরি,
কাজ করিতে লজ্জা নাইরে যদি চালাও ঠেলাগাড়ি ॥
মায়ের মতো হয় শাশুড়ি তার কথা মান্য করি,
খাও তুমি কামাই করি মান-ইজ্জত যাবে না,
কাজ না কেমনে চলবা বাবার নাইকা জমিদারি ॥

৫০.

বউ অইয়া এমন ঠবক ঠবক যে করতাছো। এই তিন কথা কইয়া যদি ছাইড়া দেয়। তয় তোর মায় শুদ্দা আমার কাছে আইয়া পাও ধরবো। অ্যা! বেহায়ার ঘরের বেহায়া, কয় কী? কয়- চাপার দাঁত রাখুম না ! শ্বাশুরির দাঁত রাখবো না, আর সারা বাংলাদ্যাশের শ্বাশুরিরা অর দিকে চাইয়া থাকবো নাকি! অরে এক থাপ্পরে না চাপার দাঁত আর সামনের দাঁত খুলাইবো। গোয়ার দাঁত শুদ্দা খুলাই ফালাইবো। সাহস কত বড় দেখছেন ন্যাকি? কত বড় সাহস লইয়া এই দ্যাশটার মধ্যে ঘুরে! এইটা হইল বাংলাদেশ, বাংলাদেশ। এইটা ইউরোপ কান্ট্রি নয়, বাংলাদেশের ভিতরে কোনো বাঙালি বধূ, কোনো বাঙালি পুত্রবধূ এইভাবে কথা বলবে, অরতো কল্লা দুই ভাগ কইরা দেওয়া উচিত। ('কোপা খালি' দোহারের সংলাপ)। কোপা মানে কোপা শামশু। আবার কয় কী, কয় পাইক্ক্যা, এমন পাকা পাকছে আমার শ্বাশুরি, একেবারে রস পড়ে। কয় কী! পাকাডার রস পড়বো না, কাঁচাডার রস পড়বো? অ্যা? এই এই এই বুঞ্জি, এই বুঞ্জি, পাকার রস পড়বো না, কী কাঁচার রস পড়বো! কাঁচাডা অইল তিতা, কটা কটা কষ কষ। কষ কষ লাগে। আর পাকা যেইডা রসের অভাবই নাই। যেমন পাকা ডালিম, পাকা গ্যান্ডারি, পাকা আনারস, পাকা আম, পাকা কাঁঠাল। আর এই কাঁচা আম, কাঁচা কাঁঠাল, কাঁচা পেঁপে, কাঁচা বেদানা, এইগুলো কী খাওয়া যায়? খাওয়া যাবে এইডি? ('না, না' দোহারের সংলাপ)। ও কয় আমারে পাকার চোটে রস পড়ে! ঐ.. শ্বাশুরির রস পড়ে? তোর তল দ্যা রস পড়ে না লো? ঐ.. মনডায় যে কয় কী? পোলার বউ দেইখ্যা কইতেও পারি ন্যা, সইতেও পারি ন্যা। পোলার বউতো, অরে কইলে তো আমার উপরে আইয়্যা পড়ে। এর জন্য অরে আমি কইতে পারি ন্যা। ও অইলো বেলাজা, বেলাজা ঘরের বেলাজা। আবার কয় আমার মা উনার বইন লাগে। ও (হাসি) যুইতের বেলা আছো নাকি? অ্যা? যে সুম কইছি, ঐ খাসচুন্নীর ঘরের খাসচুন্নী, কয় দেহেন আমার মায়েরে কতকিছু কইয়্যা গেল। আমার মায় তো উনার বোইনই লাগে। অহনে বেয়ুইতে পড়ছে, দেখছে যে, ঠাপাইয়া এক্কেবারে তলা ছুটাই দিব। অহনে অর মায়রে আমার বোইন বানাইছে। ঠিক আছে অসুবিধা কী? বিয়াইন আর বোইন একই তো কথা। কী কন আপনেরা ভাই? অ্যা, হ্যার মায় অইল আমার বিয়াইন। বিয়াইন আর বোইন একই কথা, গলায় গলায় ধইরা আটুম, গলায় গলায় ধইরা পান চাবামু, গলায় গলায় ধইরা কতা কমু, গল্প করুম এই তো। তয় আমার কথা হইলো কী, আমি হইলাম পোলার মা, আর তোমার মা হইলো মাইয়ার মা। মাইয়ার মার সব সময় মাথা নিচ্যা কইর‍্যা থাকুন লাগবো, মাইয়ারও মাথা নিচ্যা কইর‍্যা থাকুন লাগবো। অ্যা? আবার কয়, কী কইছে, সেন্টের কথা কইছে নি? ঐ দে (দোহারকে) সেন্ট লাগাই দিমু। (বউ পক্ষের গায়েনকে সেন্ট স্প্রে করার অভিনয় করে)। কয় কী, কয় কী! কয় কী উনি! কয়- সকালে কাপড় শুকা দেয়, শরম নাই। আমি ভোর পাঁচটা বাজে গোসল কইরা কাপড় শুকা দেই। ছি ছি ছি, কয় ঘরের কথা পরে জানে কেমনে, এই যে এমনেই জানে নাকি? আ লো, কয় অহন পর্যন্ত বুড়ি অইয়া গেছে, অহনো পর্যন্ত বুড়ি অইয়া

গেছে, বুড়া অইয়া গেছে, অহনো পর্যন্ত সকালে কাপড় শুকায়। তয় সকালে সকালে কাপড় শুকাম না। ঐ মাগির জি, ঐ মাগির জি, দুইড্যা তিনড্যা পোলাপান অওয়াই থুইছোস, এই পোলাপান লইয়া তুই ঘুমাস, না তোর জামাইর লগে ফূর্তি কইরা ঘুমাস। তোর পোলাডি আমার লগে ঘুমাইতে দ্যাছ। তোর পোলাপানে রাইত ভইর‍্যা আইগ্যা-মুইত্যা শ্যাষ করে। সকাল বেলা আমি গোসল করুম না, তুই গোসল করবি না তোর মায় গোসল করবো? অ্যা? পোলাপান মইধ্যে থাইক্যা গ্যাঞ্জাম করবো দেইখ্যা সব পোলাপান, আমাগো শ্বশুর-শ্বাশুরির উপর চাপাই দিয়্যা হ্যার পরে উনারা রাইত ভইরা গোসল করে। খালি, গোসলই করে। যাক, এই কারও লিগা কূয়া খুদলে, ঐ কূয়ায় নিজেরই পরুন লাগে। ঠিক আছে না, ঠিক কইছি না? আবার কয় ফাটায় যা লাগে তাই দিমু! কইছে না! এই, ফাটায় যা লাগে তাই বলে দিব! ছি ছি ছি! আ লো ফাডা কি খালি তোর শ্বাশুরির আছে? তোর মারও ফাডা আছে, তোর বোইনেরও ফাডা আছে, তোরও ফাডা আছে। এই ফাডার কথা কইয়া কোনো লাভ আছে! ফাডার কথা কইয়্যা কোনো লাভ নাইক্যা। উপর দিকে থুথু ফালাইলে নিজের উপরেই পড়বো। কাজেই ঐ সব কথা বলার কোনো দরকার নাই। আবার কয়, তোর চুলে ধরুম! ধরুম নি চুলে? (দোহারকে বলে) চুলে ধরুম, আমগো আত বাসায় থুই আইছি না। হ্যায় বউ অইয়্যা চুলে ধরবো, আর আমরা শ্বাশুরি, আমরা আত বাড়ি থুইয়া আইয়া পড়ছি! ধরুম নি চুলে? (চুল ধরতে উদ্ধত হয়)। কয় কী অ্যা? কারবারডা দেখছো নি! চুলে ধরবো! সাহস কত বড়! এই কার গোলার ধান খাইয়া ইন্দুর লোতা লোতা লো!... আরে শ্বাশুরি হইলো মাথার তাজ, শ্বাশুরি ভালো থাক, খারাপ থাক, তারে পূজা করতে অইবো, সেবা করতে অইব। সম্মান করতে হবে। এই শ্বাশুরিরে অসম্মান কইর‍্যা কতা কয় যে, হ্যায় যে একদিন শ্বাশুরি হইব এইডা কী তার মনে নাই। কী ভাই, হ্যায় তো একদিন শ্বাশুরি অইবো, তখন যদি তারে কেউ কয়, ফাডা বুজায় দিমু, রস পড়ে, গোসল করে, চাপার দাঁত খুলাই ফালামু, তহন হ্যার কাছে কেমন লাগবো। তয় আপনি যা কইয়া যাইবেন, কয়দিন পর কর্মফল আবার ভোগ করতে অইবো, এইডা আমার কথা।...তোমারও একদিন শ্বাশুরি অইতে অইব, তুমি আমারে বউ অইয়া যা কইয়া গেলা, তুমি আবার এই কথা শুনবা তোমার বউয়ের কাছে। ভালো কইলে ভালো শুনবা, খারাপ কইলে খারাপ শুনবা।

৫১.

পাটশাক রান্দে বউমা পানিতে চুবাইয়া,

মুখের সামনে ধরলে শাক গলায় যায় চলিয়া ॥

কেমন মায়ে পেটে ধরছে রান্দা শিখায় নাইরে,

সামনে পাইলে জিগাইতাম ঠোকনা দিয়া তারে ॥

ডাইল রান্দে যেমন-তেমন খাট্টা রান্দে কিরে,
বউ-পোলা মিলিয়া যেমন খাট্টায় সাঁতার পারে ॥

৫২.

ঘাটে-পথে ঘুরঘুর করোস চোখ টিপি দ্যাস আমারে,
ঠোঁট লারিয়া কী জানি কস ইশারা দ্যাস আমারে ॥
রাতের বেলা শুইয়া থাকি ঢিল মারোস টিনের চালে,
কত বড় বুকের পাটা দেখবো আজ তোরে ॥
নীলা পাগলী ভেবে বলে আয় আমার কাছে আয়,
দেখবো কেমন বাপের ব্যাটা কত বড় সাহসরে ॥

৫৩.

আমার সাথে কত ছেমরি সিনেমাতে যায়,
বুইড়ার সাথে বিয়া বসতে কত জনায় চায়,
তুই আমার আদরের নাতনি তোর পিরিতের দেওয়ানা ॥

৫৪.

প্রাণ সখি গো
একবার এসে বলুক সখি
বাজবে না তার মোহন বাঁশি
আর হবে না মেশামেশি
থাকিতে জীবন গো ॥
প্রাণ সখি গো
শ্যাম যদি কলঙ্কের ডরে
না আসে আভাগির ঘরে
কেন বা ফুলের ডালি ভোরে
মরলাম জনমের মতন ॥
প্রাণ সখি গো
একদিন সাঙ্গ হবে রঙ্গের খেলা

পশ্চিমে ডুবিবে বেলা গো

মাতাল রাজ্জাকে কয় যাওয়ার বেলা

কেবা কার আপন গো ॥

৫৫.

ত্রিশ গুরা লম্বা তরী, একশ ত্রিশ হাত, পলকে যায় ত্রিশ হাজার বৎসরেরই পথ,

ওরে দাড়িমাল্লা গায় সারিগান নবির দরুদে ॥

কুদ্দুস মিয়া নামরে গুনী, হাইলে হাবিবর, বিশ্বাসেরই বৈঠাখানি সিদ্দিক মিয়া ধর,

অধম আয়নাল মিয়া হয় পেসেঞ্জার ঐ না তরীতে ॥

৫৬.

চোর দিয়ে চোর ধরাধরি এ কী কারখানা

আমি তাই জিজ্ঞাসিলে তুমি বলো না

চোরেরা চুরি করে সাধু দেখে পালায় ডরে

চোরে সব লয়ে গেলো কোন্‌খানে ॥

অধীন লালন বিনয় করে সিরাজ সাঁইয়ের পায়

স্বামী মারিলে লাথি নালিশ করিব কোথায়

তুমি মোর প্রাণপতি কী দিয়ে রাখবো রতি

কেমনে হব সতী চরণে ॥

৫৭.

মসজিদ-মন্দির মানুষের জন্য

মানুষ নয় মসজিদের জন্য

জন্ম পাইয়া হইলি ধন্য সৃষ্টির হইলি সেরা।

কেউ করিবে রামের রাজ্য কেউ ইসলাম করবে খাড়া

যারা করে মানুষ মাইরা ধর্ম খাড়া

মানুষ নামের কলঙ্ক তারা ॥ ঐ

বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ রাখতে

ঐক্য হয় বিস্‌মিল্লাহর সাথে

গোলাম আজম দেশের পথে, রাজাকারের সেরা।

আদভানি আর গোলাম আজম, যদি গদিতে দেয় পারা

দেশে ঠিক থাকিবে মসজিদ-মন্দির

মানুষ মাইরা করবে সারা ॥

সৎ লোকের শাসনের নামে

লিপ্ত থাকে অসৎ কামে

আল্লাহর দেওয়া ধরাধামে আজব মানব তারা

রাজশাহী আর চিটাগাঙ্গে পড়ছে যে ছাত্ররা

করে ভার্সিটিতে গোলাগুলি

কেউ না তারা শিবির ছাড়া ॥ ঐ

আগে নবিজির আদর্শ মান, আছো যত মুসলমান

মানব প্রেমিক হইয়া যাওগা

কৃষ্ণ ভক্ত যারা।

রশিদ সরকার নাই তার ধর্ম, হইছে ধর্ম ছাড়া

বুঝলে পরে মানবধর্ম

কিছুই নাই এই মানুষ ছাড়া ॥ ঐ

৫৮.

ভাই-বন্ধু-আত্মীয়-স্বজন গো

এখন সবাই হইছে বারি

নয়নে লাইগাছে যারে

তারে কেমনে পাষরি ॥ ঐ

সাধে কী পাগল হইয়াছি গো

ছাইড়া কোলের বেরি

তোরা হইলে মরতি প্রাণে

বন্ধুর ঐ রূপ হেরি ॥

লজ্জায় মুখ দেখাব কারে গো

আমার বন্ধু গেছে ছাড়ি

রশিদের বাকি রইয়াছে (বানতে)

মাটির নিচে বাড়ি ॥ ঐ

৫৯.

পিতা তাহার নাম মুহাম্মদ, কোরেশ বংশে যিনি,

শাহ পরানকে পাইয়া বড় খুশি হইল তিনি,

মা-জননী গিয়া একদিন জিজ্ঞাস করলো স্বামীরে,

আমার গর্ভে বইয়া সন্তান আল্লার জিকির করে,

স্বামী বলে ধন্য তোমায় করলেন সাঁই কিবরিয়া ॥

জন্ম নিয়া পরান বাবায় মা-জননীর ঘরে,

গেরামবাসী দেখে আসি আল্লার জিকির করে,

সুলতানুল আসগারের সবক দিলো বাবার মুখে,

বেলায়তি চাপা ছিলো পরান বাবার বুকে,

গর্ভ হইতে জন্ম নিলো গর্ভজাত আওলিয়া ॥

রাখো তুমি তাহার জন্যে খাবার যোগার করে,

সন্ধ্যাবেলায় আসবে ছেলে আসবে তোমার ঘরে,

তাহার ছেলে ফিরা পাইলো জীবনীতে দেখি,

তাই ভাবিয়া কাঁন্দে হিয়া মম পরান পাখি,

পাগল দুলাল রাস্তায় কাঁন্দে নিও পার করিয়া ॥

৬০.

ও যে   আমায় ঘরের বাহির করে,   পায়ে-পায়ে পায়ে ধরে-

ও যে   কেড়ে আমায় নিয়ে যায় রে   যায় রে কোন্ চুলায় রে।

ও যে   কোন্ বাঁকে কী ধন দেখাবে,   কোন্খানে কী দায় ঠেকাবে-

কোথায় গিয়ে শেষ মেলে যে   ভেবেই না কুলায় রে ॥

৬১.

কেতকী-কদম-যূথিকা কুসুমে বর্ষায় গাঁথ মালিকা,

পথে অবিরল ছিটাইয়া জল খেল চঞ্চলা বালিকা।

তড়াগে পুকুরে থই থই করে শ্যামল শোভার নবনী ॥

শাপলা শালুক সাজাইয়া সাজি শরতে শিশির নাহিয়া,

শিউলি-ছোপানো শাড়ি পরে ফের আগামনী-গীত গাহিয়া।

অঘাণে মা গো আমন ধানের সুঘ্রাণে ভরে অবনি ॥

শীতের শূন্য মাঠে তুমি ফের উদাসী বাউল সাথে মা,

ভাটিয়ালি গাও মাঝিদের সাথে গো, কীর্তন শোনো রাতে মা।

ফাল্গুনে রাঙা ফুলের আবিরে রাঙাও নিখিল ধরণী ॥

৬২.

হিন্দু বাড়িত যাত্রা গান হইত

নিমন্ত্রণ দিত আমরা যাইতাম

কে হবে মেম্বার কে হবে গ্রামসরকার

আমরা কি তার খবর লইতাম ॥

বিবাদ ঘটিলে পঞ্চাইতের বলে

গরিব কাঙালে বিচার পাইতাম

মানুষ ছিল সরল ছিল ধর্মবল

এখন সবাই পাগল বড়লোক হইতাম ॥

করি ভাবনা সেদিন আর পাব না

ছিল বাসনা সুখী হইতাম

দিন হতে দিন আসে যে কঠিন

করিম দীনহীন কোন পথে যাইতাম ॥

৬৩.

টাকা পয়সা রোজগার করলে

ভাই বন্ধুর আর অভাব পড়ে না

গায়ের শক্তি কম হইলে

বন্ধুতো আর মিলে না ॥

কাউকে হাসাও কাউকে কান্দাও

সাজাইয়া রঙের কারখানা

রঙ্গিলা মিস্তরী তুমি

তোমার রঙের নাই সীমানা ॥

৬৪.

আমার দয়াল ভরসা, ছেড়ে পরেরও আশা,

দয়াল যদি করে দয়া ঘুচবে পিয়াসা,

আমার যার কারণে যাওয়া-আসা, তার চরণে সব সপেছি ॥

এসে দুনিয়ার মাঝে, ব্যস্ত রই নানান কাজে,

কামিনী-কাঞ্চন পাইয়া খেলাতে মজে,

ও তাই আবুল কান্দে সন্ধ্যা-সাঁঝে,

কী যে ঠকা ঠকেছি ॥

৬৫.

চুলি পাকিয়া কদম ফুল লাগে যেন সবই ভুল

মাঝে মাঝে পাকা চুলে কলপ মাখিয়া

করি কত ছন্দি বন্দি আমি যেন রাজনন্দী

বন্দি থাকি হাতে মায়া মেন্দি দিয়া ॥

দাঁতের গোড়া নড়েচড়ে, অধিক সান্নিকের জোরে

ব্যথা বাড়ে কথা কইলে জোর করিয়া

মুখে দুর্গন্ধ আসে যাই না লোকের আশেপাশে

বাতের দোষে শরীর কাঁপে চমকিয়া ॥

পর্দায় ঢাকা দুইটি আঁখি হা করিয়া চাইয়া থাকি

তবু লোকে দেই ফাঁকি ফাঁক বুঝিয়া

উঠা-বসায় ধরাধরি বুকের ভেতর গড়াগড়ি

ডুবলো বুঝি মানবতরী কুবাতাস পাইয়া ॥

মুসলমান হইলে পরে উত্তর শিওরে করে

হিন্দু হইলে ঘরের বাহির করিয়া

মাতাল রাজ্জাকের খেলা সাঙ্গে বিদায় প্রসঙ্গে

মাটিতে মাটির অঙ্গ মিশিয়া ॥

৬৬.

জগতে ধনী-মানী-মহাজন যারা,

ধন-সম্পদের পাগল তারা,

তাদের মন বসবে না ঐ জান্নাত ছাড়া,

যেন জান্নাত তাদের জন্য রাখা ॥

হুর-পরী আর নারীর সেবা,

ঐ দোজখে বা পাইবে কেবা,

তুমি কাজলকে দোজখে দিবা,

দোজখের ফল বড়ই পাকা ॥

৬৭.

মরে যাবো রেখে যাবো দুনিয়ার সম্পদ

এই সম্পদে ডেকে আনবে বিপদ আর আপদ-২

সম্পদ ভাগের জন্য

সম্পদ ভাগের জন্য মন মালিন্য ঝগড়ার সূত্রপাত

একজনকে করবে আরেকজনকে অপমান আঘাত ॥

ভালো-মন্দ উপার্জনে গড়া এ সংসার

ওরা পাপ-পূণ্যের ধার ধারে না শুধু অংশীদার-২

আমি মরার পরে

আমি মরার পরে হিসাব করে দিবে পাপের বোঝা

অনন্তকাল বইবো আমি আমার পাপের সাজা ॥

গানের ছন্দে মন আনন্দে মাথা দোলাও তালে

বুঝলি না জীবন্ত মানুষ লেখকে কী বলে-২

সবার হাতে ধরি

সবার হাতে ধরি পায়ে পড়ি বেঁধে নাও সামান

মহন্ত কয় পারের ঘাটে ভয়ংকর নিদান ॥

৬৮.

মরায় মরায় লেনাদেনা, জেতায় তার ভাব বুঝে না,

জেতা লোকের কানে যায় না মরায় যাহা কয় ॥

ভক্তের বুকে জ্বলে প্রেমের আগুন, ঐ আগুনে পুড়ায় দ্বিগুণ,

পাইলে গুরুর ভাবের শকুন মরারে দেখায় ॥

আবুলের স্বভাব মরে না, মুর্শিদ প্রেমে তাই পুড়ে না,

পুইড়া হইলে খাঁটি সোনা রাখতো রাঙা পায় ॥

৬৯.

কাসেম সাকিনার বিয়া সকালে গেল হইয়া

চক্ষের পানি দিয়া অজু করে (মনরে)

হাতের মেহেন্দী হাতে রইল কাশেম আলী শহীদ হইল

স্মৃতি রহিল সংসারে ॥

হোসেন হয়ে নিরুপায় ফোরাত কূলে চলে যায়

মারে কুফর কাতারে কাতারে (মনরে)

দুই হাতে তুলিয়া পানি ফেলিয়া দিলেন অমনি

কি জানি কি চক্ষেতে হেরে ॥

৭০.

২. কামেল অলি সাধু যারা, নূরের ছায়া পাবে তারা

থাকিবে গাও ভরা নূরেরই চাদর

পাপীতাপী গুনাগার, হইবে মস্তলাচার

হাড় করিবে গুড়া তার পাইলে পামর ॥

৩. ছেড়ে দে খুঁটিনাটি লাঠি ছাড় ধর ভাটি

শেষ বিচার হইবে খাঁটি অতি ভয়ংকর

মাতাল রাজ্জাক কয় ছাড় তামাশা উড়বে পাখি ভাঙবে বাসা

আসিতেছে সর্বনাশা কাল বৈশাখী ঝড় ॥

৭১.

লেংটা পাগল কেশা পাগল

উথলীতে ফজর পাগল

গোলাপ নগর সলেমান শাহ্

আল্লাহর এশকে দেওয়ানা ॥ ঐ

আফাজ পাগল বাঠুইমুরী

পাচু ফকির খড়ারচরী

ভাকলার পাগলি দুলি বুড়ি

ধামরাইর পাগলি বরকত মা ॥ ঐ

লেংটা আফাজ গালিমপুরী

গোলাম মওলা বৈরাবরী

খলিল চাঁনকে স্মরণ করি

গড়পাড়ায় যার ঠিকানা ॥ ঐ

বাঘা থানায় বাঘা পির

নুরল্লাপুরে শানাল ফকির

ঝিটকাতে হয় রশিদ ফকির

তাসাউফের ঠিকানা ॥ ঐ

আখাউরাতে কেল্লা শাহ্

কুষ্টিয়াতে লালন শাহ্

পারিলে হয় ইব্রাহিম শাহ্

তরিকতের নিশানা ॥ ঐ

ঝিটকায় দরবেশ আল্লাবাজান

জয়মন্টপে হয় ডেংগর চাঁন

ভাণ্ডারের গোলাম রহমান

পাগল এরা সবজনা ॥ ঐ

বৈরাবরের খালেক চাঁন

সুরেশ্বরের মওলানা জান

ঘোড়াশালের কাজী এমরান

চিনেও কেন চেন না ॥ ঐ

ফকুর হাটির জালাল উদ্দিন

পয়লাতে পির কসিমুদ্দিন

নকীব বাড়ির একলাস উদ্দিন

আল্লাহর প্রেমে দেওয়ানা ॥ ঐ

সব পাগলের বাবার বাবা

সিলেটে শাহ্ জালাল বাবা

হাইকোর্টে শরফুদ্দিন বাবা

পাগল এরা সবজনা ॥ ঐ

বাহার শাহ্ হয় বাবু বাজার

মাক্কু শাহ্র জেলাখানায় মাজার

মিরপুর হয় শাহ্ আলী বাবা

পুরায় মনের বাসনা ॥ ঐ

উত্তর টাঙ্গাইল ফাইল্লা বাবা

করটিয়া জান শাহ্ বাবা

এনায়েতপুরে ইউনুছ বাবা

পাগল রশিদের নাই ঠিকানা ॥ ঐ

৭২.

২। ডাকলে যে জন দয়া করে দয়াল বলে কে কয় তারে

না ডাকলে যে দয়া করে দয়াল সেজনা

এ দুনিয়ার ভব সাগরে কেউ যদি হায় ডুবে মরে

ডাকলে না কেউ দয়াল বলে পেয়ে যন্ত্রণা ॥

৩। দুঃখের কিবা আছে বাকি, যদি থাকে দেও হে দেখি

আমি দুঃখের ভয় কি রাখি, তুমি জেনে জান না

চিরকাল কাটাইলাম দুঃখে, আর বাসনা নাই হে সুখের

তোমার মনের মত দুঃখ দিয়ে পুরাও বাসনা ॥

৪। আলেপ চান কয় কাঁদিস বৃথা, মন তুই নিজে খাইলি নিজের মাথা

কার কাছে কই দুঃখের কথা ভেবে বাঁচিনা

সম দুঃখের দুঃখী পেলে কইতাম দুঃখ বদন খুলে

সুখী জনায় দুঃখের বেদন কিছুই জানে না ॥

৭৩.

জালাল সরকার সাধু (মানিকগঞ্জ), ছোট আবুল সরকার (মানিকগঞ্জ), কাজল দেওয়ান (ঢাকা), আরিফ দেওয়ান (ঢাকা), অসীম দাশ বাউল (রাজবাড়ি), আয়নাল বয়াতি (ফরিদপুর), আলেয়া বেগম (মাদারীপুর), তাপস্বী সরকার (ফরিদপুর) ও পারুল সরকার (মানিকগঞ্জ)।

৭৪.

মসজিদ কী মন্দিরে গাছতলাতে সন্ন্যাসী

তুলসী আর গঙ্গার জলে তোমাকে করে খুশি

হে গিরিধারী রাই শ্যাম বাঁশরী

চির বিরহী কাঁদে, শ্রী রাধিকার মন ॥

আকাশ কুসুম নিরাময় ক্ষুদ্র কণা পাতালে

অনন্তে অনন্ত মিশি গোত্র ভেদ মায়াজালে

পতিত পাবন নামটি ধর, সকলকে পার কর

নাই কেহ তোমার বড় শ্রী মধুসূদন ॥

শুনে তোমার নামের বাঁশি, দীনহীন রাজ্জাক দেওয়ান

মোকছেদ তোমার জমিদারি, রাজবাড়ি করলাম শ্মশান

কী জানি কী খাইয়াছি নেশা, হাড়-মাংসের পাই না দিশা

সোনা ভাবি দস্তা-সিসা, পাইতে তোমার মন ॥

বন্দি আল্লাহ, বন্দি নবি, বন্দি ফাতেমা জননী,

মওলা আলির চরণ সেবী ইমাম ভাই দুইজন,

এক লাখ ২৪ হাজার পয়গম্বর ভক্তি জানাই সকলেরে,

৩৬০ আওয়ালিয়ারে ভক্তি জানাই পরাণভরে,

চার তরিকার চার পিরেরে ভক্তি জানাই হৃদয়ভরে,

বাগদাদেরও বড় পির ঐ দরবারে নুয়াইলাম শির,

দয়াল খাজা রও আজমীরে ভক্তি জানাই দরবারে,

কুতুবউদ্দিন বক্তিয়ার কাকী দরবারেতে ভক্তি রাখি,

শেখ ফরিদ আওলিয়া, নিজামউদ্দিন আওলিয়া,

আমির খসরু আওলিয়ার দরবারে যাই ভক্তি দিয়া,

শাহ্ জালাল, শাহ পরান দরবারে ভক্তি রাখিলাম,

মিরপুরে বাবা শাহ্ আলি, চাই বাবা তোর চরণধূলি,

চট্টগ্রামে মাইজভান্ডারি তব নামটি স্মরণ করি,

গনি শাহ্ বাবা রাহেত আলী শাহ্ আমি করি চরণ আশা,

বেলতলীর সোলেমান লেংটা স্মরণ করি তোমার নামটা,

কদম চাঁন আর চাঁন মাস্তান দরাবারে ভক্তি রাখিলাম,

ফরিদপুরের সুরেশ্বরী তব নামটি স্মরণ করি,

আটরশি আর চন্দ্রপুরী ঐ দরবারে ভক্তি করি,

হাইকোর্টে শরফদ্দিন চিশ্তি তব নামে ভাসাই কিস্তি,

গুলিস্তানের গোলাপ শাহ্ বাবা চরণধূলি আমায় দিবা,

কোথায় বাবা হোসের শাহ্ ওয়ায়েসপুরী তার দরবারে ভক্তি করি,

মানিকগঞ্জে আল্লাবাজান দরবারে ভক্তি রাখিলাম,

কুষ্টিয়াতে লালন ফকির ঐ দরবারে নুয়াইলাম শির,

খুলনাতে খানজাহান আলী তোমার নামে প্রদীপ জ্বালি,

হযরত কলিমদ্দিন শাহের পাকদরবারে ভক্তি জানাই নতশিরে,

হযরত আনোয়ার শাহের পাক দরাবারে সালাম ভক্তি প্রেমভরে,

খাজা আয়নাল হক পাঠানের পাকচরণে ভক্তি জানাই মনে-প্রাণে,
খালেক চাঁন আর মালেক চাঁন-এর দরবারে ভক্তি রাখিলাম,
মাতাল রাজ্জাকেরে ভক্তি জানাই বারে বারে,
মা মধুমালার পাকচরণে ভক্তি জানাই মনে-প্রাণে,
আফাজদ্দিন শাহ্ আজিমপুরী তার দরবারে ভক্তি করি,
লালপুরী শাহ্, আব্দুল্লাহ শাহ্ পুরাও ভক্তের মনের আশা,
আমার কালু চাঁন্দে রয় ঘুমাইয়া দরবারে যাই ভক্তি দিয়া,
বিশ্বের আওলিয়া যত ভক্তি জানাই শত শত,
আজকের গান কমিটির সভাপতি, সালাম জানাই তাহার প্রতি,
আয়নাল হক পাঠানের ভক্ত যত ভক্তি জানাই শত শত,
প্রতিপক্ষ বন্ধু যিনি ভক্তি-সালাম দেই এখুনি,
সভাকরে যতজন আস্‌সালামু আলাইকুম,
থাকলে পরে হিন্দু শ্রোতা আদাব-প্রণাম নিবেন কর্তা,
পর্দার আড়ে মা-বোন যত ভক্তি জানাই শত শত,
তাল-সংগীতে আছো যারা ভালোবাসা নিও তারা,
সকলের কাছে সালাম, করিবেন গ্রহণ ॥
মা-বাবা ওস্তাদ ও পির ভক্তি-সালাম নতশির,
যাদেরকে ওসিলা করে দেখি শ্রীভুবন,
আমার ওস্তাদ-পিতা রাজ্জাক দেওয়ান,
তার দরবারে ভক্তি রাখিলাম,
মা জননীর পাক রওয়াজায় ভক্তি জানায় হতভাগায়,
বাবা-মা বাউল বানাইয়া আপন দেশে যায় চলিয়া,
ঢাকা জেলায় জন্ম বাড়ি, কেরানিগঞ্জ থানা ধরি,
ঢাকার বুড়িগঙ্গার দক্ষিণ পাড়ে ওয়াইসপুর গ্রামটি ধরে,
খোঁজ করিলে পাবেন মোরে,
তবে এটা হয় পত্রের ঠিকানা,

আসল বাড়ির খবর জানি না,

দুই দিনের মুসাফিরখানা, কৈ যেন রাখেন রাব্বানা,

লইয়া মওলার প্রেমডুরি বাউলবেশে ঘুরিফিরি,

কাজল দেওয়ান নামটি ধরে দোয়া চাই এখন ॥

৭৫.

বন্দি তোমার সৃষ্টি যত, নাম ধরে বলিব কত,

এসো গো মা বীণাপানি, আমি কি আর ভজন জানি,

আমার বিদ্যা-শিক্ষার গুরু যেজন, বন্দি আমি তাঁহার চরণ,

আমার বাউল শিক্ষার গুরু যিনি বন্দি তাঁর চরণখানি,

ওস্তাদ ইসরাইলের চরণ বন্দি, যে শেখাইলো বাউলের সন্ধি,

আমার দাদা গুরু জালাল উদ্দিন, নতশিরে তারে বন্দি,

রশীদ সাঁইয়ের পাক দরবারে ভক্তি জানাই নতশিরে,

গদিনশীন আছেন যিনি আমার ভক্তি নিবেন তিনি,

দরবারের ভক্তবৃন্দ যারা, আমার ভক্তি নিবেন তারা,

আসরের পরে বসলেন যত, ভক্তি জানাই হইয়া নত,

হিন্দু শ্রোতা থাকলে পরে নমস্কার জানাই তাদেরে,

আমার সঙ্গে গাবেন যেজন , আমার ভক্তি করবেন গ্রহণ,

সংক্ষেপেতে বন্দনাদি এখানেতেই ইতি করি ॥

৭৬.

এই যে পোশাক পরিধানে এটাও গাছের ফল,

কোষের ভেতর হচ্ছে তুলা আল্লাহর কি কৌশল,

কুসুম ভরা ডিমের মাঝে ভবিষ্যতের পাখি বিরাজে,

সাজালো অপরূপ সাজে সৃষ্টিকর্তা ফুল বাগান ॥

একটি বীজ হইতে লক্ষ লক্ষ বীজের উৎপত্তি,

এই মহাসত্য স্বীকার করতে কার আপত্তি,

একটি মাছে লক্ষ ছানা এই কথা সবারই জানা,

নিত্য নতুন জোগায় খানা, ফজলুল করিমের গান ॥

বন্দি আল্লাহ, বন্দি নবি, বন্দি ফাতেমা,

মওলা আলীর চরণ সেবী, ইমাম দুইজনা,

চার তরিকার মুর্শিদ আমার দয়াল ছবরুল চাঁন,

যাহারও কদমে আমি সাজিলাম গোলাম,

ওস্তাদ বন্দিয়া যাব সাধক আয়নাল মিয়া নাম,

বাজানের রওজায় আমি ভক্তি জানাইলাম,

মাতা-পিতার চরণ পরে ভক্তি নতশিরে,

যাদেরও ওসিলা করে এলাম ভবের পরে,

বিশ্বেরও আওলিয়া যত ভক্তিও জানাই,

সকলেরই পাকচরণে ভক্তি করে যাই,

বাগদাদে বন্দিয়া গাব জিলানীর জিলানী,

তোমারই নামের গুণে বাজান আগুন হইলো পানি,

আজমীরের ঐ খাজাবাবা হিন্দেরও সুলতান,

গাইতে যেন পারি বাবা তোমার নামের গান,

বিশ্বেরও আওলিয়া যত ভক্তি ঐ দরবারে,

বাংলাদেশের যত অলি ভক্তি রয় দরবারে,

রবিউল্লাহ ফকিরের পাক দরবারে ভক্তিও জানাই,

বাবাজানের রওজায় আমার ভক্তি করে যাই,

বাবাজানের আওলাদ যারা ভক্তি নতশিরে,

মান্যগন্য আছে যারা ভক্তি রয় সবারে,

প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি আছে যারা যারা,

সবার প্রতি ভালোবাসা রইলো পরাণ ভরা,

সভা করে বসলেন যত জ্ঞানী-গুণীজন,

সবারও চরণের পরে ভক্তি রয় এখন,

মা-বোনেরা আছে যারা ভক্তিও জানাই,

আসরেতে বসে আছে আমার মেজ ভাই,

ভাইয়েরও চরণে আমার ভক্তি-নতশিরে,

সাথী-শিল্পী আছেন যেজন ভক্তি জানাই তারে,

উভয় দলের সাথী শিল্পী আছে যারা যারা,

সবার প্রতি ভালোবাসা রইলো পরাণভরা,

এবার সিংগাইরে বন্দনা করি আব্দুর রশিদ সরকার,

যার মাজারে ভক্তি আমি রাখিলাম এইবার,

ঠিকানা আর বলিব কি, বলার কিছু নাই,

কবে যেন এই প্রাণপাখি নিবে তো বিদাই,

রাজবাড়ি ঐ জেলা ধরি সদরে মোর থানা,

বেলগাছি বসত বাড়ি গোলামের ঠিকানা,

বর্তমানে ফরিদপুরে সদর থানা হয়,

চণ্ডিপুরে বসতবাড়ি জানাই এ সভায়,

আমি ফকির আবুল সরকার,

চরণেতে ভক্তি সবার,

সবাই মিলে করেন দোয়া

তবেই হবে এ গান গাওয়া,

গাইতে যেন পারি আমি অলি-আল্লাহর গুণগান ॥

৭৭.

(আমি) বন্দি আল্লাহ, বন্দি নবি, বন্দিলাম ফাতেমা বিবি,

হযরত আলীর চরণ সেবী ইমাম ভাই দুইজন,

চার পীর চৌদ্দ খান্দান, হযরত খাজা হিন্দের সুলতান,

পীরানে পীর দস্তগীরকে করিলাম স্মরণ ॥

সভা করে বসলেন যারা, আমার সালাম নিবেন তারা,

দোয়া করবেন প্রাণভরা অতিভাজন,

কোথায় মা বীণাপাণি আমি কি তোমার ভজন জানি,

তালসংগীতে আছো তুমি দাও দরশন ॥
আমার ওস্তাদের নাম স্মরণ করি,
যে চরণে ধরলাম পারি,
দয়াল বাবা রজ্জব আলী ভক্তি রয় এখন,
তুমি মোরে করলে দোয়া, হতে পারে গান গাওয়া,
অপরাধ করিলে ক্ষমা করিও মার্জন ॥
(আমি) দোহার থানার অধিকারী, দোহার উপজেলায় বাড়ি,
পরশ আলী নামটি ধরি ডাকে ভাই দশজন,
পরশের এই ভাঙ্গা তরী অকূলে ধরিলাম পাড়ি,
কখন জানি ডুবাইয়া মরি, আমার চিন্তাতে জীবন ॥

৭৮.

আজমীরে এক গরীর ছিলো বড় অসহায়,
তার বিয়ার যোগ্য কন্যা ছিলো কেউ না নিতে চায়।
মাত্র পাঁচশ টাকা হইলে পরে দিতে পারে বিয়া,
কোথাও পাইলো না টাকা কান্দে ঘরে বইয়া।
অবশেষে মনে পড়ে হিন্দের অলির কথা,
গরীবেরও নেওয়াজ বুঝবে গরীবেরও ব্যথা।
এক নিয়তে পাক দরবারে কেউ যদি যায়,
তার মনের আশা পূরণ করে দয়াল খাজায়।
তাই গরীব লোকটা চিন্তা করে দরবারে যাই ॥
ঐ দরবারেতে যেয়ে গরীব উঠায় দুটি হাত,
আর কান্দিয়া কয় খাজা বাবা করছি মোনাজাত।
আমায় পাঁচশ টাকা দাও তুমি সত্য খাজা হইলে,
মাইয়া বিয়া দিব আমি ঐ টাকা পাইলে।
এইভাবেতে মোনাজাতে তিন দিন হইলো গত,
তবুও ঐ গরীব বেটা টাকা পাইলো নাতো।

টাকা না পাইয়া বেটায় বাইরে গেল হাঁটি,

ব্যাহির হইতে হাতে তুইলা নিল একটা লাঠি।

রওজায় তিনটা বারি মাইরা বলে খালি হাতে যাই ॥

ঐ দরবার হতে হাঁইটা গরীব গেলো কিছু দূরে,

পেছন হতে এক পাগলা ডাক দিয়া কয় তারে।

পাগলের ডাক শুইনা বেটায় হইয়া গেল খাড়া,

পাগলায় তার হাতে দিলো পাঁচশ টাকার তোড়া।

গরীব কয় টাকা চাইলাম খাজারও দরবারে,

খাজায় তো দিলো না টাকা যাচ্ছি খালি ফিরে।

আমি তোমার টাকা কেন নিব তোমায় চিনি না,

তোমার পরিচয়টা না পাইলে টাকা নিব না।

ঐ পাগলায় কয় পেছনে দেখো কম্বলও উঠাই ॥

ঐ পাগলার কথা শুইনা বেটা গেল তার পেছনে,

যাইয়া দেখে তিনটা বারির দাগ রয় সেখানে।

যেই তিনটা বারি মারছে খাজার রওজায়,

সেই তিনটা বারি দেখে পাগলেরও গায়।

পাগলের পায় ধরিয়া বলে গরীব, নিশ্চয় তুমি খাজা,

অপরাধ হইয়া গেছে দাও আমারে সাজা।

এইভাবেতে পাও ধরিয়া কান্দে অনেকক্ষণ,

উপর দিকে মাথা গরীব উঠাইলো যখন।

পাগলায় গেছে গায়েব হইয়া নাইরে আশেপাশে,

খাজায় নিজে টাকা দিছে আইসা পাগল বেশে।

টাকার লোভে হায়রে গরীব খাজারে হারাইলি,

বিশ্বাস ছাড়া দেয় না ধরা খাজা আল্লাহর অলি।

আমার খাজা বাবা আল্লাহর অলি যে করবে না বিশ্বাস,

এলেম-কালাম, নামাজ-রোজা সবই সর্বনাশ।

ভেবে মানিকগঞ্জের আবুল বলে খাজার জুড়ি নাই ॥

৭৯.

না করে গণ্ডোগোল খোল তোরা হাদিস খোল,

বিল্লাল ক্যান বাজায় ঢোল সেই দিন (কোন দিন),

যে দিন দ্বীনের নবি ছেড়ে যান পৃথিবী,

ঢোল বাজাইয়া ক্ষমা চায় ঋণ ॥

সুর দিয়া দেয় আজান, সুরে পড়ে কোরান,

সুর দিয়া করে বয়ান ওয়াজিন,

কয় সরকার শাহ্ আলম আছে গান দুই রকম,

বাউলগানে স্বাগতম মমিন মমিন ॥

৮০.

মা জননী কোরান পড়ে গর্ভেতে রেখে সন্তান,

আঠার সিপারা কোরান মুখস্থ করিয়া যান,

মায় জানে না ছেলের গুণ যে হয়ে গর্ভধারিণী ॥

আমার কি আর শক্তি আছে গাইতে তোমার জীবনী,

মূর্দাদের কলবে তুমি এনে দিতে রূহানী,

তোমার কাছে ধরা পড়ে ফেরেশতা আসমানী ॥

জন্ম তোমার জিলানেতে ছিলো রমজানের সময়,

দিনের বেলা দুগ্ধ খাও না তাতে তোমার রোজা হয়,

কয় দ্বীনহীন আলাউদ্দিন মারফতের খনি ॥

৮১.

বৃক্ষের সাথে প্রেম করিলে বৃক্ষে দিতো ছায়া,

তোমার সাথে প্রেম করিয়া পাইলাম নাতো মায়া,

(ওরে) তুমি একদিন না দেখিলে এসে আছি কত সুখে ॥

কী দিয়ে গড়েছো এ তীর বিষের এতো জ্বালা,

সহিতে না পারি আমি, যায় না লোক-সমাজে বলা,

(ওরে) তাই ভেবে কয় কিয়ামদ্দিনে একি করলি আমাকে ॥

৮২.

বাসর সাজাই রোজ নিশীতে,

ও সখিরে চুলে জুঁইমালতি,

একলা ঘরে আমার বন্ধুরে খুঁজে কেঁদে পোহাই রাতিরে ॥

আমার মরণ হইলে শান্তি পাইতাম,

ও সখিরে হইতো কান্নার সমাপ্তি,

আলোর (আলেয়া বেগম) দুই চোখ কাঁন্তে কাঁন্তে এখন চোখে নাই আর জ্যোতিরে ॥

পরিশিষ্ট : ১

বিচারগানের পারিভাষিক শব্দ

পাল্লাপালি- বিচারগানের দুই পক্ষের গায়েনদের মধ্যে প্রতিযোগিতা।

আলিফ- পুরুষ যৌনাঙ্গ

মিম- স্ত্রী যৌনাঙ্গ

ত্রিমোহনা- স্ত্রী যৌনাঙ্গ

ঠ্যাশ- এক গায়েন কর্তৃক আরেক গায়েনকে চাতুরী ছলে কোনো কিছু বলে ছোট করার চেষ্টা।

প্যাঁচ- পরিবেশনায় গান বা কথার মধ্যে কৌশলে এক গায়েন কর্তৃক আরেক গায়েনকে পরাস্ত করার চেষ্টা।

খোঁটা/খোঁচা- এক গায়েন কর্তৃক অন্য গায়েনের পালার ত্রুটি ধরে কথা বলা।

প্যালা- দর্শক-শ্রোতার পক্ষ থেকে গায়েন ও কুশীলবদেরকে টাকাসহ অন্যান্য উপহার প্রদান।

উসিলা- কারও মাধ্যমে বা সহযোগিতায় উদ্দেশ্য হাসিল করা।

ডায়না বা ঠ্যাটা- যিনি পরিবেশনায় গায়েনের সহকারী অভিনেতা হিসেবে ভূমিকা রাখেন।

দশা ধরা- গায়েনের গানে-কথায় করুণ রসে আপ্লুত হয়ে গায়েন-দর্শক কান্নাসিক্ত হয়ে একে-অপরকে জড়িয়ে ধরাকে বোঝায়।

ডাকের গান- ভারোত্তোলন বা ঠেলা ঠেলার কালে শ্রমিকরা যে গান গায়।

মেছাল- একটি উপমা দিয়ে আরেকটি বিষয়কে বুঝানো।

পরিশিষ্ট : ২

বিচারগানের পরিবেশনার অংশবিশেষ

(পরিশিষ্টে সংযুক্ত পরিবেশনার অংশবিশেষ থেকে অভিসন্দর্ভে প্রামাণ্য ও উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে)

১.১ আব্দুর রশিদ সরকার ও আমজাদ সরকার পরিবেশিত গুরু-শিষ্য পালার অংশবিশেষ

শিষ্যপক্ষের গায়েন আমজাদ সরকার : আজকে আমি আমার দয়াল বাবা, আমার কলিজার টুকরা রশিদ সরকারের সাথে আমি এমন একটি গুরু-শিষ্য পালা করতে চাই, যে পালার মধ্যে মানুষের কর্মের জন্য মানুষের জীবনের উদ্দেশ্যে কিছু জিজ্ঞাসা করবো, ভক্ত হতে শিষ্য হতে। জানতে চাই, যেমন আল্লাহকে পাওয়ার জন্য আল্লাহ তাঁর পবিত্র কোরানের মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ইবাদত দেয়া আছে। যেমন- নামাজ পড়া, রোজা রাখা, হজ করা, যাকাত দেয়া, কলেমাকে বিশ্বাস করিয়া পাঠ করা, মাতা-পিতার ভজন করা, বড় হইয়া ছোটকে স্নেহ করা, ছোট হয়ে বড়কে শ্রদ্ধা করা, সমাজের সাথে তাল মিলাইয়া চলা, মানুষ হয়ে মানুষকে ভালোবাসা, এর মধ্যেই খোদাকে পাওয়ার একটা রাস্তা কিন্তু আছে। কেমনে- হাদিসের মধ্যে বলেছে, 'আসসালাতু মিরাজুল মুমিনিন'। মুমিন বান্দার মেরাজ হবে নামজের মধ্যে। তাহলে একটি দলিল পাওয়া যায়। খোদাকে পাওয়ার সহজ একটা রাস্তা, নামাজেই বান্দার মেরাজ হয়ে যায়। তাহলে দরদি, আপনার কাছে সর্ব প্রথম জানতে চাই, এই যে আল্লাহকে পাওয়ার তো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ইবাদত দেয়া আছে। আমি আবার গুরু ধরবো তার কারণটা কী? আর হাদিস-কোরান মতে কোন কোন জাগায় গুরু ধরার কথা উল্লেখ করেছে। গুরু ধরতেই হবে, না ধরলে আর চলবে না, দয়া করে দরদি গোঁসাই আমাদের একটু বুঝাবেন।

গুরুপক্ষের গায়েন আব্দুর রশিদ সরকার : আমাকে প্রশ্ন করা হইয়াছে, রোজা, নামাজ, কলেমা, হজ, যাকাত, বড়কে মাইন্য করা, ছোটকে স্নেহ করা, মাতা-পিতার খেদমত করা ইত্যাদি ইত্যাদি বহুত রকমের ইবাদত আছে সত্য পথে চলা, তার পরেও গুরু আমার ধরতেই হবে এ সম্পর্কে হাদিস এবং কোরানের কোথায় কী আছে আমাকে বলতে হবে। ... তুমি যদি পাহাড় সমান ইবাদতও করো, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি বাতেনি ইবাদত গুরু ধরে হাসেল করতে না পারবে, ততক্ষণ তোমার এই ইবাদত চাইর পয়সার মূল্যও আসবে না। সে সম্পর্কে বহু জায়গায় বহুভাবেই বলা আছে। (গান)...যাহোক, প্রশ্ন করেছে আমজাদ সরকার, আমি সমস্ত ইবাদত করবো, 'আসসালাতু মিরাজুল মুমিনিন', নামাজের মধ্যে আল্লাহর সঙ্গে দিদার করবো। এখানে পিরের প্রয়োজন কী? না সর্ব প্রথম তুমি লক্ষ্য করো দয়াল নবি (স.) গাদিরে খুমে উনি বলেছেন,'আমার থেকে নবুয়াতের যুগ শেষ হয়ে গেলো, আজ থেকে বেলায়েতের যুগ শুরু হলো। 'মান কুনতু মাওলা ফা'হাযা আলিউন মাওলা'।-আমি যার মাওলা, আলি তার মাওলা। এই আলির

সিলসিলা দিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত যত লোক আসবে তারা প্রত্যেকেই পির-মোর্শেদ-ওলিআল্লাদের হাত ধরিয়া রেজালে গায়েব, গায়েবি এলেম না জানা পর্যন্ত মানুষের কোনো এলেম হাসিল হবে না। আল্লাহ পাক বলেছেন, '............(গায়েনের কথা বোঝা যায়নি)............ ।'অর্থাৎ জাহের-বাতেন দুই প্রকারের নেয়ামত দ্বারা তোমার দেহকে আমি পরিপূর্ণ করে দিয়েছি। জাহের-বাতেন দুই প্রকারের এলেম শিক্ষা করা মুসলমান নর-নারীদের জন্য ফরজ করে দিলাম। স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটি/বিশ্ববিদ্যালয়-মাদ্রাসা-মক্তব এখানে জাহেরি এলেম শিক্ষা করা যায়। দুনিয়ার একটা বিষয়বস্তুর উপরে তুমি ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করতে পার কিন্তু অন্তর জগৎ সম্পর্কে জানতে হলে কামেল মুর্শিদের কাছে বায়েত গ্রহণ করিয়া, তাঁর কাছ থিক্যা সেই মদুদ, আল্লাহ প্রদত্ত মদুদ, সেই মদুদ গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া তুমি পার পাইব্যা না। এখানে হাদিস শরিফে বলা হয়েছে, '.........(গায়েনের কথা বোঝা যায়নি).........।' সেখানে বলা হয়েছে, তুমি যদি পাহাড় সমানও শরিয়তের ইবাদত করো, যতক্ষণ পর্যন্ত বাতেনি ইবাদত না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই ইবাদতের তোমার চাইর পয়সার মূল্য হবে না। (রশিদ ও আমজাদ, ২০০৮ : পরিবেশনা)

১.২ জীব-পরম পালার জীবপক্ষের গান

ওগো মুমিনের কলবে যদি বেদ্বীনে বাসা বাঁধায়,
আল্লাহ তুমি নাম ধরিয়া লুকাইছো কোন জাগায় ॥
বড় মুমিন হয় রাসুলে, ছিলা নাকি তাঁর কলবে,
তবে কেনো যায় মেরাজে, আরশে কোন খোদায় ॥
যদি বলো ভ্রমণ করাইতে, আমি আনি তারে আরশেতে,
দেখি সাতাইশ বছর এক রাত্রে, অসীম শক্তি তাই দেখা যায় ॥
(আরে) এত বড় শক্তি লইয়া, (প্রভুগো) কার ভয়েতে রও লুকাইয়া,
মুহাম্মদকে দাও পাঠাইয়া, কী গুণ আমি গাইব তথায় ॥
(দয়াল) নবীকে আমি মানি, আরবেতে জন্মভূমি,
আলোর দিশারী তিনি, আরবিতে কথা গায় ॥
(দয়াল) কোরানকে আমরা মানি, কোরান হয় পবিত্র বাণী,
আরবেতে জন্মভূমি, কোরান হয় আরবি ভাষায় ॥
আল্লার আলাদা কী ভাষা আছে, থাকলে বল আমার কাছে,
পাগল মনির বলে ধোকা দিছে, মজে যাও মুর্শিদের পায় ॥ (মনির, ১৯৯৮ : পরিবেশনা)

১.৩ আব্দুর রশিদ সরকার ও আকলিমা বেগম পরিবেশিত কাম-প্রেম পালার অংশবিশেষ

প্রেমপক্ষের গায়েন আব্দুর রশিদ সরকার : তুমি বলেছো আমরা যদি কাম না করি, জন্মটা হইব কিভাবে? জন্মটা হইব সৃষ্টি। হইব কিভাবে? এখানে আমি বলতে চাই, তুমি একটা কথার শুধু জবাব দিবা আমাকে। তোমাকে যেদিন জন্ম দিয়েছিলো বা সৃষ্টি করেছিলো তোমার মা-বাবা। যেদিন রাত্রে মিশছিলো, আগের দিন কি কোনো মিটিং করছিলো, আজকে রাত্রে আমি আকলিমা বানামু। মিটিং করছিলো নাকি? না ঐ দিন রাত্রে সহবাসের আগে মিটিং করছিলো? আজকে আমরা দুইজনে আকলিমা বানামু। কিছুই না, কোনো মিটিং-সিটিং নাই। এইটা মালিকের দয়ায় আইসা পড়ছে। মালিক অন্যভাবেও দিতে পারতো। উনি উসিলা ছাড়া কিছু করেন না। উসিলা দেবারও কারণ আছে। আল্লাহ বলেছেন, আমি বিনা মেঘে বরিষণ করি ন্যা। আর কামেল মুর্শিদ ছাড়া আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারে না। আর উসিলা ছাড়া পোলাপান সৃষ্টি হয় না। তিনি পারেন কিন্তু করেন না। মুসা নবি তোমার মত কইছিলো। আমরা পোলাপান বানাই তোমার কী? তুমি পারলে দুই একটা প্রেমের পোলাপান ফ্যালাই দেও। আল্লায় কয়- দিমু আগামী মঙ্গলবার দিন। তুমি ঐ নীল দরিয়ার পাড় দাঁড়াইও। মুসা নবি নীল দরিয়ার পাড় দাঁড়াইছে। দুরুম দুরুম ছেলে সন্তান পড়ে, আর সাগরের ভেতর ঝাঁপ দিয়্যা ভাইস্যা যায়। হাজার খানিক বানাইছে, হাজার খানিক দরিয়্যায় লাফ দ্যা পইড়্যা গেছে। আর ভাইস্যা গেছে।

আল্লায় কয়- মুসা আমি বানাইছি তো।

মুসা কয়- হ বানাইল্যা তো।

আল্লায় কয়- তোমার সামনে পড়ে নাই?

মুসা কয়- হ আমার সামনে পড়ছে।

আল্লায় কয়- পইড়্যা যে এত পোলাপান মরলো, হাজার খানেক। তুমি এক-আধজন ধরলা না যাইয়্যা?

মুসা কয়-ধরুম কী আল্লা, এর একটার জন্যিও মহব্বত লাগলো না। একটার জন্যেও প্রেম আসলো না, মহব্বত আসালো।

আল্লায় কয়- তাইতেই আমি দেই ন্যা। তাইতে আমি আসমান থেইক্যা দুরুম দুরুম ফালাই ন্যা। তোমার মধ্যে প্রেম সৃষ্টি কইর্যা, ঐ প্রেমের মাধ্যমে সন্তান আইন্যা, ঐ প্রেমের সুত্যা বুন্যাইয়্যা দেই সন্তানের হৃদয়ের সাথে আর মা-বাবার হৃদয়ের সাথে একটা প্রেমের বন্ধন দিয়্যা দেই। তাই এর একটা যদি তোমার সামনে পড়তো, তাইলে নিজেও মরতে চাইত্যা। তুমি প্রেম চিন না। ভাত খাও তার ভাতার চিন না। তোমার কাম যদি এত ভালো জিনিস হইয়্যা থাকে, কাম যদি এত প্রয়োজনীয় হইয়্যা থাকে। বাজারে একটা ভালো বোয়াল উঠলে, ঐ বোয়াল নিয়্যা মায়রে খাওয়ান যায়, বাবারে খাওয়ান যায়, নিকটতম আত্মীয়-স্বজনরে খাওয়ান যায়। তোমার কামের ফলটা এত ভালো

জিনিস তোমার মায়রে তুমি খাওয়াইতে পারব্যা? তোমার বাপেরে তুমি খাওয়াইতে পারব্যা? তোমার খালারে খাওয়াইতে পারব্যা? ফুফুরে খাওয়াইতে পারব্যা? পারব্যা না কারণ আত্মীয়র সঙ্গে ঐ কাম করা যাইব না। উডা অইল্যা একটা বিল্যা। ভূয়া জিনিস, করলেও হয়, না করলেও হয়। তুমি বল জন্ম হইব ক্যামনে? অউইন্যা কুত্তা-বিলাই বহুত আছে। তুমি সাধকের-প্রেমিকের লাইনে চইল্যা আসো। চাচা তো নিজের জান বাঁচা। তাহলে প্রশ্ন আমার একটাই কাম যদি এত ভালো জিনিস, তা নিকটতম আত্মীয়দের খাওয়ানো যায় না কেন?

কামপক্ষের গায়েন আকলিমা বেগম : যেইভাবেতে কথা বলে, কথা শুনে অঙ্গ জ্বলে। আমার প্রতিপক্ষ শিল্পী বলে, টল-অটল-সুটল সবই নাকি তাঁর সাঁইয়ের লীলা। খুব ভালো বুদ্ধি পাইছেন। টল-অটল-সুটল, অটল যেইটা সেইটাও তাঁর সাঁইয়ের লীলা। আর যেইটা টলে, সেইটাও সাঁইয়ের লীলা। তার মানে তিনি বুঝাইতে চায় যে, যেইটা কাম, সেইটাও সাঁইজির লীলাখেলা, আর যেইটা প্রেম, সেইটাও সাঁইজির লীলাখেলা। তাইলেতো আর পালা থাকে না। তাইলে আপনি কী নিয়া কাড়াকাড়ি করবেন, আমিই কী নিয়া কাড়াকাড়ি করবো? তাইলে এইটা আপনাকে বলতে হবে, স্বীকার করতে হবে, প্রেমের প্রয়োজন আছে, এই দুনিয়াতে কামেরও প্রয়োজন আছে। কাম ছাড়া প্রেম হবে না। আগে কাম পরে প্রেম। আপনার প্রেমের দরকার আছে। কিন্তু সর্ব প্রথমই প্রেম করবেন, প্রেম দিয়ে দুনিয়াতে কিছু বাড়বে না। একাধিক হবে না। প্রেম দিয়া কখনো কোনো কিছু বাড়ানো যায় না, প্রেম একটা সীমাবদ্ধ জিনিস। কাজেই আমি বলবো, আপনি যদি বলেন যে, টল-অটল-সুটল সব আপনার সাঁইয়ের লীলা, তাইলে আপনি বলবেন, আপনাকে ধরা রইল। আপনি সুন্দরভাবে এই কথাটার উত্তর করবেন, 'আলিফ'-এর মাথা ফাঁটা কেন? আলিফ, এই আলিফের মাথা ফাঁটা কেন? কোনদিন থেকে, কী কারণে, আপনাকে একটু প্রশ্ন রইল? আপনি সুন্দর করে আমার এই কথার মিমাংসা করবেন। হাসি দিয়া আপনার নূর ঝরে পড়ছে, এইটা অন্যকোনো রাস্তা দিয়া বা অন্যকোনো পদ্ধতিতে নূর টলে নাই, ঝরে নাই, এইটা হইল আল্লাপাক হাসি দিছে আর হাসি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নূর টইল্যা গেছে। তাইলে এইবার প্রশ্ন থাকবে, এই আলিফের মাথা ফাঁটা কেন? হাসিতেই যদি সবকিছু হয়, শুনেন রশিদ ভাই, আমি হইলাম কামের পালা নিছি, আমি হইলাম কামুক, আপনি হইলেন প্রেমিক। কাম না থাকে যার, তার কোনো প্রেম নাই। যার এই জীবনে কামের শক্তি নাই দেহের ভেতরে, তার কোনো প্রেমের বালাইও নাই। যার কাম নাই, তার কোনো এবাদত-বন্দেগী নাই। মিছ্যা, সব মিছ্যা, এক্কেবারে মিছ্যা। আপনে আর একটু খেয়াল কইর‌্যা শুনেন, খুব সুন্দর কথা বলছে। তাঁর কথা অতি উত্তম। কয় প্রেমের মধ্যে সন্তান জন্ম দেয়া যায় না। ঐ যে মুসা নবির সামনে সন্তান একটা একটা কইরা পরে, আল্লায় কয়- এই মুসা, তুমি ঐ সন্তানের কাছে যাওনা ক্যান? মুসা কয়- যামু ক্যামনে আমার তো এইখানে মহব্বত নাই। কেন মহব্বত নাই? কারণ সেইখানে কাম নাই। বাবা-মা রতিরণে গিয়ে, একটা সন্তান জন্ম দিল, সেইখানে প্রেম আছে। আর আকাশ থিক্যা আল্লায় ফালায় দেয়, ঐখানে কোনো প্রেম নাই।

যদি কাম কইর‍্যা সন্তান জন্ম দেয়, সেই সন্তানের জন্য মায়া-মহব্বত অবশ্যই লাগবে। লাগতে হবে। এইটা আল্লার কথা এইটা আমার কোনো কথা না। তাই আমি বলবো, এই বিশ্বে যত অলি-আওলিয়া, গাউস-কুতুব, পির-পয়গম্বর যতকিছু আছে, এই দুনিয়াতে সবাই কামে সন্তান জন্ম দিছে এবং কামে তারা জন্ম নিছে। বাবা-মায়ের কামে তারা জন্ম নিছে এবং কাম কইর‍্যা নিজেও সন্তান জন্ম দিছে। শুনেন, হযরত পিরানে পির দস্তগির মাহবুবে সুবাহানি কুতুবে রাব্বানি আবদুল কাদের জিলানি, উনার জীবনীতে প্রমাণ করে, উনার ঊনপঞ্চাশটা সন্তান, আর চাইর জন হইল তার ইসতিরি। কোনো ইসতিরির সাথে শুধু কারেন্টের চুমা খাইয়া পোলাপান জন্ম দেয় নাই। ... তো শুনেন আপনে যত কিছুই কন, কারেন্টের চুমা দিলে কোনো কাজ হবে না। কারেন্টের চুমায় কোনো লাভ নাইক্যা। আমার প্রতিপক্ষ শিল্পী আমাকে প্রশ্ন করছে, খুব সুন্দর প্রশ্ন। কয়, তোমার কামের ফলটা সবাইরে খাওয়াইতে পারবা? হ্যা, পারবো না কেন? আমার কামের ফল খাওয়ার যে উপযুক্ত আমি তাকেই খাওয়াবো। আমার কামের ফল খাবে আমার স্বামী। আমার মায়ের কামের ফল খাবে, আমার বাবা। আমার মেয়ের কামের ফল খাবে, মেয়ের জামাই। খাওয়াইতে পারবো না মানে? খাইতে খাইতে খাইতে, কত খাইবেন আপনে, জনমের খাওয়ান খাওয়াই দিমু কামের ফল। কয়, কামের ফল সবাইরে খাওয়াইতে পারবা! পারুম না মানে? পৃথিবীতে যত মানুষ আছে সবাই কামের ফল খাইছে। কে না খাইছে? ... আর এই পৃথিবীতে যত মানুষ জন্ম নিবে সবাই কামের ফল খাবে। কিন্তু আপনি যেইভাবে বলতেছেন, এইভাবে না। আসলে বিষয়টা ঐ রকম না। আমার জন্য কামের ফল খাওয়ার জায়েজ যে, সেই খাবে। আমার সন্তানের জন্য আরেক জনরে জায়েজ কইর‍্যা দেওয়া হইছে। এইভাবে কামের ফল খাওয়াইতে কোনো মানুষ বাকি থাকবো না। আপনার প্রেমে কয়জন আগাই আইবো। প্রেম করেন দেহেন এত দুর্নাম। দুর্নামের চটে প্রকাশ্য দিবালোকে কোনো কাজ করতে পারবেন না। এমন একটা অবস্থা প্রেমের। প্রেমের ফলটাই সবাইরে খাওয়ানো যায় না। কিন্তু কামের ফল খাওয়াইতে কোনো সমস্যা হয় না। কারণ এইটার হইল দলিল আছে রেজিস্ট্রি করা। এক্কেবারে রেজিস্ট্রি কইর‍্যা নেয়। কাম আপনে যত পারেন করেন, দিন-রাইত ২৪ ঘন্টা। পারলে আপনার তাগতে যদি কুলায় আপনে সারাদিন-রাইত কামই করতে থাকেন। অসুবিধা নাই। নিজে খান আর আরেকজনরে খাওয়ান যদি পারেন, যদি যোগ্যতা থাকে। (রশিদ ও আকলিমা, ২০০৭ : পরিবেশনা)

১.৪ মালেক সরকার ও শংকর দাস বাউল পরিবেশিত হিন্দু-মুসলমান পালার অংশবিশেষ

হিন্দুপক্ষের গায়েন মালেক সরকার : কর্তারা আমাগো বাজার গরম না। আমাগো বাজারডা একটু ঠান্ডা ঠান্ডা। আমাগো বাজার কোনো সময় ছিলো। এহন আমারা একটু দুর্বল। তাই কর্তারা অনেক কথা বলতে পারি না। অ্যামনেই আমাগো বাড়ি-ঘর যা আছে মাইনষে দহল কইরা লইয়া যায় গা। আর কী কমু দেখেন বাজান, আমি

আপনারে যেই জায়গায় কথাডা বলছিলাম, ‘জিজ্ঞাসিলে বাবার নাম, দেয় মামুর পরিচয়।’ অ্যা আপনার বংশ পরিচয় কেউ কেউ হইল সুন্নি মুসলমান, তয় আগে মানতো কোন বিধান? এই বাংলাদেশে তো আগে মুসলমান ছিলো না গো। আপনারা কী ছিলেন, আপনেগো রক্তের মইধ্যে আছে কী? ধুইয়া উপরের ময়লা পরিষ্কার করছেন, রক্ত পরিষ্কার করছেন কী দিয়া? কলেমা, বারে বারে কলেমার দাওয়াত দেন ! কলেমা খালি মহম্মদেরই আছে ! আর কারও নাই? কলেমা আর কারও নাই? ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ।’ নাই? এইডা পড়ে না ক্যা? এইডা ক্যান পড়ে না? উডা আপনেরা পড়বেন না। কারণ, বাবার নাম কী? কয়- মামার নাম কালাই বেপারি। কয়- আরে বাবা, বাবার নাম কী? কয়- মামুর অবস্থা ভালো। মামুর অবস্থা ভালো তাই ! হ্যা? আরেকটু দেখেন, একটু কথা কই। পালা যখন লইছি, এহানে কিছু লোক আছে। তাই কই, দেখেন, আমরা হিন্দু সম্প্রদায়রা বর্তমানে একটু প্রমোশন পাইছি। এইডা আবার কইতে পারেন প্রমোশন কেমনে পাইলেন? দেখেন কর্তারা, আগে আমাগো হিন্দুদের মধ্যে নাপিত ছিলো, ধোপা ছিলো, জাইল্যা আছিলো। এই মুসলমান বেটারা আমাগোরে কইতো নাপিতের ঘরের নাপিত, ধোপার ঘরের ধোপা, চাড়ালের ঘরের চাড়াল। আমাগো কইতো। কর্তারা আমরা এখন প্রমোশন পাইয়া, এই ডিমোশনয়ালা যারা, এই মুসলমান হ্যাগোরে দিয়া, আমরা কর্তারা একটু উপরে উইঠ্যা গেছিগো এহন দেখেন এই বাংলাদেশে মুসলমানদের মইধ্যে মাছ বেচে বেশি, চুলও কাটে বেশি, আবার ধোপাও বেশি। অহংকার পতনের মূল, অহংকার কইরা উনারা গেছে নিচে। আর আমাদের প্রভু-ভগবান-ঈশ্বর উনি আমাগোরে দিয়া দিছে একেবারে উপরে। বিশ্বের মধ্যে এই শুধু মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি, যত দলাদলি, বাহাত্তরটা ফেরকা, তেহাত্তরটা কাতার, এই দলে দলে মারামারি, হ্যায় কয় সুন্নি, হ্যা কয় ওহাবি, অ্যা কয় খারেজি, অ্যা বলে আরেকটা বলে কী ! কিয়ের বলে অমুক ঐ করতে করতে, এই দলেরে টুকরা টুকরা করতে করতে মুসলমানরা বর্তমানে আছে সব চাইতে পিছে। আর বিশ্বের সমস্ত ধর্মের মানুষরা দিন দিন আগাইয়া গিয়া জাতিকে বানাইছে অনেক উর্ধ্বে। আর আপনারা খালি ঐ যে কইছেন না, ‘ইসলামের সওদা হাতে আসলেন রাসুল।’ ঠিক কইছেন কিন্তু মুখে যা কন অন্তরে তা আপনারা কন না। একটা গান শুনেন-

(গান)

নামের বাঁশি আছে প্রভু, গয়া-কাশি-গোলকধাম,
যদি ভালো লাগে তোমার দ্বীনবন্ধুর নাম ॥
নামই তন্ত্র, নামই মন্ত্র, নামে কাটে মনের ভ্রান্ত,
নাম জপিয়ে নিশীকান্ত মরা নামই হয় সে রাম ॥

অজপা করে নাম করে আশা, নটা পাইল পথের দিশা,

মিটে যায় মরণ পিপাসা দেখতে পাইল রাধেশ্যাম ॥

না হইলে নামের নামের নামী, কেমনে হয় ঊর্দ্ধগামী,

ভোগ-বিলাসে নিম্নগামী তার কাছে নাই রামের সাম ॥

রাধা-কৃষ্ণের যুগোল নামে মালেক হয় যার অন্তর ঘামে,

আমার দ্বীনবন্ধুর নামও প্রেমে নিশ্চয়ই (...(গায়েনের কথা বোঝা যায়নি)॥

প্রশ্ন, আমাদের হিন্দুধর্মে মেয়েরে বিয়া করছে কিরা? অ্যাই, একজনকে মন্দ বলতে হলে, দেখতে হবে আমার সেই দোষ আছে কী? নিজের মেয়ে আপনাদের (মুসলিমদের) মধ্যে করে নাই কেউ? অ্যা? আমাদের হিন্দুদের মধ্যে নিজের মেয়ে বিয়া করে নাই। লীলা ক্ষেত্রে এসে, নিত্যের হরি লীলায় এসে, সে কখনো হয় মা, কখনো হয় সন্তান, কখনো হয় বাপ, কখনো হয় মেয়ে, কখনো হয় স্বামী, কখনো স্ত্রী, তারে কয় কামে হরি। নিত্যের হরি, ভগবান হয়ে, দুই নামে নিজেকে প্রকাশ করিলো, তার এক ভাগ নারী, আরেক ভাগ পুরুষ হলো। তাই স্থান-কাল-পাত্রভেদে সেই নারী আবার পুরুষ। নিত্যের হরি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে নিজেই নিজেরে জন্ম দিল, একটি সন্তান এলো, তার নাম হল আমি-তুমি-সে, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব, আলিফ-লাম-মিম, একই কথা। তোমার ধর্মেও তা আছে। আমার ধর্মে এই আছে, গেল এ কথা। এবারে আসলো স্বামী থুয়ে পরপুরুষের সাথে কে ঘর করিল? না গো না, এমন নাই। তবে থাকলে থাকতে পারে তোমার মধ্যে, আমার মধ্যে নাই। তোমার মধ্যে আছে আমি বলিতে না চাই। তবে শোন, আমার সত্য যুগের হরি, তার ভার্যা ছিলো লক্ষী। তার এক ভক্ত ছিলো শতপা বাহ্মণ। সে সাধনা-তপস্যায় রত হয়ে গেল। তার সাধনায় স্বয়ং সত্য যুগের হরি খুশি হয়ে বলে, কী চাও? আমি যা চাই তুমি দিবে? দিব কী চাও? দিব। তিন সত্যি করার পরে বলে, দয়াল গো আমি তোমার স্ত্রী লক্ষীকে আমার ভার্যা রূপে চাই।

বলে না না, হবে না। ও যে তার গুরুমা। না মাকে বিয়ে করা যায় না। ভক্ত বলে তাহলে আমি আর কিছু চাই না। বলে দেব, আবার যখন ভক্ত তপ করলো, সিংহাসন কাঁপে। লক্ষী বলে, দয়াল কিসের জন্য সিংহাসন কাঁপে? ভক্তের ডাকে, ভক্তের অধীন হয় ভগবান।

(গান)

ভক্তের হাতে প্রেমের ডুরি,

যে দিকে ঘুরায়, সেই দিকে ঘুরি ॥

ভক্ত আমার মাতা-পিতা, ভক্ত আমার গুরু। ভক্ত আমার নাম রেখেছে বাঞ্ছা-কল্প-তরু। তাই যদি ভক্ত চায় দিয়ে দ্যাও। তোমাকে চায় ! আমাকে চাইলেও দিতে হবে। তাই দিয়ে দিলো। এই যুগে নয়, ঐ যুগে, দ্বাপর যুগে শ্রী

কৃষ্ণ হয়ে আসবে, রাধা রাণী হয়ে আসবে। আর শতপা ব্রাহ্মণ আয়ন ঘোষ হইয়া আসবে। সেই আয়ন ঘোষের কাছে রাধিকাকে বিয়ে দিলো। কিন্তু উসিলায় সামনে রইল রাধা। সামনে রইল আয়ন ঘোষ। আসলে কাজটা যার জিনিস তার কাছে রইল ! তার কাছে হল। হয় নাই? বিয়ে তো যারটা তার কাছেই হল। মাঝখান দিয়ে লীলাচ্ছলে জীবকে প্রেম শিক্ষা দেওয়ার জন্য, এখানে নিজে ভগবান এসে, অবতার হয়ে প্রেম শিক্ষা দিলেন। এই ছিলো তোমার প্রশ্ন। এবার আমি প্রশ্ন করে যাই, জবাব দিও। একটি কথা বলেছে, কোরাইশ বংশে নবি জন্ম নিছে। আমি বলবো এই বংশ উনার না। কোরাইশ বংশে নবি জন্ম নিছে, এই বংশ নবির না। তাহলে শংকর দাস তুমি একটু শোন আমার বর্ণনা। ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ, তাঁর ছেলে ইসমাইল জবিয়ুল্লাহ নিয়া এই মক্কা ঘর মেরামত করলেন পাঁচ পাহাড়ের পাথর দিয়া। মেরামত করে, মক্কার ঘর সামনে নিয়া বলে, মালিক, ও আমার মালিক, মালিকরে এই মক্কা ঘর রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য আমার এই বংশের মধ্যে এমন একটি প্রদীপ চাই, যুগে যুগে যেন এই মক্কা ঘর রক্ষা করতে পারে তার উসিলায়। সেই দোয়া কবুল হয়েছিলো। ঐ কারণে, ঐ বংশের ঐ ইব্রাহিম খলিলের বংশে নবি জন্ম নিলো। এইবার কিছু কই, বলেছিলাম তোমার দাদার নাম কী? বাপ থাকলে দাদা আছে, তোমার দাদার নাম কী? তা কয় নাই। ইব্রাহিম খলিল হল জাতির পিতা। নাকি? ইব্রাহিম খলিলের বাবার নাম কী? ইব্রাহিম খলিলের বাবার নাম কইতে লজ্জা করে কেন? আমার প্রশ্ন , আপনার মুসলমানের মধ্যে, চার ছেলের কাছে চারটি মেয়ে বিয়ে দিল, ছোট মেয়ে নিজেই বিয়ে করলো। আমার প্রশ্ন আপনে বলবেন, চাইর ছেলের কাছে চাইর মেয়ে বিয়া দিয়া, নিজের ছোট মেয়ে বিয়া কইরা, সেই ব্যক্তি আবার জান্নাতী অইল সেইডা ক্যামনে? একটু বুঝাইয়েন তো আমারে।
(গানের স্থায়ী গেয়ে আসর শেষ করেন)

মুসলমানপক্ষের গায়েন শংকর দাস বাউল : অনেকগুলি কথাই বলেছেন। একটা বলেছেন, বাড়ি-ঘর নাকি আমরা দহল করতাছি। আরেকটা বলছেন জোর যার মুল্লুক তার। না, এই রকম না। ইসলামের একমাত্র জোরই হল কলেমা। গোরগোবিন্দ রাজা সম্পর্কে তো মোটমুটি আপনে ভালোই জানেন। কিন্তু শাহ্ জালাল বাবা একটা আজানের ব্যবস্থা করেছিলে, ঐ আজানের ধ্বনিতে গোরগোবিন্দের যাদুর যতকিছু ছিলো সমস্ত কিছু ধলিৎসাৎ হয়ে গেছে। খাজা বাবা, পৃথিরাজের সাথে কি মারামারি করছিলো? না। শুধু কলেমা। এবং চিন্তা করেন কলেমার কত বড় শক্তি। তাই আমি একটি গানে বলেছিলাম, ‘কলেমা তৈয়্যব সামান্য নয়, যে বাক্যে মানুষ মুসলমান হয়, ওজন তার ব্রমাণ্ডময়, খুলিয়া দেখ পাক কোরান।’ এইবার কয়, হিন্দুরা নাপিত আছিলো, ধোপা আছিলো, এহন অ্যারা গেছে গা, এহন মুসলমানে শুরু করছে। মুসলমানে করছে মানে, আরে এইটা তো কর্ম, এইটা তো ধর্ম না। এদেশের লোক বিদেশে গিয়া কর্ম করে না? এইডা কর্ম। আর এহন মুসলমান করে ভালো কইরা। আগে হিন্দুরা কী করতো একটা চেয়ারের

মধ্যে বহাইয়া কানের মধ্যে টাইনা তুলতো। দাউ লইতো, দাউদ্যা করতো। এখন ঐভাবে করে না, এখন উন্নত ধরনের হয়ে গেছে। এহন বসাইয়া, কী সুন্দর, আস্তে কইরা শেভ কইরা দেয়। হিন্দুরা এইভাবে কানে টাইনা করতো।

(গান)

আমার মুহাম্মাদ রাসুল গো, আমার হাবিবে রাসুল ॥

সাফায়েতুল্লাহ নবি, রাহমাতাল্লিল আলামিন,

যাকে পেয়ে ধন্য হল আসমান-জমিন,

ও জিকির করে ফেরেশতাগণ নামেতে মশগুল ॥

ইসলামের ঝাণ্ডা হাতে এলেন নবি এ ধরায়,

কত কাফের হয় মুসলমান কলেমারও উসিলায়,

হাশর-মিজান পার হয়ে যায় পুলসিরাতের পুল ॥

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ,

এই কলেমা পড়লেরে মন থাকবে না ত্রিতাপ জ্বালা,

বাউল শংকর দাস হয় উতালা পাইতে চরণধূল ॥

সুন্নি, ওহাবি, রাফেজি, খারেজি এই রকম একটা সিস্টেম আছে। এইটা হইল দলীয় করা। এইটা যার যার গোত্র থেইকা সিস্টেম করা। আসলে হিন্দুদের মধ্যেও আছে, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, একজন আরেকজনকে দেখতে পারে না। এগুলোর মধ্যে না, আমরা যে পালা নিয়া আসছি, গুণগুলা বলা দরকার। আপনে একটি কথা বলেছেন, কয় ইব্রাহিম খলিলুল্লাহর বাবার নাম কী? আপনে বলবেন, আজর, আমি বলবো না। আপনে বলবেন, হিন্দু ছিলো, না। আজর কে ছিলো? আদম থেকে তো মুসলমান আরম্ভ হলো। মাঝখানে আইয়া হাবিল-কাবিল। এক ভাই আরেক ভাইকে যখন মারলো। এক ভাইকে শয়তান বললো, তোমার পিতা-মাতাকে দেখতে চাও? কয়- হ্যা দেখতে চাই। শয়তান কয়- দেখলে ভক্তি দিবা তো? কয়- হ্যা দিব। তখন দেখাইলো, পরে একটা ভক্তি দিয়া দিলো। এরপরে মুসলমান কিছুটা, ইচ্ছা কইরা না, পরিস্থিতির শিকার হইয়া তখন তারা এদিক-সেদিক হয়ে গিয়েছিলো। আজর ছিলো কে? ইব্রাহিম খলিলুল্লাহর পিতা। আজর না, তাঁর নাম ছিলো তারেক। কোরানে প্রমাণ আছে, আজরের নাম ছিলো তারেক। আজর কেন বলতো, সে মুসলমানই ছিলো। পরিস্থিতির শিকার, তাই ইংলিশে একটা কথা আছে, 'ডিমান্ড অব সিচুয়েশন'। ঐ পরিস্থিতির শিকার হইয়া উনি মূর্তি বানাইতো। এই মূর্তি বানাইলে, সমস্ত মূর্তিরা তাঁর সাথে কথা বলতো বিধায় তাকে বলতো মূর্তির পিতা। আজর শব্দের অর্থ মূর্তির পিতা। এইবার চিন্তা করেন, মূর্তিকে কথা বলাইতে পারেন কারা, একমাত্র মুসলমান। খাজা বাবা মূর্তিকে কথা বলাইয়া ছিলেন, মুসলমান। খাজা বাবার

পির উসমান হারুনি মূর্তিকে কথা বলাইয়া ছিলেন, মুসলমান। মুসলমানরাই পারে একমাত্র মূর্তিকে কথা কওয়াইতে। এইবার কয় বাহারাম বাদশা যেন নিজের মেয়ে বিয়া করলো? যে বিয়া করছে সে মুসলমান না। মুসলমানে নাই সে নিজের মেয়ে বিয়া করায়। মুসলমান ছিলো, কোন লোভে পইরা সে নিজের মেয়েকে বিয়া করাতে সে ইসলাম থেইক্যা খারিজ হইয়াছিলো। মাফ পাইলো কিভাবে? এক মহিলা দুইটা সন্তান, সেই দুইটা সন্তান খিদায় ছটফট করতেছে। চাইর পাঁচ দিন হইয়া গেল। ঐ মহিলা চিন্তা করলো বাহারাম বাদশার কাছে যাই, তাইলে যদি কিছু আইনা আমার সন্তানদের খাওয়াইতে পারি। এবার কয় না, বাহারাম বাদশার কাছে যাব না। অর চেহারাও দেখা ঠিক না। এইভাবে কয়েকবার চিন্তা করার পরে, ঐ মহিলা যখন অন্যদিকে চলে গেল। লোকের মুখে শুনতে পাইল বাহারাম বাদশা এই খবর। সে কী করলো, রাজকীয় খানা নিয়া ঐ মহিলার ঘরে থুইয়া আসলো। মহিলা আইসা দেখে খাবার, সুস্বাদু খাবার। সন্তানদের খাওয়াইলো, খাওয়ানোর পরে আল্লার কাছে ফরিয়াদ করেছিলো, আল্লাহ কবুল করে গেল। আপনে শুনেন নাই? আমার আল্লাহ বলেছেন, আমি ঐ ব্যক্তির কাছে ঋণী, যেই ব্যক্তি এতিমের মাথায় হাত বুলিয়েছে। তাই আল্লায়ই এই ব্যবস্থা করেছিলো মাফ কইরা দেওয়ার। তাই আল্লাহ মাফ করে দিয়েছিলো। তখনই মুসলমান হলো। এই তো আপনার কথা ছিলো আর তো কিছু নাই। বাহারাম বাদশার কথা বললেন, এইবার দেখেন চিন্তা করে, সে কে? কিন্তু আপনাকে হয়তো আর পাব না আজকের আসরে, পাইলে অনেক কিছুই বলতাম। কিন্তু আজরের কথাটা যে বললেন, আমি ইব্রাহিম খলিলুল্লার কথা বললে তাতে আপনার রাগ হয় কেন? সেও তো মুসলমান। ইব্রাহিম খলিলুল্লাহর পিতাও মুসলমান। আজর, তার নাম তারেক। আপনে মনে করেছেন আজর বুঝি হিন্দু, দাদার নাম কমু। না, এই রকম না। আজরের নাম অইল তারেক। কথা আপনার ভালোই অয়, কিন্তু কথা ‘এই যে, এই যে’-এর মত অইয়া যায় গা। ‘এই যে, এই যে’ কী? একটা ছেলে, একটা মেয়েরে দেইখা পছন্দ করছে। মেয়েটার বাবা-মা কোটি ট্যাহার মালিক। তো তখন ঐ ছেলেটা, মেয়েটার বাড়ি যায়, গিয়া অর বাবা-মার সামনে হুদাই প্যাচাল পারে। কয়- আমি না অনেক লেখাপড়া জানি। বাংলাদেশ সরকার আমারে বিদেশ পাঠাইবার চায়, আমি যাই না। তিন বার তো খালি ঢাকা-গাবতলী থেইকা ফেরত আইছি। এই রকম কইতে কইতে, মেয়ের বাপ-মা মনে করছে ছেলেটা তো অনেক শিক্ষিত। অর কাছে আমার মেয়ে বিয়ে দিলে, মেয়ে সুখে থাকবো। বিয়া দিছে, বউ নিয়া চইলা গেছে। আবার যহন বেড়াইতে আসছে। হঠাৎ কইরা শ্বাশুরির মনে অইছে, আরে আমার জামাই না লেখাপড়া জানে। আহ্হা আমাগো উত্তর পাড়ার কবিতার ভাই কী সুন্দর পুঁথি পইড়া শুনাইতো। লোকটা অনেক দিন ধইরা নাই। তা আমার জামাই তো লেখাপড়া জানে, জামাইর কাছে পুঁথিটা শুনতে পারি। পুঁথি জামাইর কাছে দিয়া কয়, জামাই পুঁথিটা শুনাইও। এইডা কইয়াই, পাড়া-প্রতিবেশি গো কাছে গিয়া কয়, আজকে আমাগো বাড়িতে যাইও। কয়- কেন? কয়- আইও, কেন যাইতারো না। কয়- কির লিগা? আরে আইজকা আমাগো জামাই

পুঁথি পড়বো। ওহ্ নতুন জামাই, এমনেও যাইতে অয়, পুঁথিডা শুইনা আমু। ভালোই তো অইছে। সন্ধ্যার পর সবাই আসছে, বসছে। একটা চেয়ারের ভেতরে জামাইরে বসাইছে, পুঁথি নিয়া দিছে। জামাই করছে কী, পুঁথি উল্টা কইরা ধইরা অনেক ক্ষণ চাইয়া রইছে। কারণ এ তো লেখাপড়া জানে না, ধরা খাইয়া গেছে নি। এইবার শ্বাশুরি কয়- জামাই শুরু কর। এই বার জামাই সুর দিছে,

(গান)

আ গো এই যে, এই যে, এই যে,

এই যে, এই যে, এই যে,

এই যে, এই যে, এই যে গো,

আ গো এই যে, এই যে, এই যে,

এই যে, এই যে, এই যে গো,

এই যে, এই যে, এই যে এ এ এ ॥

এক বুড়ি কয়- কী গো, আমাগো কবিতার ভাই পুঁথি পড়ছে, কী সুন্দর মজা লাগছে। তোমার জামাই তো খালি এই যে, এই যে-ই কয়। আর যে কিছু কয় না ! কয়- চপ কথা কইও না। আমাগো কবিতার ভাই প্রথম থ্যা ধরে নাই। আমাগো জামাই প্রথমে থ্যা ধরছে। এইবার জামাইরে কয়- জামাই তিন-চাইরডা পাতা উল্টাইয়া সুর দাও। এহন তিন-চাইর পাতা উল্টাইয়া সুর দিছে। 'এই যে, এই যে, এই যে...' (গানের সুরে)। ব্যাপার হইলো আপনার কথা এই যে, এই যে-এর মতন অইয়া গেছে। (মালেক ও শংকর, ১৯৯৮ : পরিবেশনা)

১.৫ মমতাজ বেগম ও লতিফ সরকার পরিবেশিত শরিয়ত-মারফত পালার অংশবিশেষ

মারফতপক্ষের গায়েন মমতাজ বেগম :

(গান)

মারফত হয় বিশ্ববিদ্যালয় বুঝবে কী তত্ত্ব,

শরিয়ত প্রাইমারির ছাত্র, শরিয়ত প্রাইমারির ছাত্র ॥

ফকিরের সাথে দিবে যে আড়ি,

এমন বাপের ব্যাটার জন্ম হয় নাই যায় চেলেঞ্জ করি,

কারণ ফকির করে আল্লাহর জিকির রয় ধ্যানে মত্ত ॥

তুমি হইলে শরিয়তের বাঘ,

আমি মারফতেরই সিংহ হইয়া ভাঙবো মুখের দাঁত,

ভয় পাইলেও পাইবা না মাফ কাঁদলে দিন-রাত্র ॥

মমতাজের ঝুলায় আছে যেই পুঁজি,

ঝোলার মুখ খুলিলে তোমায় পাইবা না খুঁজি,

শেষে কাঁদিবে মায় পাগল সাজি আয় আমার পুত্র ॥

মমতাজের প্রশ্ন- প্রথমবারের মত তারে করিব জিজ্ঞেস, আমি কিছু প্রশ্ন করি, লাগে না য্যান দৌড়াদৌড়ি, দৌড়াদৌড়ি মানে পায়ে দৌড়াদৌড়ি না। জ্ঞানের একটা দৌড়াদৌড়ি আছে, অবশ্যই এটা লাগতেও পারে। জ্ঞানের দৌড়াদৌড়ি না করলে সঠিক জবাব সে আমারে দিতে পারবে না। আমার প্রথম প্রশ্ন আপনাকে, শরিয়তের আলেম আপনি 'বিস্‌মিল্লাহ' নিয়ে আমি প্রথম প্রশ্ন করতে চাই। আপনি শুধু বলবেন, এই যে বিস্‌মিল্লাহ, এই বিস্‌মিল্লাহটা প্রথম কোন দিন, কিভাবে এটা নাজিল হয়েছে। কার ওপরে নাজিল হয়েছে? আল্লাহ কেন নাজিল করেছেন? বিস্‌মিল্লাহর আগে কিছু ছিলো কিনা? যদি বলেন যে ছিলো, বিস্‌মিল্লাহর আগে এই শব্দটার, এই জায়গাটায় কোন শব্দ ব্যবহার করা হতো? আপনার জানা থাকলে এই বিস্‌মিল্লাহর মিমাংসাটা প্রথম দিবেন। তারপর সামনে দেখা যাক, কার কী পুঁজি আছে?

শরিয়তপক্ষের গায়েন লতিফ সরকার : শরিয়ত নাকি প্রাইমারির ছাত্র, মারফত বিশ্ববিদ্যালয়, এগুলো আপনার এখনও মনে আছে? এমন একজন শিল্পী সে পারে না কোনো গান নাই! সে আলুর গান, মাছের গান, গাছের গান, মানে পারে না এমন কোনো গান নাই। আমাকে যে কথাগুলো বলে গেছে, আমার বসে থাকতে খুব কষ্ট হয়ে গেছে। কারণ তিনি বলেছে মারফত বিশ্ববিদ্যালয়, শরিয়ত প্রাইমারির ছাত্র। এই যে প্রথম স্কুলের মধ্যে গিয়া স্বরবর্ণ, ব্যাঞ্জনবর্ণ, এই শিক্ষা যদি না হইতো আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী হইতে পারতেন না। বাবা যতই বৃদ্ধ হোক না কেন? সন্তান কী বলে বাবা যেহেতু বুড়া হয়ে গেছে, নতুন কইরা জোয়ান দেইখ্যা, একটা বানাই লই। এইটা হয় না, বাবা তো বাবাই। মাস্টার, মাস্টারই। প্রাইমারি স্কুলের স্বরবর্ণ, ব্যাঞ্জনবর্ণ, আপনি বিশ্ববিদ্যালয় যান, কলেজে যান, যেখানেই যান, ঐ প্রাইমারি স্কুলের স্বরবর্ণ, ব্যাঞ্জনবর্ণ ছাড়া আপনি লেখাপড়া করতে পারবেন? পারবেন না। আর আরেকটা কথা বলি, এই প্রাইমারি স্কুলের মধ্যেই হাইস্কুল আছে, এই প্রাইমারি স্কুলের মধ্যেই কলেজ আছে, এই প্রাইমারি স্কুলের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয় আছে। যদি কেউ বুঝতে পারে। আপনাকে বুঝাবো ধীরে ধীরে। এইবার বলে, আমি হইলাম সিনিয়ার। ঐ যে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর আমাকে প্রাইমারি বলেছে! সেই জন্য আপনাকে একটা কথা বলি, একজন আলেম ছিলো শরিয়তের কাজি, মারফতের ফকিরকে বলেছে, ফকির তুমি বড় বড় মুছ রাখছো, মুছ কেটে ফেলো। বলে যে না, আমি মারফতের ফকির, ঐ যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহাদুরি দেহাইছে। এই মুছ কাটা

যাবে না। শরিয়তের আলেম বলেছে, আমি শরিয়তের কাজি। তোমার মুখের এই বড় বড় মুছ আমি রাখবো না। কারণ মুছ ধোয়া পানি খাইলে এইটা মাকরুহ হইয়া যায়। কাজি বলেছে, আমি কাটবো, আর মারফতের ফকির বলেছিলো আমি কাটতে দিব না। যার নাম বোয়ালি কালান্দার শাহ্। তখন শরিয়তের কাজি ক্যাচি এনেছিলো, তখন মারফতের ফকির বলেছিলো বোয়ালি কালান্দার শাহ্, হে শরিয়তের কাজি তুমি একবার আমার বগল তলায় চেয়ে দেখো। আর শরিয়তের কাজি ঐ বোয়ালি কালান্দারের বগল তলার মধ্যে চেয়ে দেখে, এই বোয়ালি কালান্দারের মুছ আল্লাহর আরশের পায়ার সাথে প্যাচ দিয়া জিকির করে আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু। শরিয়তের কাজি কয় মস্ত বড় ব্যাপার! যে মুছ আল্লাহর আরশের পায়ার মধ্যে জিকির করে, আল্লাহু আল্লাহু ঐ মুছ আমি ক্যামনে কাটি। শরিয়তের কাজি বলে আল্লাহ, আমি যদি নায়েবে রাসুল আলেম হইয়া থাকি, তুমি ফকিরকে কিছু দেখাও। শরিয়তের কাজি বলে, হে ফকির তুমি আমার বগল তলায় চেয়ে দেখ, বোয়ালি কালান্দার শরিয়তের কাজির বগল তলায় চাইয়্যা দেখে, ঐ যে আল্লাহর আরশের পায়ার নিচে মুছ প্যাচ দিয়া জিকির করে আল্লাহু আল্লাহু। ঐ আরশের উপরে যে মুছ, ঐ মুছের চাইর আঙ্গুল উপরে শরিয়তের ক্যাচি গিয়ে কয়, তোরে আমি কাটুম, তোরে আমি কাটুম, তোরে আমি কাটুম। তাতে আমারে প্রাইমারির দাও বানাইয়া, যতই বিশ্ববিদ্যালয়ে যান, আর যেখানেই যান, তার চাইর আঙ্গুল উপরে আছে শরিয়তের ক্যাচিটা।

(গান)

ভেবেছিলাম ‘ফু’ মারিলে যাইবো ফকির উইড়া,
এখন দেখি আমার মাথায় পড়ছে ফকির ঘুইরারে,
(হায় হায়) আমার তীর, আমার বুকে দিছে মাইরারে ॥
অনেক দিন পর পাইছি মারফতের খাঁটি এক ফকির,
দশটা লক্ষণ কইতে পারলে হইবা ভক্তের তীর,
(হায় হায়) ছয় লতিফার আছে জিকির জবাব দাও আমারেরে ॥
গানের মধ্যে প্রশ্ন শুনি মুখটা করছে কালা,
কাঁদলে ছাড়বো না ফকির বাড়াই দিমু জ্বালা,
(হায় হায়) খুললে তোমার কলবের তালা গলায় দিব মালারে ॥
দেহের মধ্যে আছে তোমার বার ইস্টিশন,
ভেদের কথা কইলে হবে সঠিক মহাজন,
(হায় হায়) কয় লতিফে দাও বিবরণ নইলে উপায় নাইওরে ॥

যাহোক, তিনি আমার কাছে প্রশ্ন করেছেন সুন্দর একটি কথা। বিস্‌মিল্লাহ্‌র আগে কী ছিলো? যখন বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম ছিলো না, তখন ছিলো 'বিইসমি রাব্বি'। আরেকটা দলিলের মধ্যে বলা হয়েছে 'আল্লাহুমা বিইসমি'। (মমতাজ ও লতিফ, ২০১৫ : পরিবেশনা)

১.৬ আব্দুর রশিদ সরকার ও মমতাজ বেগম পরিবেশিত আদম-শয়তান পালার অংশবিশেষ

শয়তানপক্ষের গায়েন মমতাজ বেগমের প্রশ্ন : আপনার কাছে আমার সর্বপ্রথম একটা প্রশ্ন থাকবে, আপনে শুধু বলবেন আদম কয় প্রকার? এবং উহা কী কী? এবং আজকে যে আপনি পালা করতেছেন, কোন আদম হইয়া পালা করতে চান? এই প্রশ্নটার উত্তর আমি জানতে পারলেই বুঝতে পারবো, আপনে আমার সাথে পালা করার যোগ্যতা অর্জন করছেন কিনা? দ্বিতীয় প্রশ্ন, এই যে পালা করার যোগ্যতা অর্জন, এই কথাডা যে আমি বললাম, কারণ আদমের একটা স্তর আছে। আদি আদম যাকে বলে, সেই আদি আদম হইতে হইলে অনেকগুলি সাধনার প্রয়োজন, আপনার মইধ্যে সেই সাধনাগুলি আছে কিনা? আপনার কাছে আমার প্রশ্ন। এই আদি আদম হইতে হইলে যেই সাধনার প্রয়োজন হয় সেই সাধনাগুলি কী কী? কী সাধনা করলে সেই আদি আদম হওয়া যায়? এই দুটি প্রশ্ন, আশা করি আপনে সুন্দরভাবেই তার মিমাংসা দেওয়ার চেষ্টা করবেন।

আদমপক্ষের গায়েন আব্দুর রশিদ সরকারের উত্তর : আমার কাছে প্রশ্ন করেছে, আদম কয় প্রকার? আদম পাঁচ প্রকার- আদি আদম, বুনি আদম, বাণী আদম, সফি আদম, দমসে আদম। আদি আদম- খোদা নিজেই খোদ খোদা, দমসে আদম- যে দমের সঙ্গে আছে, সফি আদম- আরশে মহল্লায় যার ছবি...আর বাণী আদম হলো- কলবের ভিতরে যে রূহ আকারে যে দেওয়া হয়েছিলো, আল্লার বাণী হিসেবে, হুকুম হিসেবে ঐটা হলো- বাণী আদম। আর বুনি আদম- আদমের বুনিয়াদ হইতে যারা পরস্পর জন্মগ্রহণ করেছে, তারা হলো বুনিয়াদ আদম। এখন প্রশ্ন করেছে, আদি আদম হইতে গেলে, কী সাধনার প্রয়োজন? আদি আদমকে আল্লাপাক আমানত হিসেবে ইনসাফ দিয়েছে, সেই ইনসাফ করে যেই ইনসান, ইনসাফ করে চলতে পারে, আমার আল্লা বলেন, তিনি আমার আদমে আইস্যা পৌঁছতে পারে। অর্থাৎ আমার জাতের সঙ্গে পৌঁছতে পারে। তাই যখনই তুমি চলো, উঠতে-বসতে-খাইতে-শুইতে সাধনার ক্ষেত্রে রাজনীতির ক্ষেত্রে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে, দৈহিক ক্ষেত্রে, সমস্ত ক্ষেত্রে যিনি ইনসাফ করে চলতে পারেন, তিনিই কেবল আদিতে পৌঁছতে পারে, আদতে পোঁছতে পারে। এই আমি কথার জবাব দিলাম। (মমতাজ ও রশিদ, ১৯৯৫ : পরিবেশনা)

১.৭ আব্দুর রশিদ সরকার ও মমতাজ বেগম পরিবেশিত নারী-পুরুষ পালার অংশবিশেষ

পুরুষপক্ষের গায়েন আব্দুর রশিদ সরকার :

(গান)

সুন্দরী সাজিয়া, সুন্দর খুঁজিয়া,

যৌবন কর সুন্দর, যার যার স্বামীরই ভজন ॥

শুনলো যুবতী-বক্ষিল, লাগবে না তোর স্বাক্ষী উকিল,

একজন রইয়াছে দাখিল জীয়ন আর মরণ,

এবার বাদ দেগা কলেমার ঘটা, লাগবে না তোর হলদি কুটা,

হিয়াতে হিয়া মিশাইয়া রাইখো সর্বক্ষণ ॥

শিশুকালে সাজি বসে, শুধুমাত্র রঙ্গে মিশে,

যৌবনকালে সাজি বসে পাইতে রমণ, একজন রমণের কারণ,

যেমন বুড়ি যাইয়া নিকা বসে, মনেরই হায়হুতাশে,

কোন দিন যেন যমে এসে তারে করে লয় বন্ধন ॥

আজকে তোমার-আমার সঙ্গে মেয়ে-পুরুষের পালা। প্রতিপক্ষের গায়িকা মমতাজ আর আমি আ. রশিদ সরকার। পালা চলছে মেয়ে আর পুরুষ। তোমার কাছে আমি প্রথম আসরে একটা প্রশ্ন করবো। তুমি বলতো পৃথিবীর মধ্যে নামজাদী এমন একজন নারী ছিলো যে নাকি কয়েক হাজার বৎসর তার স্বামীকে গর্ভে করে রাইখা পরবর্তীতে সে ঐ স্বামীর সঙ্গেই বিয়ে বসেছে। এই মেয়েটা কিরা আর স্বামীটা কিরা? এই গর্ভটা তার কোথায় হয়েছিলো এবং এই গর্ভটা কার দ্বারা হয়েছিলো?

(গান)

নিকা বইসো যথাতথা বেইচো না কেউ বেচা মাথা,

তা না হইলে গুনাখাতার মাফ নাই আর কখন,

ও তুই কোথা হতে কোথা যাবি, কার সেবার ধন কারে দিবি,

নইলে চোখ বাঁধা বলদি হবি জনমের মতন ॥

সুন্দর গুরুচরণ কর্মকার বাড়ি, সুন্দর অলংকার গড়ি,

ঠিকভাবে করিও স্বামীর মহিমা ধারণ।

তোমার স্বামীর নামের চন্দ্রের হার, গলেতে পড়িয়া এবার,

ঠিকভাবে করিও তার মহিমা ধারণ ॥

আব্দুর রহিম কয় ভাবিয়া, শোন মোর মুর্শিদ পিয়া,

মহরটা বান্দিয়া লও তোমার স্বামীর দুই চরণ।

ওগো ওয়াজেদ শাহ কয় বারে বারে বোকা রহিম কইরে তোরে,

সানজরটা সুনজরে রাইখো সর্বক্ষণ ॥

নারীপক্ষের গায়েন মমতাজ বেগম :

(গান) ওরে বিশ্বমাতার রয় অধিকার,

ওরে মন পাপী উদ্ধার রোজ হাশরে,

মেয়ে জগতের প্রধান, পাক সোবহান মা বলেছে ফাতেমারে ॥

মেয়ের হাতে বেহেস্তের ডুরি হাদিসে আছে প্রমাণ,

মার নাম ধরে হাশরে ডাকবে আল্লাহ সোবহান,

মেয়ে সবার আগে বেহেস্তে যাবে নিদানে কয়াশ দিবে,

বিচার করে দেখ ভেবে মেয়ের মত নাই সংসারে ॥

সম্মনিত শ্রোতামণ্ডলী, আজকে আমাদের মেয়ে-পুরুষ পালা, আমার বিপক্ষের শিল্পী আ. রশিদ সরকার সাহেব। উনি আমার কাছে কিছু কথা রেখে গেলো এবং একটা প্রশ্ন করে গেছে। প্রথমবার একটা গান গাইলো 'সুন্দরী সাজিয়া, সুন্দর খুঁজিয়া/যৌবন কর সুন্দর, যার যার স্বামীরই ভজন...'। যাইহোক, শ্যাষে পাইলাম যার গানটা লেখা, সে বলেছে 'ওয়াজেদ শাহ কয় বারে বারে বোকা রহিম কই তোমারে।' আইচ্ছ্যা, এখানে পুরুষ, আরেকজন পুরুষকে বলতেছে, 'সানজরটা সুনজরে রাইখো।' আইচ্ছ্যা, একজন পুরুষ তো মেয়েকে বলতে পারে। কিন্তু কেন ঐ পুরুষকে বললো? এইটা একটা বলার ব্যাপার আছে। কারণ শুধু মেয়েই নয়, এই যে পুরুষ, এই পুরুষও কিন্তু মেয়ে। কিভাবে মেয়ে, সে আল্লার কাছে মেয়ে। যতক্ষণ পর্যন্ত একটা মেয়ে না সেজে ইবাদত করবে, ততক্ষণ আল্লার দরবারে ইবাদত পৌঁছাবে না। একটা মেয়ের রূপ ধরে, মেয়ের একটা ভাব ধরে, স্বভাব ধরে তারপর আল্লার সেই সাধন-ভজন করতে হবে। তাই তার পির কেবলা তাকে বলেছে, 'ওয়াজেদ শাহ কয় বারে বারে বোকা রহিম কই তোমারে।' এইবার আমার কাছে প্রশ্ন করেছে, কয়েক হাজার বৎসর একটা মেয়ে, একটা সন্তান রাখছে প্যাটে। তারপর তাকে প্রসব করে তার সাথে বিয়্যা বসছে। এই যে কথাটা বললেন, একটা মেয়ের গর্ভে সবকিছু, সবাই আপনারা যারা হইছেন, সবই হইলো আমার মেয়ের গর্ভে। এই যে প্রশ্নটা করলেন আপনে, লইজ্জা হইলো না? আমার মনে হইতাছে আপনার শরম-লইজ্জা বলতে কিছু নাই ! হাজার হাজার প্রশ্ন থাকতে আপনে কেন প্রথম স্টেজে

এই প্রশ্নটা করলেন? শুইনা রাখেন, আপনে যেইভাবে প্রশ্ন করছেন, কার জন্মে কী অত কিছু না। এই যে আমি যার নামে গানটা গাইতেছি সেই হইলো, সেই ব্যাক্তি। সে ফাতেমা, আল্লায়ও যারে মা কইছে। বিশ্বজগতের সবার মা, সেই ফাতেমা। এই ফাতেমা হযরত আলিকে প্যাটে রাখছে। কিভাবে? আমরা যেভাবে রাখি এইভাবে না। যখন নাকি ডিম্ব আকারে ছিলো, তখন ডিমের উপরের খোসা ছিলো মা ফাতেমা, আর হযরত আলি ছিলো ডিমের ভিতরে। ঐ তখন রাখছিলো প্যাটে। যখন নাকি ডিম ফেটে যায়, পাক-পাঞ্জাতন বাইর হয়। ঐ পাক-পাঞ্জাতন দুনিয়ায় আইসা আবার হযরত আলির সাথে মা ফাতেমা বিয়া বসে। এই তো কথা। কিন্তু আপনার লইজ্জা হইলো না, এই প্রশ্নটা করার জন্য? দেখেন তো কোন জাগার প্যাচ কোন জাগায় লাগছে। আমার মেয়ের প্যাটে আপনার পাক-পাঞ্জাতন সব লুকাইয়া ছিলো। এই মায়াজাত না থাকলে আপনারা তো বরবাদ অইয়া যাবেন বুঝেন না?

(গান)

ওরে মেয়ের প্যাটে পাক-পাঞ্জাতন জন্ম নিল এই ধরায়,

সেই কারণে মহৎজনে ভক্তি করে মেয়ের পায়,

ওরে মেয়ের কাছে অমূল্য ধন যে নিয়েছে করে সাধন,

সে হইয়াছে প্রেম মহাজন মরণের ভয় গেছে দূরে ॥

এইবার তার কাছে আমার প্রশ্ন ছোট্ট কইর‍্যা, সর্বপ্রথম বলবেন, দেইখেন আমার প্রশ্নের ধাঁচগুলি। আপনাকে কুরান মোতাবেক একটা প্রশ্ন করবো। আপনে শুধু বলবেন, এমন একটা পুরুষ ছিলো, সে মেয়েকে বিয়ে তো দূরের কথা, পাওটা দেখার জন্য লক্ষ লক্ষ ট্যাকা সে খরচ করেছিলো। এটা কোরানে প্রমাণ করেছে। আপনার কাছে আমার প্রশ্ন সেই পুরুষটা কে এবং কোন মেয়ের পাও দেখার জন্য সে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ট্যাকা সে খরচ করেছে। কেন করেছে? বিয়ে তো দূরের কথা শুধু পাও দেখার জন্য। চিন্তা কইর‍্যা দেখেন গ্যা কোন পর্যন্ত গেছে। এইট্যা কম ইনজেকশন না ! দেখেন গ্যা। দিছি একটা দিয়া। বুইজ্যা দেইখেন।

(গান)

ও তাই মেয়ের গর্ভে জন্ম লইয়া কমলকূলে বসিয়া,

মা বলিয়া ভক্তি দিয়া প্রাণ বাঁচাইলাম দুধ খাইয়া,

(ও তাই) কাদের বলে মায়ের মতন দরদী নাই আর কোনো ধন,

ছেলে-মেয়ে করে পালন কত কষ্ট সহ্য কোরে ॥

পুরুষপক্ষের গায়েন আব্দুর রশিদ সরকার :

(গান)

(ওরে) না খাওয়াইয়া খাওয়ায় দেইখা তাইতে একটু আদর করি,

মেয়ের দল পোষা বেড়াল রয় চিরকাল স্বামীর বাড়ি ॥

(আরে) মেয়ের লোকের জাতের ধারা,

তারা সময় পাইলে বেড়ায় পাড়া,

গোপন কথা শুনতে তারা ইচ্ছুক ভারি,

শোনা মাত্র নয় বাড়ি ছড়াইয়া দিব ছেড়ি কিংবা থাকুক বুড়ি ॥

যাহোক, আজকে নারী-পুরুষ পালা। আমাকে প্রশ্ন করেছে, কোন পুরুষ, কোন মেয়ের পাও দেখার জন্য লক্ষ লক্ষ ট্যাকা খরচ করেছিলো? আরে খালি পাও দেখছিলো না, আরো কিছু দেখছিলো। পাওটা কেবল শরিয়তে জারি, মারফতও দেখছিলো। অর্থাৎ রাণী বিলকিস যে রাস্তা দিয়া আসব, ঐ রাস্তার মধ্যে, পানির উপর দিয়া কাঁচ ফিট করে রাখছিলো, যেন পাওটা পানি ভাইবা, পানির উপর যদি কাঁচ ফিট করে তাইলে ঐটা পানির মত দেখা যায়। এই দেইখ্যা কাপড় উচ্যা করছিলো। এটা শরিয়তের কোরানে তো আর বেশি লেখা যায় না। মারফত দেইখ্যা লেখে নাইক্যা। খালি পাও দেখে নাইক্যা, জাগা মতনও দেখছিলো মিয়া। তোমারে আর বেশি কিছু আমি কইলাম না। ক্যাসেটের ব্যাপার অনেক লোকে শুনবো, তাই চিকন কইর‌্যা কইলাম। তুমি খালি জ্ঞান থাকলে বুইজ্যা নিব্যা। (গানের স্থায়ী গীত হয়) আবার আব্দুর রহিম ফকিরের একটা কথা বলছে, কী? আব্দুর রহিম ফকিরও পুরুষ, তার মুর্শেদও পুরুষ। গানটা লেখা একটা পুরুষের তাই তার মুর্শেদকে উদ্দেশ্য করে লিখছে। এখানে মেয়ে-পুরুষের কিছু আসে যায় না। এই কথাডা কইয়্যা খুব একটা জিততে পার নাই। তুমি বলেছো, মায়ের গর্ভে জন্ম নিয়্যা, মিয়া মায়ের গর্ভে জন্ম নিছি, বাপ ছাড়া হইছে নাকি? অ্যা? হাশরের দিন মায়ের নামে ডাকবে এইটা গৌরব করছাও। মায়ের নামে ডাকবে কোন কারণে, তা তুমি জান? কোনো মেয়ে যদি স্বামী রাইখ্যা পরপুরুষে আকাম-কুকাম কইর‌্যা গর্ভে কোনো সন্তান ধরায় তাহলে কাল হাশরের দিন, সন্তানের বাপের নাম ধরে ডাক দিলে ঐ দিন তাঁর স্বামীর কাছে সে লজ্জা পাবে। সেই লজ্জাকে গোপন রাইখ্যা, সেই গুনাকে গোপন রাইখ্যা আল্লাহ পাক বিচার করবে। তাকে ইজ্জত দেওয়ার জন্য তার নাম ধরে ডাকবে। এটা তোমার বড় জেতার কথা না। লইজ্জা করে না? কাজেই তোমাকে বলছি, এই সমস্ত গৌরব কইরো না। (গানের স্থায়ী গীত হয়) তোমার কাছে এখন আমি প্রশ্ন করবো। তুমি সুন্দরভাবে জবাব দিবা? কোনো একটা মেয়ে স্বামীর অভিশাপে মশা হইগেছিলো। সেই মশা থাকা অবস্থায় কাবার ঘরে হজ কইর‌্যা, সে মেয়ে হইয়্যা আবার স্বামীর কাছে আইস্যা মুক্তি চায়। এই মেয়েটা কে, ঐ স্বামীটা কে?

(গান)

মেয়েদের এই রকম অনেক গুণ আছে, মাত্র একটা গুণ চাই পুরুষের কাছে,

মাঝে মাঝে দিয়া রাখেবেন পাতলা বারি,

(ওগো) তা না হইলে ঠিক থাকবে না রশিদ বলে যুক্তি করি ॥

নারীপক্ষের গায়েন মমতাজ বেগম :

(গান)

(ওরে) যা দেখিলে ঝইরা পড়ে সিদ্ধা লোকের মাথার মণি,

মায়া ভুজঙ্গিনী, আমি মায়া ভুজঙ্গিনী ॥

(ভাইরে ভাই) মায়া লোকের মুখের হাসি, দাঁতে চমকায় বিদ্যুৎ আসি,

ধরতে গেলে কাছে আসি তার ব্যথায় জিন্দেগানি।

যেমন আগুনে পতঙ্গ জ্বলে দিবস ও রজনী,

(ও লোভী মন, মন মন মনরে) তথায় লোহা গেলেও গইলা পড়ে কামসাগরের নোনাপানি ॥

সম্মানিত শ্রোতামণ্ডলি, আমার বিপক্ষের শিল্পী যিনি আজকের পুরুষ। তিনি একটা গান গাইলেন, 'মেয়ের দল পোষা বিড়াল রয় চিরকাল স্বামীর বাড়ি।' কোনো ভাড়াইটা যদি বাড়িয়ালারে খেদায়, কেমন দেখা যায়! সে আমারে বলতেছে পোষা বিড়াল, না আমি পোষা বিড়াল না, কাজে-কর্মে দেখা যায়, পুরুষ হইলো মায়াদের পোষা বিড়াল। আপনি তো আন্তাজে কইলেন, কিন্তু আমি আপনারে দেখাইয়া দিতে চাই। যেমন- প্রথম আপনে যখন বিয়্যা কইর‍্যা আনেন, একটা পালকির ভিতরে কইর‍্যা, আপনের মত চাইরজন, এই রকম পোষা বিড়াল চাইরজন, আমারে কান্দে কইর‍্যা আনে। বাড়িতে আইন্যা কত ভজন-সাধন। আরে বাপরে বাপ! তারপর আমি যা বলি, আপনে তাহাই করেন। আমাকে খাইট্যা-পাইট্যা কত কষ্ট কইর‍্যা আপনে খাওয়ান। আপনে রিস্‌কা চালাইয়্যাও খাওয়ান। তারপরে যদি একদিন কই যে আমার পায়ের জুতাড্যা তো ছিড়্যা গেছে। জুতাড্যা মাথায় কইর‍্যা নিয়্যা সাইর‍্যা নিয়ে আসেন ন্যা। পোষা বিড়াল ক্যারা এখন দেখেন চিন্তা কইর‍্যা একটু। ও মিয়্যা কিছু কইন্যা দেইখ্যা নাকি? বেশি জুত পাইয়্যা গেছো। খবরদার ফারদার তুমি আমার সাথে এই রকম কথা বলবা না। তোমাকে হুশিয়ার কইর‍্যা দিলাম। কার সাথে কি বলতেছো। ফাইজল্যামি করার জাগা পাওনা না ন্যা? মেয়ের দল পোষা বিড়াল! কথা বলতে তোমার লইজ্জা হইল না! আমি যুদি এই কথা বলি, তাইলে তার কাইন্টারে কোন কথা বলবে? কারণ কথা পেছনে কথা আছে। সে বলছে সময় পাইলে বেড়ায় পাড়া। আচ্ছা বলেন তো দেখি, সময় পাইলে পাড়া বেড়ামু না, সময় পাইলে এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়ি যায়। এক বাড়ি বইস্যা থাকতে থাকতে হয়তো ভালো লাগে না। আমি তো শুধু এক বাড়ি থেইক্যা আরেক বাড়ি যাই। আর তুমি যে জগৎ ভইর‍্যা ঘুইর‍্যা বেড়াও। কত জাগায় না কোন জাগায় যাও। ঐডি আমি খোঁজ লই। তুমি আমার পাড়া বেড়ান দেখো! আসলে মিয়া অসভ্য, এই রকম অসভ্য পুরুষ না হইলে আমারে

এই রকম কথা বলে নাকি? আমি প্রশ্ন করেছিলাম যে, একটা মেয়ের পাও দেখার জন্য লক্ষ লক্ষ ট্যাকা সে খরচ করেছে, সেই পুরুষটা কে? জবাব দিয়্যা কয়, কোরানের কথা কিন্তু জিজ্ঞেস করছি, সে বলছে যে, পাও দেখছে নাকি আরও অনেক কিছু দেখছে। ও কোরানে যেইটা কইছে, কোরানের উপর দিয়্যা মাদবারি করছো নাকি? দুই পয়সার মোড়গ বাক দিতে চাও পাহাড়ে! অ্যা? বাবার নাম নাই, দাদার নাম নাই, টেম্পুর আলির নাতি। মিয়া কোরানে বলছে, পাও দেখছে শুধু। আর সে বলে আরও কিছু দেখছে। আসলে যে কি করার দরকার। আসলে ঐ যে ফরিদপুরের আয়নাল বয়াতি কইছে, 'বাবা কব কিরে, কবার বলে পারি, বিকায়দার জন্যি কিছু কইন্যা।' ইটু বিকায়দার জন্যি তোমারে কিছু কইন্যা। নাইলে তোমারে অনেক কিছু কইতাম আর কি। কিছু করতাম আরকি তোমারে।

(গান)

তার কমল অঙ্গ রূপের জোরে আদ্যশক্তি অর্জন করে,

ভোলানাথ দেখিয়া যারে হইয়াছে অজ্ঞানী,

(ও লোভী মন, মন মন মনরে) এই মায়ায় অসুর বংশ ধ্বংস করছে ধরিয়া কালফণি,

দিয়া মহাদেবের বুকে পারা ঠিক রাখিলো এই ধরণী ॥

আমি বলেছিলাম যে, মার নাম ধইর‍্যা হাশরে ডাকা হবে। একটা পিন মাইর‍্যা গেছে। কয় মায়ের ইজ্জতের জন্যে মার নাম ধইর‍্যা ডাকবো। এই মিয়া এই কথা যে কইলেন, মায়ের ইজ্জতের জন্য মায়ের নাম ধরে ডাকবো। যদি জারজ সন্তান হয়ে থাকে, বাবার নাম ধইর‍্যা ডাকলে তো ঐ যে মেয়েটা লজ্জা পারে এর জন্য। আপনে এই কথা দিয়ে কাউন্টার দিতে চান, ঐ কথার? ঐ কথার ধাক্কা কী এই কথায় হয়? এই রকম কাজ যদি মায় কইর‍্যা থাকে, তাহলে তার বিচার হবে। ও ঐ জাগা কইলে দোষ অইব, আর বিচার যখন হবে তখন লইজ্জা পাবে না সে? আসলে আপনার এইট্যা কাইন্টারই হয় নাই। মার নাম ধইর‍্যা ডাকবে এখানেই আপনে থাকেন। আপনার কথায় আপনে রায় দেন। ও কাউন্টার দিয়্যা আমার কথা পিছে ফালাইতে চান। মায়ের ইজ্জতের জন্য না? কলা জমাইছেন, জমাইন্যা কলা বাদ দেন। ফাইজলেমি।

(গান)

তাই প্রেম সাধিতে কালায় রামায়ণ-ভাগবত গীতায়,

দেখি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচূড়ায় বসা রাধারাণী।

শ্রীকৃষ্ণের মাথার চূড়ার উপর ছিলো রাধারাণীর নাম। আরে এই পুরুষের ঘরের পুরুষ। কিছু কমু? না থাক, কিছু না কইলাম। আর কৃষ্ণের নাম কোথায় লেখা ছিলো রাধার পায়ের নিচ দিয়্যা। এর চাইয়্যা লইজ্জা কী গাছে ধরে মিয়া

! আমি হইলাম তোমার প্রেমের গুরু। মেয়ে হইল প্রেমের গুরু। এই গুরুকে বাড়িতে নিয়া ভজন-সাধন কর। এই প্রেমের গুরু যুদি না চিন তাইলে তোমার ভজন-সাধন অইবো মিয়া? আবার কয় পোষা বিড়াল! দাঁত ফালাইয়া দেওয়ার কাম এই রকম পুরুষ গো।

(গান)

(ওরে) প্রেম সাধিতে কালায় রামায়ণ-ভাগবত গীতায়,
দেখি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচূড়ায় বসা রাধারাণী।
(ও লোভী মন, মন মন মনরে) মরা বাঁচাইতে পারে মায়া সুভাষিনী,
ভবে তারে কইরা অবহেলা চুবান খাইছে নারদমুনি ॥

প্রশ্ন করেছে, কোন নারী স্বামীর অভিশাপে মশা হয়েছিলো? এবং মক্কা ঘরে হজ কইর‍্যা নাকি সে মানুষ হইয়া আবার আসে। আপনের তো প্রশ্ন করাটাই ভুল হইছে। নাম জানি না ডুগুরে ভাই আইট্যা আয়, নাকি? প্রশ্ন করাই ভুল অইছে। স্বামীর অভিশাপে সে মশা হইছে এটা ঠিক। কিন্তু মক্কা ঘরে হজ করে নাই। মক্কা ঘরে গেছিলো। সেই মক্কা ঘরে যে পাথর আছে, যে পাথরে হাজিগণে চুমে। সেই পাথরের স্পর্শ পাইয়্যাই সে মানুষ অইয়্যা গেছে। তখন হজের কোনো টাইম ছিলো না, বেটাইমে গেছিলো। যাইহোক এই লোকটা ছিলো হাতেমতাঈ, সে ছিলো দাতা। মানে সে দান-দক্ষিণা করতো। ঐ মহিলা সেটা ভালোবাসতো না। কারণ দানটা করতো আল্লার জন্য। যে দান করে, দানশীলকে আল্লাহ ভালোবাসেন। তাই দানশীল হাতেমতাঈকে আল্লাহ ভালোবাসতেন। ঐ মহিলা যখন সেটার বিরুদ্ধে গেছে তখন তো আল্লাহ বেরাজি হয়ে গেছে। যার ওপর আল্লাহ বেরাজি হয়ে যায়, সে তো মশা হবেই। সে তো অভিসপ্ত হবেই। আর আল্লাহ যদি বেরাজি না অইতো তাইলে চৌদ্দ জন ঐ রকম পুরুষের অভিশাপে তার কিছু আসতো আর যাইতো না। আল্লাহ বেরাজি হইয়েগেছিলো তাই।

(গান)

(ওরে) মেয়ের কাছে পড়ছে ধরা কত পুরুষ ছাগল-ভেড়া,
হইয়া সব দিশাহারা খাইছে ঘোলাপানি।

এইবার তার কাছে আমার প্রশ্ন আপনে জবাব করবেন। কোন পুরুষ একটা মেয়েকে নিন্দা কইর‍্যা, চল্লিশ জন পুরুষের গর্ভ হইয়্যা গেছিলো? একটা মেয়ে নিন্দা কইর‍্যা। আমার প্রশ্ন সেই মেয়েটা কে? সেই চল্লিশ জন পুরুষ কী নিন্দা করেছিলো? যার জন্য গর্ভ অইয়া গেছে চল্লিশ জন পুরুষের ! জবাবটা দিয়েন তাইলে টের পাইয়া যাইবেন, কোন পর্যন্ত গেছে।

(গান)

মেয়ের কাছে পড়ছে ধরা কত পুরুষ ছাগল-ভেড়া,

হইয়া সব দিশাহারা খাইছে ঘোলাপানি।

মাতাল রাজ্জাকে কয় গরম জলে খাল বাকলা থাকে নি,

আমি দেখলাম কত শত শত চোখ বাঁধা বলদের ঘানি ॥

বলছে কী, 'মেয়েদের এই রকম অনেক গুণ আছে, মাত্র একটা গুণ চাই পুরুষের কাছে,

মাঝে মাঝে দিয়া রাখেবেন পাতলা বারি।' এই মিয়া তুমি জান, যেই পুরুষ নারীকে মারে সেটা কেমন পুরুষ। আসলে সে পুরুষটা খুব খারাপ। সে ভালো নয়। কোনো অলি-আল্লাহ, নবি-অলি-পয়গম্বর, এদের মইধ্যে কী দেখেছেন তাঁর স্ত্রীকে মারছে? আমার হযরত মুহাম্মদ (স.) উনার ছিলো ১৪ জন বউ। সে কী কোনো দিন তাঁর স্ত্রীকে মারছে? মারে নাই। আপনে যে মারতে চান, এইটাই অসভ্যের কারবার। (গানের স্থায়ী গীত হয়)। (রশিদ ও মমতাজ, ১৯৯৫ : পরিবেশনা)

১.৮ নারী-পুরুষ পালার নারীপক্ষের একটি গান

মাসে মাসে জোয়ার আসে ত্রিবেণী সঙ্গতেরে,

মেয়ে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীরে ॥

(আরে) যেদিন নদী হয় উতালা তিন দিনে হয় মেয়ের খেলা,

একদিন কালা একদিন ধলা একদিনে লালমতি,

সেই নদীতে স্নান করিলে হবি গৌরাঙ্গ মুরতিরে ॥

(আরে) এই মেয়ের গুণকে বলতে পারে কিঞ্চিত জানে মহেশ্বরে,

দুইজন বুকে একজন শিরে ফিরছে বসুপতি,

ও তার সাক্ষী আছে গোপের মেয়ে যার গোকূলে বসতিরে ॥

(আরে) এবার মইলে মেয়ে হব প্রেম সাগরে সাঁতার দিব,

মহৎ সঙ্গ বেছে নেব প্রেমের রীতিনীতি,

ও গোঁসাই হাওরে বলে না রাখিব বংশে দিতে বাতিরে ॥ (আকলিমা, ২০২১ : পরিবেশনা)

১.৯ কাজল দেওয়ান ও শেফালী সরকার পরিবেশিত বাবা-মা পালার অংশবিশেষ

মাপক্ষের গায়েন শেফালী সরকার : আজকে মা-বাবার কিছু কথা বোলে যাতে আপনাদের আত্মার কিছু খোরাক দিতে পারি। আমি যতটুকু জানি, আজকে যেহেতু আমি মায়ের পালা নিয়েছি, আমি কোনো বিতর্কে যাব না। তবে ততটুকু বুঝাইতে চাইব, সন্তানের প্রতি মায়ের যতটুকু দায়িত্ব-কর্তব্য মা পালন করে। সামাজিকভাবে বাবা সেটা করে কিনা? এটা আপনারা বিবেক-বিবেচনা করে দেখবেন। আমি শুধু চাপার জোরে পুঁথি পড়বো না। তাই আমি সর্ব প্রথম একটি গান গাব এবং সে গানের মধ্যে কিছু কথা আছে। আপনারা খুব মনোযোগ সহকারে শুনবেন। এই যে মা, এই মা শব্দটি এমন একটা শব্দ, কিছুদিন পূর্বে একটা জরিপ করেছে, সারা পৃথিবীতে সব চাইতে ছোট শব্দ মা। যত জাত আছে, যত ধর্মের লোক আছে, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান-মুসলিম-ইহুদি-নাসারা। সর্বোপরি, সর্ববিষয়ে দেখা গেছে, তারা আলোচনা-গবেষণা করে দেখছে, একটা সংক্ষিপ্ত শব্দ, এই শব্দটার মধ্যে এত মধু, এত ভালোবাসা, এত প্রেম, যা আর কোনো শব্দের মধ্যে নাই। আর সেই শব্দটা হলো 'মা'। মা বলে ডাকলে সন্তানের হৃদয় শান্তি পায়। কলিজা ঠান্ডা হয়। তাই এই দিকে লক্ষ্য করে আমার একটি গান-

মায়ের দুধের মত এমন নিয়ামত আর নাই,
ভাই মা শব্দের মত এমন মধুর শব্দ নাই ॥
যত রকম প্রেম-পিরিতি পৃথিবীতে রয়,
সবচেয়ে উত্তম প্রেম মায়ের সাথেই হয়,
সেই মায়েরে বড় হয়ে কেমনে ভুলে যাই ॥
মা যতদিন ঘরে থাকে ঘর থাকে আলো,
মা মরে গেলে ঘরের আলো নিভে গেলো,
মা বিহনে আমারে কে বুকে দিবে ঠাঁই ॥
মা হলো অমূল্য রতন খোদার দেওয়া দান,
পৃথিবীতে মায়ের মত নাই কিছু সমান,
এমন সম্পদ আব্বাস দেওয়ান খুঁজে না আর পাই ॥

তাই আমি বলতে চাই, আমার প্রতিপক্ষ শিল্পী জনাব কাজল দেওয়ান, যিনি বাবার ভূমিকায় গান করবেন। আমি এতটুকু আপনাকে বলতে চাই, আমি যে গানটি গেয়ে আপনাকে শুনাইলাম, 'মা শব্দের মত এমন মধুর শব্দ নাই।' মা নামটা শুনলেই সন্তানের হৃদয়ের মধ্যে একটা ঝাকি মারে, একটা প্রেম জাগে, একটা মহাব্বত জাগে। বাবা শব্দ শুনলে কিন্তু তেমনটা লাগে না। এইটা বাস্তবিকভাবে আপনে একটু ভেবে দেখেন তো, শেফালি সরকার যা বললো

ঠিক কিনা? তাই আমি আপনার কাছে ছোট করে প্রথম আসরে একটি কথা আপনার কাছে জানতে চাই। একটা সন্তান যখন ভূমিষ্ঠ হয়, সে সন্তান যখন আস্তে আস্তে বড় হয়। সামাজিকভাবে স্কুল-কলেজ, শিক্ষা-দীক্ষায়, শিক্ষাগুরু-দীক্ষাগুরু, যে গুরুই বলেন না কেন? একজন সন্তানের জন্য প্রথম গুরুটা কে? সে কি মা নাকি বাবা? ...

বাবাপক্ষের গায়েন কাজল দেওয়ান :...মা এবং বাবা আমাদের আজকের বিষয়। আমার প্রতিপক্ষ শিল্পী তিনি আমার কাছে সর্বপ্রথম প্রশ্ন রেখেছেন, অত্যন্ত জটিল এবং কঠিন। তারপরও আমি বলবো যে, না, জটিল-কঠিন যতই হোক না কেন, এটারও একটা মিমাংসা অবশ্যই আছে। একজন সন্তানের জন্য বাবা এবং মায়ের দুইজনের মধ্যে কার অবদান বেশি? আমাকে যদি এই প্রশ্ন কেউ করে, আমি হৃদয় থেকে, মন থেকে বলবো, যে উত্তরটি করবো সেটা হলো দুইজনেই অবদান সমান-সমান। এইটা পুরা সত্য। বাবা সন্তানকে যে দৃষ্টিতে দেখে, মাও সন্তানকে ঐ দৃষ্টিতে দেখে। তবে সন্তানকে লালন-পালন করতে গিয়ে, মা যেমন সংসারের কাজগুলিরে গুছিয়ে করেন। আর বাবার কাজগুলি হলো বাহিরের, সংসারের বাহিরে। উপার্জন করতে হবে। রিক্সা চাইতে হবে, ঠেলা গাড়ি চালাইতে হবে, মাথায় বোঝা নিতে হবে, আমার সন্তান যেন স্কুলে লেখাপড়া করতে পারে, তার মাস্টারের বেতন দিতে হবে, তার স্বাস্থ্যের দিক খেয়াল রাখতে হবে, এই কর্মগুলো হলো বাবার। মায়ের কাজ হচ্ছে সাংসারিক কাজ যেমন- রান্না-বান্না। এই কাজগুলো করার পর যখন সন্তানের খাবারের সময় হবে, তখন সন্তানকে খাবার দিবে। সন্তানকে কাছাকাছি রাখা, শিশু হলে একেবারে কাছে, একটু বড় হলে তাকে একটু দেখেশুনে রাখা। মায়ের চোখে চোখে রাখা, যদি মেয়ে হয় আরেকটু বেশি বেশি দেখে রাখা। মেয়ে যেন পড়শি বাড়ি না যেতে পারে। ছেলে যদি হয় তাকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে স্কুলে ঠিক মত পাঠনো, এইটা হলো মায়ের কর্তব্য। বাবার কর্ম সন্তান স্কুলে গেল কিনা? মাস্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করা, স্কুলে গিয়া তার পড়ালেখার রেজাল্ট কী আসলো এইটা বাবা দেখবে। সেই দৃষ্টিকোন থেকে আমি বলবো মা এবং বাবা দুজনেরই অবদান সমান এবং সমান। এই পৃথিবীর বুকে নাকি মা ডাক বড় সুন্দর। আমিও বলি মা ডাক অত্যন্ত মধুর। তবে বাবা ডাক এইটাও কিন্তু কম মুধুর না।... আমি বাবাকে বাবা ডাকতাম, বাবা ডাকলে মনটা ভইরা যায়। আপনারা বিচারক (দর্শকের উদ্দেশ্যে), বিচার করবেন। যদি কেউ ডাকে ডাকার মতন বাবা, বাবা, বাবা, সুন্দর মধুর লাগে, মজা লাগে। ... আমার ছোট করে একটি গান আসলো, আরো কথা বলেছে, আমি চেষ্টা করবো গানের পরে কথাগুলির জবাব দিতে।

(ওরে) বাবা বাবা বলে ডাকলে, বাবা কী আর থাকে দূরে,
বুকেরই ভেতরে বাবা, আছে এই অন্তরে ॥
যখন তুমি ছিলে বাবা কিবা মায়ের কোলে,
শিশু হতে কিশোর-কিশোরী মনে কী আর পড়ে,

বই-খাতা আর আহার দিতে কত কষ্ট বাবা করে ॥

বাবা চালায় ঠেলা-গাড়ি আবার কাজ করে মানুষের বাড়ি,

সন্তানকে মানুষ করি এই আশায় বুক ভরে,

ওরে নিজে না খাইয়া খাবার, খাইতে দেয় সন্তানেরে ॥

বাবা অমূল্য ধন হিরা-কাঞ্চন, বাবার মত নাইরে আপন,

খুঁজে দেখ বিশ্ব-ভূবন কোথাও পাবি নারে,

বাবা হারাইয়া কাজল এতিম হইলো সংসারে ॥

প্রশ্ন করছে আমার কাছে সন্তানের কাছে প্রথম গুরু কে? বাবা নাকি মা? আমি যদি জবাব দেই, তাহলে সন্তানের জন্য প্রথম গুরু হলো বাবা। কারণ আমি কিন্তু বাবার শরীরের মধ্যে মিশে ছিলাম, রক্তের সাথে। আমি ছিলাম বাবার শরীরের রক্ত হয়ে, শক্তি স্বরূপ। বাবা সেই রক্তকে মৈথুন করে মাতৃদ্বারে ঢেলে দিয়েছেন। ঐ যে এক দুই ফোঁটা পানি, এইটা থেকে আমি কাজলের জন্ম। মায়ের কাছে দশ মাস দশ দিন থেকে দুনিয়ার মধ্যে আসছি। প্রথম গুরুটা যদি ধরতে যাই তাহলে আমার বাবা। বাবা যদি প্রথম আশ্রয় আমাকে না দিতেন, মায়ের কাছে যাইতে পারতাম না। পরে মা আমাকে আশ্রয় দিল তারপর আমি দুনিয়ার মধ্যে আসলাম। আর যদি দুনয়িায় ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরের কথা বলি, সেইখানে বলবো, এইখানেও বাবা গুরু। কারণ মাতৃদ্বার দিয়ে সন্তান আসলো দুনিয়ার মধ্যে, আসার পরে ঐ সন্তানকে লালন-পালন, দেখভাল করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব হইলো বাবার। মা শুধু সংসারের মধ্যে দেখে রাখে, এইটা মায়ের দায়িত্ব। আর বাকি বা সম্পূর্ণ দায়িত্বটাই বাবার। এ জন্য প্রথম গুরুটা হইলো বাবা। ...(শেফালী ও কাজল, ১৯৯৯ : পরিবেশনা)

১.১০ শালী-দুলাভাই পালার শালী পক্ষের একটি গান

দুলাভাইয়ে এত শয়তান পারি নাই বুঝিতে,

আসলে তো দুলাভাইরে ধইরাছে ভূতে ॥

বড় আপার স্বামী হইয়া আমার দিকে থাকে চাইয়া,

মনে বুঝে চাওয়ার ঢক বুঝি না,

আমার আপায় জানতে পারলে দিব তোরে গুতে ॥

হাত ভাঙ্গিমু, পাও ভাঙ্গিমু, আড্ডি-গুড্ডি গুড়া করমু,

বুঝবি তখন শালীর মাইরের মজা,

দুলাভাইয়ে এত শয়তান পারি নাই বুঝিতে ॥

পরের গালে মোয়া থুইয়া, নিজের গাল কাটে কামড়াইয়া,

গুজায় চায় চিৎ অইয়া শুইতে,

পাগলী (নীলা পাগলী) বলে লেংড়ায় চায় ফুটবল খেলিতে ॥ (নীলা, ২০১৮ : পরিবেশনা)

১.১১ আকলিমা বেগম ও সুরুজ মিয়া বয়াতি পরিবেশিত দেবর-ভাবী পালার অংশবিশেষ

ভাবীপক্ষের গায়েন আকলিমা বেগমের প্রশ্নের জবাবে দেবরপক্ষের গায়েন সুরুজ মিয়া বয়াতির উত্তর : এইবার আমার কাছে প্রশ্ন করেছে, যে এমন একজন ভাই, তারা দুই ভাই ছিলো, এক ভাবী ছিলো। ভাবী আর ভাই যখন বনবাসে যায় তখন ছোট ভাই রাজাত্ব ফালাই থুইয়া সেই ভাইয়ের সঙ্গে যায়। যখন নাকি এক বনের মধ্যে যায়, তখন ঐ ভাবীকে কে বা কাহারা জোর কইরা ধইরা নিয়া যায়। কিন্তু এরা কারা? হ্যা, শুন একটু খিয়াল করে। রাম-লক্ষণের নাম শুনছো তোমরা, এই রামকে যখন বনবাসে দেওয়া হয় সীতাকে সহ। তখন লক্ষণ বলে, দাদা আমি কী করে ঘরে থাকবো? আমি তো তোমাকে খুব ভালোবাসি। আমি তোমার সঙ্গে যাব। তখন রামের সঙ্গে লক্ষণ চলে যায়। ঐ জঙ্গলে রাম, লক্ষণ এবং সীতা এই তিন জনে গেছিলো, ঐ বনের মধ্যে যখন নাকি রাবণ রাজায় এই সীতাকে হরণ করে, তখন উদ্ধার করতে যায় লক্ষণ। দেখা যায় যে, সেই লক্ষণ ঐখানে লান্নত খায়, অনেক অসুবিধায় পড়ে, তীরের আঘাতে মারাও গেল। আবার দেখা গেল সে পুনর্জনম পাইল। আমার কাছে জিজ্ঞেস করে, তারা কারা? তারা হলো- রাম, লক্ষণ আর সীতা। এইখানে একটা কথা আছে, তুমি কী সীতার মতো ভাবী হইতে পারবা কিনা? যদি পার, ঠিক লক্ষণের মতো তোমার পূজা করতে আমি বাধ্য। যেমন দেখা গেল, বলছিলো যে জীবনে নারীর মুখ দেখে নাই, সেই ব্যক্তি ছাড়া সীতাকে উদ্ধার করতে পারবে না। বা (রাবণের সঙ্গে) যুদ্ধে জয় লাভ করতে পারবে না। সেই ব্যক্তি কে? লক্ষণকে জিজ্ঞেস করছিলো রাম, লক্ষণ তুমি কী জীবনেও নারীর মুখ দেখ নাই। সে বলে না দাদা। তাহলে তুমি তোমার ভাবীর সঙ্গে ছিলা, তুমি কী একদিনও দেখ নাই? তখন (লক্ষণ) বলেছিলো দাদা, ভাবীর যে কী রূপ, কী যে চেহারা তা আমি বলতে পারবো না। আমি ভাবীর গিরার উপরে কোনোদিন চাইয়া দেখি নাই। তখন রাম, লক্ষণকে টান দিয়া বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরছিলো। তাই আমি বলতে চাই, এ রকম ভাবী যদি হতে পার। আমি তোমাকে ভাবী বইলা গ্রহণ করবো। (আকলিমা ও সুরুজ, ১৯৯৯ : পরিবেশনা)

১.১২ ভাবীপক্ষের একটি গান

বেহায়া দেবর গো বলিও না বড় বড় কথা ॥

তোমার ভাই সদা শুনে আমার কথা,

সব সময় হইয়া থাকে গাঁধা ॥

তোমরা নামেতে পুরুষ হইয়া যাও বেহুশ,

যুবতী দেখলে করো আফসুস,

এই তোমাদের নমুনা খাসিলত যাবে না,

চলাফেরা যেন নবাবজাদা ॥

পুরুষের কামলা খেটে খায়, স্ত্রীর কাছে যায়,

হিসেবে কম পড়লে সে গালি খায়,

গালি খেয়ে মুচকি হাসে, তবুও সে ভালোবাসে,

জীবন-যৌবন সপিয়া দেয় সদা ॥ (আকলিমা, ১৯৯৯ : পরিবেশনা)

১.১৩ শেফালী সরকার ও লিপি সরকার পরিবেশিত ননদ-ভাবী পালার অংশবিশেষ

ভাবীরপক্ষের গায়েন শেফালী সরকার : (এই পরিবেশনাটির কিছু অংশ অভিসন্দর্ভের তৃতীয় পরিচ্ছেদের ননদ-ভাবী পালায় উদ্ধৃতি হিসেবে যুক্ত করা হয়েছে) আমি আমার ননদীকে বলবো, আমি গানের মইধ্যে যাই বলছি, তোমার ভালোর জন্যই বলছি। তুমি আবার রাগ-টাগ কইরো না যে ভাবী আমারে এতো কথা কয় ক্যান। আরে আমার বলার দাবি আছে, তাইতে বলি। অ্যা, বিয়ার আগে সব কিছু দিয়্যা দিও না, অন্য মাইনষ্যেরে। তাইলে আবার বিয়া দিতে ঝামেলা অইবো। আর ঘুরতে-মুরতে গেলে আমারে লগে নিয়া যাইও, তাইলে তোমার তেমন একটা সমস্যা অইবো না। আর যদি একলা একলা যাও, তাইলে কিন্তু ছ্যাকদ্যা দিব, বুঝছাও নাকি, কি কইছি।...

ননদপক্ষের গায়েন লিপি সরকার : বলতাম না, কিছুই বলতাম না, গানও এটা গাইতাম না। কিন্তু মনে আর মানাইলো না। আমার ভাবী এমন কিছু সাজেশন দিলো আমাকে, আহারে, এক্কেরে হাসতে হাসতে দোজখে যাওন লাগবো এই সাজেশন শুনলে ! কী ভাই তাই না? (দর্শককে উদ্দেশ্য করে) কী বললো, ভালো হইয়া চললে ভালো, নাইলে বলে থাপ্পর-টাপ্পর দিয়া আমাকে ভালো করবে তাই না। কী ভাই তাই না? (দর্শককে উদ্দেশ্য করে) আমি জানি, এমন ভদ্র একজন ভাবী আমার ঘরে থাকতে আমি কেন ব্যাকা রাস্তায় চলাফেরা করবো? আপনার মতো লোক থাকতে, আর যদিও আমি ব্যাকা রাস্তায় চলাফেরা করি, এইডা তো আমার দোষ না, এইডা তো গোড়ার দোষ, কী ভাই

এইডা আমার দোষ? (দর্শককে উদ্দেশ্য করে) আমার দোষ না, এইডা গোড়ার দোষ। এইডা তো তোমার দোষ। আইজ-কালকার ভাবী, ওরে বাপরে বাপ, ননদী যদি যুবতী থাকে, একটারে কানটিস্-মানটিস্ করতে ভাও কইরা দিয়া বড় বড় পুটলা খায়। আবার যদি একটু ছুইট্যা যাইতে, কয় এই তোর লগে আমার ননদ ভালোবাসা করবো না। কয় ক্যান? কয়- করতে পারে, যদি তুই আমারে ৬-৭ হাজার ট্যাকা দ্যা একটা বেনারশি আইনা দিতে পারোস, আমি আবার জোড়া লাগাই দিমু। ঐ যে খাওজানির মলম লাগায়। কী ভাই তাই ন্যা? (দর্শককে উদ্দেশ্য করে) আমি বলে পার্কে যাই, আবার বলে একাই বলে শুইয়া পড়ি। এই ছি, ছি, ছি। এতো খারাপ আপনে! আপনে থাকতে আমি কেন শুইয়া পড়বো? এইডা তো আপনের দোষ। অ্যা, সুযোগটা তো আপনেই কইরা দিয়েছেন। কারণ আপনের তো ভাব-চরিত্র কোনো কিছুই ভালো না। (শেফালী ও লিপি, ২০১৭ : পরিবেশনা)

১.১৪ ননদ-ভাবী পালার ননদপক্ষের একটি গান

ওগো মোর প্রাণের ভাবী, নাদুস-নুদুস তোমার দুইটা গাল,
গাল দেখিয়া বুইড়ায় মারে ফাল ॥
ভাবী তোমার মুখের হাসি, আমি কতো ভালোবাসি,
মধুর হাসি যেমন খ্যামটা তাল ॥
ননদের মনের কথা, ভাবী বুঝে সকল ব্যাথা,
সারান ভাবী ননদের ঝঞ্জাল ॥
বড় ভাইয়ের চোখ রাঙানি, করেন ভাবী শীতল-পানি,
লিপি মনি পিরিতের কাঙ্গাল ॥ (লিপি, ২০১৭ : পরিবেশনা)

১.১৫ বিয়াই-বিয়াইন পালার যুগোলগান

বিয়াইন : আমি অল্প বয়সে প্রেম করিয়া সইলাম কত জ্বালা,
মন কাড়িলো বড় ভাইয়ের শালা ॥
বিয়াই : বিয়াইন আমার দেখতে সুন্দর মনটা অনেক ভালা,
পাগল করছে ভাতিজারও খালা ॥
বিয়াইন : আমার যখন বয়স ষোল, সুযোগ বুঝে কাছে আইল,
গলাতে পড়াইলো ফুলের মালা, কী জানি কী বললো কানে মন হইল উতালা ॥ ঐ-১

বিয়াই : দুই চোখের ইশারা দিয়া আমায় পাগল বানাইয়া,

কাছে নিয়া ধইরা আমার গলা, নিশী-রাইতে ঘুম ভাঙ্গাইলো করে ছলাকলা ॥ ঐ-২

বিয়াইন : আমি নারী হই অবলা বুঝে নারে বিয়াই শালা,

বুকের ব্যথা যায় না মুখে বলা, ফুরুৎ কইরা উইড়া যামু শেষে খাইবা কলা ॥ ঐ-১

বিয়াই : তোমার কথায় আমি রাজি চল ডেকে আনি কাজি,

বিয়া কইরা ঘর বাঁধি নিরালা, সেলিম নুরীর লেখা এই গান বিয়াই-বিয়াইনের পালা ॥ ঐ-২

(সেলিম, ২০২১ : পরিবেশনা)

১.১৬ পাখি সরকার ও খোরশেদ আলম বয়াতি পরিবেশিত বাইদা-বাইদানী পালার অংশবিশেষ

বাইদানীপক্ষের গায়েন পাখি সরকারঃ

(গান)

(ওরে) বান্দর যদি ভেংচি মারে ঝরে কী আর গাছের আম,

জুতা খাইয়া ভুলবি বাপের নামরে, বাঁচতে চাইলে এইবার একটু থাম ॥

(ওরে) বইয়া বইয়া খাইয়া খাইয়া পাছা গেছে ফুইল্যা,

এবার আমি তোর মুখোশ সব দিমু খুইল্যা,

গোপন কথা দিলে বইল্যা ঘুম হইয়া যাবে হারাম ॥

আমার মতো ধৈর্যশীলা কৈ পাবি খুঁজিয়া,

এত জ্বালা-যন্ত্রণা থাকি মুখ বুজিয়া,

রোদ্রে পুড়ি, বৃষ্টিতে ভিজি, ফেলি কত মাথার ঘাম ॥

যাইহোক, এইবার একটা সুন্দর কথা বলছে, তোর বাবার টাকা-পয়সা, ধন-সম্পত্তি থাকতে, এই বাইদানী আমার কাছে বিয়া দিল ক্যান? হ্যা, বাবার যতই ধন-সম্পত্তি থাক না কেন, এইটা নিয়ম মেয়েকে একটা ছেলের কাছে বিয়া দেওয়া। আমার বাপে তোর কাছে বিয়া দিছে, এইডা কী অন্যায় অইছে! এই আমারে যদি তুই বিয়া না করতি, তাইলে বইয়া বইয়া খাইতি ক্যামনে? তোর কোন মায় খাওয়াইতো তোরে?...বিয়াডা নিয়ম, বাবা একটা ছেলের কাছে বিয়া দিব। তাই বইলা তো তুই আমারে যা তা কবি এমন না। তুই যদি আমারে একটা দ্যাস, আমি তোরে দশটা দিমু। আমি তোর চেয়ে কম না। এইবার সকালে যাস আর রাইতে আহোস ক্যান? এই বাইদ্যা, এই কিপ্টা, কির্পিন। সকালে যাই আর রাইতে কেন আহি? এই তোরে যে আমি ট্যাকা পয়সা কামাইয়া আইনা দেই, তুই কোনো

পয়সা-কড়ি দ্যাস আমারে? আমি আইট্যা যাই আর আইট্যা আহি। এত সন্দেহ ক্যা? (মারতে উদ্ধত) সকালে যাই আর রাইতে আহি ক্যা, তুই আমারে ট্যাকা-পয়সা দিস্‌নি? আইট্যা যাই আর আইট্যা আহি, এর লিগ্যা আমার দেরী অয়। কত্ত বড় সাহস, শরম করে না কইতে, মাইষ্যের কাছে কস যে! তোর কী লজ্জা-শরম নাইরে বেহায়া ঘরের বেহায়া! গাওয়াল কইরা আহস, ভাত তোর কোন বাপে রান্দে? তুই ভাত রানবি না? তুই ভাত রানবি, আমার পোলাপানে আগবো, এইডি তুই হুসাবি। রানবি-বারবি সব করবি। আমার কাপড়-চোপড় ধুইয়া দিবি। তারপরে আরেকটা গোপন কথা কই, তোর তো কোনো লজ্জা-শরম নাই! তোর লগে এহন ঝগড়া করতেও শরম করে। আমার জাইঙ্গাডা আছে না, এইডা ধুইয়া ইস্তিরি কইরা, সেন্ট মাইরা রাখবি, আমি আইয়া পরমু। বাইদ্যার ঘরের বাইদ্যা তোর কত বড় সাহস! তুই কস, ভাত রানছে কোন বাপে? তুই রানবি ন্যা রানবো কে? আমি কী তোর মতো মাইগ্যা নি! কামাই কইর‍্যা আইন্যা দেই, এইডাই বেশি। আনি এক পোয়া চাইল, আমার দুইটা বাচ্চা-কাচ্চা নিয়্যা বইস্যা বইস্যা খামু, তুই তো তিন হানকি এক লগে ভরস ! আমার বাচ্চা-কাচ্চা গুলি না খাইয়া থাকে। আবার বড় বড় কথা কস, পাছা ঝুলাস আমার সামনে, থুতমা ঝুলাইস না, থুতমা ভাইঙ্গা ফালামু।

(গান)

(ওরে) বাইদ্যা হইয়া বাইদ্যা গো ইজ্জত মারছোস তুই,
মনে চায় শুয়াইয়া দেই তোরে মই,
রঙ করিয়া গাল ফুলাইয়া করলি শুধু বউয়ের বদনাম ॥

এই বাইদ্যা, এই যে আমি সারাটা দিন এত কষ্ট করি, এত কষ্ট কইর‍্যা কামাই-রুজি কইর‍্যা দেই, তোর একটু মায়া-দয়া লাগে না আমার লিগ্যা? কিরে বাইদ্যা, ইকটু মায়া-দয়া লাগে না? তুই একটা কাম করস না ক্যা অহনো? অহনো যে তোর বউডা পাড়ায় পাড়ায় পাডাস, একটু লজ্জা করে না, একটু মায়া-দয়া থাকতে অয় না? আমার বউডা সকালে যায়, সেই যে রাইতে আহে। আমার বউডারে এইবার কামে না পাঠাই, আমি যাই। বইয়্যা বইয়্যা খাস ক্যা এত? এত বইয়্যা বইয়্যা খাস ক্যা? তোর একটু লজ্জা করে না বাইদ্যা? আজকে তোরে এই দ্যাখ, এই কাপড় গুজলাম (মহিলা গায়েন শাড়ির আঁচল কোমরে গুজে) তোরে আইজক্যা খাইছি। আমারে খেপাইছোস না ! আমি বাইদানী আজকে তোরে পাইছি। আরেক প্রশ্ন করি তুই কইস তো, আমি যে পাড়ায় পাড়ায় গুরতে পাই, চুড়ি বেচতে যাই। যদি আমি অন্য একটা পুরুষের হাত ধইরা যাইগা, তহন তোর কী উপায় অইব? তোরে কিডা তিন হানকি বওয়াইয়া বওয়াইয়া খাওয়াইবো? কিরে আমি আরেকটা পরপুরুষের হাত ধইরা যদি যাইগা তহন তোর কেমন লাগবো? কী অবস্থা হইবো তহন? তুই কইস তো? সুন্দর কইর‍্যা কবি, নাইলে আইস থুতনা ভাইঙ্গা ফালামু তোর। … (গানের স্থায়ী গেয়ে বাইদানী পক্ষের গায়েন আসর শেষ করেন)

বাইদাপক্ষের গায়েন খোরশেদ আলম বয়াতি :

(গান)

ঢঙের বাইদানী, আমার সাথে আর দেখাইস না মাস্তানী,

চুপে চুপে কী করস তুই, (ওরে) আমি তা জানি ॥

পায়ে ধইরা বইছোস বিয়া মনে আছে নি,

জনম ভইরা কাম করিয়া আনবি মালপানি ॥

যাক, আমার কাছে বেশি কিছু কথা বলে গেছে। আর হিস্ মেরে কিছু কথা বলেছে। বলছে হে বাইদা, আমি সারা রাইত তোরে জ্বালাইমু না? কেননা সারাদিন পাড়ায় পাড়ায় হেঁটে হেঁটে গা-হাত-পা ব্যথা হয়ে যায়। তুই আমাকে গা-হাত-পা টিপা দিবি না? এই চুমকি কোন জাগা টিপতে বাকি রেখেছি তুই বল দেখি? তোর কোন জায়গা বাকি রেখেছি তুই বল, সত্যি করে বলবি তুই। তোর মাথা থেকে পা পর্যন্ত টিপতে বাকি রেখেছি কোথাও? হ্যা সত্যি কইরা মানুষের সামনে বলবি হ্যা। আরো বলেছে, তুই বসে বসে শুধু খাস। আরে বসে তো সবাই খায়। এই আমি যদি তাবিজ-কবজ ভইর‍্যা না দেই, কোথাকার গাছ তুইল্যা আনতে হয়, শিকর তুইল্যা আনতে হয়, তাবিজ যদি পুইর‍্যা না দেই, এই তুই কী বেচবি? অ্যা তুই বেচতে যাবিডা কী? তুই কী বেচতে যাবি? এগুলোতো যোগার করতে হয় আমার। তারপর তুই বেচতে যাইস। আরেক কথা বলে গেছে, বড় লজ্জার কথা! বড় রাগ করে বলে গেছে! অ্যা বাইদা তুই আমার তলের জাইঙ্গা পর্যন্ত ধুইয়া দিবি। এই তোর জাইঙ্গা তো আমি প্রত্যেকদিন ধুই, এত ময়লা হয় কী কাজ কইর‍্যা তোর? অ্যা? তুই শিঙ্গা লাগাইস, না তারাই শিঙ্গা তোকে লাগায়? আমি তো কিছুই বুঝতে পারি না! এত ময়লা কেন হয়? প্রতিদিন জাইঙ্গা ধুতে ধুতে আমার তো জীবন শেষ! এই তুই কী শিঙ্গা খালি মেয়েছেলেদের লাগাইস? না পুরুষেও লাগাইস? আর যদি পুরুষরে লাগাইস তাইলে কোন কায়দায় লাগাইস? সে কায়দাডা কী? এইটা আমার প্রশ্ন থাকলো?

(গান)

কত ছেড়ি পিছে ঘুরে খবর রাখস নি,

আমার মতো এমন স্বামী আর পাবি নি ॥

কেন এই কথা বললাম, বলছে এই বাইদা আমি যদি ভিন্ন পুরুষের সাথে চলে যাই, তুই কী করবি? এই তুই যে ভিন্ন পুরুষের সঙ্গে চলে যাবি, এতে তো বুঝা যায়, তুই খুব সতি নারী মনে হয়। একজনার দ্বারায় তোর হয় না। এই আমি কী পারি না? তুই চলে যাবি ! এই আমার কোন দিকটা কম আছে? তোর থেকে চেহারা আমার কম আছে, না

গায়ে মাংস কম আছে, কোন দিক থেকে কম আছে? অ্যা তুই ভিন্ন পুরুষের সাথে যাবি যা। তুই কোন চাচার সঙ্গে চলে যাবি যা। আমার পিছে তোর মতো কত বেদেনী ঘুরে লো। আমার কোন দিকে কম আছে?

(গান)

স্বামীর সাথে বড় বড় কথা চলে নি,

খুপায় ধইরা চুপায় মারবো তোমায় বাইদানী ॥

আরেক কথা বলে গেছে, এই বাইদা তোকে যে এত কামাই কইরা খাওয়াই, আমার প্রতি কী তোর একটুও মায়া লাগে না? এই চুমকি, মায়া না লাগলে তুই আছিস কী করে? মায়া না লাগলে তোকে আদর করি কী করে? এই দুটো বাচ্চা হলো কী করে? মায়া-মহব্বত-প্রেম-পিরিতি যদি না থাকবে, আজগবি দুটি বাচ্চা এসে গেছে? তুই এই কথা কেন বলবি, তুই আমার কাছে সে কথা বল? এই বাচ্চা কী আমার না, নাকি? আমার তো সন্দেহ হয়ে গেছে এই কথা শুনে ! যে আমার মায়া লাগে কী না লাগে, ক্যা তুই বুঝতে পারছিস না? আমায় এমনভাবে মশান দেখাচ্ছে, যেন কী না কী করে ফেলবে ! হ্যা স্ত্রী হয়ে স্বামীকে অনেক কিছু করা যায়। আপনাদের আশেপাশে গ্রামে ব্র্যাক সমিতি আছে না? হ্যা ব্র্যাক সমিতিতে মেয়েরা টাকা লন নেয়। প্রতি মাসে মাসে শোধ যে দিতে পারে, সেই আবার টাকা তুলতে পারে। এখন আমার এই বেদেনীর মতো চল্লিশ জন মেয়ে ব্র্যাক সমিতি থেকে টাকা নিয়েছে। কিন্তু ঊনচল্লিশ জন মেয়েই ঠিক মতো মাসে টাকা কিলিয়ার করে, টাকা তুলেছে। কিন্তু এই বেদেনী পেছনে পড়ে গেছে একা। এখন যেয়ে বলছে, স্যার আমি কী টাকা পাব না? এখন স্যার বলছে, হ্যা পাবা, তোমার যদি মাসিক কিলিয়ার থাকে অবশ্যই পাবা। এই বেদেনী বুঝতে পারছিস তো? হ্যা এই বেদের সঙ্গে পারবি, পারবি যদি তোর ঐ কিলিয়ার থাকে আর কি? এতটুকুই বললাম।

(গান)

ভাত না খাইলে কপালে তোর আছে লো শনি,

রাস্তায় রাস্তায় মাইগা খাবি বাসি ফ্যান-পানি ॥

পায়ে ধইরা বইছোস বিয়া মনে আছে নি,

জনম ভইরা কাম করিয়া আনবি মালপানি ॥ (পাখি ও খোরশেদ, ২০১৭ : পরিবেশনা)

১.১৭ পাখি সরকার ও আব্দুল গনি সরকার পরিবেশিত নানা-নাতিন পালার অংশবিশেষ

নাতিনপক্ষের গায়েন পাখি সরকার : আমি আমার আসরের কাজে দাঁড়িয়েছি দুটি পালা নিয়ে, পালা দুটির নাম হলো নানা ও নাতিন। নাতিনের ভূমিকায় আমি পাখি সরকার গাইব, নানার ভূমিকায় গাইবেন বাংলাদেশের সুনামধন্য

গায়ক আ. গনি সরকার সাহেব। আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন, যাতে আমরা পালাটা ভালোভাবে গাইতে পারি। সকলের কাছে সালাম, স্লামালাইকুম। নানা, নানা গো, অনেক দিন পর পাইছি আইজক্যা লাগুর। ধরছি, কই যাইবেন আপনে? আজকে পাইয়া বইছি আপনেরে। গান একটা গাইয়া লই, তারপর আপনার খবর লইতাছি।

রূপে-গুণে আমি খুব সুন্দরী,
সুন্দরী, খুব সুন্দরী ॥
চুল পাকা, দাঁত পড়া, নানা তুমি,
কেন আমায় দাও সুরসুরি ॥
দুধে-আলতায় গায়ের রঙ আমার,
পাগল যে হয় দেখে একটি বার,
আমার বয়স কম, টাঙ্গাইলের চমচম,
পুরান ঢাকার গরম গরম, তেলে ভাজা আলুপুরী ॥
নানা তোমার গায়ে খুব গন্ধ,
এজন্য নানি করে না পছন্দ,
যেমন রাম পাঠা, তোমার পাও ফাঁটা,
কিনো আগে সাবান সোডা, যাও আইকে কর মুড়ামুড়ি ॥
নানা কত সুন্দর আলকাতরার রঙ্গে,
পিরিত করতে চাও আমার সঙ্গে,
তোমার হাঁপানী, কইছে মোর নানি,
কত খাও নাকানি-চুবানি, একটু করলে নানি জোরাজুরি ॥

আজকে প্রথমেই নানার কাছে একটা প্রশ্ন করি। প্রশ্ন না করলে তো ঝগড়া অইব না, কী বলেন? তারে খোঁচা দিয়া, রস বাইর করতে অইব, নাইলে বাইর অইব না। ও নানা তুমি কইও তো, নাতিনের প্রতি বা আমার প্রতি তোমার কর্তব্যটা কী? তুমি কইও নাতিনের প্রতি তোমার কর্তব্য কী? আরেকটা কথা আছে। ও নানা এই প্রশ্নডার খুব সুন্দর কইর‍্যা জবাব দিয়েন তো। আপনের কী মুসলমানী অইছে নি? কী কন এইডা তো জানতে অইব? নানা আপনে কইবেন, মুসলমানি হইছে নাকি মুসলমানি করাইতে হইব? কোদাল কিন্তু লইয়্যা আইছি, স্টেজের পিছে থুইছি। আপনে কইবেন আপনার মুসলমানি হইছে নি? আর নাতিনের প্রতি আপনের কর্তব্য কী? এই আপনের কাছে আমার দুটি প্রশ্ন। খুব সুন্দর করে জবাব করবেন।...

নানাপক্ষের গায়েন আব্দুল গনি সরকার : উপস্থিত সুধিমণ্ডলি ও আজকের বাউল-বিচারগানের আশেকানবৃন্দ সকলের প্রতি আমি আমার ভক্তিপূর্ণ সালাম রেখে, আপনাদের সম্মুখে যেই পালা নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। এই পালার নাম হলো নানা এবং নাতিন। নানার ভূমিকায় আমি গনি সরকার। কিছু কথা ও কিছু গান করার চেষ্টা করবো। আর আমার বিপক্ষে যে শিল্পী বাংলাদেশের সুনামধন্য উদীয়মান শিল্পী পাখি সরকার। সর্বপ্রথম সে আসর করেছে এবং আমাকে কিছু কথাবার্তাও বলে গেছে। সবচেয়ে বেশি সুন্দর লাগছে তার একটা কথা, আমি নাকি রাম পাঠা। রাম পাঠা আমাকে বলছে, তো পাঠার যে আবার একটা ধর্ম আছে। হেইডা খুব খারাপ কিন্তু। পাঠার যে ধর্ম, খুব খারাপ ব্যাপর-স্যাপার এইখানে।... তুমি যে আমারে পাঠা বলছো, আমি আর তোমারে তেমন কিছু কমু না। কারণ তুমি তো আমার নাতিন। কী কমু তোমারে! এক রাজার মাইয়ায় অন্ধ। রাজার মাইয়া হইলে কী হইব, অন্ধ হইলে তো কেউ বিবাহ করতে চায় না। কিন্তু বয়স তো পরিপূর্ণ। যৌবনের তো একটা যন্ত্রণা আছে, এইডা তো আর সেই সহ্য করতে পারে না। একদিন দোতালায় বইসা বইসা, একা একা কইতাছে, আল্লারে যদি আজরাইল পাঠাইয়া দিতা। জান কবজ কইরা নিতে কও, তাতে মনে হয় এই যন্ত্রণা থেকে আমি বাঁচতে পারতাম। এই কথা তো নিচে থেইকা এক মুছওয়ালা দাড়োয়ানে শুনছে। শুইন্যা যখন ঐ মেয়েটার সামনে দিয়া ঘুরাফেরা করে। মেয়েটা বুঝতে পারছে কে জানি হাঁটতেছে। জিজ্ঞেস করে ভাই তুমি কে? দাড়োয়ানে কয়- আমি আজরাইল। রাজার মেয়ে কয়- তাইলে আমার জান কবজ কর। দাড়োয়ানে কয়- আহো। একেবারে ইচ্ছা মত জান কবজ করছে। জান কবজ করার পর মাইয়ায় কইতাছে, ভাই জান কবজ করলে কী এত মজা লাগে? তয় তুমি প্রত্যেক দিন আইয়া আমার জান কবজ কইরো। বুঝছো নাকি পাখি সরকার?

(গান)

তুমি আমার রঙ্গিলা নাতিন, আমি তোর নানা,
আমার সাথে ভাব না রাখলে হাঙ্গা (বিয়া) হবে না ॥
বুঝোছ না লো রসের নাতিন, একলা থাকবি আর কতদিন,
শুধু পাড়ায় বেড়াস হইয়া স্বাধীন, বুকে নাই ওড়না ॥
আমারে তুই বুড়া কইছোস, নিজের কপাল নিজে খাইছোস,
আমার জন্যে বাঁইচা রইছোস টের পাইছোস না ॥
পুরুষ মানুষ বুড়া হয় না, এই কথা সকলের জানা,
এখনো তো বিয়া করতে ভয় করি না ॥
বকরির মত ডাক উঠছে, ঘুরিয়া যাছ যারতার কাছে,

নানার মত আর কে আছে, এমন আপনা ॥

আস্তে, আমার নাতিনের কথাবার্তায় বুঝা যায়, রসিক নাতিনই। রস আছে ভিতরে। আমারে কয়, আমি খোঁচা না দিলে রস বাইর অইব না। কথা ঠিক আছে, খোঁচা তুমি দিও কোনো অসুবিধা নাই, কিন্তু খোঁচাডা জাগা মতো দিও। জাগা মতো দিলেই রস পাওয়া যাবে। বেজাগায় দিলে সমস্যা আছে। আমারে প্রশ্ন করে, কয়, নানা তোমার মুসলমানি অইছে নি? আচ্ছা কন, আমার মুসলমানি অইছে কি অয় নাই, এইটা বলদের কথা না? এইডা তুমি আমারে না জিগাইয়া চুপসে গিয়া তোমার নানির কাছে জিজ্ঞাস করতা। তাইলেই তার খবর পাইতা। মুসলমানি তো নানার অবশ্যই অইছে। কারণ আমাগো ধরার জাগা আছে, কাটার জাগা আছে। অহন তোমারে যুদি আমি জিগাই, তোমাগো মুসলমানি আছে নি? এক নানায় একজন নাতিন আর একজন নাতি লইয়া গাছের তলায় বইয়া খেলা করতেছে। নাতি দৌড়াইয়া ঘরে গিয়া লম্বা সুতা আনছে একটা, লাল সুতা। আইনা নানারে কয়, নানা। নানা কয়- কী? নাতি কয়-এই সুতাটা আমার, মানে ঐ বোটটার মাথায় বাইন্ধা দাও। যহন এই কতা কইছে। নানায় কয়- ঠিক আছে, পুলাপাইন মানুষ একটা আবদার করছে, না রাখলে তো অসুবিধা। আচ্ছা দে। লাল সুতা নিয়া তো নাতির নুনুর মাথায় বাইন্দা দিছে। বাইন্দা দিতে অহনে নাতিনে দেখছে। দৌড়াইয়া ঘর থেইকা হেয়ও লাল সুতা লই আইছে। আইনা কয়-নানা। নানা কয়-কী? নাতিন কয়-ভাইরে যহন সুতা বাইন্দা দিছো আমারেও ঐডা বাইন্দা দাও। অহনে নানায় হাসে। নাতিন কয়- নানা তুমি হাস ক্যা? বাইন্দা দাও, ভাইরে বাইন্দা দিছো যখন আমারেও বাইন্দা দাও। নানা কয়-নাতিন লো, তোর ভাইরে যে বাইন্দা দিছি, অর তো ধরুইন্যা জাগা আছে, তোর ধরমু কুনহাইন্দ্যা আর বান্দুম কুনহাইন্দ্যা? তবে আরেকটা কথা বলছে, নাতিনের প্রতি নানা তোমার কর্তব্য কী? কর্তব্য বলতে আমি এতটুকুই বুঝি। নানা সব সময় তোমার সুকামনা করবে। বড় হইয়া যাতে সুন্দর একটি ছেলে পাও এবং স্বামীর সংসারে গিয়া সুখে-শান্তিতে বাস করতে পার। সব সময় সুকামনা করা হলো নানার কর্তব্য। আমি প্রশ্ন রাখলাম, নাতিন তোমার কথার পৃষ্টে। তুমি জবাব দিও। আমাদের মুসলমানির কথা যহন জিজ্ঞাস করছো। তোমারে আমি এইখানেই জিজ্ঞেস করবো, তুমি বলবা তোমাদের মুসলমানি আছে নি? যদি থাকে এইডা কিভাবে হয়? ধরে কুনহাইন্দ্যা আর কাটে কুনহাইন্দ্যা? এইডা আমার জিজ্ঞেস রইল। (পাখি ও গনি, ২০২০ : পরিবেশনা)

১.১৮ খাজা বাবা-বড়পির পালায় খাজা বাবাপক্ষের গান

(খাজা বাবাপক্ষের গান-১)

আমার খাজা বাবার গুণের কথা, বলবো কথা ধীরে ধীরে,

(আমার খাজা পিরে) ছোট একটা মাসুম বাচ্চা জিন্দা করে ॥

একদিন আমার খাজা বাবা রাস্তা দিয়া যায়,
দেখে একটি বাচ্চা মরে আছে রাস্তার কিনারায়,
খাজা বাবা কাছে যাইয়া কোন কাজ করিলো,
গাছের একটি ডাল ভাঙ্গিয়া বুকেতে ধরিলো,
খাজা বলে ওরে বাছা তোমারে দেই কইয়া,
যদি আপন দোষে মরে থাকো তবে রও মরিয়া,
নইলে তুমি কথা বলো তোমারে শুধাই,
আরে খাজার হুকুম পাইয়া ছেলে জিন্দা যায়,
(ওগো) জিন্দা হইয়া কথা বলে, খাজা বাবার পায়ে ধরে ॥
জিন্দা হইয়া ছেলে বলে খাজা বাবার ঠাঁই,
আপন দোষে হুজুর আমি মরি নাই,
আমারে জুলুমকারী দিয়াছে মারিয়া,
সর্বদাই চলে হুজুর ঘোড়া দৌড়াইয়া,
আল্লার ভয়, নবির কথা সেই তো মানে না,
এই দুনিয়ায় থেকে কাওরে ভয় তো করে না,
হুজুর আমারে সে মেরে গেলো ঘোড়া দিয়ে আঘাত করে ॥
এই কথা শুনিয়া খাজা সামন দিকে যায়,
জালালি ভাব খাজার অমনি আইসা যায়,
খাজা বলে ওরে দুষ্ট তোমারে দেই কইয়া,
অনেক পাপ করেছো এই দুনিয়ায় থাকিয়া,
জুলুমকারীকে আল্লায় ভালোবাসে না,
এই কথা বলার পরে হয় কী ঘটনা,
সঙ্গে সঙ্গে ঐ ব্যক্তি ঘোড়া হইতে পড়িয়া,
আরে প্রাণ পাখি উড়িয়া গেলো দেই সবারে কইয়া,
অলির বিচার দেইখা খুশি আপে-পরয়ারে,
এবার খুশি হইলো খাজা বাবা দেখিয়া অন্তরে,

পাগল সোহরাব বিনয় করে, দিও আমায় ক্ষমা করে ॥ (সোহরাব, ২০২০ : পরিবেশনা)

(খাজা বাবাপক্ষের গান-২)

জিলানী পীরানে পীরের সর্দার

গাউসুল আযম মহিউদ্দিন

কান্ডারী আমার ॥

খাজা বাবার গানের জলশায়

শুনতে একদিন গান

হঠাৎ করে বড় পীরসাব গায়েব হয়ে যান।

উপস্থিত লোক সবাই খোঁজে

কই গেল হুজুর আমার ॥ ঐ

যাইয়া দেখে এক মাদ্রাসার

বারান্দায় আছে পড়ি

বেহুঁশ হইয়া শুইয়া রইছে ভবপারের কান্ডারী।

সবাই মিলে জিজ্ঞাস করে

কেন এই হাল হয় আপনার ॥ ঐ

জিলানী কয় খাজার গানে

হইছে এশকের তুফান

কারেন্টে ধরিয়া এনে আমায় বারান্দায় ফেলান।

আমার সার্থক হইল মানব জনম

গান শুনে খাজা বাবার ॥ ঐ

যে গানেতে বড় পীরসাব

এত পেরেশান

কলির শেষে রশিদ এসে করে সেই গানের অপমান।

গান কারে কয় গাইলাম বা কি

কে করবে তার বিচার ॥ ঐ (রশিদ, ২০২০ : ৪৪)

(খাজা বাবাপক্ষের গান-৩)

খাজা বাবা খাজা বাবা, মারহাবা মারহাবা,

গেয়েছিলেন নবির গুণগান ॥

একদিন আমার বড় পীরে ডাক দিয়া কয় খাজারে,

তোমার বদন কেন এতই ম্লান,

খাজায় কয় পীরেরে তিন দিনের অনাহারে,

রূহের খোরাক আমার ছামা-গান ॥

খাজা কয় গান বাজনা এশকের গাজা করিলে হয় রূহু তাজা,

না করলে পাই সাজা বাঁচে না প্রাণ।

পীরে কয় খাজারে গান গেয়ে শোনাও মোরে,

আশেক হৃদয় বড় পেরেশান ॥

খাজা বাবা গান তুলে পীর নাচে তালে তালে,

আরো নাচে আল্লার জমিন-আসমান।

পীরে কয় আল্লা আল্লা লা ইলাহা ইল্লাল্লা,

হইল ফানাফিল্লা রাহে কোরবান ॥

পীরের হাতে লাঠি দিয়া পৃথিবী লয় থামাইয়া,

আরেক হাত উপরে দিয়া ঠেকায় আসমান।

আবুলে কয় আশেক হলে এই গানে মাশেক মিলে,

আশেক-মাশেক করে মধু পান ॥ (ছোট আবুল, ২০২০ : পরিবেশনা)

(খাজা বাবাপক্ষের গান-৪)

কেরামিন কাতেবিন রোজ হাশরের দিন,

আল্লার দরবারে যদি করে অভিযোগ,

আমি বলবো দুনিয়ায় ছিলাম খাজা বাবার লোক ॥

(যেজন) খাস খাজার আশেকান, শুনে খাজা বাবার শান,

প্রেমানন্দে নাচে প্রাণ খাজা বাবার তরে ॥

আল্লার আওলিয়া গরীবের বন্ধু, গরীবের নেওয়াজ দয়ারও সিন্ধু,

হে পাক সুবহান আমি তার আশেকান,

এই পাপীর নাম খাজা বাবার আশেক রূপে হোক ॥

খাজা বাবার বংশ-তালিকা, নবিজির বংশ আওলাদে আলিকা,

সেই খাজারে এই সংসারে বাবা বলার আমি পেয়েছি সুযোগ ॥

চেরাগে চিশ্‌তি রওশন জমিন, খাজা মৈনদ্দিন শাহে আজমীর,

পাপী নরাধম এই শাহ আলম রোজ হাশরে দিও তোমার প্রেমালোক ॥ (শাহ আলম, ২০১১ : পরিবেশনা)

১.১৯ খাজা বাবা-বড়পির পালায় বড়পিরপক্ষের গান

(বড়পিরপক্ষের গান-১)

বড়পির গুণমনি, তুমি কাদের জিলানি,

তরাইয়া নিও দয়াল আমারে ॥

তুমি মারফতের খনি, আওলিয়ার শিরমণি,

রাখিও আমায় তোমার নজরে ॥

মূর্দার কলবে শুনি, এনে দিলেন রূহানী,

তাইতো ডাকি তোমায় কাতরে ॥

আমারও নিদানের কালে, জড়াইয়া নিও কোলে,

রাইখো না দয়াল ফেলে দূরে ॥

গর্ভেতে থাকিয়া পড়েন, আঠার সিপারা কোরান,

মুখস্থ করলেন আমার বড়পিরে ॥

চাই বড়পির তোমার দিদার, আমারে কইরো উদ্ধার,

হারুনে ডাকে তোমায় নতশিরে ॥ (শরীফ, ২০১৯ : পরিবেশনা)

(বড়পিরপক্ষের গান-২)

তোমার নামে পাথর গলে, আগুন হয় পানি,

বড়পির জিলানি, ওগো জিলানির জিলানি ॥

(আরে) বাগদাদে এক বুড়ি ছিলো,

বুড়ির একটি মাত্র ছেলে ছিলো,

ছেলে বিয়ার উপযুক্ত হলো,

বিয়া করিতেই গেল,

বরযাত্রী সহকারে, বিয়া করতে গেল চলে,

নতুন এক নৌকা দিয়া, নদী পার গেলো হইয়া,

বিয়া খান লয় করিয়া, আবার আসে ফিরিয়া,

বরযাত্রী সহকারে, সঙ্গে নতুন বধূ নিয়া,

নৌকাতে যায় চড়িয়া, নৌকাটা দেয় ছাড়িয়া,

নদীর মাঝখানে এলো, কোথাও হতে বাতাস এলো,

নৌকাটা বুরে গেলো, নৌকাতে যারা ছিলো মরে সকলী ॥

এবার বুড়ি বেটি খবর পাইয়া, সে যে নদীর পাড়ে যায় চলিয়া,

বুড়ি বেটি কান্দে বইয়া, সারাদিন কান্তে ছিলো,

দিনের পর রাত্র এলো, বুড়ি বেটি কান্তে ছিলো,

কয়েক দিন গত হলো, বুড়ি বেটি কান্তে ছিলো,

দিনের পর সপ্তাহ এলো, বুড়ি বেটি কান্তে ছিলো,

সপ্তার পর মাস এলো, বুড়ি বেটি কান্তে ছিলো,

মাসের পর বছর এলো, বুড়ি বেটি কান্তে ছিলো,

ছেলের কথা মনে করে, বুড়ি বেটি কান্তে ছিলো,

যুগের পর বছর এলো, বুড়ি বেটি কান্তে ছিলো,

একদিন আমার বড়পিরে নদীর পাড় দিয়া চলে,

হঠাৎ করে নজর পড়ে, বুড়ি একলা কান্দে বইয়া,

বড়পির তাই দেখিয়া, বুড়িকে দেয় জিগাইয়া,

শুন আমার মা-জননী কেন বসে কান্দো তুমি?

বুড়ি বেটি দেখা পাইয়া, তখনই দেয় বলিয়া,

শুনেন হুজুর কই আপনারে,

আমার এক ছেলে ছিলো, বিয়া করিতে ছিলো,

বরযাত্রী সহকারে, সঙ্গে নতুন বধূ নিয়া,

আবার আসবে ফিরিয়া, নৌকাতে যায় চড়িয়া,

নৌকাটা দেয় ছাড়িয়া, নদীর মাঝখানে এলো,

কোথাও হতে বাতাস এলো, নৌকাটা বুরে গেলো,

নৌকাতে যারা ছিলো, সকলী মরে গেলো,

তাদেরকে জিন্দা করেন বাসনা করি ॥

আমার বড়পিরে খবর পাইয়া, অমনি পড়লো সিজদা দিয়া,

বিনা তারে তার লাগাইয়া, মাওলাকে দেয় জানাইয়া,

শোন আমার সাঁই কিবরিয়া, তোমার কাছে যাই বলিয়া,

বুড়ির যে ছেলে ছিলো, ছেলে জিন্দা করতে হলো,

আল্লা এই কথা পাইয়া, তখনই দেয় বলিয়া,

মহিউদ্দিন কই তোমারে, বুড়ির যে ছিলো,

সেই ছেলে মরে গেলো, বার বছর গত হলো,

কেমনে জিন্দা হইবে বলো, বড়পিরে কথা পাইয়া,

তখনই যায় বলিয়া, শোন আমার সাঁই কিবরিয়া,

কোরান যাচ্ছি পড়িয়া, কোরানে যে প্রমাণ আছে,

হাইশরের মাঠ একদিন হবে, লক্ষ লক্ষ বৎসর আগে কত মানুষ গেছে মরে,

হাইশরের মাঠের পরে আবার সবাই জিন্দা হবে,

এই কথা সত্য হলে এই ছেলেও জিন্দা হবে এখনি ॥

আমার পাক রাব্বানা ... পাইয়া,

তখনই দেয় বলিয়া,

মহিউদ্দিন কই তোমারে,

এক হাতে পানি নিয়া, তুমি তা দাও ছিটাইয়া,

বড়পির কথা পাইয়া, সেজদা হতে লয় উঠিয়া,

হাতের মধ্যে পানি নিয়া, কি জানি কি মুখে কইয়া,

আবার পানি দেয় ছিটাইয়া,

কিছুক্ষণ পরে দেখিলো নতুন এক নৌকা এলো,

বরযাত্রী সহকারে সঙ্গে নতুন বধূ নিয়া,

নৌকা যায় ঘাটে ভিরিয়া,

বুড়ির ছেলে কাছে যাইয়া, বুড়িকে রয় সালাম করিয়া,

বড়পীরকে ভক্তি কর ভেবে কয় পাগল মনির ॥ (মনির, ২০১৯ : পরিবেশনা)

(বড়পিরপক্ষের গান-৩)

বড় ভাব লাগালি আমার মনে ॥

ভাইরে ভাই,

বোগদাদের মাঝেতে এক ইহুদি যে ছিলো,

ইহুদির ঘরেতে ভাই ঊনিশ মাইয়া হইলো।

এইবারও ইহুদির পরিবারে,

গর্ভবতী হইলো ভাই এই না সংসারে।

ইহুদি ডাকিয়া তখন পরিবাররে কয়,

এইবারও গর্ভে তোমার মেয়ে যদি হয়।

তিন তালাক দিয়া আমি দিব তোমায় ছেড়ে,

এই কথা শুনিয়া বেটি কান্দে জারে জারে,

এই কথা শুনিয়া বেটি কান্দে তখন ডরে ॥

ভাইরে ভাই,

কান্দিতে কান্দিতে বেটি ভাবিলো তখন,

বোগদাদের মাঝেতে একজন পির যে রইয়াছে,

আবু সালেহ জঙ্গি মুসা যাব তাহার কাছে।

এক ফানা কলা বিটি লইলো কিনিয়া,

এক ঘটি দুগ্ধ লইলো পিরেরও লাগিয়া।

পিরের কাছে যাইয়া বেটি দিছে দরশন,

যাইয়া বলছে ওগো হুজুর আমার নিবেদন।

ঊনিশ মাইয়া আমার গর্ভে দিল পরয়ারে,

এইবারও গর্ভবতী কই আমি আপনারে।

স্বামী বলছে এইবার যদি মেয়ে হয় মোর ঘরে,
তিন তালাক দিয়া আমায় দিবে সে যে ছেড়ে।
ছেলের জন্য দোয়া চাইতে আসলাম আপনার ঠাঁই,
দুধ-কলা লইয়া আসলাম আপনাকে জানাই।
দুধ কলা খাইয়া পিরে ধ্যান করিয়া চায়,
গর্ভে যে সন্তান রইয়াছে মেয়ে দেখতে পায়।
ধ্যান ভাঙ্গিয়া বলে পিরে ঐ না বেটির ধারে,
এইবারও মেয়ে হবে তোমারই ঘরে।
এই কথা শুনিয়া বেটি কান্দে আরও যায় ওরে ॥
ভাইরে ভাই,
কান্দিতে কান্দিতে বেটি করিলো গমন,
রাস্তার পাশে গিয়া বেটি পেলো দরশন।
রাস্তারই পাশে একটা মাঠ যে রইয়াছে,
কিছু ছেলে ঐ মাঠে খেলা করতে আছে।
এক ছেলে আসিয়া তখন বেটিরে কয়,
কান্দো কেন মা জননী বলো তার বিষয়।
বেটি বলছে শোন বাবা বলি তোমার ধারে,
ঊনিশ মাইয়া আমার গর্ভে দিলো পরয়ারে।
এইবারও গর্ভবতী করলো মালেক সাঁই,
স্বামী বলছে মেয়ে হইলে তালাক দিবে তাই।
দুধ-কলা লইয়া গেলাম জঙ্গি পিরের দরবারে,
ছেলের জন্য দোয়া চাইতে গেলাম তার ধারে।
দুধ-কলা খাইয়া পিরে আমার কাছে কয়,
এইবারও মেয়ে হবে কান্দি তার বিষয়।
ছেলে বলছে মা জননী দেই তোমারে কইয়া,
জঙ্গি পিরের দরবারে যাও তুমি চলিয়া।

ছেলের জন্য দোয়া যখন করিতে পারলো না,

দুধ-কলা ফিরিয়া আনো তোমারটা এখনা।

এই কথা শুনিয়া বেটি পিরের দরবারে যায়রে ॥

ভাইরে ভাই,

পিরের কাছে যাইয়া বেটি দিলো দরশন,

যাইয়া বলছে ওগো হুজুর আমার নিবেদন।

ছেলের জন্য দোয়া যখন করিতে পারলেন না,

দুধ-কলা ফিরাইয়া দেন আমারটা এখনা।

এই কথা শুনিয়া পিরে বেটির কাছে কয়,

দুধ-কলা খেয়ে ফেলেছি উদরতে রয়।

কেমন করে দুধ-কলা ফিরাইয়া দেই তোমারে,

এমন কথা কে শিখাইলো কও তুমি আমারে,

বেটি বলে ছেলে একটা আছে রাস্তার ধারে।

পিরে তখন বেটির সঙ্গে করিলেন গমন,

রাস্তার পাশে গিয়া পিরে দিলো দরশন।

যাইয়া দেখে আবদুল কাদের রইয়াছে দাঁড়াইয়া,

আবু সালেহ জঙ্গি বলে ছেলের কাছে গিয়া।

বেটিরে পাঠাইলা কেন আমারি ধারে,

আবদুল কাদের বলে আব্বা বলতেছি আপনারে।

ছেলের জন্য দোয়া যখন করিতে পারলেন না,

দুধ-কলা খাইতে কি আর বিবেকে বাঁধলো না।

এই কথা শুনিয়া তখন রাগ হইয়া সালেহ,

থাপর একটা মারলো গিয়া বড়পিরের গালে।

বড়পির কয় আব্বা হুজুর আপনাকে জানাই,

এক থাপ্পরে ঊনিশ মাইয়া ছেলে কইরা যাই।

গর্ভে একটা মাইয়া ছিলো ছেলে হইয়া যায়,

আরেক থাপ্পর মারেন যদি আপনি আমায়,

আমি বোগদাদেতে মাইয়ার বংশ একটাও রাখতাম নারে ॥ (বড় আবুল, ২০১৭ : পরিবেশনা)

১.২০ বিচারগানের মঙ্গলগীত পর্বে পরিবেশিত কয়েকটি জনপ্রিয় বিচ্ছেদগান

(বিচ্ছেদগান-১)

ভুলিও না বন্ধু আমায় হৃদয়ে রেখো স্মরণ,

অপরাধী হইলেও বন্ধু আমি তোর আপন,

(তুমি জান না, তুমি বুঝ না) অপরাধী হইলেও বন্ধু আমি তোর আপন ॥

(বন্ধু) তোর বিরহে পুইড়া হইলাম ছাই,

দিবা-নিশি জ্বলছে আগুন, কী দিয়া নিভাই,

তোমার যত প্রকার আগুন আছে আমাকে করো অর্পণ ॥

(বন্ধু) আমার মতো দুঃখী কেহ নাই,

কী নিয়ে যে বেঁচে থাকি, কী দিয়ে বুঝাই,

কোনো দিন ভাবি নাই মনে এইভাবে যাবে জীবন ॥

(বন্ধু) কিয়ামদ্দিনের বৃথা এ জীবন,

আরশেদ তুমি এতো নিঠুর, হইলা কী কারণ,

আমি আজ হতে তোমায় দুষী না সব আমার কর্মের লিখন ॥ (গবেষক, ২০২৩ : সংগ্রহ)

(বিচ্ছেদগান-২)

যদি ভুল বুঝে চলে যাও,

যত খুশি ব্যথা দাও,

সব আমি নিরবে সইবো,

তোমার লেখা গানটারে গাইবো ॥

মন গগনের ফুলবাগানে তুমি বনমালী,

সেদিন তো আমি ছিলাম প্রথম গানের কলি,

দুটি বীণা একই সুর, ভালোবাসা কি মধুর,

তোমায় ছেড়ে যত দূরে যাইবো ॥

যে গানের বিনিময়ে ভালোবাসাবাসি,

সে গানের ছন্দে দিতাম মুক্তা-ঝরা হাসি,

সেই মিলন-রজনী আজও তারে ভুলিনি,

বিরহরাগিনী হয়ে বাঁচবো ॥

কূলহারা ফুল আমি, নাই কোনো ঠিকানা নাই,

ভুল আমায় বুঝ না বন্ধু যত দূরে ভেসে যাই,

পাব না জীবনের সাধ নিয়ে শুধু অপবাদ,

জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে মরবো ॥

ভাই বলো আর বন্ধু বলো কেউ রবে না পাশে,

মাতাল রাজ্জাকেরই পাড়ের ডাক যদি নেমে আসে,

ধূলা-কাদা মুছিয়া বন্ধুয়ার কাছে গিয়া,

চির নিদ্রায় ঢলে পড়বো ॥ (রাজ্জাক, ২০১৭ : পরিবেশনা)

(বিচ্ছেদগান-৩)

কলিজাতে দাগ লেগেছে হাজারে হাজার,

ভালোবাসার ময়না পাখি এখন জানি কার ॥

যার জন্য ঘর বানাইলাম সে রইলো না ঘরে,

সেই ঘর উড়াইয়া নিল কালবৈশাখী ঝড়ে,

প্রাণটা আমার ছটফট করে বুকে হাহাকার ॥

শিকলকাটা পাখির মত উড়িয়া গেলো,

সেদিন হতে আমার জীবন শুধু এলোমেলো,

জাতের কূলে কালি দিলো কান্না হলো সার ॥

যার জন্য সব হারাইলাম সে রাখে নাই মনে,

কার জন্য যে এত ব্যথা সইলাম এ জীবনে,

ভেবে কয় জীবন দেওয়ানে সুখের জীবন তার ॥ (জীবন, ২০১৯ : পরিবেশনা)

(বিচ্ছেদগান-৪)

তোমারে না দেখলে আমার ঘরে রয় না মনরে,

তুই আমার জীবনরে বন্ধু তুই আমার জীবন ॥

তোমার-আমার ছিলোরে বন্ধু প্রেমেরই বন্ধন,

আমায় ছেড়ে চলে গেলে পরেরই মতন ॥

একবার যদি কাছে পাইতামরে বন্ধু করিতাম যতন,

অঙ্গেতে ছিটাইয়া দিতাম তুলসী-চন্দন ॥

নগরে-বন্দরে ঘুরিরে বন্ধু পাইতে দরশন,

অন্ধের চোখের আলো তুমি সাত-রাজারই ধন ॥

আমি তোমার আশায় থাকিরে বন্ধু থাকবো সর্বক্ষণ,

কয় সালামে মনে হলে ঝরে দুই নয়ন ॥ (সালাম, ২০২০ : পরিবেশনা)

(বিচ্ছেদগান-৫)

আমি চাই না দুনিয়ার জমিদারি,

সকল দুঃখ দূরে যাইত

তুই হইলে আমারি

আমার বান্ধব রে ॥

কিসের বেহেস্ত কিসের দোজখ

আমি কি ভয় করি।

তোর নামেতে বিলাইয়া দিমু

ভবের জমিদারি ॥ ঐ

এই দেশ হইতে বন্ধুর ঐ দেশ যাইতে

যেদিন ধরব ভবের পাড়ি।

আমার গায়েতে পড়াইয়া দিও

মুর্শিদ চান্দের শাড়ি ॥ ঐ

সরকার রশিদ বলে নিদান কালে রে

তোমার ঐ রূপ যেন হেরী

আমার এই নায়ের কাণ্ডারি হইও

দয়াল বৈরাবরী ॥ (রশিদ, ২০২০ : ২৪৮)

(বিচ্ছেদগান-৬)

জ্বালা জুড়ায় না, জ্বালা জুড়ায় না রে ॥

সখী তোরা আমার হইয়া জিজ্ঞাস করিস তারে,

এত কেন পিরিতের জ্বালা পুড়াইয়া মারে রে ॥

ভিতরে বাহিরে জ্বালা

বলিব সই কারে।

শূণ্য-ভিটায় ঘর পোড়া ছাই

আমি রাইখাছি যতন করে ॥ ঐ

কাল সাপে দিয়াছে কামড়

না বুঝে প্রেম করে।

তোরা হইলে মরতি প্রাণে

আছে যেই জ্বালা মোর অন্তরে ॥ ঐ

কত কথা কইয়া বন্ধু

বাঁধলো প্রেমডোরে।

প্রেম রশির শক্ত বাঁধে

আমার কলিজায় টান মারে ॥

যা করলি তা ভালোই করলি

বইসা বৈরাবরে।

রশিদের হয় মরণ ভালো

যে জ্বালা তার অন্তরে ॥ ঐ (রশিদ, ২০২০ : ২১৯)

পরিশিষ্ট : ৩

বিচারগানের আলোকচিত্র

(অভিসন্দর্ভে সংযুক্ত ছবিসমূহ গবেষক কর্তৃক ধারণকৃত, বিভিন্ন মাধ্যম থেকে সংগৃহীত ও পরিমার্জিত)

২.১ বিচারগানের আসরে যে সকল বাউল-সুফিকবির গান বেশি পরিবেশিত হয় তাদের কয়েকজনের ছবি

ফকির লালন সাঁই

দেওয়ান আব্দুর রশিদ চিশতি

আলফু দেওয়ান

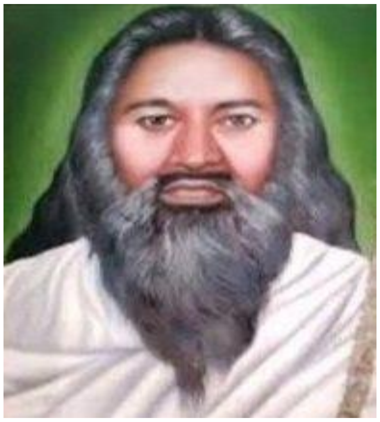

কালু শাহ ফকির

রাধাবল্লভ সরকার

বিজয় সরকার

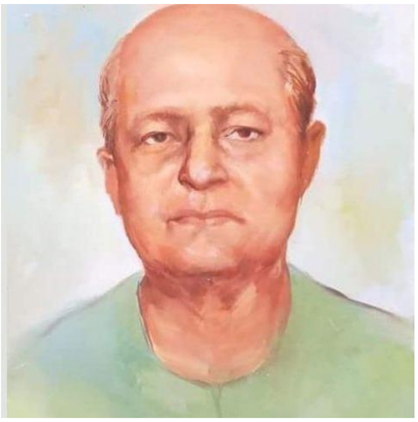

রশিদ উদ্দিন

জালাল উদ্দীন খাঁ

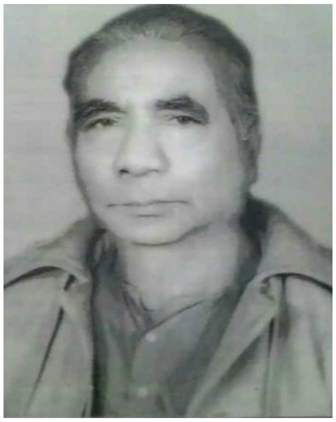

অনাদি জ্ঞান সরকার

ভবা পাগলা

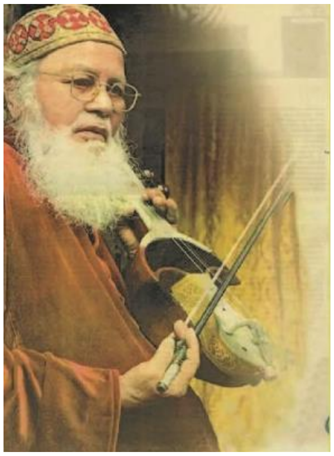

আব্দুল হালিম বয়াতি

রজ্জব আলী দেওয়ান

খালেক দেওয়ান

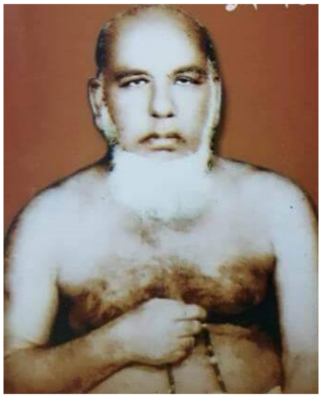

মালেক দেওয়ান

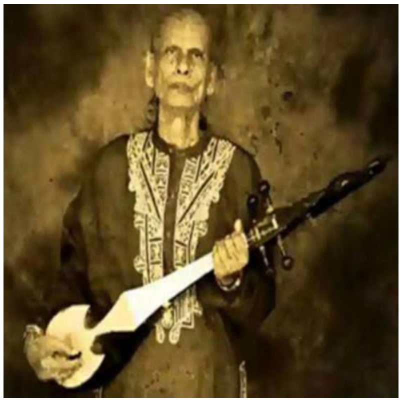

শাহ আব্দুল করিম

নূর মেহেদী আব্দুর রহমান

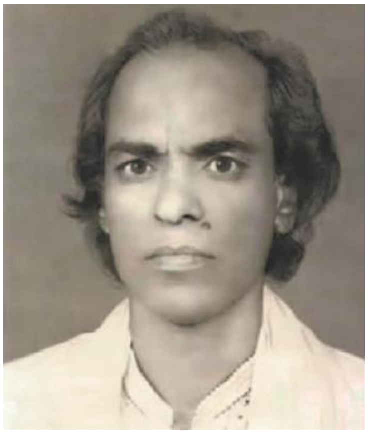

মাতালকবি রাজ্জাক দেওয়ান

আব্দুর রশিদ সরকার

আয়নাল মিয়া বয়াতি

পরশ আলী দেওয়ান

দলিল উদ্দিন বয়াতি

কারি আমির উদ্দিন

আব্দুস সাত্তার মোহন্ত

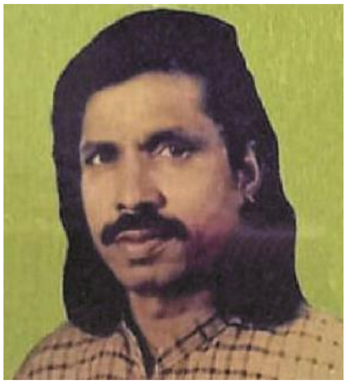

কিয়ামদ্দিন বয়াতি

বড় আবুল সরকার

ছোট আবুল সরকার (মহারাজ)

শাহ্ আলম সরকার

আলেয়া বেগম (আলো)

মায়া রাণী

সালাম সরকার

আক্কাস দেওয়ান

লতিফ সরকার

২.২ বিচারগানের যে সকল গায়েন বর্তমানে সারিন্দা বাজিয়ে আসরে গান করেন তাদের কয়েকজনের ছবি

মানিক দেওয়ান

ছোট পরশ আলী দেওয়ান

করিম দেওয়ান

২.৩ বিচারগানের যে সকল গায়েন বর্তমানে দোতারা বাজিয়ে আসরে গান করেন তাদের কয়েকজনের ছবি

আনোয়ার সরকার

এম.এ ফারুক

জয়নাল সরকার

২.৪ বিচারগানের যে সকল গায়েন বর্তমানে বেহালা বাজিয়ে আসরে গান করেন তাদের কয়েকজনের ছবি

আব্দুল গনি সরকার

সাত্তার সরকার

হেলাল সরকার

আরিফ দেওয়ান

২.৫ বিচারগানের কয়েকজন নারী গায়েনের ছবি

বিলকিস বানু

আকলিমা বেগম

দেওয়ান বাবলি সরকার

খাদিজা ভাণ্ডারী

মুক্তা সরকার

জেসমিন সরকার

২.৬ বিচারগানের কয়েকজন অন্ধ গায়েনের ছবি

শামসু দেওয়ান

সুনীল কর্মকার

হবিল সরকার

অলিদ মিয়া

আজিজুল সরকার

আনোয়ার সরকার

২.৭ আসরে বিচারগান পরিবেশনাকালে কয়েকজন গায়েনের ছবি

আসরে পরিবেশনাকালে কার্তিক সরকার

আসরে পরিবেশনাকালে আনোয়ার সরকার

আসরে পরিবেশনাকালে মানিক দেওয়ান

আসরে পরিবেশনাকালে হানিফ সরকার

আসরে পরিবেশনাকালে খাদিজা ভাণ্ডারী

আসরে পরিবেশনাকালে সাত্তার সরকার

২.৮ আসরে বিচারগান পরিবেশনাকালে দর্শক-শ্রোতার ছবি

২.৯ বিচারগানের আসরে নৃত্যরত গায়েন ও দর্শক-শ্রোতার কয়েকটি ছবি

২.১০ বিচারগানের আসরে গায়েন ও দর্শক-শ্রোতার ‘দশা-ধরা’র মুহূর্তের ছবি

২.১১ বিচারগানের গায়েনদের সংগঠন ‘বাংলাদেশ বাউল সমিতি’র অনুষ্ঠানের ছবি

২.১২ বিচারগানের আসরে দর্শক-শ্রোতা কর্তৃক গায়েনকে ‘প্যালা’ দানের মুহূর্তের ছবি

২.১৩ বিচারগানের দোহার ও বাদকদের কয়েকটি ছবি

২.১৪ বিচারগানের আসরে তাজিমি সিজদাহ্ প্রদানের ছবি

২.১৫ বিচারগানের আসর ও আসন ব্যবস্থাপনার ছবি

২.১৬ বিচারগানের পোস্টারের ছবি

২.১৭ বিচারগানের পরিবেশনাস্থল মাজার শরিফের ছবি

২.১৮ বিচারগানের আসরে আলো-ব্যবস্থাপনার ছবি

২.১৯ বিচারগানের পরিবেশনা-মাধ্যম অডিও ক্যাসেট, ভিসিডি ক্যাসেট, সিডি ক্যাসেট ও ইউটিউবে প্রচারিত বিভিন্ন পালার প্রচ্ছদ-ছবি

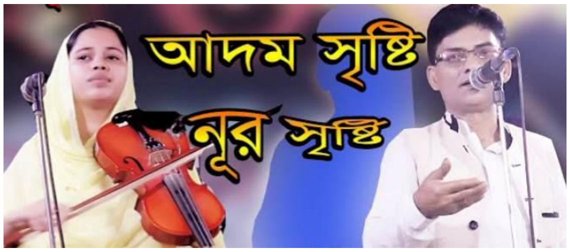

পালা গান
শরিয়ত মারফত
শিল্পী : মিতু সরকার ও
শাহ আলম সরকার

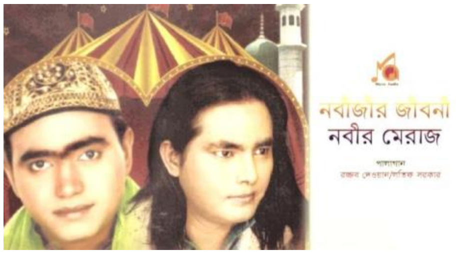
নবীজীর জীবনী
নবীর মেরাজ

SUBRATA DEB PRESENTS
শ্রেষ্ঠ পালা গান
নারী
পুরুষ

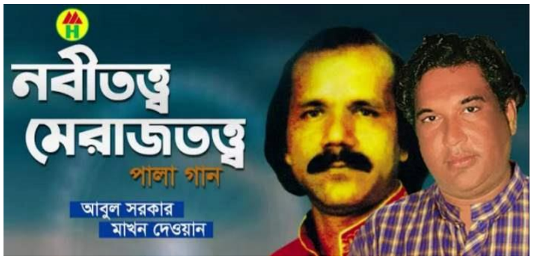
নবীতত্ত্ব
মেরাজতত্ত্ব
পালা গান
আবুল সরকার
মাখন দেওয়ান

নূরতত্ত্ব-কারতত্ত্ব
মাখন দেওয়ান
দলিল উদ্দিন

নারী
পুরুষ
লিপি সরকার

দেবর
ভাবী
রঙ্গরস
Abdul Gani Sarkar, Saleha Sarkar
Album
Debor Bhabi Rongoros

শরিয়ত
মারফত

গুরু-শিষ্য
সকল তত্ত্ব ফাঁস
ফকির আবুল সরকার
ছোট আবুল সরকার

পালা গান
দাদা
নাতিন

শরিয়ত
মারেফত
আয়নাল বয়াতী
দলিলউদ্দিন বয়াতী

মা-ছেলের
হাডাহাড্ডি
লড়াই

আদমতত্ত্ব
দেহতত্ত্ব
আবুল সরকার
শাহ আলম সরকার

মামা
ভাগনী
মালেক সরকার
নীলা পাগলী

আদি
আদম
বিশ্ব
নবী

CD ZONE Present's
আদম
শয়তান

ননদ
ভাবী
আকলিমা
মিনারা বেগম

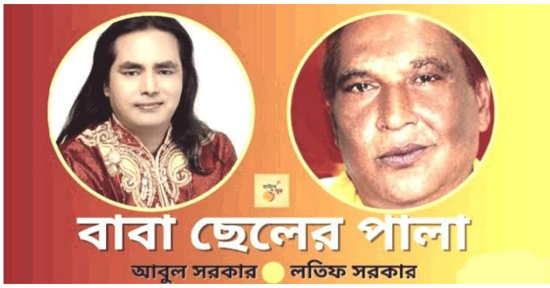
বাবা ছেলের পালা
আবুল সরকার
লতিফ সরকার

কাম প্রেম
পালা
রশিদ সরকার
মমতাজ

আদম সৃষ্টি ও
নূর সৃষ্টি
বাবু সুনীল কর্মকার ও
ক্বারী বারেক বেদেশী

Dhaka University Institutional Repository

গুরু শিষ্য
আক্কাস দেওয়ান • রুমা আক্তার

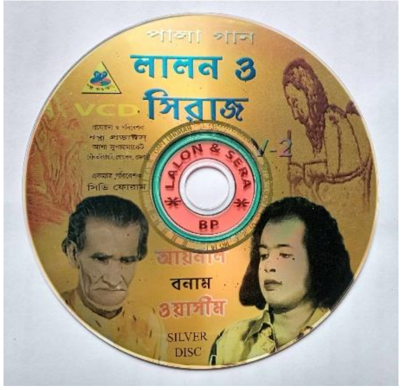
পালা গান
লালন ও সিরাজ
VCD
বনাম
SILVER DISC

মা-বাবা'র পালা
আলেয়া বেগম
রশিদ সরকার
আঃ হালিম প্রযোজিত

বুলু নিবেদিত
গুরু শিষ্য
SILVER DISC
কাজল দেওয়ান
লতিফ সরকার
VCD

সাউন্ডটেক এর উপহার
জিন্দা ওলি খাজা বাবা
SILVER DISC
VCD
ছোট আবুল

গুরু শিষ্য
পালা
VCD
শেফালী • আবুল

সামিয়া
নারী পুরুষ
পালাগান
VIDEO CD
রশিদ সরকার
SILVER DISC

Soundtek
সাউন্ডটেক এর উপহার
গুরু শিষ্য
পালা
SILVER DISC
Video CD
রশিদ সরকার
ছোট আবুল

গুরু শিষ্য
SILVER DISC
আবুল সরকার । পরশ আলী
VideoCD

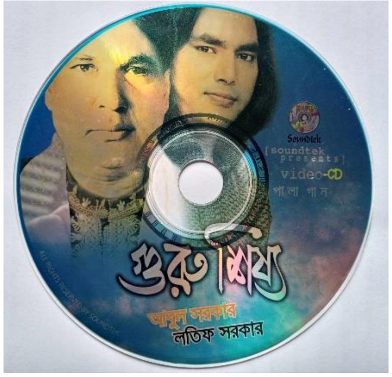
video-CD
পালা গান
গুরু শিষ্য
আবুল সরকার
লতিফ সরকার

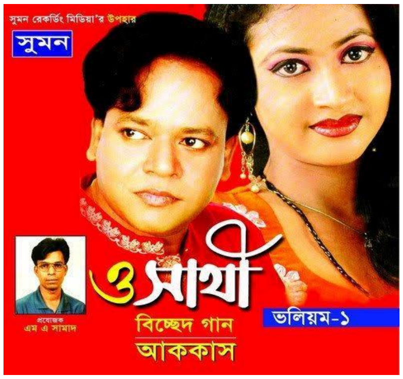
সুমন রেকর্ডিং মিডিয়া'র উপহার
সুমন
ও সাথী
বিচ্ছেদ গান
আককাস
ভলিয়ম-১
প্রযোজক
এম এ সামাদ

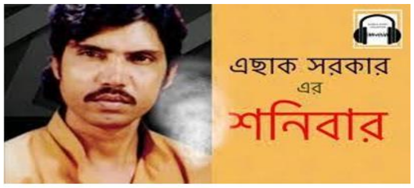
এছাক সরকার
এর
শনিবার

RMP
মন তুই আমার
এছাক সরকার

তথ্যনির্দেশ

অন্নদাশংকর রায় (২০১৭)। *লালন ফকির ও তাঁর গান*। কবি প্রকাশনী, ঢাকা।

অনন্ত কুমার বিশ্বাস (২০২৩)। *গবেষক কর্তৃক সাক্ষাৎকার গ্রহণ*। হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ।

অনুপ সাদি (২০২১)। *লোকসংস্কৃতি একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর দ্বারা ভাগ করা সংস্কৃতির অভিব্যক্তিপূর্ণ অঙ্গ*। ফুলকিবাজ।

অরূপ রাহী (২০১৮)। *উপস্থাপক: বিচারগানের নবুয়েত-বেলায়েত পালা*। ঢাকা।

লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=P3Zt5LkY1KE&t=808s

অসীম দাস বাউল (২০১৬)। *বিচারগানের লালন সাঁই-সিরাজ সাঁই পালা*। বন্ধু প্রোডাক্ট, ইউটিউব।

লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=ojMErnl-h7Y

অসীম দাশ বাউল (২০১৯)। *বিচারগানের হিন্দু-মুসলমান পালা*। জয়গুরু মিডিয়া।

অসীম দাস বাউল (২০১৯)। *বিচারগানের লালন সাঁই-রশিদ সাঁই পালা*। চ্যানেল রঙধনু, ইউটিউব।

লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=kBkqKRSw9gE

আকলিমা বেগম (২০০৭)। *ভিসিডি ক্যাসেট : বিচারগানের কাম-প্রেম পালা*। মানিকগঞ্জ।

আকলিমা বেগম (২০২০)। *গীতিকার-সুরকারের স্বকণ্ঠে গাওয়া গান হতে সংগৃহীত*। ইউটিউব।

লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=ChYo4DPR3cY&t=1076s

আকলিমা বেগম (২০১৭)। *ভিসিডিতে বিচারগানের পরিবেশনা*। ঢাকা।

লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=gRxpIdEuR8c&t=1746s

আলীম আল রাজী (২০১০)। *বাংলা লোকনাট্য পালাগান : প্রকৃতি ও প্রয়োগ*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

আরিফ দেওয়ান (২০২১)। *গবেষক কর্তৃক সাক্ষাৎকার গ্রহণ*। কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।

আলেয়া বেগম আলো (২০২০)। *মঞ্চে বিচারগানের পরিবেশনা*। ঢাকা।

আব্দুর রশিদ সরকার ও আমজাদ সরকার (২০০৮)। *ভিসিডি ক্যাসেট : বিচারগানের গুরু-শিষ্য পালা*। ঢাকা।

আব্দুর রশিদ সরকার ও আকলিমা বেগম (২০০৭)। *ভিসিডি ক্যাসেট : বিচারগানের কাম-প্রেম পালা*। মানিকগঞ্জ।

আলেয়া বেগম (২০১৭)। *বিচারগানের রাধা-কৃষ্ণ পাল পরিবেশনা*, ইউটিউব।

লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=fx8PmKpD7F4&t=1532s

আকলিমা বেগম (২০২১)। *নারী-পুরুষ পালায় আকলিমা বেগমের পরিবেশনা হতে সংগৃহীত*। ইউটিউব।

লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=udHmel-oxkk&t=20s

আকলিমা বেগম (১৯৯৯)। *অডিও ক্যাসেট : বিচারগানের দেবর-ভাবী পালা*। ঢাকা।

লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=_nHGRgcJY-g&t=2196s

আকলিমা বেগম (২০২০)। *অডিও ক্যাসেট : বিচারগানের দুই বাইদানী পালা*। সিডি জোন, ইউটিউব।

লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=uxZSlPn4Ka4

আকলিমা বেগম (২০১৬)। *ভিসিডি ক্যাসেট : বিচারগানের দাদা-নাতিন পালা*। ইসলামী জগৎ, ইউটিউব।

লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=nMQpMIwIe4w

আকলিমা বেগম (২০১৬)। *ভিসিডি ক্যাসেট : বিচারগানের দাদি-নাতিন পালা*। মিউজিক হ্যাভেন, ইউটিউব।

লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=4B9M_y0chHk

আকলিমা বেগম (২০১৬)। *ভিসিডি ক্যাসেট : বিচারগানের জামাই-শাশুড়ি পালা*। মিউজিক হ্যাভেন, ইউটিউব।

লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=IpczmG0RIUE

আকলিমা বেগম (২০২১)। *ভিসিডি ক্যাসেট : বিচারগানের বউ-শাশুড়ি পালা*। তরঙ্গ ইলেক্ট্রো সেন্টার, ইউটিউব।

লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=0U4tQzlKhcc

আ.জ.ম. ওবায়দুল্লাহ্ (২০২১)। *কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা ও আমাদের শিক্ষা*। যুগান্তর পত্রিকা, ঢাকা।

আজিজ সরকার (২০০৯)। *গবেষক কর্তৃক সাক্ষাৎকার গ্রহণ*। ঘিওর, মানিকগঞ্জ।

আজির হাসিব (২০২০)। *লোকসাহিত্য লোকসংস্কৃতি*। নাগরী, সিলেট।

আব্দুর রশিদ সরকার (২০২০)। *রশিদগীতি : মানুষে আল্লাহ থাকে*। র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা।

আব্দুর রশিদ সরকার ও মমতাজ বেগম (১৯৯৫)। *অডিও ক্যাসেট : বিচারগানের আদম-শয়তান পালা*। রাজবাড়ি।

আব্দুর রশিদ সরকার (১৯৯৫)। *অডিও ক্যাসেট : বিচারগানের আদম-শয়তান পালা*। রাজবাড়ি।

আব্দুর রশিদ সরকার ও মমতাজ বেগম (১৯৯৫)। *অডিও ক্যাসেট : বিচারগানের নারী-পুরুষ পালা*। ঢাকা।

আবদেল মাননান (২০০৯)। *অখণ্ড লালনসঙ্গীত*। রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা।

আবদুল খালেক (২০২২)। *মযহারুল ইসলাম ফোকলোর গ্যালারি : প্রাসঙ্গিক ভাবনা*, ইত্তেফাক পত্রিকা, ঢাকা।

আব্দুল গনি সরকার (২০২০)। *ভিসিডি ক্যাসেট : বিচারগানের নানা-নাতিন পালা*। সংগীতা, ইউটিউব।

লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=ubf3AHMc4Lo&t=286s

আলাউদ্দিন বয়াতি (২০১৬)। *মুজিব পরদেশীর পরিবেশনা থেকে সংগৃহীত* । চেনাসুর, ইউটিউব।

লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=DrZ4WmLPhjI

আব্দুস সাত্তার মোহন্ত (২০১৬)। *গীতিকার-সুরকারের স্বকণ্ঠে গাওয়া গান হতে সংগৃহীত*। বাউলগান, ইউটিউব।

লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=46tWgEQ-6P8

আলেয়া বেগম আলো (২০২১)। *গীতিকার-সুরকারের স্বকণ্ঠে গাওয়া গান হতে সংগৃহীত*। চ্যানেল রংধনু।

ইউটিউব। লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=NaMEvux-hk0

আয়নাল মিয়া বয়াতি (২০১৪)। *গীতিকার-সুরকারের স্বকণ্ঠে গাওয়া গান হতে সংগৃহীত*। বন্ধু প্রোডাক্ট, ইউটিউব।

লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=dwVdFm0Ws48

আয়নাল মিয়া বয়াতি (২০১৬)। *বিচারগানের লালন সাঁই-সিরাজ সাঁই পালা*। বন্ধু প্রোডাক্ট, ইউটিউব।

লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=ojMErnl-h7Y

ইয়ামিন সরকার (২০২০)। *মা-ছেলে পালায় ইয়ামিন সরকারের পরিবেশনা হতে সংগৃহীত*। ইউটিউব।

লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=oGD1wdTG59I&t=769s

কাজল দেওয়ান (১৯৯৯)। *ভিসিডি ক্যাসেট : বিচারগানের বাবা-মা পালা*। ঢাকা।

কাজল দেওয়ান (২০১৪)। *গবেষক কর্তৃক সাক্ষাৎকার গ্রহণ*। ঝিটকা, মানিকগঞ্জ।

কাজল দেওয়ান (২০১৭)। *বিচারগানের বেহেস্ত-দোজখ পালা*। মিউজিক হ্যাভেন, ইউটিউব।

লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=tJCiLnbSvTo

কাজল দেওয়ান (২০১৮)। *বিচারগানের নবুয়েত-বেলায়েত পালা পরিবেশনা*। ঢাকা।

লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=P3Zt5LkY1KE&t=808s

কাজল দেওয়ান (২০১৯)। *মঞ্চে বিচারগানের বন্দনাগীতের পরিবেশনা*। ফকির মওলা দরবার শরিফ, মানিকগঞ্জ।

কানন দেওয়ান (২০২১)। *মঞ্চে বিচারগানের পরিবেশনা*। ঢাকা

খাদিজা ভাণ্ডারী (২০২২)। *দেহতত্ত্ব-পারঘাটা পালা*। সুরের বাঁধন, ইউটিউব।

লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=R27_ix1XwtI

খোরশেদ আলম বয়াতি (২০১৭)। *বিচারগানের রাধা-কৃষ্ণ পাল পরিবেশনা*। ইউটিউব।

লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=fx8PmKpD7F4&t=1532s

খোরশেদ আলম বয়াতি (২০১৭)। *ভিসিডি ক্যাসেট : বিচারগানের বাইদা-বাইদানী পালা*, বাউলমেলা, ইউটিউব।

লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=itwqh_fxIPs&t=1194s

খোরশেদ আলম বয়াতি ও আলেয়া বেগম (২০১৭)। *বিচারগানের রাধা-কৃষ্ণ পাল পরিবেশনা*,

লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=fx8PmKpD7F4&t=1532s

ছোট আবুল সরকার (২০১৮)। *গীতিকার-সুরকারের স্বকণ্ঠে গাওয়া গান হতে সংগৃহীত*। চ্যানেল রুপালি,

ইউটিউব। লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=tVYnGxViF74

Dhaka University Institutional Repository

ছোট আবুল সরকার (২০১৮)। *বিচারগানের নবুয়েত-বেলায়েত পালা পরিবেশনা*। ঢাকা।
লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=P3Zt5LkY1KE&t=808s

ছোট আবুল সরকার (২০২০)। *মঞ্চে বিচারগান পরিবেশনা*। ফকির মওলা দরবার শরিফ, মানিকগঞ্জ।

ছোট আবুল সরকার (২০২০)। *মঞ্চে বিচারগান পরিবেশনা*। ফকির মওলা দরবার শরীফ, মানিকগঞ্জ।
লিংক- https://youtu.be/QFplK2Dh-og

ছোট আবুল সরকার (২০২০)। *গীতিকার-সুরকারের স্বকণ্ঠে গাওয়া গান হতে সংগৃহীত*। বাউলমাতা আলেয়া আলো, ইউটিউব। লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=6-bTlqgAt24

ছোট আবুল সরকার (২০২০)। *বিচারগানের সংসার-সন্ন্যাস পালা*। সিডি জোন, ইউটিউব।
লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=E54aV1RHx7A

ছোট আবুল সরকার (২০২১)। *গীতিকার-সুরকারের স্বকণ্ঠে গাওয়া গান হতে সংগৃহীত*। বাংলা বাউল মিডিয়া, ইউটিউব। লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=JF_PQ63fNhE

ছোট রজ্জব আলী দেওয়ান (২০১৭)। *ভিসিডি ক্যাসেটে স্বামী-স্ত্রী পালায় স্বামী পক্ষে পরিবেশনা*। তরঙ্গ ইলেক্ট্রো সেন্টার, ইউটিউব। লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=qhZNs6S9etg&t=1597s

ছোট রজ্জব দেওয়ান (২০১৮)। *ভিসিডি ক্যাসেট : বিচারগানের বিয়াই-বিয়াইন পালা*। বাউল মেলা, ইউটিউব।
লিংক-https://www.youtube.com/watch?v=khnJ8M95IH0

জালাল সরকার (২০১৯)। *মঞ্চে বিচারগানের পরিবেশনা*। মানিকগঞ্জ।

জীবন দেওয়ান (২০১৯)। *গীতিকার-সুরকারের স্বকণ্ঠে গাওয়া গান হতে সংগৃহীত*। সুর-অঞ্জলী, ইউটিউব।
লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=hDzAlsfX2jU

জেসমিন সরকার ও হবিল সরকার (২০২১)। *বিচারাগানের খাজা বাবা-নবির জীবনী পালা*। এম.টিভি পালা, ইউটিউব। লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=uu1tpggXxsQ

ড. আশুতোশ ভট্টাচার্য (১৩৭৪)। *বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, সংখ্যা ৩য়*। কলকাতা।

ড. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (১৯৭২)। *বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা*। কলিকাতা।

ড. তপন বাগচী [সম্পা.] (২০২২)। *মাতাল রাজ্জাক গীতিমালা*। আলোকায়ন, ঢাকা।

ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী (১৯৯৫)। *বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ*। অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলিকাতা।

ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী (২০০৯)। *লোকসংস্কৃতির সাতকাহন*। বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা।

ড. মুহম্মদ এনামুল হক [সম্পা.] (২০১০)। *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

ড. মুহাম্মদ আবদুল হাননান (২০১৬)। *মহানবী (সা.)-এর জন্ম তারিখ নিয়ে ঐতিহাসিকদের অভিমত*। ২২ এপ্রিল, কালের কণ্ঠ।

ড. মযহারুল ইসলাম (২০২০)। *ফোকলোর পরিচিত ও পঠন-পাঠন*। অবসর, ঢাকা।

ড. শরদিন্দু ভট্টাচার্য (২০১১)। ফোকলোর ও লোকসংস্কৃতি। রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা।

ড. সুরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ও ড. ছন্দা চক্রবর্তী [বঙ্গানুবাদ] (১৯৯৭)। *ভরত নাট্যশাস্ত্র : ১ম খণ্ড*। [সম্পা. ড. সুরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়], নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা।

ড. সুরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ও ড. ছন্দা চক্রবর্তী [বঙ্গানুবাদ] (১৯৯৭)। *ভরত নাট্যশাস্ত্র : ২য় খণ্ড*। [সম্পা. ড. সুরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়], নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা।

দেওয়ান খাজা শাহ্ আব্দুর রশিদ চিশ্তি নেজামী (১৯৮৪)। *জ্ঞান-সিন্ধু বা গঞ্জে তওহিদ*। উদিবাড়ী, কুষ্টিয়া।

দেওয়ান মো. রজ্জব আলী চিশতি নিজামি (২০১৮)। *জ্ঞানের প্রদীপ : রজ্জবগীতি(২য় খণ্ড)*। বাউল প্রকাশনী, ঢাকা।

নীলা পাগলী (২০১৭)। *বুড়ির সাথে ছোকরার প্রেম বা বুড়ি-ছোকরা পালায় পরিবেশনা*। সংগীতা, ইউটিউব। লিংক-https://www.youtube.com/watch?v=QXcwddQQJN0&t=3115s

নীলা পাগলী (২০১৭)। *বুড়ির সাথে ছোকরার প্রেম বা বুড়ি-ছোকরা পালার পরিবেশনা থেকে সংগৃহীত*। সংগীতা, ইউটিউব। লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=QXcwddQQJN0&t=3121s

নীলা পাগলী (২০১৭)। *ভিসিডি ক্যাসেট : বিচারগানের দাদি-নাতি পালা*। সংগীতা, ইউটিউব। লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=4_5SRIqBlGg

নীলা পাগলী (২০১৮)। *ভিসিডি ক্যাসেট : বিচারগানের মামী-ভাগিনা পালা*। সংগীতা, ইউটিউব। লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=fIFReXr80JI

নীলা পাগলী (২০১৮)। *গীতিকার-সুরকারের স্বকণ্ঠে গাওয়া গান হতে সংগৃহীত*। ইউটিউব। লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=o-dlFtBLXPM&t=1023s

নীলা পাগলী (২০২০)। *বিচারগানের পাগলা-পাগলী পালা*। সিডি জোন, ইউটিউব। লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=aX4Yl-8yVhc

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী (১৩৯৮)। *মহাভারতের ভারত যুদ্ধ এবং কৃষ্ণ*। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

পরশ আলী দেওয়ান (১৯৮৫-৯০)। *অডিও ক্যাসেটে বিচারগানের বন্দনাগীত পরিবেশনা*। দোহার, ঢাকা।

পরশ আলী দেওয়ান (২০২০)। *অডিও ক্যাসেট : বিচারগানের আদম-শয়তান পালা*। সিডি জোন, ইউটিউব। লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=u9tY-Rhh764

পরশ আলী দেওয়ান (২০২০)। *বিচারগানের ধনী-গরীব পালা*। সিডি জোন, ইউটিউব।

লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=Mb78NHCnvsk

পারুল সরকার (২০২০)। *গবেষক কর্তৃক সাক্ষাৎকার গ্রহণ*। হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ।

পাখি সরকার ও খোরশেদ আলম বয়াতি (২০১৭)। *ভিসিডি ক্যাসেট : বিচারগানের বাইদা-বাইদানী পালা*, বাউলমেলা, ইউটিউব। লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=itwqh_fxIPs&t=1194s

পাখি সরকার (২০১৭)। *ভিসিডি ক্যাসেট : বিচারগানের বাইদা-বাইদানী পালা*, বাউলমেলা, ইউটিউব।

লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=itwqh_fxIPs&t=1194s

পাখি সরকার (২০১৮)। *ভিসিডি ক্যাসেট : বিচারগানের দুই বিয়াইন পালা*। সুরের ভিশন, ইউটিউব।

লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=65e-B5BuUk4&t=577s

পাখি সরকার ও আব্দুল গনি সরকার (২০২০)। *ভিসিডি ক্যাসেট : বিচারগানের নানা-নাতিন পালা*। সংগীতা, ইউটিউব। লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=ubf3AHMc4Lo&t=286s

পাখি সরকার (২০২০)। *ভিসিডি ক্যাসেট : বিচারগানের নানা-নাতিন পালা*। সংগীতা, ইউটিউব।

লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=ubf3AHMc4Lo&t=286s

পাগল মনির (১৯৯৮)। *অডিও ক্যাসেট : বিচারগানের জীব-পরম পালা*। ঢাকা।

পাগল মনির (২০১৭)। *ভিসিডি ক্যাসেট : বিচারগানের শালা-দুলাভাই পালা*। মিউজিক হ্যাভেন, ইউটিউব।

লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=Q7sUrJkua4M

পাগল মনির (২০১৯)। *গীতিকার-সুরকারের স্বকণ্ঠে গাওয়া গান হতে সংগৃহীত*। এস.কে. মিউজিক। ইউটিউব।

লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=tyWe3gzg2EM

পাগল সোহরাব (২০২০)। *অডিও ক্যাসেটে গীতিকার-সুরকারের স্বকণ্ঠে গাওয়া গান হতে সংগৃহীত*। মিউজিক হ্যাভেন, ইউটিউব। লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=dr0-cnCi7dc&t=2518s

পাগল দুলাল (২০২০)। *বিচারগানের শাহ জালাল-শাহ পরান পালা*। গানের আসর, ইউটিউব।

লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=fGivJjfPcSI

পান্নু কাদরি (২০২৩)। *গবেষক কর্তৃক সাক্ষাৎকার গ্রহণ*। হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ।

ফকির আবুল সরকার (২০২০)। *মঞ্চে বিচারগানের বন্দনাগীত পরিবেশনা*। কাজী স্টুডিও, রাজবাড়ি। ইউটিউব।

লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=JBsv5C4DUDU

বড় আবুল সরকার (২০১৭)। *বড় আবুল সরকারের পরিবেশনা থেকে সংগৃহীত*। মিউজিক হ্যাভেন, ইউটিউব।

Dhaka University Institutional Repository

লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=9qKbNoCAgwM

বারেক বৈদেশী (২০২৩)। *বিচারাগানের নবির জীবনী-কৃষ্ণের জীবনী পালা*। এম.টিভি পালা, ইউটিউব।

লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=6iTIQOTk3KE

বাবুল মৃধা (২০২৩)। *গবেষক কর্তৃক সাক্ষাৎকার গ্রহণ*। হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ।

বিজয় সরকার (২০২২)। *গবেষক কর্তৃক অডিও থেকে সংগৃহীত গান : আমরা বহুনামে ধরাধামে*। ঢাকা।

বিশ্বজিৎ হালদার (২০১৯)। *তরজাগান : বাঙালির একটি পরম্পরীণ সংস্কৃতিচর্চার সন্ধানে*। কোলকাতা।

লিংক-https://www.sahapedia.org

বিষ্ণু দাশ (২০১৪)। *জন্মাষ্টমী : ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব*। প্রথম আলো পত্রিকা, ঢাকা।

মজিবর রহমান (২০২৩)। *গবেষক কর্তৃক সাক্ষাৎকার গ্রহণ*। টঙ্গী, গাজীপুর।

মমতাজ বেগম ও লতিফ সরকার (২০১৫)। *ভিসিডি ক্যাসেট : বিচারগানের শরিয়ত-মারফত পালা*, ঢাকা।

মমতাজ বেগম (২০১৭)। *অডিও ক্যাসেট : বিচারগানের নুরতত্ত্ব-কারতত্ত্ব পালা*। ইউটিউব।

লিংক-https://www.youtube.com/watch?v=WgkpA0zdo_4

মাতালকবি রাজ্জাক দেওয়ান (২০১৭)। *গীতিকার-সুরকারের স্বকণ্ঠে গাওয়া গান হতে সংগৃহীত*। ইউটিউব।

লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=mXNoZtHTe_c&t=54s

মাতালকবি রাজ্জাক দেওয়ান (২০১৭)। *গীতিকার-সুরকারের পুত্রের গাওয়া গান থেকে সংগৃহীত*। কাজল দেওয়ান-টপিক, ইউটিউব। লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=gg43u78-tdA

মানিক দেওয়ান (২০২৩)। *গবেষক কর্তৃক সাক্ষাৎকার গ্রহণ*। রাজবাড়ি।

মালেক সরকার ও শংকর দাশ বাউল (১৯৯৮)। *ভিসিডি ক্যাসেট : বিচারগানের হিন্দু-মুসলমান পালা*। ঢাকা।

মালেক সরকার (১৯৯৮)। *ভিসিডি ক্যাসেট : বিচারগানের হিন্দু-মুসলমান পালা*। ঢাকা।

মালেক সরকার (২০১৬)। *ভিসিডি ক্যাসেট : বিচারগানের দাদা-নাতিন পালা*। ইসলামী জগৎ, ইউটিউব।

লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=nMQpMIwIe4w

মালেক সরকার (২০১৭)। *ভিসিডি ক্যাসেট : বিচারগানের শালা-দুলাভাই পালা*। মিউজিক হ্যাভেন, ইউটিউব।

লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=Q7sUrJkua4M

মালেক সরকার (২০১৮)। *গীতিকার-সুরকারের স্বকণ্ঠে গাওয়া গান হতে সংগৃহীত*। ইউটিউব।

লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=o-dlFtBLXPM&t=1023s

মালেক সরকার (২০২০)। *বিচারগানের পাগলা-পাগলী পালা*। সিডি জোন, ইউটিউব।

লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=aX4Yl-8yVhc

মালেক সরকার (২০২০)। *ভিসিডি ক্যাসেট : বিচারগানের বুড়া-ছুকরি পালা*। সিডি জোন, ইউটিউব।

লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=v_5FBrJdokk

মাওলানা মাজহার উদ্দিন (২০২১)। *বড়পীর হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.)-এর জীবনী*। সোলেমানিয়া বুক হাউজ, ঢাকা।

মাহবুব আলম বেগ (১৯৯৯)। 'বাংলাদেশের লোকনাট্য'। *বাংলার লোকঐতিহ্য লোকনাট্য*। [সম্পা. সৈকত আসগর], বাংলা একাডেমি, ঢাকা

মায়া রাণী (২০২২)। *বিচারগানের তরিকার ভাই-তরিকার বোন পালা*। গানের আসর, ইউটিউব।

লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=XANpVXkFVQ0

মিনারা বেগম (২০২০)। *অডিও ক্যাসেট : বিচারগানের দুই বাইদানী পালা*। সিডি জোন, ইউটিউব।

লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=uxZSlPn4Ka4

মুস্তাফিজুর রহমান সৈয়দ (১৯৯৯)। *স্তানিস্লাভ্স্কির অভিনয় পদ্ধতি : সোনিয়া মুর*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

মুহাম্মাদ উছমান গনী (২০২০)। *ইসলামি বিশ্বাসে কিয়ামত ও হাশর-নশর*। প্রথম আলো পত্রিকা, ঢাকা।

মোবারক হোসেন খান (২০০৭)। *লালন সমগ্র*। গীতাঞ্জলি, ঢাকা।

মোহাম্মদ আবুল খায়ের (২০০২)। *'গরীবে নেওয়াজ খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তি (রহ.)*। সোলেমানিয়া বুক হাউজ, ঢাকা।

মোহাম্মদ সাইদুর (১৯৯৯)। *'লোকনাট্য'। বাংলার লোক ঐতিহ্য লোকনাট্য*। [সম্পা. সৈকত আসগর], বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

মোহাম্মদ সাইদুর (২০১৭)। 'লোকনাট্যকলা'। *বাংলাদেশের লোকঐতিহ্য* [সম্পা. শামসুজ্জামান খান], বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

মো. আজিমদ্দিন (২০২১)। *গবেষক কর্তৃক সাক্ষাৎকার গ্রহণ*। হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ।

মো. আমজেল বিশ্বাস (২০২৩)। *গবেষক কর্তৃক সাক্ষাৎকার গ্রহণ*। হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ।

মো. আরফান দয়াল (২০২৩)। *গবেষক কর্তৃক সাক্ষাৎকার গ্রহণ*। হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ।

মো. জাহিদ হোসেন (২০২৩)। *গবেষক কর্তৃক কিয়ামদ্দিন বয়াতির বিচ্ছেদগান সংগ্রহ*। হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ।

মো. দিরাজদ্দিন (২০২০)। *গবেষক কর্তৃক সাক্ষাৎকার গ্রহণ*। হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ।

মো. মনছুর আলী আল চিশতি (১৩৮৮)। *ছের্‌রোল কোরআন বা আকাশ বাণী*। উদিবাড়ী দায়রাপাক, কুষ্টিয়া।

Dhaka University Institutional Repository

মো. মোজাম্মেল হেসেন (২০২৩)। *গবেষক কর্তৃক সাক্ষাৎকার গ্রহণ*। হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৭১)। *গীতবিতান*। বিশ্বভারতী, কলকাতা।

রশিদুন্ নবী [সম্পা.] (২০১৬)। *নজরুল-সংগীত সংগ্রহ*। নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

রুবেল সাইদুল আলম (২০২২)। *মালজোড়া গানের জনক বাউল রশিদ উদ্দিনের জন্মদিনে শ্রদ্ধাঞ্জলি*। কালের কণ্ঠ পত্রিকা, ঢাকা।

লতিফ সরকার (২০১৫)। *ভিসিডি ক্যাসেট : বিচারগানের শরিয়ত-মারফত পালা*, ঢাকা।

লতিফ সরকার (২০১৭)। *গীতিকার-সুরকারের স্বকণ্ঠে গাওয়া গান হতে সংগৃহীত*, ইউটিউব। লিংক-https://www.youtube.com/watch?v=gRxpIdEuR8c&t=1746s

লতিফ সরকার (২০১৭)। *গীতিকার-সুরকারের স্বকণ্ঠে গাওয়া গান হতে সংগৃহীত*। সুরের ভুবন, ইউটিউব। লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=OY1Z2S8ptrA

লিপি সরকার (২০১৭)। *ভিসিডি ক্যাসেটে স্বামী-স্ত্রী পালায় স্ত্রী পক্ষে পরিবেশনা*। তরঙ্গ ইলেক্ট্রো সেন্টার, বি.বাড়িয়া, ইউটিউব। লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=qhZNs6S9etg&t=1597s

লিপি সরকার (২০১৭)। *গীতিকার-সুরকারের স্বকণ্ঠে গাওয়া গান হতে সংগৃহীত*। চেনাসুর, ইউটিউব। লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=cd7OundaqHw&t=2016s

লাল মিয়া বয়াতি (২০১৭)। *অডিও ক্যাসেট : বিচারগানের নুরতত্ত্ব-কারতত্ত্ব পালা*। ইউটিউব। লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=WgkpA0zdo_4

লতিফ সরকার (২০১৮)। *ভিসিডি ক্যাসেট : বিচারগানের ভাই-ভাই পালা*। অডিও ইলেকট্রনিক্স, ইউটিউব। লিংক-https://www.youtube.com/watch?v=-sRgZ5laElk

লতিফ সরকার (২০১৭)। *বিচারগানের বেহেস্ত-দোজখ পালা*। জান্নাত মিউজিক, ইউটিউব। লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=A-SF1rjrqRU

লতিফ সরকার (২০১৯)। *গীতিকার-সুরকারের স্বকণ্ঠে গাওয়া গান হতে সংগৃহীত*। ইউটিউব। লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=vdMeulgaeK8

লতিফ সরকার (২০২১)। *বিচারগানের হাশরের মাঠ-কারবালার মাঠ পালা*। লতিফ সরকার মিউজিক, ইউটিউব। লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=7BsNN9a8_uE

লিপি সরকার (২০১৮)। *ভিসিডি ক্যাসেট : বিচারগানের বিয়াই-বিয়াইন পালা*। বাউল মেলা, ইউটিউব। লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=khnJ8M95IH0

শংকর দাশ বাউল (১৯৯৮)। *ভিসিডি ক্যাসেট : বিচারগানের হিন্দু-মুসলমান পালা*। ঢাকা।

শাকির দেওয়ান [সম্পা.] (২০১৫)। *আলফু দেওয়ান : জীবন ও সংগীত*। নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ঢাকা।

শাহিন টিটু (২০২৩)। *গবেষক কর্তৃক সাক্ষাৎকার গ্রহণ*। হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ।

শহীদ মিয়া (২০২৩)। *গবেষক কর্তৃক সাক্ষাৎকার গ্রহণ*। হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ।

শাহ আলম সরকার (২০০৭)। *ভিসিডিতে বিচারগানের পরিবেশনা*। ঢাকা।

শাহ আলম সরকার (২০১১)। *গীতিকার-সুরকারের স্বকণ্ঠে গাওয়া গান হতে সংগৃহীত*। সত্যজানি, ইউটিউব। লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=Yv_zMbJCNVY

শাহ আলম সরকার (২০১৭)। *গীতিকার-সুরকারের স্বকণ্ঠে গাওয়া গান হতে সংগৃহীত*। ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ফোক ফেস্ট, ইউটিউব। লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=tn8TGTpBY-E

শাহ আলম সরকার (২০১৭)। *বিচারগানের জিন্দা-মরা পালা*। বাউল মেলা, ইউটিউব। লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=9wVQjLXCAlw

শাহ আলম সরকার (২০১৮)। *বিচারগানের বেহেস্ত-দোজখ পালা*। বাউল মেলা, ইউটিউব। লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=uZujVNOvD-Q

শেফালী সরকার (১৯৯৯)। *ভিসিডি ক্যাসেট : বিচারগানের বাবা-মা পালা*। ঢাকা।

শেফালী সরকার ও লিপি সরকার (২০১৭)। *ভিসিডি ক্যাসেট : বিচারগানের ননদ-ভাবী পালা*। চেনাসুর, ইউটিউব। লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=cd7OundaqHw&t=2016s

শেফালী সরকার (২০১৭)। *ভিসিডি ক্যাসেট : বিচারগানের ননদ-ভাবী পালা*। চেনাসুর, ইউটিউব। লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=cd7OundaqHw&t=2016s

শেফালী সরকার ও কাজল দেওয়ান (১৯৯৯)। *ভিসিডি ক্যাসেট : বিচারগানের বাবা-মা পালা*। ঢাকা।

শরীফ উদ্দীন (২০১৯)। শরীফ উদ্দীনের *পরিবেশনা থেকে সংগৃহীত*। ওয়ান মিউজিক বিডি, ইউটিউব। লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=MiUGX5pim5E

শুভেন্দু ইমাম [সম্পা.] (২০০৯)। *শাহ আবদুল রচনাসমগ্র*। বাতিঘর, চট্টগ্রাম।

সজল রোশন (২০২১)। *রিলিজিয়াস মাইন্ডসেট-১ : বিশ্বাসের ঢেঁকি গেলা*। মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ঢাকা।

সরকার সেলিম নুরী (২০২১)। *মাসুদ সরকার ও পাগলী সাথীর বিয়াই-বিয়াইন গান পরিবেশনা*। এস.কে মিউজিক, ইউটিউব। লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=xODBIGJ_6ok

সাইদুর রহমান লিপন (২০১০)। *বাংলাদেশের লোকনাট্যে অভিনয় পদ্ধতি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

সাইমন জাকারিয়া (২০০৮)। *বাংলাদেশের লোকনাটক বিষয় ও আঙ্গিক-বৈচিত্র্য*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

সালাম সরকার (২০২০)। *মঞ্চে বিচারগানের পরিবেশনা*। ময়মনসিংহ।

সালাম সরকার (২০২০)। *গীতিকার-সুরকারের স্বকণ্ঠে গাওয়া একাধিক পরিবেশনা হতে সংগৃহীত*। রিপন সরকার বাউল মিডিয়া, ইউটিউব। লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=1uBdGWEFLeA

সাহেব আলী চিশতি (২০২৩)। *গবেষক কর্তৃক সাক্ষাৎকার গ্রহণ*। হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ।

সুনীল কর্মকার (২০১৮)। *ভিসিডি ক্যাসেট : বিচারগানের আদম সৃষ্টি-নুর সৃষ্টি পালা*। বাউল মেলা, ইউটিউব।

লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=JMOS8g9F-gA

সুনীল কর্মকার (২০২০)। *মঞ্চে বিচারগানের বন্দনাগীত পরিবেশনা*। ফকির মওলা দরবার শরীফ, মানিকগঞ্জ।

সুরুজ মিয়া বয়াতি ও আকলিমা বেগম (১৯৯৯)। *অডিও ক্যাসেট : বিচারগানের দেবর-ভাবী পালা*। ঢাকা।

লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=_nHGRgcJY-g&t=2196s

সোনিয়া মুর (১৯৯৯)। *স্তানিস্লাভ্স্কির অভিনয় পদ্ধতি*। [অনুসৃজনঃ মুস্তাফিজুর রহমান সৈয়দ], বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

সোনিয়া সরকার (২০২৩)। *গবেষক কর্তৃক সাক্ষাৎকার গ্রহণ*। মিরপুর, ঢাকা।

সৈয়দ গওহার আলী চিশতি (২০০১)। *জ্ঞান সঙ্গীত*। পীরজাদারা, মানিকগঞ্জ।

সৈয়দ জামিল আহমেদ (১৯৯৫)। *হাজার বছর : বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকলা*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা

সৈয়দ জাহিদ হাসান (২০১৯)। *লালন-গুরু সিরাজ সাঁইয়ের গান*। আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম (১৯৯৯)। 'বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্যে লোকনাট্য'। *বাংলার লোকঐতিহ্য লোকনাট্য* [সম্পা. সৈকত আসগর], বাংলা একাডেমি, ঢাকা

হবিল সরকার (২০২২)। *দেহতত্ত্ব-পারঘাটা পালা*। সুরের বাঁধন, ইউটিউব।

লিংক- https://www.youtube.com/watch?v=R27_ix1XwtI

হাসানুর কবীর [সম্পা.] (১৯৯৯)। *খালেক দেওয়ান গীতি সমগ্র (১ম খণ্ড)*। খালেক দেওয়ান ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

হাসানুর কবীর [সম্পা.] (২০০০)। *খালেক দেওয়ান গীতি সমগ্র (২য় খণ্ড)*। খালেক দেওয়ান ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

হিমেল শাহ চিশতি (২০২৩)। *গবেষক কর্তৃক সাক্ষাৎকার গ্রহণ*। কলতা, মানিকগঞ্জ।

Atiqul Huque Choudhury (1999).'Focus on folk drama'. *বাংলার লোকঐতিহ্য লোকনাট্য*। [সম্পা. সৈকত আসগর], বাংলা একাডেমি, ঢাকা

Syed Jamil Ahmed (2000). *Achinpakhi Infinity: Indigenous Theatre of Bangladesh.* The University Press Limited, Dhaka.